# বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয়নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধের স্বরূপ

**(The Nature of Religious Morals and Human Values in the National Education Policy of Bangladesh.)**

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ]


**গবেষক**

**মাসরুরুল হক**

পিএইচ.ডি গবেষক

রেজিঃ নং- ৪৬/২০১৮-২০১৯ (পুনঃ)

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

**গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক**

ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী

অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

**যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক**

ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান

অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।



ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

*Dr. A B M Siddiqur Rahman Nizami*
Professor & Former Chairman
**Department of Arabic**
Former Director, Centre for Arabic Teaching,
Training & Research (CATTR)
University of Dhaka, Dhaka-1000, Bangladesh

الدكتور إي بي إيم صديق الرحمن نظامي
أستاذ ورئيس سابق، قسم العربية
مدير سابق، المركز لتعليم العربية والتدريب والبحوث
جامعة داكا، داكا-١٠٠٠، بنغلاديش

Ref. No. .....  Date .....

# প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ-এর অধীনে পিএইচ.ডি গবেষক জনাব মাসরুরুল হক (রেজি: ৪৬, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯ (পুন:)) কর্তৃক উপস্থাপিত **"বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয়নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধের স্বরূপ** (The Nature of Religious Morals and Human Values in the National Education Policy of Bangladesh.)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় লিখিত হয়েছে। এটি একটি তথ্যবহুল ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। এই গবেষণাকর্মে Plagiarism-নেই। আমাদের জানামতে, অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশবিশেষ অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা থেকে প্রকাশ কিংবা ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমরা এর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছি এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদানের নিমিত্তে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমাদানের সুপারিশ করছি।

**(অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী)**
**তত্ত্বাবধায়ক**
**আরবী বিভাগ**
**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।**

Tel: +88-02-9661920-73 Ext: 6100, 6101  Mob: +88-01552428610  E-mail: abmsr66@gmail.com

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৬৬১৯০০-৭৩/৬৩৩০

Department of Islamic History & Culture
University of Dhaka
Dhaka 1000
Phone: 9661900-73/6330
E-mail : ihc@du.ac.bd

নং :.....

তারিখ : .....

# প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ-এর অধীনে পিএইচ.ডি গবেষক জনাব মাসরুরুল হক (রেজি: ৪৬, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯ (পুন:)) কর্তৃক উপস্থাপিত **"বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয়নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধের স্বরূপ** (The Nature of Religious Morals and Human Values in the National Education Policy of Bangladesh.)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় লিখিত হয়েছে। এটি একটি তথ্যবহুল ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। এই গবেষণাকর্মে Plagiarism-নেই। আমাদের জানামতে, অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশবিশেষ অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা থেকে প্রকাশ কিংবা ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমরা এর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছি এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদানের নিমিত্তে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমাদানের সুপারিশ করছি।

'9.12.25

**(ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান)**
অধ্যাপক ও যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

# ঘোষণা পত্র

আমি এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, **বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয়নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধের স্বরূপ** (The Nature of Religious Morals and Human Values in the National Education Policy of Bangladesh.) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী ও যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান-এর তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটি আমার নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ বা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি এই মর্মে আরো অঙ্গীকার করছি যে, আমার দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভে কোনো Plagiarism নেই।

গবেষক

১২.১২.২৫

(মাসরুরুল হক)
রেজিঃ নং ৪৬
শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৮-২০১৯ (পুনঃ)
যোগদানঃ ১২/০৬/২০১৮ খ্রি.
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

# শব্দ সংকেত বিবরণী

| | | |
|---|---|---|
| অ. | : | অনুবাদ |
| আ. | : | আলায়হিস সালাম |
| আনু. | : | আনুমানিক |
| ই.ফা.বা. | : | ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ |
| খ. | : | খণ্ড |
| খ্রি. | : | খ্রিস্টাব্দ |
| ড. | : | ডক্টর |
| ডা. | : | ডাক্তার |
| তা.বি. | : | তারিখ বিহীন |
| পৃ. | : | পৃষ্ঠা |
| দ্র. | : | দ্রষ্টব্য |
| বি.দ্র. | : | বিস্তারিত দ্রষ্টব্য |
| বা. | : | বাংলা/বঙ্গাব্দ |
| মৃ. | : | মৃত্যু |
| মু. | : | মুহাম্মদ |
| মাও. | : | মাওলানা |
| রা. | : | রাদি আল্লাহু তা'আলা 'আনহু |
| রহ. | : | রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি |
| লি. | : | লিমিটেড |
| সা. | : | সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম |
| সং. | : | সংস্করণ |
| হি. | : | হিজরি |
| Ltd. | : | Limited |
| P. | : | Page |
| Vol. | : | Volume |
| Ed. | : | Edition |
| Pub | : | Publisher |

Dhaka University Institutional Repository

## আরবি বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

## ( رموز تلفظ الحروف العربية بالبنغالية )

| বর্ণ | প্রতিবর্ণ | বর্ণ | প্রতিবর্ণ | বর্ণ | প্রতিবর্ণ | বর্ণ | প্রতিবর্ণ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اء | অ | ض | দ/জ্ব | ـَ | া | وُ | উ |
| ب | ব | ط | ত্ব | ـِ | ি | وُوْ | ঊ |
| ت | ত | ظ | য | ـُ | ু | وٍيْ | বি/ভী |
| ث | ছ | ع | ‘ | اَ | া | يَ | ইয়া |
| ج | জ | غ | গ | اِيْ | ী | يِ | ই |
| ح | হ | ف | ফ | اُوْ | ূ | يِيْ | ঈ |
| خ | খ | ق | ক্ব/ক | أ | আ | يُ | য়ু |
| د | দ | ك | ক | أ | আ | يُوْ | য়ূ |
| ذ | য | ل | ল | إ | ই | عَ | ‘আ/‘য়া |
| ر | র | م | ম | إيْ | ঈ | عَا | ‘আ/‘য়া |
| ز | য | ن | ন | أ | উ | عِ | ই |
| س | স | ه | হ | أُ | ঊ | عِيْ | ঈ |
| ش | শ | و | ও | وَ\وَا | ওয়া | عُ | উ |
| ص | ছ | ي | য় | وِ | বি | عُوْ | ঊ |

Dhaka University Institutional Repository

# সারসংক্ষেপ (Abstract)

একটি জাতির মনন গঠনে শিক্ষানীতির ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশের মতো বহুসাংস্কৃতিক, ধর্মীয়ভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে শিক্ষানীতিতে ধর্ম ও সার্বজনীন মানবীয় মূল্যবোধের সমন্বয় একটি জটিল ও আলোচিত বিষয়। এই গবেষণায় বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে শুরু করে বর্তমান বাস্তবতা পর্যন্ত একটি বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা শুরু থেকেই ধর্মীয় প্রভাব এবং আধুনিক ও মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের ধর্মভিত্তিক শিক্ষা থেকে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে যে পরিবর্তন আসে, তারই ধারাবাহিকতায় স্বাধীন বাংলাদেশ জন্মলাভ করে একটি অসাম্প্রদায়িক, সমতাভিত্তিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত রাষ্ট্র হিসেবে। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) এই চেতনাকে ধারণ করে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক ও উৎপাদনমুখী শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব করলেও তাতে ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য না দেওয়ায় যথেষ্ট বিতর্কিত ছিল এই শিক্ষানীতি।

তবে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষানীতিতেও পরিবর্তন আসে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ হলো একটি মাইলফলক, যা নিজ নিজ ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, মানবাধিকার, সাম্য ও নাগরিক দায়িত্ববোধের মতো সার্বজনীন মানবীয় মূল্যবোধের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই নীতির বাস্তবায়ন পর্যায়ে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষানীতিতে নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত বিষয়কে যেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বাস্তবে তার প্রতিফলন পাঠ্যপুস্তকে দেখা যায়নি।

পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণে দেখা যায়, যদিও সীমিত পরিসরে পাঠ্যপুস্তকে মানবীয় মূল্যবোধ ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তবে প্রায়োগিক দিকে তা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষকদের অবহেলা, রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি, এবং রাজনৈতিক প্রভাব প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধের অবস্থান একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক, দার্শনিক এবং সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার ফল। এই গবেষণায় প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি থেকে শুরু করে স্বাধীনতা পরবর্তী শিক্ষা কমিশন ও সরকারি নীতিতে ধর্ম, নৈতিকতা এবং মানবিকতার অবস্থান বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল- ধর্মীয় নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধ জাতীয় শিক্ষানীতিতে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, পাঠ্যপুস্তকে কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং বাস্তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এর বাস্তবায়ন কতটা কার্যকর হয়েছে তা অনুসন্ধান করা।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় শিক্ষা বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি ঐতিহ্যবাহী ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় পরিচয়, বিশ্বাস, আচরণ এবং নৈতিকতা গঠনে সহায়ক। জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিকস্তরে বাধ্যতামূলক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে বাস্তব প্রয়োগে দেখা যায়, ধর্মীয় শিক্ষা অনেক সময় শুধুমাত্র পরীক্ষার বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে, যার ফলে এর নৈতিক ও মানবিক প্রভাব শিক্ষার্থীদের আচরণে দৃশ্যমান হয় না। পাঠ্যবইয়ের মান, শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব এবং সময়সীমার সংকোচন ধর্মীয় শিক্ষার কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়।

অন্যদিকে, মানবীয় মূল্যবোধ–যেমন সততা, সহানুভূতি, ন্যায়বোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, অসাম্প্রদায়িকতা, এবং মানবাধিকার সচেতনতা–শিক্ষার্থীদের একটি মানবিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক। শিক্ষানীতিতে এই মূল্যবোধ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আলাদা গুরুত্ব বা কাঠামো নেই। পাঠ্যবইয়ে নৈতিক গল্প, কবিতা, জীবনী এবং অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তা অনেক সময় শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসিক বিকাশ এবং বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। শিক্ষকরা মূল্যবোধ শেখানোর মূল বাহক হলেও তাদের প্রশিক্ষণ, সময় এবং পদ্ধতিগত সহায়তা সীমিত। মূল্যায়ন পদ্ধতিতে মূল্যবোধের প্রতিফলন না থাকায় শিক্ষার্থীরা তা পরীক্ষার বাইরে রেখে দেয়।

**বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধের স্বরূপ** শীর্ষক এই গবেষণা বাংলাদেশের শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি, মূল্যবোধ নির্মাণের কাঠামো এবং জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থান বিশ্লেষণ করা। স্বাধীনতার পূর্বপর্ব থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষা-উন্নয়নের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও চরিত্র-গঠনের উপাদান কতটুকু অগ্রাধিকার পেয়েছে–তা নির্ণয়ের মাধ্যমে শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের গুণগত মান বোঝা এই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। একই সঙ্গে জাতীয়, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় এবং বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এর বাস্তবায়ন-সমস্যা ও করণীয় প্রণয়নও গবেষণার কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ উপস্থাপিত হয়েছে। বাঙালী সমাজে শিক্ষা শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন নয়; বরং মানবিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত–এমন এক দৃষ্টিভঙ্গির রূপরেখা এখানে উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, বিদ্যাসাগর ও বেগম রোকেয়ার শিক্ষাচিন্তকের ধারণা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে, মানুষ নির্মাণই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য–এই বোধ সর্বদা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ে স্বাধীনতা-পরবর্তী শিক্ষা কমিশনসমূহ এবং সরকারি শিক্ষানীতির ধারাবাহিকতা উন্মোচিত হয়েছে। ১৯৭২ সালের কুদরত-এ-খুদা কমিশন থেকে শুরু করে সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি পর্যন্ত সব নীতিমালায় নৈতিক শিক্ষাকে একটি মৌলিক লক্ষ্য হিসেবে স্থান দেওয়া হলেও এর বাস্তবায়নে অস্বচ্ছতা, অসঙ্গতি এবং কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা রয়েঝে। যা প্রমাণিত হয়েছে নথিপত্র, রিপোর্ট ও সরকারি সুপারিশ বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

চতুর্থ অধ্যায়ে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টসমূহে ধর্মীয় নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধের অবস্থান ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষিত হয়েছে। অধিকাংশ কমিশন ধর্মীয় শিক্ষা, চরিত্র গঠন, মানবিকতা, সহিষ্ণুতা ও নৈতিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও পাঠ্যক্রম-সংস্কার, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, ও মূল্যায়নব্যবস্থায় এর যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি–এমন এক বাস্তবতা এখানে প্রতীয়মান হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয় নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধের প্রতিফলন বিশ্লেষিত হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যবই বিষয়বস্তু, নৈতিক পাঠ, গল্প, কবিতা ও ইতিহাস পাঠে মানবীয় মূল্যবোধের উপস্থিতি চিহ্নিত করা হলেও পাঠ্যবইয়ের কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, বিষয়বস্তুর অসংগতি, প্রয়োগে বৈচিত্র্যহীনতা এবং শিক্ষকের দক্ষতার ঘাটতির কারণে এগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নৈতিক শিক্ষার অবস্থান উপস্থাপিত হয়েছে। ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতার ধারণা পর্যালোচনার মাধ্যমে দেখা যায় যে আধুনিক বিশ্বে শিক্ষার লক্ষ্য কেবল জ্ঞান নয়; বরং দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি করা। বিশ্বব্যাপী "Value-based Education", "Moral and Civic Education" এবং "Character Education" ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে–যা বাংলাদেশের জন্যও তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

সপ্তম অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের সমস্যা, চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষক স্বল্পতা, প্রশিক্ষণের ঘাটতি, সময় বরাদ্দের সীমাবদ্ধতা, পাঠ্যপুস্তকগত দুর্বলতা, পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের সমন্বয়ের অভাব ও প্রযুক্তিগত বিভ্রান্তি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পাশাপাশি করণীয় হিসেবে নীতিমালার পুনর্গঠন, পাঠ্যক্রম সংস্কার, শিক্ষক প্রশিক্ষণের উন্নয়ন, মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তন, পরিবার-সম্পৃক্ততা, এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

সার্বিকভাবে, এই গবেষণা প্রমাণ করেছে যে বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধ একটি মৌলিক ও অপরিহার্য উপাদান হলেও এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য একীভূত নীতিনির্ধারণ, সুসংগঠিত পরিকল্পনা, প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ, আধুনিক পদ্ধতি,

Dhaka University Institutional Repository

মনস্তাত্ত্বিক বোঝাপড়া এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড প্রয়োজন। গবেষণার ফলাফল ভবিষ্যতের নীতি-নির্ধারক, গবেষক, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষক ও পাঠ্যক্রম বিশেষজ্ঞদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা হিসেবে কার্যকর হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

গবেষণায় দেখা গেছে, শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় শিক্ষাকে পরীক্ষার বিষয় হিসেবে দেখে, এবং মানবীয় মূল্যবোধকে বাস্তব জীবনে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। তারা মূল্যবোধ শেখার জন্য গল্প, ভিডিও, নাটক, এবং বাস্তব উদাহরণ চায়, যা বর্তমান পাঠ্যবই ও শ্রেণিকক্ষে সীমিত। শিক্ষকদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হলেও পাঠ্যবইয়ের মান, প্রশিক্ষণের অভাব এবং সময়ের সীমাবদ্ধতা তাদের কার্যকর ভূমিকা পালনে বাধা সৃষ্টি করে। অভিভাবকরা ধর্মীয় শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, বিশেষ করে চরিত্র গঠনের জন্য, এবং তাদের প্রত্যাশা মানবীয় মূল্যবোধ শেখানোর জন্য স্কুলে কার্যক্রম বাড়ানো হোক।

পাঠ্যবই বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ধর্মীয় পাঠ্যবইয়ে কিছু ক্ষেত্রে তথ্যগত অসঙ্গতি, পক্ষপাতমূলক উপস্থাপন এবং সহনশীলতার অভাব রয়েছে। মানবীয় মূল্যবোধ বিষয়ক উপাদানগুলো অনেক সময় গল্প বা কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যার ফলে শিক্ষার্থীরা তা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয় শিক্ষা আলাদা বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত, তবে সময়সীমা সীমিত। মানবীয় মূল্যবোধ পাঠ্যসূচির বিভিন্ন বিষয়ে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু আলাদা গুরুত্ব নেই। মূল্যায়ন পদ্ধতিতে মূল্যবোধের প্রতিফলন নেই, ফলে শিক্ষার্থীরা তা গুরুত্ব দেয় না।

এই গবেষণায় চিহ্নিত হয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ–যেমন পাঠ্যবই ও পাঠ্যসূচির সীমাবদ্ধতা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব, মূল্যায়ন পদ্ধতির দুর্বলতা, প্রশাসনিক অস্পষ্টতা, এবং সামাজিক বাস্তবতার সাথে অসামঞ্জস্য। তবে এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা–নৈতিক ও মানবিক প্রজন্ম গঠনের সুযোগ, সহনশীল  সমাজ গঠনের সম্ভাবনা, পাঠ্যবই, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন, প্রযুক্তি ও মিডিয়ার মাধ্যমে মূল্যবোধ শিক্ষা, এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা গঠনের পথ।

এই থিসিসের আলোকে সুপারিশ করা হয়েছে–

- পাঠ্যবই ও পাঠ্যসূচির উন্নয়ন
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
- মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার
- সহশিক্ষা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ
- প্রযুক্তি ও মিডিয়ার ব্যবহার
- ধর্মীয়নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধের সমন্বয়
- নিয়মিত গবেষণা ও মূল্যায়ন।

Dhaka University Institutional Repository

এই গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও বিশ্লেষণ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় ও মানবীয় মূল্যবোধের কার্যকর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। শিক্ষা শুধু তথ্য নয়, বরং মূল্যবোধের বাহক। ধর্মীয় শিক্ষা যদি সহনশীলতা শেখায়, এবং মানবীয় মূল্যবোধ যদি মানবতা জাগ্রত করে–তাহলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ হয়। এই গবেষণার মাধ্যমে আমরা সেই উদ্দেশ্যকে আরও সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছি, এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নৈতিক, মানবিক ও সহনশীল সমাজ গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিতে পারি।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধের একটি আনুষ্ঠানিক ও আদর্শিক সমন্বয় থাকলেও, এর সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন একটি রাজনৈতিক ঐক্যমত্য, শিক্ষকদের কার্যকর প্রশিক্ষণ, এবং একটি সর্বজনীন, সমন্বয়বাদী ও সমালোচনামূলক চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাহলেই শিক্ষানীতি কেবল নীতিদলিলেই সীমাবদ্ধ না থেকে একটি উন্নত, নৈতিক ও সম্প্রীতিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠনের কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত হতে পারবে।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। যিনি তাঁর অসীম অনুগ্রহে **"বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয়নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধের স্বরূপ** (The Nature of Religious Morals and Human Values in the National Education Policy of Bangladesh.)" শীর্ষক বিষয়ে আমাকে এই পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ রচনা করার তাওফীক দান করেছেন। সাথে সাথে দরূদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মহান শিক্ষক ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি, তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবাদের (রা) প্রতি যারা ইসলামি শিক্ষার প্রসারে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যার এবং যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের মাননীয় ডিন এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান স্যারের প্রতি। কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক, সাবেক বিভাগীয় প্রধান ও বাংলা একাডেমির সভাপতি আবুল কাসেম ফজলুল হক স্যারকে। যারা গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলক্ষেত্রে আমাকে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। এক কথায় তাঁদের অনুপ্রেরণা ও সহায়তা না পেলে আমার গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হতো কি না সন্দেহ ছিল। বিশেষ করে গবেষণা বিষয়ে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক স্যারের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও মূল্যবান পরামর্শে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। গবেষণায় সহযোগিতার পাশাপাশি মানবপ্রেম, পারিবারিক-সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করণে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে আমার চিন্তা ও মননে অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক, ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী এবং ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান স্যারের পরামর্শ ও ব্যক্তিত্ব আমাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ও বিমোহিত করেছে। শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে এ ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। তাঁদের সুস্থতাসহ কর্মমুখর দীর্ঘজীবন কামনা করছি। গবেষণার প্রয়োজনে যাঁদের সময় অসময়ে বিরক্ত করেছি। কাজ করতে গিয়ে যেখানে সমস্যা মনে হয়েছে সেখানেই তাঁদের শরণাপন্ন হয়েছি। তাঁরা আমাকে সবসময় সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনার ফলে আমি থিসিস সম্পন্ন করতে পেরেছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের সাবেক অধ্যাপক মিসেস জীনাত আরা সিরাজীর প্রতি। কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী নূরুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

স্যারকে, যাঁর কাছ থেকে থিসিস সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বার বার পরামর্শ নিয়েছি। আমি আরও কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক এবং উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়া, প্রিয় বন্ধু অধ্যাপক ড. মুফতী মুহাম্মদ গোলাম রববানীর প্রতি। কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. হাবিব রহমান কে যাঁরা অকৃপণভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার অভিভাবক সমতুল্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মস্তফা আবুলউলায়ী ও বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ক্বারী মোহাম্মদ ইদ্রিস আলীর প্রতি। যাঁদের দোয়া ও সহযোগিতা আমি সবসময়ই পেয়ে থাকি।

পিএইচ.ডি গবেষণায় আমার জান্নাতবাসিনী মায়ের অনুপ্রেরণা ছিল অতুলনীয়। অথচ তাঁর জীবদ্দশায় গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে পারি নি। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে আম্মা ও আব্বাকে স্মরণ করছি এবং তাঁদের মাগফেরাত কামনা করছি। আমি গভীর শ্রদ্ধর সঙ্গে আমার শ্রদ্ধেয় শাশুড়ি মা সালেহা হুদার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যার স্নেহ, প্রেরণা এবং আন্তরিক দোয়া আমার পথ চলাকে সর্বদা আলোকিত ও সুন্দর করছে। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই প্রিয়তমা স্ত্রী, কিশোরগঞ্জ জেলা শিক্ষা অফিসার শামছুন নাহার মাকছুদাকে, গবেষণা কাজে যিনি সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। আরও কৃতজ্ঞতা শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রদ্ধেয় অগ্রজ সহোদর মো. মাযহারুল হক রিপন ও এডভোকেট মো. মনিরুল হক রাজন ভাইয়ের প্রতি, পিএইচ.ডি রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যারা আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমার শ্রদ্ধেয় চার বড় বোন আনিছা, ঝুনু, আইরিন ও মনা আপা এবং স্নেহের দুই ছোট ভাই তানশির ও রবিনের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাদের ভালোবাসা, সহানুভুতি ও নিরন্তর সহযোগিতা আমার গবেষণার প্রতিটি ধাপে মানসিক শক্তি ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে। তাদের সহমর্মিতা ও উৎসাহ আমার এই গবেষণা কর্ম সম্পদনের পথে অমূল্য ভূমিকা রেখেছে।

চার ভগ্নিপতি ও দুই ভাবীসহ পরিবারের সকলেই গবেষণা কর্মটি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য আমাকে সব সময় তাগিদ দিয়েছেন। বিশেষ করে আমার চার ভগ্নিপতি ডা. মো. আশারাফ আলী, মরহুম ইঞ্জিনিয়ার মো. হারেছ আলী, অধ্যাপক এ. ডি. এম. মুহিববুল্লাহ ও বিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরমাণু বিজ্ঞানী রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের সাবেক প্রকল্প পরিচালক ও বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মো. শৌকত আকবরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তাঁরা আমাকে নিরন্তর উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন।

পরামর্শ, সহযোগিতা এবং নানা বিষয়ে জ্বালাতন করায় প্রিয়বন্ধু লেখক ও সাংবাদিক, একুশে টেলিভিশনের নিউজরুম এডিটর সমর ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং প্রিয় সহকর্মী বন্ধু জামালপুর জিলা স্কুলের ইংরেজি বিষয়ের সিনিয়র শিক্ষক মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, প্রিয় সহকর্মী মো. আবদুস সালাম, আবু হাছানাত মো. আনিছুর রহমান ও উত্তরণ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা এর সাহিত্য সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থী প্রিয়াঙ্কার প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। প্রুফ সংশোধনসহ গবেষণা সংশ্লিষ্ট নানা কাজে অকৃনপভাবে সহযোগিতা করার জন্য প্রিয়াঙ্কার অবদান আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। আমার এই অর্জনের পেছনে সবচেয়ে বড় ত্যাগটি করেছে আমার আদরের তিন সন্তান। প্রিয় মাশফি, ইকতিনা ও নাজিব, এই দীর্ঘ সময় তাদের অনেক আদর-স্নেহ ও সময় কেড়ে নিয়েছি। তাদের অসীম ধৈর্য, বুঝাপড়া এবং হাসিমুখই ছিল আমার এই কঠিন পথ চলার সবচেয়ে বড় শক্তি। এই কাজটি তোমাদেরই জন্য উৎসর্গিত। এছাড়াও যে সকল গুরুজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জন আমাকে অনুপ্রাণিত ও সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও রইল আন্তরিক মোবারকবাদ। এই গবেষণা করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলকাতা-ভারত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, জাতীয় জাদুঘর গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরি, কলিকাতা সেন্ট্রাল লাইব্রেরিসহ বিভিন্ন পত্রিকা অফিস থেকে বই ও পত্র-পত্রিকা ব্যবহার করেছি। ঐসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে যেসব স্বনামধন্য লেখকের গ্রন্থ থেকে সূত্র উল্লেখসহ তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করেছি তাঁদের প্রতিও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

# সূচিপত্র


| অধ্যায় | | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| | | ♦ **প্রত্যয়নপত্র** | ii |
| | | ♦ **ঘোষণাপত্র** | iii |
| | | ♦ **শব্দ সংকেত বিবরণী** | iv |
| | | ♦ **আরবি বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত** | v |
| | | ♦ **সারসংক্ষেপ (Abstract)** | vi-x |
| | | ♦ **কৃতজ্ঞতা স্বীকার** | xi-xiii |
| | | ♦ **ভূমিকা** | **১-৫** |
| **প্রথম অধ্যায়** | : | **বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা: ঐতিহাসিক পটভূমি** | **৬-৮৬** |
| | | বাংলার প্রাচীন যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা | ৭ |
| | | বৈদিক শিক্ষা | ৮ |
| | | মধ্যযুগের শিক্ষা ব্যবস্থা | ১১ |
| | | প্রাথমিক শিক্ষা | ১২ |
| | | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা | ১৬ |
| | | পাঠ্য তালিকা | ১৯ |
| | | শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা | ২৩ |
| | | নারী শিক্ষা | ৩০ |
| | | পাঠশালা | ৪৪ |
| | | মিশনারি শিক্ষা | ৫০ |
| | | ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা | ৫১ |
| | | পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা | ৭৫ |
| **দ্বিতীয় অধ্যায়** | : | **বাংলায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ** | **৮৭-১২৫** |
| | | শিক্ষার পরিচয় | ৮৮ |
| | | শিক্ষা চিন্তা | ৯১ |
| | | শিক্ষার লক্ষ্য | ৯২ |

Dhaka University Institutional Repository


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | মুসলিম শিক্ষা | ৯৩ |
| | | ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা | ৯৪ |
| | | সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা | ৯৯ |
| | | বিদ্যোৎসাহীদের প্রয়াস | ১০৭ |
| | | মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা | ১১০ |
| | | মুসলিম সাহিত্য সমাজ | ১১৩ |
| | | নারী শিক্ষা উন্নয়নে গঠিত সংস্থা | ১১৬ |
| | | বাংলার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ১২০ |
| **তৃতীয় অধ্যায়** | : | **প্রাক-স্বাধীনতা শিক্ষাকমিশন ও সরকারি শিক্ষানীতিতে ধর্মীয়নীতি ও মূল্যবোধ প্রসঙ্গ** | **১২৬-১৪৭** |
| | | ব্রিটিশ আমল (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.)<br>ভারতের প্রথম শিক্ষানীতি | ১২৮ |
| | | ভারতীয় জাতীয় শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশন-১৮৮২ খ্রি. | ১৩০ |
| | | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, ১৯০২ খ্রি. | ১৩১ |
| | | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি- ১৯১২ খ্রি. | ১৩২ |
| | | হার্লে কমিটি ১৯১৫ খ্রি. | ১৩৩ |
| | | শামসুল হুদা কমিটি- ১৯২১ খ্রি. | ১৩৪ |
| | | হার্টোগ কমিটি রিপোর্ট- ১৯২৯ খ্রি. | ১৩৫ |
| | | মুসলিম এডুকেশন এডভাইজারি (মোমিন) কমিটি, ১৯৩১-৩৪ খ্রি. | ১৩৬ |
| | | মাদ্রাসা শিক্ষা (মওলা বখস) কমিটি- ১৯৪১ খ্রি. | ১৩৭ |
| | | মাদ্রাসা সিলেবাস (সৈয়দ মুয়াযযাম উদ্দীন হোসেন) কমিটি- ১৯৪৭ খ্রি. | ১৩৮ |
| | | ব্রিটিশ বাংলায় সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয় শিক্ষা অর্ন্তভুক্তকরণ | ১৩৯ |
| | | পাকিস্তান আমল: ১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি. শিক্ষা কমিশন | ১৪০ |
| **চতুর্থ অধ্যায়** | : | **স্বাধীনতা পরবর্তী শিক্ষাকমিশন ও সরকারি শিক্ষানীতিতে ধর্মীয়নীতি ও মূল্যবোধ প্রসঙ্গ** | **১৪৮-১৭৮** |
| | | শিক্ষানীতির পরিচয় | ১৫১ |
| | | জাতীয় শিক্ষা কমিশন-১৯৭২ খ্রি. (কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন) | ১৫১ |
| | | ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্কীম: (ড: এম. এ. বারী) কমিটি, ১৯৭৭ খ্রি. | ১৫৬ |
| | | ১৯৭৮ সালের শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন | ১৫৮ |

Dhaka University Institutional Repository


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন-১৯৮৮ খ্রি. (মফিজ উদ্দীন কমিশন) | ১৫৯ |
| | | মাদ্রাসা শিক্ষা (ড. এম.এ. বারী) কমিটি, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ | ১৬৪ |
| | | জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি-১৯৯৭ খ্রি. | ১৬৫ |
| | | শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি-২০০২ | ১৭১ |
| | | জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩ (মনিরুজ্জামান মিয়া কমিশন) | ১৭৪ |
| | | জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ | ১৭৬ |
| **পঞ্চম অধ্যায়** | : | **পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয়নীতি ও মূল্যবোধ প্রসঙ্গ** | **১৭৯-২২৯** |
| | | ধর্ম | ১৮১ |
| | | নৈতিকতা | ১৮১ |
| | | মূল্যবোধ | ১৮৪ |
| | | ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যাবোধের প্রয়োজনীয়তা | ১৮৪ |
| | | ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা | ১৮৭ |
| | | ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়ন | ১৮৯ |
| | | জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০১০ এর আলোকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয়নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধ প্রসঙ্গ: মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা | ১৯৭ |
| **ষষ্ঠ অধ্যায়** | : | **শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার অবস্থান: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট** | **২৩০-২৪৭** |
| | | ইউরোপে নৈতিক শিক্ষা | ২৩২ |
| | | যুক্তরাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা | ২৩৩ |
| | | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা | ২৩৭ |
| | | জাপানের শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা | ২৩৯ |
| | | ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা | ২৪১ |
| | | শ্রীলংকার শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা | ২৪২ |
| | | গণচীনের শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা | ২৪৪ |
| **সপ্তম অধ্যায়** | : | **ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়ন: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমস্যা ও করণীয়** | **২৪৮-২৬৬** |
| | | **উপসংহার** | **২৬৭-২৭২** |
| | | **গ্রন্থপঞ্জি** | **২৭৩-২৯২** |
| | | **পরিশিষ্ট** | **২৯৩-৩৭৩** |

Dhaka University Institutional Repository

# ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

# ভূমিকা

শিক্ষা জাতির উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পৃথিবীতে যে জাতি যতবেশি শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। অনুন্নত দেশের উন্নতির পথে অন্যতম অন্তরায় শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা হতে সুফল পাওয়া না গেলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাছন্ন হয়ে পড়ে। তাই কার্যকর জীবনমুখী ও কল্যাণকর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য। কর্ম বা উপার্জনই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য নয়। প্রকৃত শিক্ষা তাই যা মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত লুপ্ত শক্তিকে চিনিয়ে দেয়। একজন সুশিক্ষিত মানুষ অন্যের থেকে পৃথক হয়ে পড়ে তার উন্নত মার্জিত রুচিবোধ, সততা, ন্যায়নীতি, আচারনিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতার মাধ্যমে। প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তি জীবনে এ মানবিক গুণাবলী অর্জিত হয়। একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি চারিত্রিক গুণাবলীতে বলীয়ান হয়েই অন্যের কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা ভাবেন। যে শিক্ষা শিক্ষার্থীদের আত্মশক্তিতে বলীয়ান করতে ব্যর্থ সে শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে ব্যর্থ। কেননা শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করা। মানব জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। আজ সারা বিশ্বেই প্রচন্ড রকমের অস্থিরতা বিরাজমান। অধিকাংশ মানুষই কোন না কোন অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। ন্যায়ের প্রতি আগ্রহ খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। সর্বত্রই ভোগবাদী প্রবণতা, সহযোগিতা ও সহানুভূতির পরিবর্তে পরস্পরের প্রতি অবহেলা, কর্তব্যের প্রতি অবহেলা, ব্যক্তি স্বার্থ চারিতার্থের জন্য অশুভ তৎপরতা, জনকল্যাণের প্রতি অনীহা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ধরণের ঘৃণ্য মানসিকতা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে অস্থির করে তুলছে। বর্তমানে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় চোখ বুলালে দেশের সর্বত্রই নৈতিক অবক্ষয়ের করুণ চিত্র ফুঠে ওঠে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুষ, দূর্নীতি, নারী নির্যাতন, খুন, রাহাজানি ও মাদকাসক্তি ভয়ঙ্কররূপে বিস্তার লাভ করছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের মাধ্যমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ছাত্র - শিক্ষক সম্পর্ক এবং অভিভাবদের সাথে সন্তানদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈরিভাব বিরাজ করছে। শিক্ষার্থীরা আজ সহপাঠী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে সহিংস আচরণ করছে। আচরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কেন এ ধরণের বিচ্যুতি ঘটছে তা খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের মাঝে নৈতিক মূলবোধ বিরাজমান থাকলে সমাজ জীবনেও নৈতিকতার প্রতিফলন দেখা যায়। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতেই শিক্ষার বা স্বাক্ষরতার হার বেড়েছে। বেড়েছে মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণও। শিক্ষার হার বাড়ার পাশাপাশি মানুষের নিরাপত্তা, সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক অগ্রগতিও ত্বরান্বিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি খুব কমই পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই ব্যক্তি পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির স্বার্থে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। মনুষ্যত্বের যথার্থ বিকাশ ও সামাজিক অবক্ষয় হতে দেশ ও জাতিকে রক্ষার জন্য নৈতিক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দেশের সংবিধান ও জাতীয় শিক্ষা নীতির আলোকে নৈতিক শিক্ষা প্রদানের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সংযোজন করা হলেও বাস্তবে এর প্রতিফলন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে না। একটি উন্নত, সমৃদ্ধ, নৈতিক ও মানবিক সমাজ গঠনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষা প্রদান ও অনুশীলনের বিকল্প নেই। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নাগরিকদের নৈতিক ও মানবিক শিক্ষা প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশের সংবিধান, শিক্ষানীতি ও শিক্ষাক্রমে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রসঙ্গে গুরুত্বের সাথে আলোচিত হলেও পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত বিষয়াবলী শিক্ষাদান ও অনুশীলনের প্রতি কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তা বাংলাদেশের বর্তমান সমাজব্যবস্থা ও যাপিত জীবনের আলোকে বিচার বিবেচনা ও বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

আমাদের জাতীয় জীবনে নৈতিক অধঃপতন এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় আজ তীব্র আকার ধারণ করেছে। জাতীয় বিপর্যয়ের এই সন্ধিক্ষনে নতুন প্রজন্মের প্রতি বিশেষ করে শিশুদের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হওয়া উচিত। কারণ আগামী দিনে তারাই জাতীয় উন্নয়নের অগ্রদূত। নৈতিক মূল্যবোধ ছাড়া কখনো জাতিসত্তার ভীত মজবুত হয়না। সত্যিকারভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক গুনাবলীতে সমৃদ্ধ মানুষের পক্ষেই সম্ভব একটি সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণ করা। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা মানব সমাজে চির কল্যাণ বয়ে আনে এবং মানুষকে সু-শৃংখল করে।

মানব জীবনকে আদর্শিক ও সুপথে পরিচালনার জন্য নৈতিক শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক শিক্ষাই পারে ব্যক্তি ও সমাজকে সব ধরনের সামাজিক ন্যায় বিচার সম্পাদনে সহায়তা করতে। ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষা ব্যতীত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে দ্বি মতের কোন অবকাশ নেই যে, যে কোন সমাজ ও রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়ন তখনই নিশ্চিত হয়, যখন সে সমাজ ও রাষ্ট্রে সঠিক মাত্রায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা হয়। নীতির প্রতি মূল্যায়ন, সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন থেকেই আসে নীতিবোধ এবং নীতিবোধ থেকেই আসে নৈতিকতা। এ কারণেই প্রতিটি মানুষের নৈতিকতা, সুনীতি ও মূল্যবোধের চর্চা জরুরি। আর এই নৈতিক শিক্ষার চর্চা শুরু হতে হবে শিশুকাল থেকেই। কেননা এই সময়েই মানুষের মধ্যে প্রতিভার বিকাশ শুরু হয় এবং সৃজনশীলতা ও অনুসন্ধিৎসার সূচনা হয়। কাজেই শিশু বয়স থেকেই মানুষকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চায় অভ্যস্ত করা জরুরি। শিশুর নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ চর্চা শুরু হয় পরিবার থেকে এবং তা বিকশিত হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। মানুষের মাঝে নৈতিক শিক্ষার প্রসারে পরিবার ছাড়াও সমাজ ও রাষ্ট্রের অবশ্যই ভুমিকা আছে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভুমিকা অগ্রগণ্য । কারণ শিক্ষা জীবনই মূলত মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার সবচেয়ে উপযোগী সময়।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান তিনটি স্তর রয়েছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা। এর মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে । এই স্তরে শিক্ষার্থীদের মননের বিকাশ ঘটে। সুতারাং এই স্তরে শিশুকে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হলে তার পরিণত বয়সেও এর প্রভাব অক্ষুন্ন থাকে। এ জন্যই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে জাতীয় ও ব্যক্তি জীবনে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও অধঃপতনের প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কারিকুলামে নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ২০১০ সালে প্রণিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ আলোকে বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে নৈতিক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

**বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয়নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধের স্বরূপ** অভিসন্দর্ভটিতে বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষাকমিশন ও পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয়নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধের স্বরূপ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভটি ৭ (সাত) টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এতে যেসব বিষয়াবলী আলোচিত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

**প্রথম অধ্যায়: বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা: ঐতিহাসিক পটভূমি** শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে বাংলার প্রাচীন যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা, বৈদিক শিক্ষা, মধ্যযুগের শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রাচীনকালে বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়াবলী সবিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে।

**দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলা ভাষায় শিক্ষা চিন্তার ক্রমবিকাশ**-শিরোনামে অত্র অধ্যায়ে শিক্ষার পরিচয়, শিক্ষা চিন্তা, শিক্ষার লক্ষ্য, ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা, মুসলিম শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

**তৃতীয় অধ্যায়: প্রাক-স্বাধীনতা শিক্ষাকমিশন ও সরকারি শিক্ষানীতিতে ধর্মীয়নীতি ও মূল্যবোধ প্রসঙ্গ** শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রিটিশ আমল (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.), ভারতীয় জাতীয় শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশন-১৮৮২ খ্রি., ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত সুপারিশ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, ১৯০২ খ্রি. ও হার্লে কমিটি ১৯১৫ খ্রি. ও প্রাক-স্বাধীনতা শিক্ষাকমিশনগুলোতে ধর্মীয় নীতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

**চতুর্থ অধ্যায়: স্বাধীনতা পরবর্তী শিক্ষাকমিশন ও সরকারি শিক্ষানীতিতে ধর্মীয়নীতি ও মূল্যবোধ প্রসঙ্গ** শীর্ষক অধ্যায়ে জাতীয় শিক্ষা কমিশন-১৯৭২ খ্রি. (কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন), ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্কীম: (ড. এম.এ. বারী) কমিটি, ১৯৭৭ খ্রি., ১৯৭৮ সালের শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন-১৯৮৮ খ্রি. (মফিজ উদ্দীন কমিশন), মাদ্রাসা শিক্ষা (ড. এম.এ. বারী) কমিটি, ১৯৮৯ খ্রি. ও শিক্ষা সংস্কার প্রচেষ্টা টাস্কফোর্স কমিটি

গঠন (১৯৯৪), জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ সহ সরকারি শিক্ষানীতিগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে এতে উপস্থাপিত ধর্মীয়নীতি ও মূল্যাবোধ প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

**পঞ্চম অধ্যায়ঃ পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয়নীতি ও মূল্যবোধ প্রসঙ্গ-** শীর্ষক অধ্যায়ে ধর্ম ও নৈতিকতা, মূল্যবোধের ধারণা, নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় মানবিক মূল্যাবোধের প্রয়োজনীয়তা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য, ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়ন, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব, প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয়নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধ প্রসঙ্গ এবং জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০) এর আলোকে প্রণীত পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয় নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধ প্রসঙ্গ মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করে স্ববিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে।

**ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার অবস্থান** শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার পূর্বে যে দেশগুলোর শিক্ষানীতি মডেল হিসেবে অনুসরণ করা হয়, সে সকল দেশের শিক্ষানীতিতে নৈতিক শিক্ষার অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

**সপ্তম অধ্যায়ঃ ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমস্যা ও করণীয়** শীর্ষক অধ্যায়ে বাংলাদেশে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা এবং সম্ভাব্য সমাধানপন্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণা কর্মে আলোচনার পুনরাবৃত্তিকে দোষণীয় বলে গণ্য করা হলেও আলোচনার গতিধারার সামঞ্জস্য রক্ষা এবং প্রাসঙ্গিকতার দাবি রক্ষার্থে কোথাও কোথাও কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে কিংবা পরিবর্তন ছাড়াই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। **বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয়নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধের স্বরূপ** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। অভিসন্দর্ভটি তথ্যবহুল ও সুন্দর করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। তবে তথ্যগত সীমাবদ্ধতা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমালোচনা ও সামর্থ্যের অভাবে অভিসন্দর্ভটি কিছুটা অপূর্ণাঙ্গ থাকতে পারে। মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা আমার এ অভিসন্দর্ভটি কবুল করুন। আমীন।

# প্রথম অধ্যায়

## বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা : ঐতিহাসিক পটভূমি

# প্রথম অধ্যায়
# বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা : ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি দীর্ঘ, সমৃদ্ধ ও বহুস্তরপূর্ণ। প্রাচীন বাংলায় টোল, পাঠশালা, মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র, যেখানে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞান প্রদান করা হতো। মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে মাদ্রাসা শিক্ষার বিকাশ ঘটে এবং আরবি-ফারসি ভাষার প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ উপনিবেশিক আমলে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়–ইংরেজি শিক্ষা, বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠক্রম, বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এই সময়ের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। এ যুগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরসহ বহু শিক্ষাবিদ শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পাকিস্তান আমলে বৈষম্য ও অবহেলা থাকা সত্ত্বেও ভাষা আন্দোলন আধুনিক জাতীয় শিক্ষাবোধের ভিত গড়ে তোলে। অবশেষে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ মানবসম্পদ উন্নয়নকে লক্ষ্য করে শিক্ষার সম্প্রসারণ, পাঠ্যক্রম আধুনিকীকরণ ও শিক্ষার গণতান্ত্রিকীকরণে নানা সংস্কার গ্রহণ করে। এভাবে যুগে যুগে পরিবর্তন ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে। সময়ের ব্যবধানে ও যুগের চাহিদা বিবেচনায় শিক্ষায় অনেক নতুন ধারণা, নতুন বিষয়বস্তু যেমন সন্নিবেশিত হয়েছে, তেমনই অনেক কিছু বাদও পড়েছে। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও যুগে যুগে নতুন করে নির্ধারণ করতে হয়। উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার পূর্বে বাংলা তথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন একটি নিজস্ব শিক্ষাধারা প্রচলিত ছিল। আলোচ্য অধ্যায়ে প্রাচীন যুগ হতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি আলোকপাত করা হয়েছে।

**বাংলার প্রাচীন যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা**

ভারতে প্রাচীন ও মধ্যযুগে যে ব্যাপকভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল তা হিন্দু, মুসলিম ও বৌদ্ধ ধর্মের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এ শিক্ষা দেশের মানুষের ধর্ম, রীতিনীতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজ ব্যবস্থা, আবহাওয়া ও মানুষের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে উঠেছিল। আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ দেশের মাটিতে দেশীয় লোক দ্বারা এ শিক্ষা পরিচালিত ও লালিত হতো। মোগল শাসনের অবসানের পর এমন কি ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পরও দীর্ঘদিন ধরে এ শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে চালু ছিল। এ শিক্ষা দেশীয় শিক্ষা নামে অভিহিত হতো। দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ দেশের রাজা-বাদশাহ, ধনী ব্যক্তি, সমাজসেবী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের অর্থানুকূল্যে ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। তাই ধর্মের ভিত্তিতে প্রাচীন যুগে বৈদিক শিক্ষা ও বৌদ্ধ শিক্ষা চালু ছিল। নিম্নে প্রাচীন বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

## বৈদিক শিক্ষা

বৈদিক শিক্ষা ছিল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি, যা মূলত বৈদিক সাহিত্য ও তার অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষা ব্যবস্থা 'গুরুকুল'-এ কেন্দ্রীভূত ছিল, যেখানে শিষ্যরা গুরু বা শিক্ষকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বাস করে জ্ঞান অর্জন করত। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল চরিত্র গঠন, আত্মানুসন্ধান ও জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য মোক্ষ বা মুক্তি অর্জনের পথ প্রস্তুত করা। পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল চারটি বেদ (ঋক, যজু, সাম, অথর্ব), তাদের সহায়ক গ্রন্থ যেমন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, serta ছয়টি বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ)। জ্ঞানের এই বিশাল সমুদ্র মৌখিক প্রথার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হুবহু ও অক্ষুণ্ণভাবে হস্তান্তরিত হতো, যার ফলে একটি অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শক্তিশালী স্মৃতিশক্তির বিকাশ ঘটত। সামগ্রিকভাবে, বৈদিক শিক্ষা ছিল জড় ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন।

বেদ হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। বৈদিক চিন্তাধারা ও দার্শনিক মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষাব্যবস্থা 'ব্রাহ্মণ্য' শিক্ষা নামে অভিহিত। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্ণ বৈষম্য ছিল প্রকট। ফলে এ শিক্ষা সর্বজনীন না হয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়ে উঠে। এ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ বালকেরা উচ্চতর জ্ঞান লাভের সুযোগ পেত। ক্ষত্রিয় বালকেরা রাজগৌরব বা যুদ্ধবিদ্যা লাভ করত। অন্যদিকে, বৈশ্য বালকেরা কৃষি ও ব্যবসার বিষয়ে শিক্ষা লাভ করত। শিক্ষার্থীর পাঁচ বছর বয়সে "স্বীকরনম" অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা শুরু হতো। শিক্ষার প্রধান অবলম্বন ছিল বেদ।[১] বৈদিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণ শিশুদের পুরোহিত করে গড়ে তোলা। শিক্ষকরা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ। বৈদিক শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। পুরো শিক্ষাই ছিল গুরুকেন্দ্রিক, শিক্ষাগুরুই শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি নির্ধারণ করতেন। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় তিন ধরনের বিদ্যালয় ছিল। বিদ্যালয়গুলো পরিষদ, টোল ও পাঠশালা নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রাচীন ব্রাহ্মণরা পরিষদ, তরুণ ব্রাহ্মণরা টোলে এবং আদিম অধিবাসী ও শুদ্র সম্প্রদায় ছাড়া সকলেই পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত। পাঠশালায় পড়া লেখা, গণনা এবং পৌরাণিক কাহিনী পড়ানো হত। পাঠশালার শিক্ষকরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। তারা কোন বেতন পেতেন না। পূজা পার্বণে দক্ষিণা এবং ফসল উঠার সময় তিনি ফসলের একটি বিশেষ অংশ পেতেন। সে-যুগে বাংলাদেশের বড় বড় গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু ছিল। তবে এখনকার মত দালান- কোঠা বা টিনের চালাঘর তৈরি করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ চালানোর ব্যবস্থা চালু ছিল না। গাছতলায়,

---

১ দিজেন্দ্র নারায়ণ ঝা রচিত ও গৌরীশংকর দে অনূদিত, *আদি ভারত* (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৬১; ভূতনাথ সপ্ততীর্থ অনূদিত, *মনুস্মৃতির মেধাতিথি ভাষ্য* (কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৩৬১), খ.১, পৃ. ১৫৯; বেবী দত্ত, মধুমালা সেনগুপ্ত, দেবিকা গুহ, *ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস* (কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১৪

মন্দিরে, বাড়ির প্রাঙ্গণে অথবা অতিথিশালায় এসব প্রতিষ্ঠান বসতো। আর্য যুগে শিক্ষার উদ্দেশ্য অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট পণ্ডিত বিশেষত জ্যোতির্বিদ ও গণিতশাস্ত্রবিদের উদ্ভব হয়েছিল। শূণ্যের ধারণা এ যুগের পণ্ডিতদের কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। এ যুগের পণ্ডিতদের শূন্যের ধারণার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ে আরবীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ গণিতশাস্ত্রকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।[২]

**বৌদ্ধ শিক্ষা**

ভারতীয় উপমহাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।[৩] সম্রাট অশোক প্রজাসাধারণের কল্যাণে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে জনশিক্ষা বিস্তারের জন্য অভিনব পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি ধর্মাচারণ ও মানবীয় কল্যাণমূলক উপদেশমালা পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ করেছিলেন। এছাড়া শিক্ষাবিষয়ক লিপিতেও তিনি নানা অনুশাসন খোদিত করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। এভাবে তাঁর শাসনামলে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো।[৪] গৌতম বুদ্ধের অহিংসনীতির ভিত্তিতে বৌদ্ধ শিক্ষার আবির্ভাব ঘটে। নির্বাণ লাভ বৌদ্ধ ধর্মের শেষ লক্ষ্য। অষ্টমা বা অষ্টপন্থায় নির্বাণ লাভ ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার মূল কথা। সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ-সংকল্প, সৎ বিশ্বাস, সৎ উপার্জন, সৎধ্যান, সৎ প্রচেষ্টা ও সৎ স্মৃতি হচ্ছে অষ্টমার উপাদান। শিক্ষার মাধ্যমে অষ্টমা চর্চা এবং তা ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দুঃখময় পৃথিবী থেকে নির্বাণ বৌদ্ধ শিক্ষার লক্ষ্য। শিশুর ছয় বছর থেকে শিক্ষা শুরু হত এবং চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত চলত। গল্পের মাধ্যমে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে সাধারণত মুখে মুখে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হত। মাঝে মাঝে আলোচনা ও বিতর্ক সভারও আয়োজন করা হত। গণতন্ত্র ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য খোলা ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ে সংস্কৃত ছিল জনশিক্ষার মাধ্যম। তবে সংস্কৃত, পালি, আঞ্চলিক ভাষা ও ধর্ম শিক্ষাও শিক্ষার্থীদের শেখানো হতো। বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের সাথে সাথে শিক্ষাসূচিতে পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। বৈদিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত কিছু কিছু বিষয়ও বৌদ্ধবিহারে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। উচ্চ শিক্ষার প্রসারে বৌদ্ধরাই প্রথম এ উপমহাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বৌদ্ধ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার পাদপীঠ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজও আমাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সমৃদ্ধ উৎস হিসেবে পরিচিত।[৫]

---

২ J.N. Sarkar, *India Through the Ages*, Calcutta, 1957, p. 10.

৩ বেবী দত্ত, মধুমালা সেনগুপ্ত, দেবিকা গুহ, *ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৪ W. Geetz Philip (ed.), *The New Encyclopedia Britannica* (Vol. 18 Macropaedia, 15th Edition, Chicago), pp. 14-15

৫ আমানুল্লাহ আহমদ, *বরেন্দ্র অঞ্চলে শিক্ষার পটভূমি* (বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস রাজশাহী: ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১১১৩

বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ বঙ্গদেশেও প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালের যে লিপিগুলি উদ্ধার করা হয়েছে তা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, পাল বংশ প্রতিষ্ঠার সহস্রাধিক বছর পূর্ব থেকে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যবিদ্যা ও সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা প্রচলিত ছিল। হিউয়েন সাং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সেকালে বাংলাদেশে ছোটবড় বহু বৌদ্ধবিহার গড়ে উঠেছিল এবং ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোতে বৌদ্ধধর্ম ও বিদ্যাচর্চার সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাও সযত্নে লালিত হতো। এ সকল বৌদ্ধ বিহারের মধ্যে মহাস্থানগড়ের সন্নিকটে অবস্থিত ভাসু বিহারের নাম উল্লেখযোগ্য।[৬] এছাড়াও এ যুগের সর্ববৃহৎ বৌদ্ধবিহার বৃহত্তর রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত ছিল। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে পাল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল ১৭৭ কক্ষ বিশিষ্ট এই সুবৃহৎ বিহারটি নির্মাণ করেন। পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার সমগ্র বৌদ্ধ জগতে সোমপুর মহাবিহার নামে সুপরিচিত ছিল। এছাড়া দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত সীতাকূট বিহার ও কুমিল্লার শালবন বিহার বাংলার বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন।[৭] এ সমস্ত বিহারে সর্বজনীন শিক্ষার পথ প্রশস্ত ছিল।

অতীতে শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বাঙালিদের অনুরাগ ছিল অকৃত্রিম। দশ-এগার শতকের প্রশস্তিমূলক লিপিমালাগুলোতে সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা-দীক্ষার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, তর্ক, মীমাংসা, বেদান্ত, প্রমাণ, শ্রুতি, পুরাণ, কাব্য ইত্যাদি শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন যুগে চার বেদেরই অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হত। এসব বিদ্যাচর্চা কেবল পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। মন্ত্রী, সেনানায়কসহ রাজপুরুষগণও এ সকল শাস্ত্রের অনুশীলন করতেন।[৮] প্রাচীন যুগে বাংলাদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা অতি উচ্চমানের ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। উল্লিখিত পণ্ডিতদের মহৎ কীর্তির পশ্চাতে ছিল যুগ যুগ ব্যাপী ছোট-বড় নাম না জানা বহু বিদ্যার্থী ও বিদ্বজ্জনের নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান-সাধনার এক গৌরবময় ঐতিহ্য। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রকোপে এককালে বৌদ্ধভিক্ষুরা তাঁদের বিহারের নিভৃত কক্ষে নীরব জ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, তেমনি চরম দারিদ্র্য ও

---

৬ খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতক থেকে খ্রিস্টীয় ১৫শ শতকের মধ্যে গড়ে ওঠা পুণ্ড্রবর্ধন অর্থাৎ মহাস্থানগড় বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন নগরী। মৌর্য, গুপ্ত, পাল রাজাদের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। উল্লেখ্য, গৌতম বুদ্ধ সুভদ্রার আমন্ত্রণে পুণ্ড্রবর্ধন এসেছিলেন এবং ভাসু বিহারে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ পুণ্ড্রবর্ধন বা মহাস্থানগড়ের নিকটবর্তী ভাসু বিহারই কালে বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র নামে খ্যাতি লাভ করে। বর্তমান বগুড়া শহর হতে ৮ মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে মহাসড়কের পাশে ভাসু বিহার অবস্থিত। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ৬৩৮-৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে পুণ্ড্রবর্ধনে ভ্রমণের জন্য এসেছিলেন। তখন তিনি পুণ্ড্রবর্ধনের ৪ মাইল পশ্চিমে 'পো-সি-দো' নামে এক বিরাট বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির দেখেছিলেন। (দ্র. ভিক্ষু সনীথানন্দ, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষুজীবন* (ঢাকা: ১৯৯৫খ্রি.), পৃ. ১৫৪; ধর্মরক্ষিত মহাথেরো, *বুদ্ধ ও মৌর্যযুগে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম* (কুমিল্লা: ১৯৮৪খ্রি.), পৃ. ২৩-২৪)

৭ সোমপুর বিহার: বাংলাদেশের পাহাড়পুরের মাটি খুঁড়ে একটি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এটির নাম সোমপুর মহাবিহার। নওগাঁ ও বগুড়া জেলার সীমান্তে জামালগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে ৩ মাইল পশ্চিমে পাহাড়পুরের অবস্থান। বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী ও শিক্ষার অনন্য পৃষ্ঠপোষক মহারাজ ধর্মপালের (খ্রি: ৭৭৫-৮১০) আবির্ভাব উপ-মহাদেশে পুনরায় সূচিত হয়েছিল বিহারভিত্তিক আবাসিক বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার। (দ্র. নীহারঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব)* (কলকাতা: ১৯৫২খ্রি.), পৃ. ৩৯০; ভিক্ষু সনীথানন্দ, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষুজীবন*, পৃ. ১৫৭)

৮ রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: ১৯৪৩খ্রি.), খ.১, পৃ. ২১৮

অশান্তির মধ্যেও সেকালে মানুষ বিদ্যাচর্চায় কোন অবহেলা প্রদর্শন করেননি। শিক্ষা-দীক্ষার এরূপ ঐতিহ্যের ফলস্বরূপ বাংলাদেশে বহু যুগে বহু মনীষী আবির্ভূত হয়েছেন। জ্ঞানচর্চার এমন অত্যুজ্জ্বল ঐতিহ্য ভারতবর্ষের বাংলা ভূমির বিদ্বুৎসমাজের এক পরম সম্পদ।

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল একটি উন্মুক্ত ও গণমুখী শিক্ষাপদ্ধতি, যা জাতি-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এই শিক্ষার মূল কেন্দ্র ছিল বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, যেখানে নালন্দা, বিক্রমশীলা ও তক্ষশীলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল চারি arya সত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গের মাধ্যমে ব্যক্তির চরিত্র গঠন, নৈতিকতা বিকাশ এবং সর্বোপরি নির্বাণ বা আত্মজ্ঞান লাভ করা। এখানে পাঠ্যক্রমে বৌদ্ধ দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্বসহ নানাবিধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতো। শিক্ষাদান পদ্ধতিতে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক, বিতর্ক, আলোচনা ও যৌথ অনুসন্ধানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। এই ব্যবস্থা ভারতীয় উপমহাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে সমগ্র পূর্ব এশিয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**মধ্যযুগের শিক্ষা ব্যবস্থা**

মধ্যযুগের শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত ধর্মীয় প্রভাব ও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল। এই যুগে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটে, যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকাগুলো। এখানে কুরআন, হাদিস, ফিকহ, ইসলামী দর্শন, আরবি ও ফারসি ভাষার পাশাপাশি যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হতো। একই সময়ে, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে টোলে সংস্কৃত, বেদ, পুরাণ ও দর্শনচর্চা চলতে থাকে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মূলত ধর্মকেন্দ্রিক ও সীমিত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে তখনও উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে বিহার ও মাদ্রাসাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমিত থাকলেও জ্ঞানচর্চার একটি ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে। রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে, তারা এ উপমহাদেশে তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারাও নিয়ে আসেন। প্রখ্যাত গ্রন্থকার এন.এন.ল মন্তব্য করেন, মুসলমানদের ভারত আক্রমণ কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল না, শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটা যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে।[৯] মধ্যযুগে বাংলায় ধর্মপ্রচারে কিংবা মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষা বিস্তারে সুফি সম্প্রদায়ের অবদান সর্বাধিক। তের শতক থেকে পনের শতক পর্যন্ত বাংলাদেশ তথা ভারতে অগণিত সুফি, পীর, দরবেশ, সাধু-সন্ত আগমন করেন। ভারতে

৯ N.N.Law, *Promotion of Learning during Muhammedan Rule*, London, 1916, p. XIX

যে-সকল সুফি, সাধক-সন্ত বা গোষ্ঠী সক্রিয় ছিল তাদের মধ্যে সোহরাওয়ার্দী, চিশতিয়া এবং কাদেরিয়া সিলসিলা সমধিক পরিচিত। এভাবে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে মুসলমান শাসনকর্তাগণ, আমীর-ওমরাহ্, রাজকর্মচারী, ওলামা ও সুফি-সাধকগণ শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। তারা প্রায় সকলেই কোন না কোন মাদ্‌রাসা, বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বহিরাগত এ সকল মুসলমান শাসক ও সুফি দরবেশদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাংলার সম্ভ্রান্ত ও দানশীল ব্যক্তিরাও শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ফলে, শহরে এবং প্রধান প্রধান স্থানসমূহে বহু সংখ্যক মাদ্‌রাসা, শিক্ষাকেন্দ্র ও বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানগণ বাংলা তথা এ উপমহাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বজনীনতা ও উদারতার আদর্শ তুলে ধরেন। তারা সকল মানুষের নিকট এমন কি ব্রাহ্মণদের দ্বারা উপেক্ষিত নিম্ন শ্রেণির হিন্দুদের নিকটও শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন।

দেশীয় শিক্ষা ছিল গুরুগৃহ, টোল, মক্তব ও মাদ্‌রাসা কেন্দ্রিক। এখানে নিজেদের ধর্ম, রীতিনীতি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজব্যবস্থা শিক্ষা দেওয়া হত। এ্যাডাম এর রিপোর্ট (১৮৩৫-১৮৩৮)-এ বলা হয়েছে, দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা ছিল- প্রধান। বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ, নির্ধারিত পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাদান সময় ও ভর্তির কোন সর্বজন স্বীকৃত নীতি ছিল না। শিক্ষকদের কোন নির্ধারিত বেতন ছিল না। মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল না। তবে লেখাপড়া, গণনা, হিসাব শিক্ষাদান, স্থানীয় সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে শিক্ষাদান, মসজিদ, মন্দির, গাছতলায় শিক্ষাদান সব মিলে এডাম তার রিপোর্টে বলেন এ শিক্ষা ব্যবস্থার যথেষ্ট প্রাণশক্তি (Potentialities) ছিল।

**প্রাথমিক শিক্ষা**

**মক্তব**[১০]

মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এর কারণ হলো মুসলমানরা তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে শিক্ষা দেয়া ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। এছাড়া শিক্ষাকে তারা সামাজিক সম্মান-মর্যাদা ও পুণ্যের কাজ সে হিসেবেও গণ্য করতেন। ফলে সমাজের অবস্থাপন্ন মুসলমানগণ ধর্মীয় ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করতেন। মুসলিম শিক্ষা ধারার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা মক্তবগুলোতে সম্পন্ন হত। এ ধরনের মক্তব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিচালিত হত মসজিদগুলোতে। প্রাত্যহিক ধর্মকর্মের বিধি-বিধান, পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা ছিল মক্তবগুলোতে। শিক্ষা পদ্ধতিতে মুখস্থ

---

১০ মক্তব: মক্তব (المكتب) আরবী শব্দ। অর্থ-প্রাথমিক বিদ্যালয়। মক্তব হলো-মুসলমান বালক-বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় বা বিদ্যাগৃহ। প্রাথমিক স্তরের মুসলিম শিশু-কিশোরদের কুরআন ও ধর্মীয় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে এদেশে সাধারণত মক্তব বলা হয়। (দ্র. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *বাংলা-ইংরেজি-আরবী ব্যবহারিক অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০২খ্রি.), সং-১, পৃ. ৪১৭; সম্পাদনা পরিষদ, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯২খ্রি.), সং-২, পৃ. ৯৪৩)

করানোর ওপর জোর দেওয়া হত। শিক্ষকদের অনুপস্থিতিতে ক্লাসের সর্দার পাঠদান পরিচালনা করত। সর্দার ছিল অগ্রগামী শিক্ষার্থী দ্বারা পাঠদান ব্যবস্থা। বস্তুত পড়তে ও লিখতে পারা এবং হিসাব নিকাশ জানার মধ্যেই মক্তবের শিক্ষা সীমিত ছিল। প্রায় প্রতিটি মসজিদের সঙ্গেই একটি মক্তব ছিল। সাধারণত পাঁচ বৎসর বয়সে মুসলমান বালক-বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হতো। অবশ্য উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চার বৎসর চার মাস চার দিন বয়সে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা শুরু করার সাধারণ রীতি প্রচলিত ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদের এই আনুষ্ঠানিক প্রবেশ 'বিসমিল্লাহ-খানি' অনুষ্ঠান নামে পরিচিত ছিল। বাংলাসহ সমগ্র মুসলিম ভারতে এই অনুষ্ঠান পালন করা হত।[১১] বালকদের মত বালিকাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ আয়োজন হত। বালিকাদের মক্তবে যাওয়ার প্রাক্কালে একখানা রঙিন কাগজে মেয়েদের আর্শীবাদ করে কিছু লেখা থাকত যা 'জরফেশানি' নামে পরিচিত ছিল।[১২] এ সময় মাতাপিতা ও অভিভাবকরা শিক্ষককে আপ্যায়ন ও উপঢৌকন দ্বারা ভূষিত করতেন। এ জাতীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে মক্তব অর্ধদিবস বন্ধ থাকত।[১৩]

প্রত্যেক গ্রামে ও মহল্লায় মক্তব ছিল। কবি মুকুন্দরামের উক্তি থেকে জানা যায় যে, হিন্দু এলাকায় ক্ষুদ্র মুসলমান পাড়ায়ও মুসলমান ছেলেমেয়েদের জন্য মক্তব ছিল।

কবি তার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বলেন, "মুসলিম মহল্লায় মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে সমস্ত মুসলমান ছেলেমেয়েকে ধর্মপ্রাণ মৌলবীগণ শিক্ষা দিতেন।"[১৪] প্রাথমিক বিদ্যালয় 'মক্তব' বাংলাতে পাঠশালা নামেও অভিহিত হত। বালক-বালিকারা একত্রে একই বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করত। মুসলমান কবিদের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের সহশিক্ষার প্রচলন ছিল। দৌলত উজীর বাহরাম খান তার লায়লী-মজনু কাব্যে লিখেছেন যে, লায়লী ও মজনু বাল্যকালে একই পাঠশালায় পড়ত এবং অন্যান্য বহু বালক-বালিকাও সেই পাঠশালায় পড়াশুনা করত।[১৫] কবি বাহরাম থেকে জানা যায় যে, মজনুকে সাত বছর বয়সে পাঠশালায় পাঠানো হয়।[১৬]

---

১১ K.M. Asraf, *Life and Condition of the People of Hindustan* (Delhi: 1959), p. 145

১২ S.M. Jaffar, *Education in Muslim India* (Delhi: 1972), p.190-191.

১৩ ibid.

১৪ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল কাব্য*, সম্পা. কে.এন. দাসগুপ্ত, তা.নে., পৃ. ৩৩৪

'যত শিশু মুসলমান তুলিলা মক্তব স্থান,
মকদুম পড়ায় পাঠনা।' (দলিজ খান)

১৫ দৌলত উজির বাহরাম খান, *লায়লী-মজনু*, সম্পাদক. আহমদ শরীফ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫খ্রি.), পৃ. ১৯

সুন্দর বালকগণ অতি সুচরিত্র,
একস্থানে সভানে পড়া এ আনন্দিত।
সেই পাঠশালায় পড়য় কত বালা,
সুচরিত্র সুললিত নির্মল উজ্জ্বলা।

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

মুসলমান ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য ইমামই ছিলেন শিক্ষক; বিশেষ করে তিনি ছেলেমেয়েদেরকে কুরআন পাঠ ও ধর্মের মূলনীতিমালাসমূহ শিক্ষা দিতেন। প্রাথমিক পর্যায়ে মক্তব বা পাঠশালাগুলোতে বালক-বালিকাদের মৌলিক শিক্ষা প্রদানের প্রচলন ছিল। শিক্ষার্থীকে প্রথমেই শুদ্ধ উচ্চারণ, যতি বিন্যাস ও বর্ণ শিক্ষা দেয়া হত। এগুলো শেখানোর পর শব্দ গঠন শিক্ষা চলত। অতঃপর ছোট বাক্য তৈরির অনুশীলন হত। বাক্য গঠনের সাথে লিখার অভ্যাস করানো হত। এ পর্যায়ে শিক্ষকগণ বর্ণমালা, যুক্তাক্ষর, একই অর্থপদ শ্লোক বা দ্বিচরণ শ্লোক ও পূর্বপাঠের পুনরাবৃত্তি এই চারটি অনুশীলন দিতেন।[১৭] ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষকগণ অংক শেখাতেন। ক্লাসের সকল ছাত্রকে যৌথভাবে 'পাহারা' বলা অভিহিত 'নামতা' মুখস্ত করানোর একটা সাধারণ রীতি প্রচলিত ছিল।[১৮] বাংলাদেশে মসজিদকে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে ব্যবহার করার এই ঐতিহ্য মুসলিম শাসন অবসানের পরেও অব্যাহত থাকে। ১৮৮২ খিস্টাব্দে শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা করার সময় শিক্ষা কমিশনের বাংলা প্রাদেশিক কমিটি রিপোর্টে বলেন,

"এ রকম একটিও মসজিদ কিংবা ইমামবাড়া ছিল না, যেখানে আরবি ও ফারসির অধ্যাপক রাখা হত না। আবার পাঠশালার অনুকরণে মক্তবও গড়ে উঠেছিল- সেখানে মুসলমানদেরই সংখ্যা ছিল অধিক।"[১৯]

সপ্তদশ শতকের কবি আলাওলও বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষার প্রতি সাধারণ মানুষের গভীর অনুরাগের কথা উল্লেখ করেছেন। কবি তাঁর তোহফাহ নামক গ্রন্থে লিখেছেন,

"শিক্ষক যখন শিশুকে 'বিসমিল্লাহ' শিক্ষা দেন, তখন শিক্ষক, পিতা মাতা ও শিশুর নিকট বেহেস্তের দুয়ার খুলে যায়।"

কবি আরও বলেন,

"হাজার ভক্তের চেয়ে একজন বিদ্বান ব্যক্তি শ্রেয়। শয়তান বিদ্বান ব্যক্তির ভয়ে এত বেশি ভীত যে, সে তার সম্মুখে আসতে সাহস পায় না; অথচ বহু অশিক্ষিত লোককে শয়তান বিভ্রান্ত করে ও কুপথে নিয়ে যায়।"[২০]

---

১৭ Abul Fazl, *Ain-i-Akbari*, Vol. II, tr. Jarret and Sarkar (Calcutta: 1948), p. 78-79.

১৮ ইউসুফ হোসেন, *মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতি, ফারুক আহমদ অনূদিত* (ঢাকা: ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ১০৫

১৯ *British Policy and the Muslims in Bengal*, pp. 149; Education Commission: Report by the Bengal Provincial Committee, with Evidence taken the Committee and Merorial Addressed to the Education Commission, Calcutta, 1884, p. 69; M. Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, Vol. B, Riyadh, 1985, p. 827.

২০ আলাওল, *তোহফা*, তা. নে. পৃ. ১৩৯।

গুরু এ শিশুরে যদি বিসমিল্লাহ পড়ায়
গুরু মাতা পিতা শিশু বেহেস্তে যায়।

রাসূল (স)-এর হাদিসে বলা হয়েছে যে, "যিনি সাতদিন কোন বিদ্বান ব্যক্তির সেবা করেন, তিনি স্রষ্টার নিকট হাজার শহীদের পুণ্য অর্জন করেন।"

একজন তাপস কেবল স্বীয় মুক্তি সাধন করে; কিন্তু একজন বিদ্বান ব্যক্তির সান্নিধ্যে শত শত লোক তাদের মুক্তি খুঁজে পায়। অতএব, তোমাদের উচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদ্বানের সেবা করা। এর দ্বারা তোমরা জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে এবং বেহেস্তে দাখিল হবে।"[২১]

ধর্মীয় শিক্ষাদানই ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি। বালক-বালিকা নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমান শিশু সন্তানকে ধর্মের মূলনীতিসমূহ ও নৈতিক শিক্ষা দেয়া হতো। কবি বিপ্রদাস বলেন, মুসলমান ছেলে-মেয়েদের মক্তবে ওযু করা ও নামায পড়া শেখানো হতো।[২২] মুকুন্দরাম লিখেছেন, মুসলমান ছেলে মেয়েরা মক্তবে মৌলবির (মখদুম) নিকট শিক্ষা লাভ করত।[২৩] মক্তবের শিক্ষক একজন মৌলবি হওয়ায় (ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত) ইসলামি শিক্ষাকে প্রাথমিক পর্যায়ে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল, এটা নিশ্চিত বলা যায়।

ধর্মীয় বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়াদিও মক্তবে পড়ানো হতো। রলিনসন মন্তব্য করেন–

"এখানে (মক্তবে) সে (শিশু) কালেমা বা ধর্মবিশ্বাস ও কুরআন থেকে কিছু আয়াত মুখস্ত করত– যা তার দৈনন্দিন প্রার্থনায় প্রয়োজন হতো। কুরআন মুখস্ত করার একটি সাধারণ রীতিও প্রচলিত ছিল। এরই সঙ্গে হাদিস, ফারসি ভাষা ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেয়া হত। সুচারু লিখন-পদ্ধতির চর্চা করা হতো এবং বালক যদি শিল্পকলার শিক্ষালাভে আগ্রহী হতো, তাহলে তাকে একজন ওস্তাদ বা শিক্ষকের নিকট শিক্ষানবিশীর জন্যে প্রেরণ করা হতো।"[২৪]

---

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

এক আলিমের যত গুণের ব্যাখান
হাজার আবিদ নতে আলিম সমান।
ইবলিছ আলিম কাছে ডরে নাহি যায়
বহু জাহিদ এক শতানে ভুলায়।
কহিয়াছে পয়গম্বরে হাদিস খবর,
সপ্তদিন আলিমের সেবে যেই নর,
করিলে প্রভুর সেবা হাজার বৎসর,
হাজার শহীদ পূণ্য পায় সেই নর।
জাহিদের স্মরিবে মাত্র আপনার অঙ্গ,
শতজন মুক্ত হৈব আলিমের সঙ্গ।
এই থেকে আলিম সেবা কর ভক্তিভাবে
জাহান্নামে তরিয়া বেহেস্ত পাইবা তবে।

২২ বিপ্রদাস, *মনসামঙ্গল*, পৃ. ৬৭

শিখাএ নামাজ অজু সদাই মক্তবে রুজু।

২৩ মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল কাব্য*, পৃ. ৩৪৪ঃ

যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তব স্থান
মখদ (মখদুম) পড়া এ পঠন

২৪ H.G. Rawlinson, *India, A Short Cultural History* (London, 1937), pp. 372

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে আরবি, ফারসি ও বাংলা এই তিনটি ভাষা শিক্ষা করতে হতো। কুরআন ও হাদিস শিক্ষার জন্য আরবি ভাষা শেখা একান্ত প্রয়োজন ছিল। সমগ্র মুসলমান শাসনামলে ফারসি ছিল রাজ-দরবারের ভাষা ও শিক্ষার বাহন। সুতরাং রাজ-দরবারে অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরির জন্যে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন অত্যাবশ্যক ছিল। বাংলা ভাষা বহু মুসলমান ও অমুসলমানের মাতৃভাষা ছিল। ফলে, বাঙ্গালি মুসলমানগণ মাতৃভাষা শিক্ষাকে অবহেলা করতে পারে নাই। বাস্তবিকই বাংলা ভাষা বাংলার মুসলমানদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

মাহুয়ান বলেন, অধিবাসীদের ভাষা বাংলাসহ ফারসিরও কিছু কিছু প্রচলন আছে এখানে।[২৫] 'শমসের গাজীর পুঁথি' নামক বাংলা কাব্য থেকে জানা যায় যে, শমসের গাজী একটি তুলবাইখানা (বিদ্যালয়) স্থাপন করে এবং তার স্কুলের জন্য ঢাকা থেকে একজন মুনশী (ফারসি শিক্ষক), হিন্দুস্থান থেকে একজন মৌলবি (আরবি শিক্ষক) ও জুগদিয়া থেকে একজন পণ্ডিত যথাক্রমে ফারসি, আরবি ও বাংলা শিক্ষা দেবার জন্যে আনয়ন করেন।[২৬] এতে প্রমাণ হয় যে ফারসি, আরবি ও বাংলা বঙ্গদেশের বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল। সারদা-মঙ্গল নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে আরো একটি প্রমাণের দ্বারা এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ গ্রন্থে আছে যে, রাজা গোবিন্দ তার পুত্র লক্ষীন্দরকে পণ্ডিত গৌরীদাসের তত্ত্বাবধানে রাখার সময়ে তাকে বলেছিলেন যে,

"বালককে বাংলা, নাগরী (হিন্দি) ও উৎকল (উড়িয়া) ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে।"[২৭]

মধ্যযুগে হিন্দু কায়স্থ পরিবারে ছেলেরা প্রায়ই মৌলবিদের নিকট মক্তবে শিক্ষা গ্রহণ করত। ফারসি ছিল রাজভাষা এবং হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় রাজসরকারে চাকুরি পাওয়ার আশা করতেন । প্রয়োজন বিধায় এ শ্রেণির হিন্দুরা ফারসি শিখতেন এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও ফারসি শিক্ষা দিতেন। বুকানন কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যেখানে মুসলমান শিক্ষকরা হিন্দু-মুসলমান বালকদেরকে বিনা খরচে শিক্ষাদান করতেন।[২৮]

**মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা**

উচ্চ শিক্ষার জন্য সুলতান ও সম্রাটগণ বাংলার বিভিন্ন স্থানে মাদ্‌রাসা স্থাপন করেছিলেন। মাদ্‌রাসাগুলো সাধারণভাবে স্থাপিত হয়েছিল মসজিদের কাছাকাছি। মাদ্‌রাসাসমূহে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা দান করা হতো। উৎকীর্ণলিপি ও দলিল-পত্রাদিতে কিছু সংখ্যক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার উল্লেখ

---

২৫ Mohuan's Accounts, অনুবাদ উদ্ধৃতি

২৬ D.C. Sen, *Typical Selections from old Bengali Literature*, Chapter Two, pp. 1384

২৭ সারদামঙ্গল,বাঙ্গালা সাহিত্য পরিচয়, দ্বিতীয় অধ্যায়, তা. নে. পৃ. ১৩৮৫

চারিশাস্ত্রে সমুদয় পড়াবে সকল।
নাগরী ফারসী কিবা বাঙ্গালা উৎকল।

২৮ *Eastern India*, Part Two, p. 105, 432 and Part Three, pp. 560.

আছে।[২৯] মধ্যযুগে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু সংখ্যক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বেশির ভাগ শহর ও গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান এলাকাসমূহে মুসলমান অধিবাসীদের শিক্ষাগত প্রয়োজন মেটাবার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল। মসজিদ ও ইমামবাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। সমসাময়িক ইতিহাস লেখকগণ উলেমা ও শেখদের প্রতি শাসক ও অভিজাত আমির-ওমরার পৃষ্ঠপোষকতা ও বাংলায় মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন। এ সকল মাদ্‌রাসায় ব্যাকরণ, ধর্মতত্ত্ব, তর্কবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হত। উচ্চ শিক্ষার একটি প্রধান দিক ছিল আরবি ও ফারসি সাহিত্যের চর্চা। উচ্চ শিক্ষার বিষয় হিসেবে ইতিহাসও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে বর্তমানে যা বুঝায় এমন প্রাতিষ্ঠানিক পার্থক্য করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তখন ছিল বলে জানা যায় না।[৩০] মক্তবের পরই ছিল এমন কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষকদের যোগ্যতা অনুসারে ছাত্রদের পাঠ্যসূচি নির্দিষ্ট ছিল। বাংলার সুলতানদের সময়ে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছিল আল্লামা ইবনে তাওয়ামার (মৃ. ১৩০০ খ্রি.) প্রচেষ্টায় সোনারগাঁয়। এ মাদ্‌রাসার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত ছিল, কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, মানতেক, ইতিহাস ইত্যাদির বিষয়াদির পাশাপাশি প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ব্যবহারের কিছু বিষয়, যেমন, জাহাজ তৈরি, উন্নত সামরিক অস্ত্র (কামান), গোলাবারুদ, গভীর সমুদ্রে নৌ-চলাচল, চিকিৎসাশাস্ত্র, ভেষজ গবেষণা প্রভৃতি শিক্ষা দেয়া হত। সমস্ত বাংলায় এর সমমানের আর কোন মাদ্‌রাসা ছিল না। এখানে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল দিল্লি, এলাহাবাদ, লাহোর, এমনকি পেশোয়ার থেকে পর্যন্ত ছাত্ররা আসতো। আবু তাওয়ামাকে বাংলার ইসলামি শিক্ষার পথিকৃৎ বলা যেতে পারে।[৩১]

মাদ্‌রাসাসমূহে মাধ্যমিক শিক্ষা দান করা হত। উৎকীর্ণলিপি ও দলিল-পত্রাদিতে কিছু সংখ্যক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। সমসাময়িক ইতিহাস লেখকগণ উলামা ও অভিজাত আমির-উমরার পৃষ্ঠপোষকতা ও বাংলায় মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন।[৩২]

মধ্যযুগে মুসলমান শাসকদের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা শহর যেমন, মাহিসন্তোষ, সোনারগাঁও, ঢাকা, লক্ষ্মণাবতী, লক্ষ্মৌতি, গৌড় প্রভৃতি শহরগুলোতে উচ্চ শিক্ষার জন্য মাদ্‌রাসা গড়ে ওঠেছিল। এসব মাদ্‌রাসায় যুগের পটভূমিকায় শিক্ষার মান প্রথমদিকে মোটামোটি উন্নতই ছিল। কিন্তু স্থানীয় মুসলমানদের অতি নগন্য সংখ্যক সন্তানরাই এসব মাদ্‌রাসায় পড়াবার সামর্থ ছিল। দেশের উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার, আমীর-উমরাহদের ও অভিজাত শ্রেণির ছেলেদের সংকুলানই কষ্টসাধ্য ছিল।

---

২৯ Abdul Quader Badayuni, *Muntakhab al-Twarikh*, vol. III, p. 74 and vol. II; *Bibliothika*, 1868, p. 32

৩০ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব, *ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৯খ্রি.), পৃ. ৪২-৪৪।

৩১ M.A Rahim, *Social and Cultural*, Vol. 1, p. 161-169; Abdul Karim, *Social History*, p. 39-83; ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬খ্রি.), পৃ. ৪

৩২ N.N. Law, *Promition of Learning in India*, London, 1916, p. 108-09

দেশের জনসংখ্যার তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রচুর ছিল না। যা ছিল সবই গড়ে ওঠেছিল আলেম-উলামাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও ধনী ব্যক্তিদের সহযোগিতায়। সরকারি প্রচেষ্টায় তখনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। স্থানীয় মসজিদ, পীর সাহেবদের খানকা ও শিয়াদের ইমামবাড়া ভিত্তিক মক্তবগুলোই ছিল স্থানীয় মুসলিম ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার শেষ পর্যায়। তদুপরি বাংলা পড়তে ও শিখতে জানে এমন শিক্ষার হার ৬% শতাংশের অধিক ছিল না।

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে এ সমস্ত মসজিদ ও ইমামবাড়াগুলোর কিছু কিছু মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে এমনকি উনিশ শতক পর্যন্তও চালু ছিল।[৩৩]

আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন,

"প্রত্যেক সভ্য জাতিরই যুবকদের শিক্ষার জন্য স্কুল রয়েছে কিন্তু হিন্দুস্থান বিশেষ করে এসব বিদ্যালয়গুলোর জন্যে প্রসিদ্ধ।"[৩৪]

দিল্লি ও তার আশে-পাশে কিছু ভাল ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছিল। বাংলায় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব সময় অল্পই বর্তমান ছিল।

সরকার ও অবস্থাশালী ব্যক্তিরা মাদ্‌রাসা ও মসজিদগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে উদারভাবে লাখেরাজ জমি দান করেছেন। কাজী নাসির উদ্দিন ত্রিবেণীতে প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা ও ছাত্রদের ব্যয়ভার বহন করার জন্যে সুব্যবস্থা করেছিলেন। বাঘার মাদ্‌রাসার জন্য ৪২টি গ্রাম দান করা হয়েছিল। শিক্ষা ছাড়াও ছাত্ররা বিনা খরচে আহার, বাসস্থান, কাপড়-চোপড়, তেল, প্রসাধনী দ্রব্য এবং মুল গ্রন্থ ব্যবহারের প্রয়োজনে পাণ্ডুলিপি নকল করার দরকারি জিনিসপত্রসহ সবকিছু পেত।[৩৫] বীরভূমের বিদ্যালয়গুলোর কথা উল্লেখ করে মি. এডাম বলেন যে, এগুলো ধর্মীয় দানের দ্বারা পরিচালিত হত এবং বিনা খরচে ছাত্রদের শিক্ষা, আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা বৃত্তি লাভ করত।[৩৬] বৃটিশ সরকারের লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত বিবরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে মুসলমান শাসনামলে, ধর্মীয় ও শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মপ্রাণ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের জন্য অসংখ্য নিষ্কর জমির ব্যবস্থা ছিল।[৩৭]

---

৩৩ A.R. Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal*, p. 149

৩৪ আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী*, অনু. Heinrich Blochmann (India: Asiatic Society of Bengal, 1873), খ.১, *'History of Freedom Movement'* গ্রন্থে উদ্ধৃত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭২; N.N. Law, p. 161

৩৫ W. Adam, *Third Report*, p. 174 and *Second Report*, p. 59

৩৬ W. Adam, *Third Report*, p. 66.

৩৭ Hunter, *Indian Musalman*, pp. 177

মি. এডাম তাঁর রিপোর্টে বর্ণনা দেন যে, অভিজাত শ্রেণি ও সম্পদশালী মুসলমানগণ ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য তাদের গৃহে শিক্ষক রাখতেন এবং বিনা খরচে স্থানীয় গরীব ছেলে মেয়েরা তাদের নিকট শিক্ষালাভ করতে পারত। তিনি লিখেছেন,

"পান্ডুয়ায় কোন কোন প্রসিদ্ধ স্থানে প্রতিবেশী গরীব ছেলেমেয়েদের উপকারার্থে মুসলমান জমিদারগণ নিজেদের খরচে শিক্ষক রাখতেন বলে জানা যায়। একজন ধনী গৃহস্থ বা গ্রাম্য প্রধান শিক্ষার উদ্দেশ্যে গৃহে শিক্ষকের ব্যবস্থা করেননি, এরকম দৃষ্টান্ত প্রায় বিরল বলা যায়।"[৩৮]

এডাম এখানে মক্তবগুলোর কথাই তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন। মি. এডাম-এর তথ্যানুসারে মুসলমানদের রাজনৈতিক আধিপত্য ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যুগে তাদের শিক্ষার অবস্থা নিশ্চয়ই আর উন্নত ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

**পাঠ্য তালিকা**

বাংলাদেশ ও ভারত উপমহাদেশের মুসলমানেরা তাঁদের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পদ্ধতি এবং পাঠ্য তালিকার প্রবর্তনে বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফতের (৭৫০-১২৫৮) শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনুসরণ করেন। বাংলার শাসনকর্তা ও উলামা সম্প্রদায় যাঁরা ঐ একই শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করেছিলেন, স্বভাবতঃই তাঁরা তা এদেশেও প্রবর্তন করেন। তাঁদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা 'দরসে নিযামিয়া'[৩৯] নামে পরিচিতি ছিল। মধ্যযুগে বাংলার কয়েকটি বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া সমস্ত মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দু'স্তরে দেখতে পাওয়া যায়– মক্তব ও মাদ্‌রাসা। মক্তবে ভাষা হিসেবে বাংলা, আরবি ও ফারসি এবং বিষয় হিসেবে পবিত্র কুরআন পূর্ণভাবে, হাদিসের অংশ বিশেষ, ফিকহশাস্ত্রের অংশ বিশেষ, কিছু মাসআলা-মাসায়েল, আরবি, ফারসির পদ্য ও গদ্য, হালাল-হারাম এবং অঙ্ক প্রভৃতি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত ছিল। ছাত্ররা ৫ থেকে ৭ বৎসর মক্তবে অতিবাহিত করত। এই সময়ের ভেতর ছাত্রদেরকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে কুরআন ও হাদিস ভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ আকিদা গড়ে তোলা হতো। তারপর উচ্চতর দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল মাদ্‌রাসা। মাদ্‌রাসাতে ছাত্ররা অতিবাহিত করত ১০ থেকে ১২ বৎসর। তাদের প্রাথমিক পাঠ্যসূচিতে ছিল আরবি ও ফারসি ভাষা শিক্ষা, আরবি-ফারসি সাহিত্য, কুরআনের তাফসির, হাদিস ও উসূলে হাদিস, ইসলামি ব্যবহারিক

---

৩৮ W. Adam, *First Report*, p. 55

৩৯ মুসলিম আমলে উপমহাদেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে সবচাইতে বেশি প্রভাব পড়ে বাগদাদের আব্বাসীয় যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা 'দরসে নিযামিয়া'র। (দ্র. শিবলী নু'মানী, মাকালাত-এ-শিবলী, খণ্ড-৩, (আযমগড় : ১৯৩২), পৃ. ৪৩)। সেলজুকি সুলতান আলপ্ আরসালান ও মালিক শাহের স্বনামধন্য মন্ত্রী নিযাউল মুলক তুসী ১০৬৭ সালে দু'লক্ষ দিনার ব্যয়ে বাগদাদে 'নিযামিয়া মাদ্‌রাসা' নামে একটি উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এ প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীকালে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারে সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করে। এতে যে শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় এবং যে পাঠ্যসূচি অনুসৃত হয়, সেটিই বাগদাদের 'দরসে নিযামিয়া' নামে পরিচিত। (দ্র. *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam*, 1901-02-1906-07, Shillong, 1908, p. 103; *Calcutta University, Commission, 1917-19*, Vol. II, Calcutta, 1919, p. 129)

শাস্ত্র, মানতেক, ইতিহাস, রসায়ন, চিকিৎসা শাস্ত্র, অন্যান্য ব্যবহারিক বিজ্ঞান প্রভৃতি। তবে কোন কোন মাদ্‌রাসায় চিকিৎসাশাস্ত্র ও ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য মাদ্‌রাসা পাঠ্যসূচির বাইরে দীর্ঘমেয়াদি পাঠ্যসূচি ছিল। মধ্যযুগের শেষদিকে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দেবার জন্য প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

কুরআন, হাদিস, ধর্মতত্ব, আইনশাস্ত্র ও অন্যান্য ইসলামি বিষয়াদি মাধ্যমিক পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত ছিল। লোকায়ত সাধারণ বিজ্ঞান, যেমন- যুক্তিবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি এবং অন্যান্য বিষয়ও মাদ্‌রাসায় পড়ানো হত। পাঠ্য তালিকার কথা বলতে গিয়ে আবুল ফজল লিখেছেন,

"প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই নীতিশাস্ত্র, গণিত, কৃষি, পরিমাপ শাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতিষশাস্ত্র, চরিত্র-নির্ণয়বিদ্যা, গার্হস্থবিদ্যা, সরকারি আইন-কানুন, চিকিৎসা বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, উচ্চতর অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান সমূহ, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ করা উচিত; এসবগুলোর প্রত্যেকটি বিষয়ই ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করা যেতে পারে।"[৪০]

উপরোক্ত বিষয়গুলির অতিরিক্ত ছিল ন্যায়শাস্ত্র (Indian Logic), ব্যায়াকরণ (Grammar), যোগব্যয়াম (Patangala Yoga), বেদান্ত (উপনিষধ দর্শন শাস্ত্র), আকবরের ইচ্ছা ছিল মূসলমান ছাত্রদেরকে ভাল করে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে জানা এবং দুই ধর্মের মধ্যে একটি সমন্বয় গড়ে তোলা। আকবরের আদেশে মহাভারত ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং সকল অমাধ্যদেরকে এই মহাকাব্য পড়াশুনার আদেশ দেন। মহাভারতের ভাষান্তর ফারসি ১৫৯১ সালে স্বীয় পুত্র শাহজাদা মোরাদ যখন মালবের গভর্নর তাকে পাঠিয়ে আদেশ দিয়ে ছিলেন এই মহাকাব্যের শিক্ষায় নিজের জীবন গড়ে তুলার জন্য।[৪১] আবুল ফজলের বক্তব্য দৃষ্টে মনে হয় যে, ঐ সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ সমস্ত বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়া এবং ছাত্রদেরকে পাঠ্য বিষয় নির্বাচনের সুযোগ দেয়া হত। একজন ছাত্রকে উপরোক্ত সবগুলো বিষয়ই পড়তে হত না, বরং নির্বাচিত কয়েকটি বিষয় তাকে পড়তে হতো। প্রকৃতপক্ষে, আবুল ফজল সম্রাট আকবরের মতামতই প্রকাশ করেছেন যে, প্রত্যেক ছাত্রেরই উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করা উচিত। এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কলা ও বিজ্ঞানের সকল রকম বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য বাংলায় যথেষ্ট সুযোগ ছিল না। বিশেষ কয়েকটি মাদ্‌রাসায় শিক্ষার ক্ষেত্র বেশ ব্যাপক ছিল। তবে সাধারণ মাধ্যমিক স্তরের একজন ছাত্রকে উপরে বর্ণিত সব বিষয়ই অধ্যয়ন করতে হত বলে আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন যা দিল্লির ও আশে-পাশের মাদ্‌রাসাগুলির ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য ছিল।

---

৪০ আইন-ই-আকবরী, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৮৮

৪১ Akbarnama (tran.) Vol. III, p. 914

আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, মাদ্‌রাসার পাঠ্য তালিকা বিস্তৃত ও ভারী ছিল। সম্রাট আকবর পাঠ্যতালিকার ক্ষেত্রে আরও উন্নত ও উচ্চমানের কর্মসূচি প্রবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। মোগল সম্রাটগণ তাদের সন্তানদের যুগোপযুগী শিক্ষা দেবার চেষ্টা বরাবর বজায় রেখেছিলেন বলে জানা যায়। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, মোল্লা সালি (Mollah Sale) যুবরাজ আওরঙ্গজেবকে তৎকালীন পৃথিবীর ইতিহাস, মোগলদের ইতিহাস ঐতিহ্য, তাদের বিজয়গাথা, বিভিন্ন ভাষা, সাহিত্য, দর্শনসহ সর্ববিষয়ে তাকে পারদর্শী করে গড়ে তুলেছিলেন। সেজন্য তিনি ঋণ স্বীকার করে তার শিক্ষককে বলেছিলেন-

"I should be more indebted to you than Alexander was to Aristotle, and should consider it my duty to bestow a very different reward on you than Aristotle received from that Prince."[৪২]

বাংলায় সুলতানি আমলের পরে উন্নত মাদ্‌রাসা বাংলায় মাত্র গুটিকয়েক ছিল। ভারত উপমহাদেশে আগত আরবি ও ইরানি ওলামা সম্প্রদায় বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠ্য-তালিকাসমূহ এখানে প্রবর্তন করেন। বাংলার মুসলমান শাসনকর্তাগণ ও উলামা সম্প্রদায়, যারা এই একই শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করেছিলেন, স্বভাবতঃই তাঁরা বাংলাদেশেও এটা প্রবর্তন করে থাকবেন বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন। উল্লেখ করা হয়েছে যে, বোখারা থেকে আগত শরফ উদ্দিন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁও শিক্ষাকেন্দ্রে তার ছাত্রদেরকে ধর্মীয়, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুসলিম শাসনামলে এ প্রদেশে পীর-দরবেশ, উলামা ও শিক্ষকদের অধিকাংশই আরব ও পারাস্য থেকে এসেছিলেন। কিন্তু কেহউ তাওয়ামার মত পণ্ডিত ছিলেন না। বাংলার ইতিহাসে আবু তাওয়ামা অন্যতম ছিলেন। উচ্চশিক্ষার পর্যালোচনা করতে গিয়ে এটা উল্লেখযোগ্য যে, এ উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের মত বাংলাদেশের কোন কোন মাদ্‌রাসাসমূহে রসায়ণ, চিকিৎসাশাস্ত্র ও লোকায়ত বিজ্ঞান বিষয়াদি শিক্ষা দেয়া হতো। এ উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের মতো বালাদেশের মাদ্‌রাসাসমূহে 'রসায়ন', 'গ্রিক' ও 'ইরানি' চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যয়ন করা হতো এবং এই শাস্ত্রমতে চিকিৎসা চালানো হতো। 'শরফনামা' গ্রন্থে আমির সাহাবুদ্দিন হাকিম কিরমানী নামক চতুর্দশ শতকের একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালি চিকিৎসকের উল্লেখ পাওয়া যায়। চিকিৎসাবিদ্যায় বিপুল খ্যাতি অর্জন করায় তিনি 'চিকিৎসকদের গৌরব' আখ্যায়িত হয়েছেন। সুলতান জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ চিকিৎসাবিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। মীর্জা নাথনের সময়ে কবিরাজ শ্রেণির চিকিৎসক ছাড়াও, বহু চিকিৎসককে এই প্রদেশে চিকিৎসা ব্যবসায়

৪২ Francois Bernier, *Travels in the Mogul Empire*, New Delhi, p. 160.

নিয়োজিত দেখা যায়। মুহাম্মদ সাদিকের 'সুব-ই-সাদিক' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী মীর আলাউল মুলক চিকিৎসাবিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়াদিতে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন এবং উল্লিখিত গ্রন্থকারের সময়ে তিনি জাহাঙ্গীরনগরের অধিবাসী ছিলেন।[৪৩]

গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ বাংলার নবাবদের আমলের অনেক চিকিৎসকের নামোল্লেখ করেছেন। হেকিম তাজউদ্দিন ছিলেন সেই আমলের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। অবশ্য ঐ যুগের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন এবং নবাব আলিবর্দী খানের দরবারের চিকিৎসক হেকিম হাদি আলী খান। তিনি হাশেমীয় বংশের লোক ছিলেন এবং ইস্পাহান থেকে এদেশে আগমন করেন। গোলাম হোসেনের ভাষার হেকিম হাদী খান ছিলেন চিকিৎসকদের প্রতীক ও পূর্ণরূপ, দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞান ভাণ্ডার, তার সময়ের গ্যালেন। তিনি আরও বলেন, রোগ নিরাময় করার ব্যাপারে সে যুগে তার সমকক্ষ আর কেউ ছিল না।[৪৪]

বার্নিয়ারের মতে যদিও মুসলিম চিকিৎসকেরা চিকিৎসাক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের নতুন নতুন আবিষ্কারের কথা জানতেন না, তথাপিও প্রথম মুসলিম যুগের দার্শনিক ও চিকিৎসক ইবনে সিনা ও ইবনে রুশদ প্রদর্শিত পদ্ধতিতে রোগের চিকিৎসা ও নিরাময়ে তাঁরা যথেষ্ট সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। বার্নিয়ার ভারতের মুসলিম চিকিৎসকদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন। দিল্লি ও উত্তর ভারতের চিকিৎসকদের মত বাংলার চিকিৎসকরা তেমন উন্নত ছিলেন না। তবে চিকিৎসাশাস্ত্র অনুশীলনে এবং রোগচিকিৎসার ক্ষেত্রে তারা ইবনে সিনাহ ও ইবনে রুশদ এর পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। মি. এডাম ঊনিশ শতকের প্রথম দিকেও বাংলার মাদ্‌রাসাগুলোতে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যায়ন করতে দেখেছেন। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, ইসলামি বিষয়াদি ছাড়াও প্রকৃতি বিষয়ক দর্শন ও সাধারণ দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থাদির সঙ্গে অনূদিত ইউক্লিডের ক্ষেত্র বিদ্যা (geometry) এবং টলেমির জ্যোতিষশাস্ত্র কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা হত।[৪৫] 'টোলে' অনুসৃত পাঠ্য তালিকার সঙ্গে তুলনা করে এডাম মন্তব্য করেন যে, মুসলমানদের অনুসৃত পাঠ্য-পদ্ধতি বাংলার বিদ্যালয় (টোল) প্রচলিত বিষয়গুলো অপেক্ষা ব্যাপক ও উদার ছিল।[৪৬]

---

৪৩ Subhi-i-Sadiq and Lahori (II, p. 755) quoted by Dr. a. Halim in the *Journal of the Pakistan Historical Society*, 1953, pt. IV, p. 347

৪৪ সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তাবাতবায়ি, *সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খেরীন*, অনু. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (দিব্য প্রকাশ: ২০০৬খ্রি.), সং.১, খ.২, পৃ. ১০৭

৪৫ এ.আর. মল্লিক কর্তৃক উদ্ধৃত- *British Policy and the Muslims in Bengal*, p. 152.

৪৬ W. Adam, *Second Report*, p. 26-27.

**শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা**

কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানস্পৃহার সঞ্চার করেছে। রাসূল (স) জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁর অনুগামীদেরকে উপদেশ দিয়েছেন এবং কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন। মুসলমানরা খেলাফত যুগের খ্যাতনামা পূর্বসূরিদের নিকট থেকে একটি মূল্যবান শিক্ষা-পদ্ধতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। যেখানেই তারা গিয়েছেন সেখানেই তারা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে গেছেন। রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে এ উপমহাদেশে তারা তাদের শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারাও নিয়ে আসেন।

নীরেন্দ্র নাথ লাল মন্তব্য করেন,

"ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ভারত প্রবেশ কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ইহা একটি যুগান্তকারী সূচনা করে।"[৪৭]

ইতিহাসবিদ মিনহাজ-ই-সিরাজ তাঁর 'তবকাত-ই-নাসিরীতে উল্লেখ করেছেন, মুহাম্মদ-বিন-বখতিয়ার লক্ষ্মণাবতীতে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন।[৪৮] সুলতান রুকুন উদ্দিন কাউকাউসের রাজত্বকালে কাজী আল-নাসির মুহাম্মদ ৬৯৮ হিজরি (১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে) ত্রিবেণীতে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন এবং শিক্ষার জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।[৪৯] জাফরখান কর্তৃক ৭১৩ হিজরি (১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে) ত্রিবেণীতে আরেকটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্‌রাসাটি 'দারুল খায়রাত' নামে পরিচিত হয়।[৫০] আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মালদহের ফিরোজপুরে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন।[৫১] শাসকবর্গ, অভিজাত ও বিত্তবান ব্যক্তিগণ সমাজ ও রাষ্ট্রে অতি প্রশংসনীয় কার্য হিসেবে বিদ্যালয় বা মাদ্‌রাসা স্থাপন করতেন। সুতরাং সে যুগে এমন রাজপুরুষের সংখ্যা খুবই কম ছিল যাঁরা কোনো না কোনভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনের সাথে জড়িত ছিলেন না।[৫২] বাংলার মুসলিম শাসক শ্রেণি কলা, বিজ্ঞান, ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

---

৪৭ N. N. Law, *Promotion of Learning during Muhammedan Rule, London*, 1916, pp. 16 (XIV)

৪৮ মিনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী*, অনু. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩খ্রি.), পৃ. ১৫১

৪৯ *Epigraphia Indo-Moslemica,* 1917, p. 13, Plate II.

৫০ *Inscription in JASB*, ১৮৭০, পৃ. ২৮৫

৫১ *Inscription in JASB*, ১৮৭৪, পৃ. ৩০৩

৫২ S.M. Jafar, *Education in Muslim India*, *Being An Inquirey into the State of Education During the Muslim Period of Indian History (1000-1800, A.D)* (Reprint, Delhi, 1973), p. 6

এছাড়া, সূফি-উলামা, আমির-উমরাহ ও জমিদারগণ শিক্ষার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।[৫৩] সূফি-সাধকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মুসলিম বিজয়ের পূর্বেই বাংলায় আগমন করেন। তাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত খানকার মাধ্যমে ভক্ত-শিষ্যদের মাঝে মহান প্রভুর একত্ববাদ, মানবজাতির বিশ্বভ্রাতৃত্ব, শান্তি, প্রেম এবং সামাজিক বিচারের ললিতবাণী প্রচার করতেন। সূফিগণ ইবাদত, আধ্যাত্মিক সাধনা ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে মসজিদ ও খানকা নির্মাণ করেছিলেন। এ সকল মসজিদ ও খানকাই ছিল বাংলার ইসলামি শিক্ষার সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। মসজিদ, খানকাগুলোতে শত শত ধর্মান্তরিত মুসলিম পবিত্র কুরআন পাঠসহ ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান, ইবাদতের রীতিনীতি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন। কালক্রমে এ সকল মসজিদ ও খানকা মক্তব হিসেবে অপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে সমাজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ইসলামি তালিম ও তরবিয়তের কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয় এবং এগুলো ত্রয়োদশ শতকে এদেশে মুসলিম বিজয়ের পথকে সহজ ও সুগম করে তুলেছিল।[৫৪]

নরেন্দ্র নাথ লাল বলেছেন, জিয়াউদ্দিন আয়াজ খিলজি লক্ষ্মণাবতীতে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৫৫] বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ের শাসক, সুলতান ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগত আরও অনেক মাদ্‌রাসা স্থাপন করেছেন। বিদ্যোৎসাহী বাঙালি মুসলমানগণ এই প্রদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যে বহু মাদ্‌রাসা ও কলেজ স্থাপন করেন। সুলতানদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের ধর্ম ও ইসলামি শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করেন, এমনকি মক্কায়ও মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। জানা যায় যে, সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ প্রচুর ব্যয়ে মক্কায় একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। তিনি মদিনাতেও একটি মাদ্‌রাসা নির্মাণ করেন এবং এর ব্যয় নির্বাহের বন্দোবস্ত করেন।[৫৬] ঐতিহাসিক কুতুব উদ্দিন-আল-হানাফী[৫৭] তাঁর লিখিত ইতিহাসগ্রন্থ 'তারিখ-ই-মক্কায়'[৫৮] এসব বর্ণনা দিয়েছেন।

---

৫৩ Abdul Karim, *Social History of the Muslims in Bengal (Down to A.D. 1538)*, (Dacca: 1959), p. 74-75; N.N. Law, *Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule* (By Muhammadan), (London: 1916), p. 106-113.

৫৪ A.K.M. Ayub Ali, *History of the Traditional Islamic Education in Bengal* (Dhaka: 1983), p. 6-15.

৫৫ Narendra Nath Law, *Promotion of Learning in India during Muhamedan rule,* pp. 106.

৫৬ শামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আবদুল রহমান আল-সাখাবী-'আল-দাও আল-লামী' (কায়রো: ১৩০৩ হিজরি) দ্বিতীয় অধ্যায় এবং গুলাম আলী আজাদ বিলগ্রামী– *'খাজিনাত-ই-আমিরাহ'* (নওল কিশোর প্রেস: তা.নে), পৃ. ১৮৩

৫৭ **কুতুব উদ্দিন-আল-হানাফী:** তিনি একজন বিখ্যাত মুফতি ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা আলা উদ্দিন আহমদ। তিনি ৯১৭হি./১৫১২ খ্রি. লাহোরো জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মক্কার খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও আলেমদের নিকট ইসলামী জ্ঞানার্জন করেন। ৯৫৪ হিজরিতে (১৫৪৮খৃ.) তুরস্কের সুলতান সুলাইমান (১৫২০-১৫৫৫খৃ.) তাঁকে মক্কার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের নায়েব বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। পরে তিনি মক্কা শরিফের মুফতী এবং সুলাইমানিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ৯৯০হি./১৫৮২খৃ. মক্কায় ইন্তিকাল করেন।

৫৮ কুতুব উদ্দিন-আল-হানাফী লিখিত মক্কার ইতিহাসগ্রন্থ এটি পূর্ণ নাম-*'কিতাব-উল-এলাম বি-আলাম বায়তুল্লাহিল-হারাম'* তবে এটি *'তারিখ-ই-কুতবী'* এবং *'তারিখ-ই-মক্‌কা'* নামে সমধিক পরিচিত।

তাঁরিখ-ই-মক্কার দশটি অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে মিশরের মামলুক সুলতানদের আমলে মক্কা শরীফের সম্প্রসারণ ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মামলুক সুলতানদের মধ্যে আল-মালিক আল-নাসের ফরজ বিন বরবুক (৮০১-৮১৫হি./১৩৯৮-১৪১২খ্রি.) বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের সমসাময়িক ছিলেন। তাই এ অধ্যায়েই বাংলার সুলতান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজের বিবরণ দেওয়া হয়।[৫৯] সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহও মক্কায় একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৬০] বাংলার সুলতানদের এই সমস্ত মহান কার্যাবলি মুসলিম সমাজের উন্নতির প্রতি তাদের গভীর আগ্রহের পরিচয় রেখে গেছে।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় বাংলায় মুসলিম শাসনকাল ১২০৫ থেকে ১৭৫৭ পর্যন্ত ৫৫০ বছরের মধ্যে ১২১ জন মুসলিম শাসক (ইক্তাদার, সুলতান, সুবাদার ও নবাব) বাংলা শাসন করেন।[৬১] এঁরা কেউ তুর্কি, আফগান, মোগল, ইরানি বা আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদের সাথে এদেশে বহন করেছেন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এ সকল মুসলিম শাসকগণ সর্ব উপায়ে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। তার মধ্যে দিল্লির সুলতানি আমলের (১২০৫-১৫৩৮খ্রি.) প্রথম শাসক বখতিয়ার খিলজিসহ আলী মর্দান খিলজি, সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইউওয়াজ খিলজি, শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ, জালালুদ্দিন আলী মর্দান খিলজি এবং বাংলার সুলতানদের মধ্যে সুলতান গিয়াস উদ্দিন হোসেন শাহ, রুকন উদ্দিন বারবক শাহ প্রমুখ সুলতানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।[৬২] বাংলার মোগল শাসনামল (১৫৭৬-১৭৫৭খ্রি.) ছিল শিক্ষা সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল যুগ। মোগল সম্রাটগণ, যুবরাজ ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ এবং রাজকর্মচারীবৃন্দ উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন। তাঁদের দরবার সমূহ জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের কেন্দ্রস্থল ছিল। বাংলায় যে সকল সুবাদার, দেওয়ান, বখশি, কাজি, ফৌজদার ও অন্যান্য রাজকর্মচারীগণ আগমন করেন তাঁরা সকলেই শিক্ষা ও সুরুচির ক্ষেত্রে তাঁদের বিশিষ্টতা এবং পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ প্রদানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। খান খানান মুনিম, খান জাহান, রাজা মানসিংহ, ইসলাম খান, কাসিম খান, ইব্রাহিম খান, ফতেহজঙ্গ, শাহজাদা

---

৫৯ ড. আবদুল করিম, *মক্কা শরীফে বাঙ্গালী মাদ্রাসা* (চট্টগ্রাম: ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ১৩-১৪

৬০ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ওমর আল-মক্কী ওরফে হাজী দবীর– *'জাফর আল-অলি-বিন-মুজাফ্‌ফর অ-অলিহ' (Arabic History of Guzrati;* স্যার ডেনিসন্ রোস কর্তৃক সম্পাদিত), পৃ. ৯৭৯

৬১ Goron, Stan and G.P. Goenka, *The Coins of the Indian Sultans, Covering the Area of Present-day India, Pakistan and Bangladesh* (New Delhi: 2001),. p. 139-140; Abdul Karim, *Bengal Under the Mughals: Politics, Society and Culture*, `Ahme, A. F. Salahuddin and Bazlul Mobin Chowdhury (ed.), Bangladesh: National Culture and Heritage, An Introductory, Reader (Dhaka: 2004), p. 123-124.

৬২ N.N. Law, *Promotion of Learning*, pp. 106-113; জ্যোৎস্না বিকাশ চৌধুরী, *শিক্ষার ইতিহাস* (ঢাকা: ১৯৯৪খ্রি.), পৃ. ৯৪

শুজা, মীর জুমলা, শায়েস্তা খান, যুবরাজ মুহাম্মদ আজিম, আজিম উশশান ও অন্যান্য সুবাদারগণ তাঁদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য সুপরিচিত ছিলেন। মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার পর ভারতের উত্তরাঞ্চলসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষক, চিকিৎসক, শিল্পী, কারিগর ও তাদের ন্যায় অন্যান্যদের অধিক হারে বাংলায় আগমনে এক নতুন অধ্যায় সূচীত হয়।[৬৩] বাংলার নবাবগণও তাঁদের দরবার ও প্রশাসন বিভাগে বিদ্বান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়োগ দিত। এ সময়ে সম্রাটদের দরবারে ও উত্তর ভারতে রাজনৈতিক দুর্যোগের কারণে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি নিরাপত্তাহীনতায় বিরক্ত হয়ে মুর্শিদাবাদের নবাবদের অধীনে আশ্রয় লাভ করে।[৬৪] কথিত আছে যে, মুর্শিদকুলি খান ২৫০০ বিদ্বান ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।[৬৫]

শেখ আখি সিরাজ উসমানকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করার সময়ে শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মন্তব্য এর সাক্ষ্য বহন করে।[৬৬] শিক্ষা ও জ্ঞানের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা মুসলমানদের পার্থিব ও পারমার্থিক প্রয়োজনের জন্য সকল যুগে সকল দেশে ধর্মীয়ভাবে স্বীকৃত।

মুসলমান শাসনকর্তাগণ, আমির উমরাহ, রাজকর্মচারী ও অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিরা শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। উলামা ও সূফি-দরবেশগণ বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট থাকা দ্বীনি দায়িত্ব বলে মনে করতেন। ফলে, শহরে এবং প্রধান প্রধান স্থানসমূহে বহু সংখ্যক মক্তব, মাদ্‌রাসা ও বিদ্যালয় গড়ে উঠে। মুসলমানদেরকে তাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতিতে শিক্ষার গুরুত্ব অবহিত করার জন্য রাসূল (স)–এর বাণী খোদিত করে দেয়া হয়েছিল। ৬৯৮ হিজরির (১২৯৮ খ্রি.) তারিখযুক্ত সুলতান রুকন উদ্দিন কাইকাউসের সময়ে ত্রিবেণীর মাদ্‌রাসার একটি শিলালিপিতে একটি হাদিসের সন্ধ্যান পাওয়া যায় । হাদিসটি হল:

"তোমরা জ্ঞানার্জন কর, কেননা, জ্ঞানার্জনই প্রকৃত আত্মনিবেদন, এর অনুসন্ধানই ভক্তি এবং এর চর্চাতেই প্রকৃত গৌরব।"

শিক্ষাকে ধর্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কেননা, যে সকল অনিষ্ট বর্মীধারীর সহায়তায়ও এড়ানো যায় না, শিক্ষারূপ কর্মদ্বারা তা পরিহার করা যায়।[৬৭]

শেখ ও উলামাদের ধর্মপ্রচার এবং মাদ্‌রাসা ও মসজিদের গায়ে উৎকীর্ণ শিলালিপিসমূহ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এই উপলব্ধির সঞ্চার করে যে, কুরআন ও হাদিস শিক্ষা একটি ধর্মীয় কর্তব্য এবং নৈতিক ও পার্থিব প্রয়োজনের নিমিত্তে একান্ত দরকার। অতএব দেখা যায় যে, বাংলার সাধারণ

---

৬৩ আব্দুল মোমেন চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭খ্রি.), পৃ. ১২৮।

৬৪ ওয়াকিল আহমেদ, *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী (১৭৫৭-১৮০০)* (ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩-৪

৬৫ Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times*, Dacca, 1963, p. 238.

৬৬ আখি সিরাজ, *সিয়ারুল আরেফীন*, পৃ. ৯০; *আখবার আল–আখিয়ার*, পৃ. ৮৬।

৬৭ *Epigraphia Indo-Moslemica*, 1917-18; *Memoirs of Gour*, pp. 157.

মুসলমানরাও তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্যে শিক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করে। বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়, ঐ যুগের সমাজে শিক্ষা ও শিক্ষিতদেরকে উচ্চ সম্মান দেয়া হত। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের অলংকাররূপে পরিগণিত হতেন। সুলতানি আমলে একজন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত লোককে দেশের অভিজাত শ্রেণির সমতূল্য মনে করা হত। এই সত্য ষোড়শ শতকের একজন মুসলমান কবির রচনায় বিধৃত হয়েছে। কবি তাঁর 'লাইলী মজনু' নামক বাংলা কাব্যে লিখেছেন যে, পিতা নিজেকে একজন সম্মানিত ব্যক্তি মনে করতেন যদি তার পুত্র জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করত। শিক্ষাকে মানব জীবনের অলংকার, তার গলার হার ও মাথার পাগড়ী স্বরূপ গণ্য করা হত। বিদ্যাহীন একজন সুপুরুষকেও অযোগ্য ব্যক্তি মনে করা হতো।"[৬৮] স্কটিশ মিশনারি উইলিয়াম অ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে (১৮৩৫-১৮৩৮) বলেন যে, সম্পদশালী মুসলমান বা জমিদারগণ নিজ খরচে শিক্ষক রাখতেন এবং বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষণ করতেন।[৬৯] শিক্ষার প্রতি এরূপ স্পৃহা এ প্রদেশে মুসলমান শাসনামলে বাঙালি মুসলমান সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছে। যে যুগের সমাজ জীবনে শিক্ষার এত উচ্চ মর্যাদা ছিল, সেই যুগের প্রত্যেক পিতামাতা স্বাভাবিকভাবেই তার ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে আগ্রহী ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসনভার গ্রহণের সময়ে দেশের এক-চতুর্থাংশ ভূমি কর বা খাজনামুক্ত তালুক হিসেবে পেয়েছিল।[৭০] এগুলোর আয় থেকে মসজিদ, মক্তব, মাদ্‌রাসা ও খানকাসহ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করা হত। প্রতিটি গ্রাম প্রধান নিজেদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার জন্য মক্তব মাদ্‌রাসা পরিচালনা করতেন। একইভাবে দারিদ্র্য পাড়া-প্রতিবেশির ছেলে-মেয়েরাও সেসকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত।[৭১]

**শিক্ষার মাধ্যম**

বাংলার জনসাধারণের ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা, মক্তবে ছেলে মেয়েদেরকে কুরআন, কিছু হাদিসের বাণী, আরবি ভাষায় শিক্ষা দেয়া হতো। আর ফারসি ভাষায় শিক্ষা দেয়া হত গুলিস্তা, বোস্তা, পান্দে নামা প্রভৃতি। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা। ঠিক

---

৬৮ 'লাইলী মজনু', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-২৩
সদায় অনেক শ্রদ্ধা জনক মনএ।
সর্বশাস্ত্রে বিষারদ হৈতে তনয়;
ভাগ্যবন্ত পুরুষের বিদ্যা অলংকার,
বিদ্যা সে গলার হার বিদ্যা সে শৃঙ্গার।
পুরুষ সুন্দর অতি রূপে অনুপম,
গুণ না থাকিলে তার রূপে কিবা কাম।

৬৯ J. Long Rev, *Adam's Report on Vernacular Education in Bengal and Behar*, 1833, 1836 and 1838, (Culcutta : 1868), pp. 40-42

৭০ W.W.Hunter, *The Indian Mussalmans, Reprinted from the First Edition*, Lahore, p. 232

৭১ OBaidullah Al Obaidi, Muhammadan Education in Bengal, *The Bengal Magazine*, January, 1873, p. 6-7

তেমনিভাবে হিন্দুদের পাঠশালা ও চতুস্পাটিতে হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র যেমন, বেদ, গীতা, উপনিষধ, রামায়ন, মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা দেয়া হত, অবশ্য বাংলায় তা বুঝিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু মাদ্‌রাসাগুলোতে শিখতে হত ফারসি ও পরবর্তীকালে উর্দুর মাধ্যমে। আর ব্রাহ্মণদের টোলে শিক্ষা দেয়া হত সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে।

বাংলার মোগলদের নিকট উচ্চ শ্রেণিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ফারসি ছিল মাধ্যম। ফারসি ভাষায় কিতাবাদি লেখা হত আর রাষ্ট্রের ভাষাও ছিল ফারসি। অফিস-আদালতের সরকারি ভাষা ছিল ফারসি যা জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে চর্চা করা হতো। এছাড়া, সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের রুচিশীল সাহিত্যের ভাষা ছিল ফারসি এবং তাঁদের বিশ্বাস ছিল অন্য কোনো ভাষা কিংবা শিক্ষা পদ্ধতি এর পরিপূরক হতে পারে না। এই ভাষায় আলেম-উলামাদের সহজ দক্ষতা থাকায় তাঁদের ও অভিজাত পরিবারের সন্তান-সন্ততিও ফারসির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করত।[৭২] মক্তবের ছাত্রদের জন্য ফারসি, আরবির পাশাপাশি বাংলা ভাষা শিক্ষারও প্রচলন ছিল। বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। ফলে, বাঙালি মুসলমানগণ মাতৃভাষা শিক্ষাকে অবহেলা করতে পারেনি। বহিরাগত মুসলমানেরাও বাংলা ভাষা ও এদেশকে নিজের দেশ হিসেবে গ্রহণ করেছিল।[৭৩]

**শিক্ষক ও উলামা সম্প্রদায়**

মাদ্‌রাসায় আরবী, ফারসি, উভয়ই পড়ানো হত। ভারত উপমহাদেশের মুসলমানেরা তাঁদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপদ্ধতি এবং পাঠ্যতালিকার প্রবর্তনে বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের (৭৫০-১২৫৮) শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনুসরণ করতেন। বাংলার মাদরাসায় নিযুক্ত উলামা সম্প্রদায়ও ঐশিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করে এদেশেও তা প্রবর্তন করেন। তাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থা 'দরসে নিযামিয়া' নামে পরিচিত ছিল।[৭৪]

আব্দুল হামিদ খান লাহোরি মোগল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী জাহাঙ্গীরনগরের পণ্ডিত মির আলাউল মূলুককে 'বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতীক' হিসেবে বর্ণনা করেন।[৭৫]

ইসলামী ধর্ম, দর্শন, আইন, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা, রসায়ণশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যায় বিপুল জ্ঞানের অধিকারী একদল পণ্ডিত ব্যক্তির উল্লেখ রয়েছে 'সিয়ারুল মুতাখ্‌খেরিন' ইতিহাস গ্রন্থে।

---

৭২ J. Long, *Adams Reports*, p. 102-103

৭৩ N.K. Bhattasali, *Coins and Chronology of the Early Independent Studies of Bengal*, Cambridge, 1922, p. 170

৭৪ *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam*, 1901-1902_1906-07, Shillong, 1908, p. 103; *Calcutta University commission*, 1917-19. Vol. II, Calcutta, 1919, p. 129.

৭৫ Abdul Hamid Lahori, *Badshanama*, Culcutta, 1867, Vol. 2, p. 755

এঁদের মধ্যে স্মরণীয় ছিলেন, মৌলবি মুহাম্মদ নাসির, যায়ির হোসেন খান, মির মুহাম্মদ সাজ্জাদ, মুহাম্মদ হাজিন, সৈয়দ মুহাম্মদ আলী, হাজি বদিউদ্দিন, হাকিম তাজ উদ্দিন এবং হাকিম হাদী আলী খান।[৭৬] সে সময়ের শিক্ষকগণের অনেকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। উচ্চশিক্ষার পণ্ডিতগণ সমাজ ও রাষ্ট্রপরিচালনায় প্রভাব বিস্তার করতেন। মাওলানা শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা, ইয়াহইয়া মানেরী, শেখ আলাউল হক, নুর কুতুব আলম রাষ্ট্র ও সমাজে যাতে কুরআন, সুন্নাহর বিধি-বিধানগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় সেদিকে তাঁদের খেয়াল ছিল।[৭৭]

রাষ্ট্র পরিচালিত কিছু বিদ্যালয়ের শিক্ষক ব্যতীত দেশের সকল ব্যক্তিগত বিদ্যালয় বা মাদ্‌রাসার শিক্ষকগণ পাঠদানের বিনিময়ে ব্যক্তিগত সেবা ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করতেন না। কারণ শিক্ষকগণ শিক্ষাপ্রদানকে তাঁদের ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করতেন। এবং ছাত্রদের জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যাচর্চাকেই তাঁদের জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতেন।[৭৮] সেজন্য বিনাবেতনে ছাত্রদেরকে নিজ গৃহে শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্র-শিক্ষক যৌথভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন। তবে শিক্ষকগণ তাঁদের শিক্ষা সেবার কাজের জন্য সুলতান বা শাসক কিংবা জমিদারগণের পক্ষে থেকে 'মদদ-ই-মাশ' হিসেবে ভূ-সম্পত্তি লাভ করতেন।[৭৯] কিন্তু তাঁরা শিক্ষা বা গবেষণার কাজে ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। 'মদদ-ই-মাশ' তাঁদের যেমন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দান করেছিল, কাজেও তাঁদের স্বাধীনতা ছিল। তাছাড়াও শিক্ষকদের অনেকে ছাত্রদের নিকট থেকে নানা উপঢৌকন লাভ করতেন। ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকই ছিলেন প্রধানতম বিচারক। ছাত্রের শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেই তিনি ছাত্রকে সার্টিফিকেট প্রদান করতেন। তখন কোনো রাষ্ট্র বা কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা ছিলনা। শিক্ষার্থীরা জানত যে, শিক্ষকেরাই তাদের মূল্য যাচাই করার একমাত্র কর্তা। সুতরাং এই শিক্ষায় পরীক্ষা পাশের জন্য বাছাই করে পড়ার বা অন্য কথায় ফাঁকি দেওয়ার কোন অবকাশ ছিল না।[৮০]

শিক্ষকগণ সমাজে অত্যন্ত সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ছাত্ররা সাধারণত শিক্ষকদের বিনা অনুমতিতে তাদের সঙ্গে কথা বলার রেওয়াজ ছিল না। যে সকল শিক্ষক কোন প্রশ্নের উত্তর বইয়ের সহায়তা ছাড়া দিতে পারতেন তাদের পদমর্যাদা অনেক বেশি ছিল। এম.এইচ. সাইয়্যেদ তাঁর 'মোগল এম্পায়ারে'র দ্বিতীয় খণ্ডে বাদাউনির বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে,

---

৭৬ Sayed Golam Hossain Tabtabai, *Sieir Mutaqherin*, Vol. II, translated by Haji Mustafa, Culcutta, 1789, p. 175-176.

৭৭ Abdul Karim, *Social and Cultural*, Vol. I, p. 161-169; আব্দুল কারিম, *বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষার গোড়ার কথা, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ২৩৪-২৩৫

৭৮ J. Long, *Adams Reports*, p. 29; Abdul Karim, *Muhammadan Education*, p. 7.

৭৯ Khonder Fuzli Rubee, The Origin of the Musalmans of Bengal: Being a Translation of Haqiqote Musalman-I-Bengalah, Calcutta, 1895, p. 70.

৮০ আব্দুল কারিম, *বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষার গোড়ার কথা, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

"Shaikh Abdullah of Badaon who never felt the necessity of referring to a book for the purpose of solving those questions and obscure subtleties, for whatever he had once seen, he had on the tip of his tongue."[৮১]

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে তিনি একজন অতি সম্মানিত শিক্ষক ছিলেন।

**প্রতিষ্ঠানের ব্যয়**

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসনভার গ্রহণের সময়ে দেশের এক চতুর্থাংশ ভূমি কর বা খাজনামুক্ত তালুক হিসেবে পেয়েছিল।[৮২] এগুলোর আয় থেকে মসজিদ, মক্তব, মাদ্‌রাসা ও খানকাসহ অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় করা হত।

**নারী শিক্ষা**

মুসলমান নারী পুরুষ উভয়ের জন্য বিশেষ স্তর পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। কাজেই মুসলমানগণ তাদের মেয়েদের শিক্ষার প্রযোজন স্বীকার করেন, যাতে নারীরা তাদের ধর্মের মূলনীতি, কুরআন পাঠ ও ধর্মের ক্রিয়া-কর্ম সঠিকভাবে পালন করতে পারে, সে জন্য পিতা কন্যাদের শিক্ষিত করে তোলা ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। বালিকাদের ও বালকদের 'বিসমিল্লাহখানি' অনুষ্ঠান দ্বারা অক্ষর-পরিচয় শুরু হত এবং তারা একই মক্তবে বালকদের সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ করার প্রমাণ মেলে। এ থেকে এই ধারণা জন্মায় যে, স্ত্রী শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায়ের একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। আর্থিক কারণে ও সমাজের পর্দা প্রথার ফলে মেয়েদের মক্তব পরবর্তী শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাথমিক মানের শিক্ষা পর্যন্তই সাধারণ পরিবারের মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ প্রকৃতপক্ষে সীমাবদ্ধ ছিল। সম্রাট আকবর ফতেহ্‌পুর সিক্রিতে তাঁর প্রাসাদে রাজপরিবার ও অভিজাত শ্রেণির মেয়েদের জন্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।[৮৩] এ থেকে অনুমান করা হয় যে শাসক, অভিজাত সম্প্রদায় ও অবস্থাপন্ন মুসলমানেরা তাদের মেয়েদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটা দেখা গেছে যে, মুসলমান শাসনামলে অভিজাত পরিবারের মেয়েরা সুশিক্ষিতা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিলেন। মোগল সমাজে বহু রমণী ছিলেন, যাঁরা তাঁদের সাহিত্য বিষয়ক কৃতিত্বের জন্য খ্যাতি অর্জন করে ছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম, হুমায়ুনের ভাগ্নি সেলিমা সুলতানা, আকবরের দুধ মা মহাম আনাগা, জাহাঙ্গীরের মহিষী নূরজাহান, শাহজাহানের পত্নী মমতাজ মহল। শাহজাহানের কন্যা জাহানারা ও আওরঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নেসা।

---

৮১ M.H. Sayed, *History of the Glorious Mughal Empire*, Vol-3, 1st Published-2004, New Delhi, p. 376.

৮২ W.W. Hunter, *The Indian Mussalmans*, Reprinted for the First Edition, Lahore, 1964. p. 143

৮৩ N.N. Law, *Promotion of Learning* etc. pp. 202.

মোগল রমনীগণ রাজ-প্রাসাদস্থিত বিদ্যালয়ে বা গৃহে নিযুক্ত শিক্ষয়িত্রীদের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা লাভ করতেন। সতীউন্নেসা নামক জনৈকা উচ্চশিক্ষিতা ও প্রতিভাসম্পন্না মহিলার নিকট জাহান আরা ও রওশন আরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং আওরঙ্গজেবের অনুগ্রহভাজন খাস মুন্‌শী (সেক্রেটারি) ইনায়েত উল্লাহ কাশ্মিরীর মা হাফিজার নিকট জেবুন্নেসা শিক্ষা লাভ করেন। এ উপমহাদেশের অন্যান্য মুসলমান রাজ্যে এ ধরনের মহিলা শিক্ষয়িত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়। ফিরিস্তা অনুসারে, মালবরাজ সুলতান গিয়াসুদ্দিনের হারেমে (১৪৬৯-১৫০০ খ্রি.) পনের হাজার রমণী ছিলেন। এদের মধ্যে বহু শিক্ষয়িত্রী, গায়িকা ও অন্যান্য বৃত্তির মহিলা ছিলেন।[৮৪] শিক্ষয়িত্রীগণ রাজপ্রাসাদে মেয়েদের শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। শিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী সুলতানগণ, অভিজাত সম্প্রদায় এবং অবস্থাপন্ন লোকেরাও তাদের কন্যাদের শিক্ষাদানের নিমিত্ত গৃহে বিদ্যালয় এবং শিক্ষয়িত্রী রাখার ব্যবস্থা করতেন। এমনকি, ঊনিশ শতকের প্রথম পাদেও এডাম পাণ্ডুয়ায় অবস্থাপন্ন মুসলমান কর্তৃক গৃহশিক্ষয়িত্রী রাখার রীতি লক্ষ্য করেছেন। মৌলবীগণ যাঁরা সাধারণতঃ মাদ্‌রাসার শিক্ষক ছিলেন, তাঁরাও তাঁদের অবসর সময়ে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের কন্যাদের শিক্ষাদান করতেন। এভাবেই অভিজাত মুসলমান বালিকারা নিজ গৃহে উচ্চশিক্ষা লাভ করতো। এটি একটি বিশেষ ধরনের বন্দোবস্ত বিধায় বিত্তবান ছাড়া সাধারণ লোকদের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না।

মধ্যযুগে রাজা-বাদশাহ সুলতানদের হেরেমে কয়েক হাজার রমণী বাস করত। হেরেম ছিল রাজকীয় পরিবারের বাসস্থান, আশ্রিতা রমণীদের আশ্রয়, রাজা-বাদশাহর উপপত্নী, ক্রিতদাসী, বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পকলাবীদ, শিক্ষিকা, মহিলা চিকিৎসক ও ধাত্রী, রাজকীয় পরিবারের বিনোদন কেন্দ্র, সুলতানের পারিবারিক মন্ত্রণালয় ও সুলতানের বিশ্রাম ও ব্যক্তিগত বিনোদন কেন্দ্র। হেরেমেই গড়ে উঠে রাজকীয় তাহযিব ও তামাদ্দুন, আদব-কায়দা, ললিত ও শিল্পকলা, বিদ্যা চর্চা, শিল্প-সাহিত্য, প্রাসাদ বিতর্ক, আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। এখানে ছিল মহিলা হেরেম (প্রাসাদ) প্রশাসক যারা রাষ্ট্রীয় নীতি পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করার যোগ্যতা রাখত। কাজেই তাদের শিক্ষা-দীক্ষার মান, অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ ও রাজকীয় আবহ রক্ষণা-বেক্ষণের সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা তুলনা হয় না। হেরেমের নিরাপত্তায় চার দেয়াল ও পরিখার বাইরে থাকত সামরিক বাহিনীর সদ্যসরা আর অভ্যন্তরে নিয়োজিত ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খোজা কর্মকর্তা ও কর্মচারি।

---

৮৪ মুহাম্মদ কাসিম হিন্দুশাহ ফিরিস্তা, *তারিখ-ই-ফিরিস্তা*, এন.এন.ল. কর্তৃক উদ্ধৃত (লন্ডন: ১৮৬৭খ্রি.), পৃ. ২০১
সম্রাট জাহাঙ্গীরও তার 'ভুজুকে' (Elliot, Susil Publication, p. 114) লিখেছেন যে, "মালবের সুলতান গিয়াসউদ্দিনের হারেমে ১৫,০০০ হাজার রমনী ছিল।" তিনি একটি শহর নির্মাণ করেন এবং ইহা রমণী অধ্যুষিত ছিল। সেখানে সব রকম শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা দেয়া হত।"

উচ্চশিক্ষার জন্য নিয়মিত সুযোগ-সুবিধার অভাবশত মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মুসলমান মেয়েদের প্রতিভা বিকাশের কোন বিশেষ সুযোগ ছিল না। এটা সত্ত্বেও বিদ্যায় মেয়েদের কৃতিত্ব এবং পুরুষের সঙ্গে সাহিত্য-বিষয়ক প্রতিযোগিতায় তাদের সাফল্য ও গুণের বিষয়ে আমরা শুনতে পাই। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এটা প্রতিফলিত হয়েছে। বিজয়গুপ্তের মতে, হাসানহাটির জনৈক কাজীর স্ত্রী হিন্দুশাস্ত্রে খুবই পারদর্শিনী ছিলেন।[৮৫] 'গদাই মল্লিকের পুথি' বা 'মল্লিকার হাজার সওয়াল' (মাল্লিকার হাজার প্রশ্ন) নামে অভিহিত কাব্য থেকে জানা যায় যে, মল্লিকা নাম্নী মুসলমান বালিকা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, যে পুরুষ তাকে সাহিত্য বিষয়ক বিতর্কে পরাজিত করতে পারবে, তাকেই বিয়ে করবেন। বহু রাজপুত্র ও বিদ্বান ব্যক্তি তার সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হন, কিন্তু সকলেই মল্লিকার নিকট পরাজয় বরণ করেন। অবশেষে জনৈক সূফি পণ্ডিত আবদুল হাকিম গদা তার হাজার প্রশ্নের উত্তর দান করে তাকে বিতর্কে পরাজিত করেন। অতঃপর মল্লিকা তাঁর বিজয়ীকে বিয়ে করেন।[৮৬] যদিও এটি একটি গল্প মাত্র, তথাপি এতে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় মেলে যে, বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এ রকম বিদুষী রমণী বিরল ছিল না। কবি আবদুল হাকিমের 'সয়ফুল মুল্‌ক পুঁথি' নামে অন্য একটি সমসাময়িক কাব্যগ্রন্থ থেকে এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। এই প্রেম কাব্যের নায়িকা লালমতি (লালবানু) সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। [৮৭]

মধ্যযুগে মসজিদ ও খানকাভিত্তিক মক্তবগুলোতে মুসলিম ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও, পরের ধাপে অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাখা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু কোন কোন শহর ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ ব্যক্তিদের প্রেরণায় ও সহযোগিতায় গড়ে ওঠেছিল। বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে কেউ কেউ এমন অসমামান্য অবদান রেখে গেছেন। তবে এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় মুসলমানদেরকে অল্পই আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। কারণ, এই মাদ্‌রাসাগুলি থেকে বেড়িয়ে আসা যেসব আলেমদের নাম আমরা পাই তাদের প্রায় সবাই ছিলেন বহিরাগত। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্ব থেকেই এদেশে আরব, পারস্য, আফগানিস্তান ও তুরষ্ক থেকে মুসলমান আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখগণ এসেছিলেন শুধু ইসলামের মর্মবাণী ও দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর তাদের আগমন অনেক বৃদ্ধি পায়। মুসলিম সূফী-দরবেশরা বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েন। তাদের অনেকেরই বাগদাদ, নিশাপুর, গজনী, মক্কা-মদিনা, দামেষ্ক, বলখ, কান্দাহার, সমরকন্দ, বোখারা প্রভৃতি স্থানের উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার

---

৮৫ বিজয়গুপ্ত, *পদ্মপুরাণ*, অনু. শ্রী পঞ্চানন তর্করত্ন (কলকাতা: তা.নে.), পৃ. ৫৬।

৮৬ *বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ*, খ.১, দ্বিতীয় অধ্যায় (১৩২০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৯০

৮৭ আব্দুল হালিম, *সয়ফুলমুল্‌ক*, পাণ্ডুলিপি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ. ৮

অভিজ্ঞতা ছিল। তাদের সক্রিয় সাহায্য ও অনুপ্রেরণায় বাংলার দূর-দূরান্তে অনেক মান সম্পন্ন মাদ্রাসা গড়ে উঠে। এসব মাদ্‌রাসায় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অনেক বিষয়েই শিক্ষা দেয়া হত। শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও যুগোপযোগী মানবিক ও আধ্যাত্মিক অনেক বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হত। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে দেশে এত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করা হয়েছে।

খ্রিস্টোত্তর ১৬ শতাব্দী থেকে ইউরোপের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অনেক বিষয়ের শিক্ষা-দীক্ষার তুলনায় এশিয়া অনেক পিছিয়ে পড়তেছিল। ভারত ও বাংলার সম্পদ পৃথিবীবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জাগতিক শিক্ষা যুগোপযোগি ছিল না। বাংলার বিজ্ঞান মানস পরবর্তী ২০০ বৎসর পর্যন্ত জাগ্রত হয়নি। বৃটিশ শাসনের নিষ্পেষণে জাতি জাগ্রত হলেও পশ্চিম ও পূর্বের মাঝে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানের শত বৎসরের ব্যবধান আর কখনো ঘুঁচে যায়নি। নিম্নে বঙ্গের কতগুলো উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

বাংলার মুসলিম বিজয়ের সময় থেকে, গৌড় নামে সুপরিচিত লক্ষণাবতী বঙ্গদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে উন্নীত হয়। 'তাবাকত-ই-নাসিরী' প্রণেতা মিনহাজ থেকে জানা যায় যে,

**লক্ষণাবতী (গৌড়)**

মুহাম্মদ বিন-বখতিয়ার খিলজি লক্ষণাবতীতে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন এবং তিনি শেখ ও উলেমাকে সাধ্যমত সাহায্য করেন।[৮৮] তাঁর এই মহান দৃষ্টান্ত প্রদেশের পরবর্তী শাসনকর্তাদের দ্বারা অনুসৃত হয়। কয়েকটি মাদ্‌রাসা ভবনের ধ্বংসাবশেষ মুসলিম বাংলার প্রথম যুগের রাজধানী সোনাগাঁয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, গিয়াসউদ্দিন আওয়াজ খিলজি (১২১২-২৭ খ্রি.) লক্ষণাবর্তীতে একটি সুন্দর মসজিদ, একটি মহাবিদ্যালয় এবং একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে উৎসাহ দেন এবং বিদ্বান ব্যক্তিদেরকে প্রচুর পরিমাণ বৃত্তিদান করেন।[৮৯] প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক জরিপের ফলে, গৌড় অঞ্চলে ও মহরপুর গ্রামের সন্নিকটে 'দরাসবাড়ী' নামক স্থানে একটি মাদ্‌রাসার নির্দশন পাওয়া গেছে। 'দারসবাড়ি' নামের অর্থ পাঠশালা, তাছাড়া দারসবাড়ির দালানটির পরিকল্পনা দৃষ্টে মনে হয়, এটি মুসলমান আমলের একটি মাদ্‌রাসা ছিল। একই অঞ্চলে 'দারসবাড়ি' মসজিদ নামে পরিচিত একটি মসজিদও বিদ্যমান আছে। বড় ও ভারী ওজনের একটি উৎকীর্ণ শিলালিপি (১১′-৩″×২′১″) ঐ স্থানে পাওয়া গেছে। এতে ৮৮৪ হিজরি (১৪৭৯ খ্রি.) সুলতান

---

৮৮ *তাবাকাৎ-ই-নাসিরী* (অনুবাদ: র‍্যাভারটি কৃত, পৃ. ৫৫৯-৬০) উল্লেখ করে যে, মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি ও তাঁর আমীরদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঐ সব অঞ্চলে মাদ্রাসা ও খানকাহ স্থাপিত হয়েছিল।

৮৯ তাবাকাৎ-ই-নাসিরী, অনু. র‍্যাভারটি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৩; Stewart : *History of Bengal*, pp. 56-57

শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহ কর্তৃক একটি 'জাম-ই-মসজিদ' নির্মাণের উল্লেখ আছে।[৯০] এই মসজিদ জনসাধারণের কাছে 'দারাসবাড়ি মসজিদ' অর্থাৎ মাদ্‌রাসা-মসজিদ নামে পরিচিত। ফলে, সেখানে যে একটি মাদ্‌রাসা ছিল তার সমর্থন পাওয়া যায়। এই মসজিদটি মাদ্‌রাসার বহু সংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষকদের জুমার নামাজ পড়ার জন্যে নিমার্ণ করা হয়েছিল।

গৌড়ের ছোট সাগর-দীঘির পার্শ্বে একটি বড় দালানের ধ্বংসাশেষ থেকে মুসলমান শাসকর্তাদের রাজধানী শহরে আরো একটি মসজিদের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে। স্থানীয় একটি জনশ্রুতি অনুসারে দালানটি 'বেলাবাড়ী মাদ্‌রাসা' নামে পরিচিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৃহ ছিল।[৯১] মাদ্‌রাসা সমূহ কেবলমাত্র রাজধানী শহরেই গড়ে ওঠেনি; এর নিকটবর্তী প্রধান প্রধান স্থান এবং শহরের উপকণ্ঠে বে মাদ্‌রাসা শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল, তার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। মালদহের আধুনিক 'ইংলিশ বাজারের' একটি মসজিদের গায়ে ৯০৭ হিজরি/১৫০২ খ্রিস্টাব্দের একটি উৎকীর্ণ শিলালিপি অনুসারে, "ধর্মবিজ্ঞান শিক্ষাদান এবং যা' সত্য কেবল সেই মতবাদ অনুসরণের উপদেশ দান" করার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ একটি চমৎকার মাদ্‌রাসা নির্মাণ করেন।[৯২]

মুসলিম বিজয়ের প্রারম্ভকাল থেকে কয়েকটি মাদ্‌রাসা স্থাপন, একটি শিক্ষিত ও সংস্কৃতি সম্পন্ন অভিজাত শ্রেণির অস্তিত্ব এবং বহু ওলামা, পীর দরবেশ, ধর্ম প্রচারক ও শিক্ষকদের সমাগম ইত্যাদির ফলে স্বভাবতই লক্ষণাবতীতে শিক্ষাদীক্ষার উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই রাজধানী শহর মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে উন্নীত হয়েছিল। এমন কি মুসলমান শাসনের প্রথম পর্যায়েও শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে এর খ্যাতি কামরূপের হিন্দু রাজ্য পর্যন্ত পৌঁছেছিল এবং ইহা হিন্দু জ্ঞানান্বেষণকারীদের আকৃষ্ট করেছিল। এভাবে হিন্দু অতীন্দ্রিয়বাদী ও বেদান্ত দার্শনিকগণ এখানে আসেন; এদের মধ্যে ছিলেন ভোজর ব্রাহ্মণ ও অন্তনাথ। প্রথম জন আলী মর্দান খিলজির রাজত্বকালে আগমন করেন এবং এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে মুসলমান পণ্ডিত কাজী রুকনউদ্দিন সমরকন্দীর ধমীয় ও দার্শনিক আলোচনা হয়। ফলে, তিনি ইসলামের উচ্চতর ভাবধারা অনুধাবন করে মুসলমান হয়ে যান। বেদান্ত ব্রাহ্মণ অন্তনাথের বেলায়ও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ভোজর ব্রাহ্মণের সাহায্যে মুসলিম পণ্ডিতগণ সংস্কৃত থেকে হিন্দু দর্শন ও অতীন্দ্রিয়বাদের উপর লিখিত "অমৃত কাণ্ডের" অনুবাদ করেন আরবি ও ফারসি ভাষায়। এ ধরনের ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনা এবং হিন্দু অতীন্দ্রিয় বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ বাংলা মুসলিম রাজধানীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিক জীবন প্রসারিত করার তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। অতীন্দ্রিয়বাদী হিন্দু পন্ডিত ব্যক্তিদের মুসলিম আলেমদের দার্শনিক আলোচনায়ও কাছাকাছি আসার পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

---

৯০ *প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ রিপোর্ট*, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ৭৬; *Memoirs of Gour*, pp. 76-77; N. N Law, *Promotion of Learning*, pp. 108; Dani, *Inscriptions*, No. 49

৯১ *Memoirs of Gour*, pp.

৯২ Dani, *Inscription of Bengal*, No. 49

কাজী রুকন উদ্দিন সমরকান্দি ছাড়াও লক্ষণাবতীতে অনান্য বহুপণ্ডিত তাদের জ্ঞানানুরাগ প্রদর্শন করেন। সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা মিনহাজ দু'বছর কাল (১২৪২-৪৪খ্রি) বাংলার এই রাজধানীতে বসবাস করেন। খ্যাতনামা ধর্মতাত্ত্বিক জালাল উদ্দিন গজনবীও এই শহরে কয়েক বছর অবস্থান করেন এবং সুলতান গিয়াস উদ্দিন আয়াজ খিলজির সভাকক্ষে ভাষণ দান করেন।[৯৩] বিশিষ্ট কবি ও পণ্ডিত শামস উদ্দিন দবীর এবং কাজী আসির বাংলার সুলতান নাসির উদ্দিন বুগরা খানের রাজসভ্য অলংকৃত করেছিলেন।

**মাহিসন্তোষ**

বর্তমানে মহিসন্তোষ নামে পরিচিত রাজশাহি জেলার অন্তর্গত 'মহিসুন' ছিল মুসলমানদের প্রথম যুগের অন্যতম জ্ঞানকেন্দ্র। শাহ্ শুয়াইব রচিত মনাকিব-আর-আসাকিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাহিসন্তোস উচ্চ শিক্ষার একটি কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল। বাংলার বাইরে থেকেও শিক্ষার্থীরা এখানে এসে ইসলামের বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন করে।[৯৪]

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইকতা মাহিসন্তোষে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মওলানা তাকী উদ্দিন আল আরাবি এর অধ্যক্ষ ছিলেন।[৯৫] তিনি মারাফত তত্ত্বে হাক্কানি আলিম। এই মাদ্‌রাসা ঐ অঞ্চলের ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।[৯৬]

মসজিদ ও অন্যান্য স্থাপত্য ইমারতের শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ লিপির সাক্ষ্যে অনুমিত হয়। মাদ্‌রাসার পাঠ্যসূচিতে লিপিকলা (Calligraphy) ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত ছিল।[৯৭] এসময় মাদ্‌রাসা, মসজিদ হিসেবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২৭৫০ বিঘা লাখেরাজ ভূমি অনুদান হিসেবে মুসলিম শাসনামল থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।[৯৮] তার পাণ্ডিত্য-খ্যাতি ও দারসের সুনাম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পণ্ডিত ও ছাত্রদের আকৃষ্ট করত। বিখ্যাত সূফি পণ্ডিত মখদুম শরফউদ্দিনের পিতা ইয়াহইয়া মানেরি মাওলানা তকিউদ্দিন আরাবির মহিসুন শিক্ষাকেন্দ্র থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। এ তথ্য মখদুম শরফউদ্দিন মানেরির জ্ঞাতিভ্রাতা শাহ শো'য়েব কর্তৃক রচিত 'মানাকিব আল-আসফিয়া' থেকে জানা যায়।[৯৯] এতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ক্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে মহিসুন উচ্চ শিক্ষার একটি কেন্দ্র ছিল।

---

৯৩ *মিনহাজ-ই-সিরাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-৬২।

৯৪ Abul Fadl Allami, *Ain-i-Akbari*, Eng. tr. By H. Blochmann (Calcutta: Asiatic Society of Benal, 1904), p. 110; *Bengal Past and Present*, (Calcutta, 1948), p. 35.

৯৫ Shah Shu'yab, *Manaqib-al-Asfiya*, Extract Printed at the end of *Maktubat-i-Sadi*, p. 339; *The district of Rajshahi, its past and Present, p*. 67.

৯৬ ড.এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৫৯

৯৭ Dr. A.K.M. Yaqub Ali, *Select Arabic and Persian Epigraphs* (Dhaka: Islamic Foundation, Bangladesh, 1988).

৯৮ *Islamic Studies*, Vol. XXIV, pp. 434-435; f.n. 71.

৯৯ শাহ শুয়েব, *মানাকিব আল-আসফিয়া*, তাঁর শিষ্য কর্তৃক রচিত মখদুম শরফউদ্দিন মানেরীর *'মকতুবাত-ই-সাদী'*তে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৩৯

## সোনারগাঁও

অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী মাওলানা শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার অধীনে সোনারগাঁও একটি ইলম শিক্ষার পাদপীঠরূপে গড়ে উঠে। মাওলানা শরফউদ্দিন আবু তাওয়ামা বোখারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং খোরাসানে শিক্ষালাভ করেন। তিনি তাঁর পূত চরিত্র ও অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্যে সমগ্র পশ্চিম এশিয়া ও ভারতে সুপরিচিত ছিলেন। হানাফি ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ ও মুহাদ্দিস মাওলানা শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা কুরআন, হাদিস, ফিকহ, দর্শন শাস্ত্রে যেমন, সাধারণ বিজ্ঞানে, রসায়নবিদ্যা, প্রকৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে তেমনি পারদর্শী ছিলেন। জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের বিরাট খ্যাতি নিয়ে তিনি দিল্লিতে আগমন করেন এবং সকল শ্রেণির মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করেন ও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। অবশ্য তদানীন্তন সুলতানের (গিয়াস উদ্দীন বলবন) ঈর্ষার দরুন মাওলানা তদীয় ভ্রাতা মাওলানা হাফিজ জইন উদ্দিন ও পরিবার-পরিজন সমভিব্যহারে বাংলায় যেতে বাধ্য হন। পথে তিনি কিছুদিনের জন্যে মানেরে অবস্থান করেন। আবু তাওয়ামার অগাধ পাণ্ডিত্য তরুণ শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মানেরিকে তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে এবং আবু তাওয়ামার অধীনে জ্ঞানলাভের উদগ্র বাসনা নিয়ে মানেরি সোনারগাঁয়ের পথে মাওলানার সঙ্গী হন। আবু তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে বসতিস্থাপন করেন এবং সেখানে খানকাহ্ ও শিক্ষাকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করেন।[১০০] সূফি ও পণ্ডিত হিসেবে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার ফলে ভারতের সর্বত্র থেকে বহু শিষ্য ও ছাত্র তার নিকট আগমন করেন। এই বিখ্যাত পণ্ডিতের অধীনে ধর্মতত্ত্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষারও অনুশীলন করা হতো। এর ফলে সোনারগাঁও শুধুমাত্র বঙ্গদেশেই নয়, সমগ্র ভারতেও শিক্ষার একটি প্রদীপ্ত কেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করে। এখান থেকে বহু বিখ্যাত পীর দরবেশ ও জ্ঞানী ব্যক্তি গড়ে ওঠেন। খ্যাতনামা সূফি-পণ্ডিত মখদুম শরফউদ্দিন ইয়াহইয়া মানেরি ছিলেন মাওলানা আবু তাওয়ামার সোনারগাঁও শিক্ষাকেন্দ্রের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ত্রয়োদশ শতকের শেষপাদে শিক্ষাকেন্দ্ররূপে সোনারগাঁও বাংলাদেশের গৌরব ছিল। 'মাকামাত' ও 'নাম'-এর মত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ এবং শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মানেরির মত খ্যাতিমান শিষ্য মাওলানা আবু তাওয়ামার অগাধ পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য দেয়। আবু তাওয়ামা ও শরফুদ্দিন মানেরি একইভাবে বাংলার মুসলমানের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের গৌরব ছিলেন। বাংলার বুদ্ধিবৃত্তিক কৃতিত্বের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবু তাওয়ামা ৭০০ হিজরি/১৩০০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং সোনারগাঁয়ে সমাধিস্থ হন।[১০১]

---

১০০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯-৪৭; *Calcutta Review*, 1939, No-1-3, pp. 196

১০১ *জাহাঙ্গীর সিমনানীর পত্র*, 1948, No. 130, pp. 35.

ইসলামিক জীবন বিধানের বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়া এখানকার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মর্দে মুমিন, মর্দে মুজাহিদ, ইখওয়ানুল মুসলেমীন বা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো। এমনকি ছাত্র-শিক্ষকদের একই দস্তরখানায় খাওয়া-দাওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল।[১০২]

সোনারগাঁও বাংলার প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে এর বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা ঐতিহ্য পরবর্তীকালেও অব্যাহত রাখে। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত সূফি ও পণ্ডিত শেখ আলাউল হক তাঁর নির্বাসনের সময়ে দু'বছর এখানে অবস্থান করেন।[১০৩] একইভাবে তাঁর পৌত্র শেখ বদর-ই-ইসলাম এবং প্রপৌত্র শেখ জাহিদি তাঁদের নির্বাসনকালে এখানে অতিবাহিত করেন। প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে স্বভাবতই সোনারগাঁয়ে ইসলামি শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার উদ্দীপনা অব্যাহত থাকে। নুসরত শাহের রাজত্বকালে ৯২৯ হিজরি (১৫২৩ খ্রি.) সোনারগাঁয়ের একটি মসজিদে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে আয়েনউদ্দিনের পুত্র মসজিদ নির্মাতা তাকি উদ্দিনকে একজন প্রসিদ্ধ ইসলামি আইনজ্ঞ ও মুহাদ্দিস, ফিকাহ্, ও হাদিস শিক্ষাদাতাদের প্রধান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১০৪] এতে অনুমিত হয় যে, সোনারগাঁয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য ষোড়শ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

**ঢাকা**

কখন থেকে ঢাকা বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখদের ধ্যান-ধারণায় আসে সে ইতিহাস নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে যাদের পদস্পর্শে এতদঅঞ্চলের অনেক স্থান ধন্য হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন– ঐতিহাসিক শেখ মীর সুলতান মাহমুদ যিনি দেশ-বিদেশে 'সুলতান বলখী' নামে পরিচিত। তিনি তার শেখ ও আধ্যাত্মিক উস্তাদ শেখ তৌফিকের নির্দেশে এগার শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলায় আগমন করেন এবং তিনি বগুড়া ও ঢাকাকে ইসলাম প্রচারের মূলকেন্দ্র হিসেবে বেছে নেন। এতদ্বঅঞ্চলে বহু স্থানীয় উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষ তার কাছে ইসলামে দীক্ষিত হন। এসব অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তিনি অনেক বাধার সম্মুখীন হন। যেখানে প্রয়োজনে তাকে হাতিয়ার ব্যবহার করতে হয়েছিল। বগুড়া ও ঢাকায় সম্ভবত তিনি ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার কিছু কিছু নিদর্শন এখনো বগুড়াতে পাওয়া যায়। এগারো শতাব্দী থেকে বারো শতাব্দী পর্যন্ত যেসব পীর-মাশায়েখদের সাহচর্যে ঢাকা, বগুড়া, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ অঞ্চল সমূহে ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল এবং যাদের উপলক্ষ্যে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- শেখ মুহাম্মদ সুলতান রুমী, শেখ বাবা আদম শহীদ, শেখ নেয়ামতুল্লাহ মখদুম শাহ দৌলাহ, শেখ আহমদ হামযাহ নিশাপুরী

---

১০২ ড. এম.এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২খ্রি.), খ.১, পৃ. ১৬৪

১০৩ শেখ আবদুল হক দেহলভী, *আখবার আল-আখিয়ার*, (তা.নে.), পৃ. ১৪৩

১০৪ Dani, *Inscriptons*, etc. p. 124

(ঢাকায় মৃত্যু ৯০০ খ্রি.), শেখ মুহাম্মদ জাফর হাজ্জা (মৃ. ৯৫২ খ্রি.), শেখ ইসমাঈল ইবন নাজান্দ নিশাপুরী (ঢাকায় মৃতু-৯৭৫ খ্রি.), শেখ আহমদ তক্বী (মৃ. ১১৬৯খ্রি.) বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন।[১০৫]

ষোল শতকের মাঝামাঝি থেকে ঢাকা হয়ে ওঠে দেশি-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থার বাণিজ্যিক ও শিল্প-সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রবিন্দু। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত এ অঞ্চলটিতে তখন মগ ও পর্তুগিজদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের পর প্রশাসনিভাবে আফগানদের অধীনে চলে যায় সমস্ত বাংলাদেশ। সাময়িকভাবে নয় মাসের জন্য মোগল সম্রাট হুমায়ুনের অধীনে আসলেও তা স্থায়ী হয়নি। এ সময়ে আফগান ও মোগলদেরও হানাহানিতে পড়ে যায় বাংলাদেশ এবং ঢাকা রাজনৈতিক কারণেই পর্তুগিজ, মগ, আফগান, মোগল এদের বাসস্থান ঢাকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। ইতোমধ্যে বাংলায় বার ভূঁইয়াদের আধিপত্যও ক্রমাগত ঢাকার দিকে ধাবমান হচ্ছিল। এ অবস্থাতেও স্থানীয় মুসলমানদের আবাসভূমি ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং ১৬০৮ সালে ইসলাম খান চিশতি ঢাকাকে বাংলার রাজধানী করে নামকরণ করেন 'জাহাঙ্গীর নগর'। জাহাঙ্গীর নগর অনেক আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ এবং সূফী-দরবেশদের অনেক আস্থানা গড়ে ওঠে। তাদের তত্ত্বাবধানে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্টিত হয়। মোগল সুবাদারদের সময় থেকে আরম্ভ করে নবাব-নাজিমগণের শাসনকাল অবধি জাহাঙ্গীর নগর বা ঢাকা ছিল ইসলামী শিক্ষার গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী স্থান। মাদ্‌রাসা, মক্তব, পাঠশালা এবং খানকাতে প্রধানতঃ ধর্মীয় শিক্ষাদান করা হতো। মাদ্‌রাসা সমূহে একাদশ শতকের বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্‌রাসার অনুসরণে রচিত 'দরসে নিজামিয়া' শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুকরণে শিক্ষা দান পদ্ধতি ছিল। এই নিয়ম অনুযায়ী উপরের শ্রেণিতে পড়ানো হতো আরবি, ফারসি, অলঙ্কারশাস্ত্র, ফিকহ বা আইনশাস্ত্র (Jurisprudence) এবং মানতিক বা তর্কশাস্ত্র।

১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে সুবাহদার শায়েস্তা খানের উদ্যোগে ঢাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে একটি মাদ্‌রাসা ও মসজিদ নির্মিত হয়। অনুরূপ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা আরো অনেক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসনামলে এ মাদ্‌রাসাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। আবার কিছু কিছু মাদ্‌রাসা ছিল যার ব্যয়ভার নবাব ও জমিদারগণ বহন করতেন। তাদের আয়ের উৎস কোম্পানি কেড়ে নেওয়ার পর আর্থিক কারণেই একে একে সমস্ত মাদ্‌রাসাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এসব মাদ্‌রাসায় নিম্ন শ্রেণিসমূহে আরবি ও ফারসি সাহিত্য, ব্যাকরণ সহজ-তর্কবিদ্যা, গণিত ও মুসলিম আইন পাঠ্য ছিল। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ইসলামি সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার মর্যাদা ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছিল। টেইলর

---

১০৫ Dr. A.K.M. Ayub Ali, *History of Traditional Islamic Education in Bengladesh*, ibid, p. 6-7

সাহেবের মতে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে সুবিখ্যাত পণ্ডিত মৌলবী আসাদুল্লাহর মৃত্যুর পর আরবী, ন্যায়, দর্শন ও আইন পড়াতে সক্ষম সুযোগ্য শিক্ষকের অভাব দেখা দেয়। মৌলবী আসাদুল্লাহ ছিলেন মুঘল সরকার কর্তৃক মাসিক ৬০ টাকা বেতনে নিযুক্ত সরকারি শিক্ষক। লালবাগের শাহী মসজিদে ছাত্র সমাবেশে তিনি উপরোক্ত বিষয়সমূহের অধ্যাপনা করতেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ইসলামী সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার খ্যাতি যে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। জওয়াদ ইবন ইব্রাহীম সাবাত বাসিফিল আল-হাসানি নামক বসরাবাসী জনৈক আরব ভ্রমণকারী, অভিযাত্রী ও পণ্ডিত বাগদাদ, বসরা দামাসকাস ও পাটনার মত বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় এসে সার্‌ফ-ও-নাহু (আরবী ব্যাকরণ) অধ্যাপনা করেন। এই মহাপুরুষের জীবনী থেকে জানা যায়, ঊনিশ শতকের প্রথম ভাগেও ঢাকার অতীত গৌরব লুপ্ত হয়ো যায়নি।

**সাতগাঁও**

মুসলিম-বিজয়ের সময় থেকে, সাতগাঁও শিক্ষা ও একটি সমৃদ্ধশালী বন্দর হিসেবে দ্রুত গড়ে ওঠে। সরকারের প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে এখানে উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেশের অনেক আলেম ও বুদ্ধিজীবীদের বাসস্থান গড়ে ওঠে। তাদের অনুপ্রেরণা ও সহায়তায় গড়ে ওঠে মাদ্‌রাসা। সাতগাঁয়ের ত্রিবেণিতে দুটো মাদ্‌রাসা স্থাপনের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি সুলতান রুকনউদ্দিন কাইকাউসের রাজত্বকালে ৬৯৮ হিজরি (১২৯৩ খ্রিস্টাব্দ) কাজী আল-নাসির মুহাম্মদ কর্তৃক নির্মিত হয়।[১০৬] তিনি একটি মাদ্‌রাসা তৈরির জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন এবং ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। মাদ্‌রাসার উৎকীর্ণ লিপি মুসলমানদেরকে তাদের জীবনে জ্ঞানের গুরুত্ব সম্বন্ধে রসূলের বাণী স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে এর নির্মাতাকে যে উচ্চাদর্শ অনুপ্রাণিত করেছিল তা প্রকাশ পায়। জাফর খান কর্তৃক সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে ৭১৩ হিজরি (১৩১৩ খিস্টাব্দ) এই অঞ্চলে আরো একটি মসজিদ ও মাদ্‌রাসা নির্মিত হয়। এ মাদ্‌রাসা 'দারুল খায়রাত' নামে অভিহিত হয়।[১০৭] এ দুটো মাদ্‌রাসা সাতগাঁও অঞ্চলে ইসলাম বিষয়ক শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারে সহায়তা করে এবং ঐ এলাকার মুসলমানদের কুরআন-হাদিসের আলোকে জীবন গড়ার শিক্ষা দেয়।

---

১০৬ *Epigrahpia Indo-Islamica*, 1917-18; *JASB,* 1870, pp. 285-286

১০৭ *Epigrahpia Indo-Islamica*, 1917-18; *JASB,* 1870, pp. 284

**বাঘা**

বর্তমানে রাজশাহি জেলার অন্তর্গত চিলমারি থানার বাঘা গ্রামে বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের প্রাক্কালে শিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। বিখ্যাত কামেল পুরুষ শাহ দৌলার বসতি স্থাপন ও সেখানে তার খানকাহ প্রতিষ্ঠার ফলে বাঘা গ্রাম প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে।

৯৫০ হিজরি/১৫২৪ খ্রিস্টাব্দের তারিখযুক্ত একটি উৎকীর্ণ শিলালিপি অনুসারে, সুলতান নুসরুৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩৪ খ্রি.) বাঘায় একটি 'জাম-ই-মসজিদ' নির্মাণ করেন।[১০৮] বাংলার জনৈক দেওয়ান আবুল হাসানের সেবক ও সঙ্গী আব্দুল লতিফ ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে স্থানটি পরিদর্শন করেন। তিনি লিখেছেন, 'শিক্ষার্থীগণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে জ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত রয়েছেন। কুঁড়েঘর ও মাটির দেয়ালবিশিষ্ট গৃহে মহাবিদ্যালয়টি অবস্থিত। খানকাহ ও মাদ্‌রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য হাওদা মিয়াকে গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ জমি দান করা হয়েছে।'[১০৯] এতে দেখা যায় যে, বাঘার মাদ্‌রাসাটি ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে, আনুমানিক নুসরৎ শাহের সময় থেকে চলে আসছিল এবং অতঃপর গ্রামটি এতবেশী উন্নত হয়ে উঠে যে, একটি বড় ধরনের মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যা ছিল সামান্য একটি গ্রাম, তার এই গুরুত্ব কেবল খানকাহ ও মাদ্‌রাসা থাকার জন্যই বেড়ে গিয়েছিল। মাদ্‌রাসার কাজ শুরু হয়েছিল মাওলানা শাহ দৌলার সময়ে।[১১০]

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে এডাম তার শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্টে বাঘাকে ফারসি শিক্ষার কেন্দ্ররূপে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'কসবা' বাঘার অবস্থিত মাদ্‌রাসাটি বহুদিনের একটি বৃত্তিভোগী প্রতিষ্ঠান। প্রতীয়মান হয় সম্পত্তিটার প্রথমতঃ দুটো অংশ ছিল, যা' দুটো পৃথক পৃথক সরকারি মঞ্জুরির দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল। শাহজাহানের রাজত্বের ঊনিশতম বছরে একটি সনদে 'মাদ্‌রাসাকে 'মাদাদ-ই-মাশ'রূপে পূর্ব প্রদত্ত ভূমিদানের স্বীকৃতি দেয়া এবং এবং যাকে শাহজাহানের সনদটি দেয়া হয়েছিল সেই শেখ আব্দুল ওহাবকে মাওলানা উপাধি প্রদান করা হয়। খ্যাতনামা বিদ্বান ব্যক্তিদেরকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হত।[১১১]

**রংপুর**

ফিরিস্তা গ্রন্থকারের মতে রংপুর মুসলিম বিজয়ের সময় থেকে মুসলমানদের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। প্রথম বিজয়ীর কথা বলতে গিয়ে ফিরিস্তা লিখেছেন, তিনি নদীয়ার পরিবর্তে রংপুর নামে একটি শহর নির্মাণ করেন এবং তিনি তার রাজধানী করেন। নতুন অঞ্চল বিজয়ের পর পূর্বের নীতি অনুসরণ করে তিনি

---

১০৮ A.H. Dani, *Inscriptions of Bengal*, No. 127

১০৯ Abdul Latif, *Account* (সরকার অনূদিত), B.P.P. 1928, 2nd Chapter, S.L.70, pp. 143.
আব্দুল লতিফ কর্তৃক উল্লিখিত 'হাওদা মিয়া' নামটি একজন মুসলিম দরবেশের জন্যে অদ্ভুত মনে হয়। মৌলিক পাণ্ডুলিপির অভাবে আমি নামটি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পাইনি।

১১০ *JASB*, 1904, No-2, pp. 112

১১১ W. Adam, *Report on State of Education in Bengal* (1835-38), Kolkata, 1911, ppp. 161.

এই শহর ও অঞ্চলে মসজিদ, খানকাহ্ ও মাদরাসা দিয়ে সজ্জিত করেন। ফিরিস্তাকে সমর্থনে এ রকম কোন সমসাময়িক প্রমাণ নেই যে, মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি রংপুরে তার রাজধানী প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। সমসাময়িক সকল ঐতিহাসিকরাই লক্ষণবতীকে তাঁর রাজধানীরূপে উল্লেখ করে গেছেন। মিনহাজের বর্ণনা থেকে, দেবকোট খালজী সেনাপতির রাজধানী ছিল বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

যদিও ফিরিস্তার সাক্ষ্য অনুসারে রংপুরকে রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করা যায় না তথাপি এটা অবশ্য সম্ভব যে, মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার কর্তৃক সেখানে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লক্ষণাবতী নামটি কেবলমাত্র রাজধানীর জন্যেই নয়, বরং সমগ্র উত্তরবঙ্গ অর্থে ইহা ব্যবহৃত হত। এভাবে রংপুর লক্ষণাবতীর অন্তর্ভূক্ত। তাবকাত-ই-নাসিরীতে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার ও তার আমির ওমরাহ কর্তৃক লক্ষণাবতীতে (এলাকায়) একাধিক মাদ্‌রাসা স্থাপনের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এতে অনুমিত হয় যে, ঐ সময়ে রংপুরে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয়েছিল। মুসলমান আমলে ঘোড়াঘাট নামে পরিচিত রংপুর ফৌজদার বা বিভাগীয় সেনানায়কের সদর দপ্তর ছিল। মুজাহিদ যোদ্ধা শাহ ইসমাইল গাজীর সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় ঘোড়াঘাট বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছে; তিনি সুলতান বারবক শাহের রাজত্বকালে ঐ স্থানের  সেনাপতি ছিলেন। শহীদ হওয়ার পর তিনি ঘোড়া-ঘাট এলাকায় সমাধিস্থ হন। তাঁর সমাধিসৌধ লোকের তীর্থস্থান। সেখানকার মুসলমান পরিবারগুলো প্রয়োজনার্থে এই রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ স্বানে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

**চট্টগ্রাম**

বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সমুদ্র বন্দর হিসেবে এর গুরুত্ব থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম বসতি স্থাপনের সময় থেকে উহা একটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল। ব্যবসায়িক সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে সে যুগে চট্টগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। উচ্চ পর্যায়ের একজন সেনাপতি এর শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন। একটি সমৃদ্ধ মুসলিম জনসংখ্যা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারি অধ্যুষিত বাণিজ্যিক শহর চট্টগ্রামে নিশ্চয়ই মাদ্‌রাসা আবশ্যক ছিল। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, শাসনকর্তা ও রাজকর্মচারিগণ উচ্চ শিক্ষিত ও সাংস্কৃতিপরায়ণ ছিলেন। তারা তাদের দরবারে সাহিত্য সভা করতেন এবং সংস্কৃত ভাষা থেকে মহাভারতের বাংলা অনুবাদে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অধিকন্তু, চট্টগ্রামে বিপুল সংখ্যক পণ্ডিত ও কবিদের আবির্ভাব ঘটে। মুজাম্মিল, আফজাল আলী, মুকিম, শেখ মুত্তালিব, মুহাম্মদ খান, দৌলত কাজী ও আলাওলের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁদের কাব্যগ্রন্থরাজিতে আরবি, ফারসি, সাহিত্য ও ইসলামি বিষয়াদিতে তাদের গভীর জ্ঞান প্রতিফলিত হয়েছে। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, মুসলমান আমলে চট্টগ্রাম শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থান ছিল।

ওই সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে উইলিয়াম অ্যাডামের তিনটি রিপোর্টের কিছু প্রয়োজনীয় অংশ তুলে ধরা যাক।[১১২] অ্যাডামের প্রথম রিপোর্ট অনুযায়ী সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও পরস্পর সংযোগহীন ছিল। অ্যাডাম লিখেছেন বাংলা ও বিহারের প্রতি ৪০০ জন পিছু একটি বিদ্যালয় অর্থাৎ তখন এক লক্ষ পাঠশালা ছিল। কিন্তু এই তথ্য 'হার্টগ' প্রমুখ শিক্ষাবীদগণ স্বীকার করেন নি।[১১৩] অ্যাডামের দ্বিতীয় রিপোর্টে রাজশাহি জেলার নাটোর থানায় ৪৮৫টি গ্রামের মধ্যে ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৬২ জন ছাত্রের কথা উল্লিখিত আছে। কোন ছাত্রীর কথা উল্লেখ নেই। এছাড়া পরিবারভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫৮৮টি শিক্ষালয়ে ২৩৪২ জন শিক্ষার্থীর কথা বলা আছে। সংস্কৃত টোল বা কলেজ ছিল ৩৮টি এবং ছাত্রসংখ্যা ৩৯৭। অ্যাডাম দ্বিতীয় রিপোর্টে ভারতের শিক্ষার হার উল্লেখ করেছেন পুরুষ ৬.১%, নারী ৩.১%। নারীদের লেখা-পড়া গৃহ অভ্যন্তরেই হতো এটা আন্দাজ করা যায়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, ত্রিহুত, ও দক্ষিণ বিহারে সব মিলিয়ে মোট ৩০৯১৫ জন ছাত্র ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। নানা ধরনের বিদ্যালয়েরও উল্লেখ আছে যেমন সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি, আরবি, ফারসি, এবং পারিবারিক বিদ্যালয়। এই রিপোর্টে নারী বিদ্যালয়ের উল্লেখ আছে। সম্ভবত বিদ্যালঙ্কারের টোলের কথা অ্যাডাম বলেছেন। বিদ্যালঙ্কার ১৭৭৫ খ্রি. বর্ধমানের কলাইঝুটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সরগ্রাম নিবাসী গোকুলানন্দ আচার্যের নিকট সাহিত্য ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বর্ধমান জেলার মানকরের নিকট কোটা গ্রামে টোল স্থাপন করেন এবং সেই সঙ্গে চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুশীলন করতেন।[১১৪]

এডাম তার রিপোর্টে মুসলমান ছেলে-মেয়েদের জন্য মক্তব এবং হিন্দু ছেলে-মেয়েদের জন্য চতুস্পাটি ও পাঠশালাকে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর মাদ্‌রাসা ও শাস্ত্রীয় শিক্ষার জন্য টোলকে উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করেছেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মীয়ভিত্তিক প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা ছিল না। পাঠ্যসূচির মধ্যেও কোন সম্পূরক ব্যবস্থা বা এক শ্রেণি থেকে উচ্চতর শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে উত্তরণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের সীমারেখা ছাড়া পাঠ্যসূচিতে নির্ধারিত লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্রের কোন পরিকল্পনা ছিল না।

---

১১২ *Report of William Adam,: Education Commission* (Frist, Second and Third Report), (1835-1837), 557

১১৩ হরিসাধন গোস্বামী, *ভারতের শিক্ষা ইতিহাস* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পরিষদ, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ১৯২-১৯৩

১১৪ যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, *বর্ধমান ইতিহাস ও সংস্কৃতি* (তা.বি.), খ.৩, পৃ. ২১১

বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় সুলতান, জমিদার ও অভিজাত কর্মকর্তাদের অবদান শুধু বাংলার ভেতরে সীমাবদ্ধ ছিল না, দেশের বাইরেও দ্বীনি শিক্ষা প্রসারে তাদের অবদান ছিল। এমনকি সুদুর পবিত্র মক্কা মদিনাতেও তাদের অবিস্মরণীয় অবদান ছিল।

তকী উদ-দীন ফারসি (১৩৭৩-১৪২৮) বলেন, ইসকান্দার শাহের (সিকান্দার শাহ) পুত্র গিয়াস উদ্দীন আবুল মুজাফ্ফর আযম শাহ একজন বড় রাজা ছিলেন। তিনি বিদ্বান ও সম্পদশালী ছিলেন। তিনি কয়েকবার মক্কা মদিনায় অনেক ধন-সম্পদ পাঠান। এ সম্পদ বিলি করা হয় এবং প্রত্যেকেই তার উপকার পায়। এ দান সম্পদের সঙ্গে তিনি মক্কায় একটি এবং মদিনায় আরেকটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা এবং এগুলোর জন্য তাঁর নিযুক্ত লোক কাজগুলো সমাধা করেন। ৮১৩ হিজরিতে মাদ্‌রাসা নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং ৮১৪ হিজরিতে পুরোপুরী সম্পন্ন হয়। এ বছরই জমাদিউল আখের মাসে চার মাযহাবের ছাত্রদের পাঠদান শুরু হয়। একই বছর মুহররম মাসে মাদ্‌রাসার ওয়াকফও চালু হয়। ওয়াকফ দু'টি তালুক নিয়ে গঠিত হয়। মাদ্‌রাসা ঘর এবং ওয়াকফ-সম্পত্তির জন্য বার হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় হয়। তকী উদ-দীন আল ফার্সী আরো বলেন,

"মদিনার মাদ্‌রাসা মসজিদ-ই-নববীর দার-উস-সালাম ফটকের নিকট হুসনুল আতিক (পুরান দুর্গ) নামক স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। হাফিয ইবন হাজার আল-আসকালানীর 'ইনবা-উল-ওমর' পুস্তকে বলা হয়েছে যে, মক্কা ও মদিনা শরীফে নির্মিত গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের উভয় মাদ্‌রাসাতেই বাঙালি মাদ্‌রাসা বলা হতো।"[১১৫]

বাংলায় মোট কত সংখ্যক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ পরিসংখ্যান আমাদের কাছে নেই। তবে বৃটিশ শাসন এদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার পর আমরা তাদের একটি জরিপ প্রতিবেদন থেকে জানতে পারি যে, আঠার শতকের শেষ দিকে বাংলায় তখনও ৮০,০০০ (আশি হাজার) মাদ্‌রাসা বর্তমান ছিল। অর্থাৎ প্রতি ৪০০ মানুষের জন্য একটি মাদ্‌রাসা ছিল। তবে এই সংখ্যা হয়তো সমস্ত মাদ্‌রাসা ও মক্তবের মিলিত সংখ্যা।[১১৬]

### হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা

এদেশে মুসলিম শাসনের পূর্বে বাংলাদেশে শিক্ষা প্রধানত ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং যে কোন প্রকারের জ্ঞানের ক্ষেত্রে শূদ্রদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণগণ তাদের শাস্ত্রজ্ঞানের চর্চায় একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখতেন। সুতরাং, শ্রীচৈতন্য যখন সকল শ্রেণির সাম্য ও সকলের জন্য সমান সুযোগের অবারিত ঘোষণা করলেন, ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণব গুরুর প্রতি খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং মুসলমান শাসকের নিকট চৈতন্যের বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন। তারা চৈতন্যের প্রচারিত মতবাদ ধর্মবিরোধী বলে আখ্যায়িত করে বলেন,

---

১১৫ ড. আবদুল করিম, *মক্কা শরীফে বাঙালী মাদ্‌রাসা* (চট্টগ্রাম: বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ১১-১৩

১১৬ Dr. A.K.M. Ayub Ali: History of Traditional Islamic Education in Bengladesh, ibid, p. 15

"চৈতন্য প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদীদের উত্তেজিত করে হিন্দুধর্মের সর্বনাশ করেছেন। নিম্নশ্রেণির লোকেরা কৃষ্ণের নাম সংকীর্তন করছে। এ পাপ (অধমের কাজ) নবদ্বীপের সর্বনাশ করবে। এটা সত্য যে, হিন্দুশাস্ত্রে ভগবানের নাম একটি যাদুমন্ত্র বিশেষ,কিন্তু প্রত্যেকেই যদি একথা জানে, তাহলে এর ইপ্সিত ফলদানের ক্ষমতা লোপ পাবে।"[১১৭]

মুসলিম শাসকেরা সুবিধাভোগী হিন্দুশ্রেণির কবল থেকে নিম্নবর্গের হিন্দুদের সুবিধালাভের সুযোগ করে দেন। ফলে সুবিধাভোগী হিন্দুদের কবল থেকে ভাগ্যাহত ও বঞ্চিত নিম্নবর্গের হিন্দুরা মুক্তি লাভ করে এবং চিরকালের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। মুসলমান শাসনাধীনে অব্রাহ্মণদের পক্ষে শিক্ষা গ্রহণে ব্রাহ্মণদের অসন্তুষ্টি উৎপাদনের আর কোন ভয় ছিল না।

**পাঠশালা**

দ্বাদশ শতাব্দীতে স্থানীয় ভাষার জনপ্রিয় শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে পাঠশালা বা দেশজ গ্রামীণ স্কুলের যাত্রা শুরু এবং সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করে।[১১৮] মুসলিম যুগে হিন্দু ছাত্রদের জন্য স্থানীয় পাঠশালাগুলো শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সেখানে ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ও বাংলা শেখানো হতো। ভারতীয় ভাষা শিক্ষার উপরও মনোযোগ দেওয়া হতো। বিশেষ করে, বঙ্গে মুসলমান শাসকগণ হিন্দু ক্লাসিক সাহিত্য রামায়ন ও মহাভারতের বাংলা অনুবাদের জন্য পণ্ডিতদের নিয়োজিত করেন। তাই প্রায়শ মুসলমান ছাত্ররাও মাতৃভাষার স্কুলে পড়তে পছন্দ করতো। ফারসি রাষ্ট্রভাষা ছিল বলে হিন্দু মুসলিম উভয় শ্রেণিকেই জীবিকার তাগিদে শিখতে হতো।[১১৯]

বাংলার সংস্কৃত শিক্ষার চাহিদা পূরণ করেছিল চতুষ্পাঠী ও টোল। পাঠশালায় পাঁচ বছর বা তদোর্ধ্ব বয়সে শিশুরা গমন করত। সচরাচর গ্রাম্যস্কুল বা পাঠশালা গ্রামের কোনো ধনী ব্যক্তির বৈঠকখানা বা উপাসনালয়ে-যেমন, চণ্ডীমণ্ডপে ছিল। কোন কোন স্থানে বিশাল আমগাছ অথবা বটগাছের ছায়ায় শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করা হতো।[১২০] পাঠশালা হিন্দুধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। গ্রামে ও শহরে পাঠশালার মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষা চালু ছিল। বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে পড়া, লেখা এবং সাধারণ গাণিতিক দক্ষতা অর্জনের লক্ষে পাঠশালার কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্ণমালা, বানান, অক্ষর লেখার নিয়ম, নৈতিক শিক্ষা, গুণের নামতা, জমি পরিমাপের নিয়ম-কানুন শেখানো হতো। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, আইন, অধিবিদ্যা ও অলংকার শাস্ত্রও ছিল।

---

১১৭ চৈতন্য, *চরিতামৃত*, পৃ. ১২৫।
হিন্দুধর্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারী
কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ বারবার।
'এই পাপে নবদ্বীপ হৈবে উজাড়,
হিন্দুশাস্ত্রে ইশ্বর নাম যাদুমন্ত্র জানি;
সর্বলোকে শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি।'

১১৮ এ.এন. বসু, *আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা* (কলকাতা: ১৩৫১ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৬

১১৯ Narendra Krishna Sinha (ed.), *The History of Bengal (1757-1905)* (University of Calcutta, 2nd Ed. 1996), p. 433

১২০ এ.এন. বসু, *আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা* (কলকাতা: ১৩৫১বঙ্গাব্দ), পৃ. ৬

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যয় নির্বাহ করা হতো জমিদার ও বিত্তবানদের দানকৃত ভূমি থেকে।[১২১]

মধ্যযুগে নবদ্বীপ ছিল হিন্দুদের বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র এবং বঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে ছুটে আসতো। নবদ্বীপ ছিল নব্যন্যায় (নিও-লজিক) এবং স্মৃতি শিক্ষার জন্য। ন্যায়শাস্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি এবং পাণ্ডিত্যের জন্য সুবিখ্যাত বাসুদেব সর্বভৌম নবদ্বীপের শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে বাসুদেব পুরি গমন করেন এবং একজন বেদান্তিক পণ্ডিত হিসেবে স্বীকৃতি লাভকরেন। রাজা তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। সে সময় তরুণ যোগী ও ভক্তি মতবাদের প্রচারক শ্রী চৈতন্য বাসুদেবকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হন যে, মায়া মতবাদ ও বেদান্তিক দর্শন থেকেই ভক্তিবাদের উদ্ভব ঘটে এবং বেদান্তিক দর্শনই ভক্তিবাদ বা বৈষ্ণববাদ-এ রূপ নেয়।[১২২] অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপ বা নদীয়া সংস্কৃত অধ্যয়নের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সংস্কৃত পণ্ডিতদের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বহু পণ্ডিত তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করে রাখতেন। রাজা নিজেও একজন বিদ্বান ছিলেন এবং তিনি পণ্ডিতদের সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্র, ধর্ম ও দর্শন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। তাঁর দরবারের কবি রায়গুনাকর ভারতচন্দ্র কবি হিসেবে বিপুল প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নবদ্বীপ ব্যতীত সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শেখানো হতো সপ্তগ্রাম, সিলেট এবং চট্টগ্রামে।[১২৩]

বঙ্গের চতুষ্পাঠী এবং টোলসমূহ উচ্চতর সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজন মেটাত। বর্ধমানের একটি চতুষ্পাঠীতে দ্রাবিড় (দক্ষিণ ভারত), উতকালা (উড়িষ্যা), মিথিলা এবং বারানসী থেকে ছাত্ররা অধ্যয়নের জন্য আসত। একটি পাঠশালায় ছয় থেকে সাত বছর পড়াশোনা করার পর একজন ছাত্র পড়তে, লিখতে এবং প্রাথমিক অংকে দক্ষতা লাভ করত। সংখ্যা গণনা, বিশেষ করে যোগ ও বিয়োগ শেখানো হতো কড়ি ও পাথরের টুকরো দিয়ে। পাঠশালাগুলোতে আরো শেখানো হতো চিঠি লেখা, হিসাব কষা, দলিল ও দরখাস্ত লেখাসহ প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ। চতুষ্পাঠী এবং টোলসমূহ সংস্কৃতে উচ্চতর অধ্যয়নের সুযোগ দিত। এসব প্রতিষ্ঠান ছিল আবাসিক এবং তা শিক্ষকের বাড়িতেই স্থাপিত হতো। ছাত্রদের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করা হতো রাজা ও ধনী ব্যক্তিদের অনুদানের মাধ্যমে। এসব প্রতিষ্ঠান ছাড়া কীর্তন, কথকতা (আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনা), যাত্রা প্রভৃতি ছিল সাধারণ মানুষের জ্ঞানের উৎস।[১২৪]

---

১২১ Martin, *History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India*, volume II, London, 1838: 705; 52 Poromesh Acharya, *'Indigenous Vernacular Education in Pre-British Era: Traditions and Problems*, 1978, o. 86

১২২ R.C. Mazumdar, *History of Mediaeval Bengal* (K Mukherjee & G Bhardwaj and Co Calcutta, 1973), pp. 229-230

১২৩ Ibid, 231

১২৪ Ibid, 232

**হিন্দুনারীদের শিক্ষা**

তুর্কি, আফগান এবং মোগল যুগে সামগ্রিকভাবে হিন্দু নারীদের অবস্থান তেমন ভালো ছিল না। প্রাচীন যুগে মিথিলার ভারতী, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাতীগুপ্ত অথবা রাজা হর্ষের ভগ্নি রাজশ্রীর ন্যায় কতিপয় নারী ছিলেন ব্যতিক্রম। যারা নিজেদের মেধা, পাণ্ডিত্য এবং প্রশাসনিক দক্ষতায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[১২৫] বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পর্দাপ্রথা অথবা সতীদাহের মতো সামাজিক ব্যাধি দূর করার জন্য কোনো চেষ্টা করা হয়নি। শাসকগোষ্ঠী অথবা ধর্ম-প্রচারকগণ, কেউই নারীদের শিক্ষিত করার উদ্যোগ নেননি। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় কতিপয় শিক্ষিত নারীর নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে মাধবী চক্রবর্তী, প্রিয়ম্বদা, আনন্দময়ী প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের কয়েকজন নারী সাহিত্য ও দর্শন চর্চায় আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা সকলেই বেদান্ত, সংস্কৃত সাহিত্য এবং মীমাংসায় পণ্ডিত ছিলেন। কয়েকজন শিক্ষিত নারী চিকিৎসা বিজ্ঞানে আগ্রহী ছিলেন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১২৬]

বহুল প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে, যদি সাধারণ হিন্দু বালিকা শিক্ষা গ্রহণ করে তবে বৈধব্য ত্বরান্বিত হবে। মূলত গৃহস্থালীই ছিল মেয়েদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী স্কুল। পরিবারের মধ্যেই শিশুকন্যাটি আদর্শ পত্নী হয়ে ওঠার সামাজিক শিক্ষা পায়। এই সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে মুখ্য ছিল, জন্ম, মৃত্যু, বয়ঃসন্ধি, বিবাহ এবং সন্তান জন্মদান। আনুষঙ্গিক হিসাবে ছিল দৈনন্দিন জীবন যাপনের নিয়মরীতি। মৌখিক সংস্কৃতি ছিল অন্তঃপুরের প্রধান চালিকা শক্তি। কন্যাসন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রধান উৎস ছিল প্রবচন এবং ব্রতকথা বা প্রায়শ্চিত্ত করার বিভিন্ন রীতিনীতির বর্ণনামূলক বিধান।[১২৭] এই রীতিনীতিগুলি ব্রাহ্মণ্য আদর্শ ও শৃংখলের মধ্যেই পরিচালিত হতো এবং এগুলির উদ্দেশ্যে ছিল পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের শুদ্ধতা বজায় রাখা। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা কখনো কখনো বাড়িতেই পড়ালেখা করত। অ্যাডাম বাংলার শিক্ষিত জমিদার স্ত্রী এবং কন্যা, গণিকা এবং বৈষ্ণব সাধক শ্রীচৈতন্যের নারী অনুসারীদের উল্লেখ করেছেন।[১২৮]

---

১২৫ Radha Krishna Sharma, *Nationalism Social Reform and Indian Women*, Patna, 1981, p. 5-6; সম্পাদক, মমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশের ইতিহাস: সুলতানি ও মোগল আমল* (আনু. ১২০০-১৮০০ সাল অব্দ) (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি.), খ.২, পৃ. ৪১৩

১২৬ *বাংলাদেশের ইতিহাস: সুলতানি ও মোগল আমল*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪১৩

১২৭ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪১৩

১২৮ Rachana Chakraborty, 'Some Thoughts on Women's Education in Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries Bengal: Its form and Content', *The Quarterly Review of Historical Studies*, Vol. LII Nos. 1&2: 38-39; Rachana Chakraborty, 'Women's Education and Empowerment in Colonial Bengal' in Hans Hagerdal (ed.) Responding to the West: Essays on Colonial Domination and Asian Agency, *Amsterdam*, 2009: 89-90; মমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশের ইতিহাস: সুলতানি ও মোগল আমল*, খ.২, পৃ. ৪১৩

**শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা**

মুসলিম শাসকেরা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য যে করমুক্ত ভূমি দান করতেন, তা শুধু মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যই ছিল না, হিন্দুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যও করমুক্ত তথা লাখেরাজ সম্পত্তি দান করা হতো। নিষ্কর জমি সরকার থেকে দান করা হতো মাদ্‌রাসা ও টোলের জন্য, প্রাথমিক শিক্ষা বা পাঠশালার জন্য নয়। পাঠশালা শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ স্বনির্ভর। মুসলিম শাসকেরা পাঠশালা শিক্ষার জন্য কোনো নিষ্কর ভূমি বরাদ্দ না করলেও নিম্নবর্গের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সেটা কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। হিন্দু কবির রচিত মানিকচন্দ্র রাজার গান নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে জানা যায়, মুসলিম শাসনামলে হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণির 'হরি' ও 'সউদ'গণ দলিলপত্র পড়া ও লেখার মতো যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন। এমনকি নাপিত ও ঝাড়ুদাররা বিদ্যা ও সাহিত্যজ্ঞানে খ্যাতি অর্জন করেন। নল-দময়ন্তীর কবি মধুসূদন একজন নাপিত ছিলেন। একজন ধোপা ভাগমন্ত ধোপী হরিবংশ লিখে সম্মান অর্জন করেন। [১২৯] কড়চার লেখক কবি গোবিন্দ দাস একজন স্বর্ণকার ছিলেন। জনৈক গোয়ালা রামনারায়ণ গোপ 'দেবায়ন উপাখ্যান' রচনা করেন একজন ধোপা ভাগ্যমন্তভূতি 'হরিবংশ' লিখে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।[১৩০] শ্রী মাঝি কায়েত, গঙ্গাদাস সেন, কালিচরণ গোপ, রামপ্রসাদ দে, রাম দত্ত এবং নিম্নশ্রেণির অনেক হিন্দু স্বশিক্ষিত ছিলেন এবং তাদেরকে বাংলায় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করতে দেখা যায়।[১৩১] এমনকি নিম্নবর্ণের রমণীরাও যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' থেকে জানা যায় যে, ব্যাধ রমণী ফুল্লরা, বিপুলা ও রাজুদেবীর হিন্দুশাস্ত্রের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।[১৩২] জনৈক মালীর স্ত্রী হিসাবপত্র লিখতে পারত।[১৩৩]

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের উদার প্রশাসনিক সহায়তায় নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হলেও বর্তমানের আধুনিক শিক্ষার তুলনায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের জন্য নির্ধারিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক স্তরেই ছিল। সামাজিক অনুদান ও শিক্ষকদের সহায়তায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো। বিশেষ করে হিন্দু ছাত্রদের টোল ও পাঠশালার শিক্ষকগণ শিক্ষা ভবন তৈরির জন্য কোন সহায়তা চাননি। তাদেরকে গাছ তলায় বসিয়ে পড়াতেন এবং বিনা বেতনে শিক্ষা দিয়ে তাদের খাদ্যও যোগান দিতেন। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অবৈতনিক ছিল। কোন কোন মুসলমান শিক্ষক মাদ্‌রাসা ও মক্তবে সরকারি বা সামাজিক অনুদান পেলেও প্রায় শিক্ষকই ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে কুরআন-হাদিস শিক্ষা দিতেন। এ বিষয়ে জন-মার্সালের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি ১৭ শতকের শেষদিকে ভারতে এসেছিলেন। তিনি বলেন,

---

১২৯ দীনেশচন্দ্র সেন, *মানিকচন্দ্র রাজার গান*, বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (কলকাতা: ইউনিভার্সিটি অব কলকাতা, ১৯১৪খ্রি.), খ.১, পৃ. ৭২

১৩০ দীনেশচন্দ্র সেন, *ভঙ্গভাষা ও সাহিত্য* (কলকাতা: হেমেন্দ্র সেন, ১৮৯৬খ্রি.), পৃ. ২৭৪-৭৫ এবং ৩০৯-১০

১৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯-১০।

১৩২ দ্বিজ হরিরাম, *চণ্ডীকাব্য*, সম্পা. টি.সি. দাসগুপ্ত (তা.বি.), পৃ. ১৯২

১৩৩ ভারতচন্দ্র, বিদ্যাসুন্দর কাব্য, পৃ. ১৩; জে.গুপ্ত, রামপ্রসাদ, পৃ. ৬৮

"Hindus never teach their chidren for money; those they teach, they give them victuals, too, besides their learning which is estimated as a gift."

মসজিদ সংলগ্ন মক্তব ও মাদ্‌রাসাগুলিতে একই চিত্র দেখা যেত। পর্যটক ডেলাভেল (Della Valle) সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে ভারতে এসে অনেক শহর-বন্দর অবলোকন করে বলেছিলেন যে,

"প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে ব্যক্তিগত ও সামাজিক অনুদানে মক্তব ও মাদ্‌রাসা চলছে।"[১৩৪]

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের শাসনামলে বাংলা ভাষা ও সর্বস্তরের মানুষের শিক্ষার প্রতি তাদের উদার মানসিকতার জন্য নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। অনেক সুলতান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হুসেন শাহের নাম বার বার গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। সুলতানি আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ব্যাপক উন্নতি ঘটে।[১৩৫] যা-ই হোক, সুলতানি আমলের এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় গড়ে ওঠে মধ্যযুগের বিশাল বাংলা সাহিত্য আর পাশাপাশি গড়ে ওঠে বাংলা শিক্ষার প্রথাবদ্ধ ধারা বাংলা পাঠশালা। স্বাভাবিকভাবেই নিচুতলার শূদ্ররাই মূলত এই দুই ধারার ধারক-বাহক। মোগল আমলে বাংলা ভাষা ও বাংলার জনগণের শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে না পারলেও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি মোগলরা উদাসিন ছিলেন না। বিশেষ করে, মধ্য ও উত্তর ভারতে হিন্দি, নাগরি ও সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিতদের অনেক সহায়তা করেছেন। ১৬ শতকের শেষদিকে সম্রাট আকবরের সময়ে হিন্দি ভাষার মরমী কবি তুলসি দাস হিন্দি ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করেন। হিন্দিভাষীদের ক্ষেত্রে হিন্দি রামায়নের বহুল প্রচলন হয়। এ সময়ের উল্লেখ করে বার্ণিয়ের (Barnier) বলেছেন, পাঠশালার ছেলে-মেয়েরা অক্ষর পরিচয়ের পরই পুরান পড়তে আরম্ভ করে। ধর্মীয় পুস্তক হিসেবে পুরাণ, তাছাড়া অঙ্কশাস্ত্র ও সাহিত্য পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত ছিল। বেনারসে কিছু সংস্কৃত পড়াবার প্রতিষ্ঠান ছিল যেখানে ধর্মীয় গ্রন্থ পূরাণ, উপনিষধ এবং বেদ ছাড়াও ব্যাকরণ, কাব্য, বেদান্ত, ন্যায়শাস্ত্র, আইন ও জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দেয়া হত।

মুসলমান প্রশাসকগণ, জমিদার ও কোন কোন ধনী ব্যক্তিরা যেভাবে মুসলমান বালক-বালিকাদের ধর্মীয় শিক্ষা ও ব্যবহারিক বিদ্যার জন্য অর্থ ব্যয় করেছেন ঠিক তেমনি বাংলায় অনেক হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ীরা হিন্দু সমাজের বালক-বালিকার বিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠশালা এবং ব্রাহ্মণ ছেলেদের জন্য টোল প্রতিষ্ঠা করেছেন। সপ্তদশ শতক থেকে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা, নাটোরের জমিদার, কাশিমবাজারের মহারাজা, সন্তোষের মহারাজাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

---

১৩৪ M.H. Sayed, *History of the Glorious Mughal Empire*, ibid, p. 375.

১৩৫ পরমেশ আচার্য, *বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা* (কলকাতা: অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৬২; কাজী শহীদুল্লাহ, *পাঠশালা থেকে স্কুল*, আবদুল মমিন চৌধুরী অনূদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৭

**শিক্ষকদের অবস্থান**

শিক্ষকরা সমাজে সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ গ্রামের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন। পিতামাতা মৌলবি অথবা গুরুর নিকট তাদের ছেলেমেয়েদের পৌঁছে দিয়ে নিজেরা সন্তান-সন্ততির শিক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতেন। দৌলত উজীর বাহরাম খানের কাব্যগ্রন্থ 'লায়লী মজনু'তে এ মনোভাবই পরিস্ফুট হয়েছে।[১৩৬] শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদেরও গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল এবং ছাত্ররা পরম ভক্তির সঙ্গে গুরুর সেবা করত।[১৩৭] রাজ সরকার ও সমাজ কর্তৃক শিক্ষকদেরকে প্রচুর পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়া হত। মাদ্‌রাসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষদেরকে লাখেরাজ সম্পত্তি ও বৃত্তি দানের ব্যবস্থা ছিল। রাষ্ট্র ও অবস্থাসম্পন্ন মুসলমান কর্তৃক প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে মঞ্জুরী দেয়া হত। প্রায় সবগুলো টোলই কোন না কোন উৎস থেকে ভূমি মঞ্জুরী ভোগ করত। অবস্থাপন্ন কোন কোন মুসলমান তাদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার জন্যে মৌলবী ও মুন্সীদেরকে অর্থ দান করতেন। নানারকম শস্য, শাক-সবজি ও জীবন ধারনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়ে সাধারণতঃ শিক্ষকদের পারিশ্রমিক দানের ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছাত্ররা শিক্ষকদের সাংসারিক কাজকর্মেও তাঁকে সাহায্য করত। গ্রাম্য মুসলমানদের ধর্মেকর্মে, অনুষ্ঠান ও উৎসবাদিতে শিক্ষক ছিলেন তাদের পথ-প্রদর্শক ও ইমাম। তিনি বিয়ে-শাদী ইত্যাদি বহু রকম অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। এজন্য তিনি লোকদের নিকট থেকে উপহার সামগ্রী লাভ করতেন।[১৩৮] প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ছাত্ররাও গুরুকে উপহার উপঢৌকন দিত।[১৩৯] প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাঁর ছাত্রদেরকে শিক্ষিত করে তোলার জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতেন। অনিয়মিত উপস্থিতি, পাঠে অমনোযোগ, পড়া তৈরি করতে না পারা, বেয়াদবি ও দুষ্টুমীর জন্যে ছাত্রদেরকে নানা ধরনের শারীরিক শাস্তি দেয়া হত। সপ্তদশ শতকের কবি দয়াময় বলেন,

"যদি কোন ছাত্র তার পড়া শিখতে অপারগ হত, তাহলে গুরু তাকে একগাছি দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতেন ও তার বুকের উপর চড়ে বসতেন। অনিয়মিত ও দুষ্ট ছাত্রদের জন্য বেত্রাঘাত ও অন্যান্য প্রকারের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।"[১৪০]

---

১৩৬ লায়লী মজনু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

১৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

১৩৮ মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০; বিজয়গুপ্ত,মনসামঙ্গল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৬১

১৩৯ কৃত্তিবাস, রামায়ণ, সম্পা. জয় গোপাল তর্কালঙ্কার (কলকাতা: শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮৩০-৩৪ খ্রি.), ভূমিকা, পৃ. ২

১৪০ দয়াময়, সারদামঙ্গল, বঙ্গসাহিত্য পরিচয় পত্রিকায় উদ্ধৃত, পৃ, ১৩৮৪-৮৫

'শিখিতে না পারে তবু; শিখাইতে না পারে।
মারিয়া বেতের বাড়িএ ঠেঙ্গা করে।।
কভূ কভূ বেন্ধ্যা রাখে বুকে বসে রর।
উচিত করয়ে শাস্তি যখন যেদিন যে হয়।।

বাস্তবিকই মক্তব ও পাঠশালায় শাস্তিটা কঠোর ছিল এবং বেত মারা না হলে শিক্ষার্থী ভালো হবে না, শিক্ষক এই প্রবাদটি অনুসরণ করে চলতেন। এডাম ১৮৩৫-৩৮ খ্রিস্টাব্দে তার রিপোর্টে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রচলিত নানা ধরনের শাস্তির বর্ণনা করেছেন।[১৪১]

**মিশনারি শিক্ষা**

১৪৯৮ সালে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার হওয়ার পর দু'শতাব্দীর মধ্যে পর্তূগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, মিশনারি ও ইংরেজ বাণিজ্য সংস্থা এ দেশে আসে। তারা পাদ্রী ও মিশনারিদের মাধ্যমে ধর্ম ও শিক্ষার প্রচার প্রসার ঘটান। ১৫৭৭ সালে ছাপার মেশিন স্থাপনের সাথে সাথে ভারতবর্ষ শিক্ষায় অনেকদূর এগিয়ে যায়। পর্তূগিজদেরকে ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার জনক বলা হয়। এরপর ওলন্দাজ, ফরাসি ও মিশনারিদের ভূমিকা খুব বেশী উজ্জ্বল না হলেও ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি (১৬০০) নিজেদের সার্থেই এদেশে শিক্ষার প্রসারতায় হাত দেয়। এক্ষেত্রে ১৬৯৮ সালের কোম্পানি ও উইলিয়াম কেরির কথা অবিস্মরণীয়। ১৮১৩ সালের সনদ ছিল আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর। ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর বহু বছর এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি উদাসীন ছিল। ইউরোপের সমসাময়িক রীতি অনুযায়ী বাণিজ্য জাহাজের সাথে মিশনারিদের আগমন ঘটে। নাবিকদের ধর্মীয় মূল্যবোধ অক্ষুন্ন রাখা এবং নতুন ভূখণ্ডে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু শিক্ষার প্রসার ছাড়া ধর্ম প্রচার সম্ভব নয়। তাই তারা কোথাও চেষ্টা করেছেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে ধর্ম প্রচার করতে, আবার কোথাও ধর্মান্তরিতদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।[১৪২] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের পূর্বেই ধর্ম প্রচার ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে মিশনারিরা কলকাতা ও এর আশেপাশে অনেকগুলো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

মিশনারিরা প্রথম দিকে দেশজ শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করেননি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর তারা ক্রমশ পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হন। ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগিজরা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসেন। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পর্তুগিজ মিশনারিরা অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার বিষয় ছিল- ল্যাটিন ভাষা, যুক্তিবিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ, সঙ্গীত ইত্যাদি।[১৪৩] মিশনারি স্কুলগুলোতে খ্রিস্টান ছাত্রদের

---

ছাত্ররা শিক্ষকদের ভয়ে খুবই ভীত। দয়াময় পাঠশালায় অধ্যায়নরত ছেলেদের মনের কথাই তুলে ধরছেন।

পাজি খড়ি খুঙ্গী পুঁথি পাশক্ত বেতের বাড়ি
পাইলে কোলই সরোবরে।

১৪১ এডামের রিপোর্টে টি.সি.দাসগুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ. ১১৭

১৪২ মোহাম্মদ ইলিয়াছ আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ* (ঢাকা: জাগরণী প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১১

১৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

পাশাপাশি অখ্রিস্টান ছাত্ররাও পড়ার সুযোগ পেত। পাদ্রীরা বিনামূল্যে খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বই-পুস্তক দিয়ে অখ্রিস্টান ছাত্রদের প্রভাবিত ও প্রলোভিত করত।[১৪৪] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করলে মিশনারিরা ধর্ম প্রচারে বাধা প্রাপ্ত হয়। বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষা প্রসারে কোন বাধার সম্মুখীন হননি।

শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক সর্বপ্রথম এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী ভাষা শিক্ষা, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক বই লিখে ছাপার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯১৭ সালে ফ্রেজার কমিশন নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে সমগ্র বাংলা-ভারত-পাকিস্তানে মিশনারি পরিচালিত ১০৪৬১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এর মধ্যে ৯২৫৯ টি প্রাথমিক স্কুল, ৪২ টি কলেজ, ৪৮৩ টি মাধ্যমিক স্কুল, ৭৫ টি ট্রেনিং স্কুল ও ২২২ টি অন্যান্য স্কুল। আবার ১৯৩৬-৩৭ সালে গৃহীত তথ্যানুযায়ী মিশনারি পরিচালিত বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল ১৪৩৪১ টি।[১৪৫]

**ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা**

ব্রিটিশ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল একটি গতিধারার মৌলিক পরিবর্তন, যা এদেশীয় tradition ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের সমন্বয়ে একটি নতুন শিক্ষাধারার সূচনা করে। শুরুতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শিক্ষা বিস্তারে তেমন আগ্রহী না থাকলেও ১৮১৩ সালের সনদ আইনের মাধ্যমে একটি লক্ষ্য টাকার বরাদ্দ দেওয়া হয় শিক্ষার জন্য। ১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলের প্রস্তাবনার মাধ্যমে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ইংরেজি ভাষার প্রবর্তন ঘটে, যার মূল লক্ষ্য ছিল একটি এমন শ্রেণি সৃষ্টি করা যারা "রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় কিন্তু রুচি, মতামত, নৈতিকতা বুদ্ধিতে ইংরেজ"। ১৮৫৪ সালের উডের ডেসপ্যাচে শিক্ষাকে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত করার পরিকল্পনা করা হয় এবং কলকাতা, ঢাকা ও রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। ফলস্বরূপ, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, যা became a beacon of higher education in the region। তবে এই শিক্ষানীতি মুসলমানদের মধ্যে প্রথমদিকে ব্যাপক অসন্তোষ ও পিছিয়ে পড়ার কারণ হয়, যা পরবর্তীতে স্যার সৈয়দ আহমদ ও অন্যান্য নেতাদের প্রচেষ্টায় নতুন জাগরণের দিকে পরিচালিত করে। সামগ্রিকভাবে, এই শিক্ষা ব্যবস্থা একটি নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে তুললেও তা ছিল সীমিত ও শহরকেন্দ্রিক, যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশকে শিক্ষার বাইরে রেখে দিয়েছিল।

---

১৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

১৪৫ অধ্যাপক মুহাম্মদ মোমিন উল্লাহ, *শিক্ষার ইতিহাস* (ঢাকা: এডুকেয়ার পাবলিকেশন, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৩৬৩

ভারত ও বাংলার অতুল ঐশ্বর্য বিদেশীদের আবহমানকাল থেকেই প্রলুব্ধ করে আসছে। বণিকরূপে এসে ব্রিটিশরা ১৭৫৭ সালে এদেশের শাসনক্ষমতা দখল করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত ও বাংলায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর বহু বছর এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি নজর দেয়নি। বিশিষ্ট বৃটিশ ঐতিহাসিক এ. হাওয়েল এ সম্পর্কে বলেন,

"Education in India under the British Government was first ignored, then violently and subsequently successfully opposed, then conducted on a system now universally admitted to be erroneous and finally placed on its present footing."

শাসনকার্য পরিচালনার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে দেশীয় একটি তাবেদার জনগোষ্ঠী সৃষ্টির তখন একান্ত প্রয়োজন হয়, যাঁরা ভারতীয় হয়েও রুচি, সংস্কৃতি ও নৈতিকতায় হবেন ইংরেজ এবং তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে এদেশ শাসন করবেন। শাসকগোষ্ঠীর এই মনোভাব থেকে বুঝা যায় ব্রিটিশরা ভারত ও ভারতীয়দের উন্নয়নের প্রতি মোটেও যত্নবান ছিল না। এই নীতির ফলে হাজার বছরের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠা দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে। বৃটিশ শাসকেরা তাদের সাম্রাজ্যের প্রসার ও সংরক্ষণের স্বার্থে উদ্দেশ্যভিত্তিক একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। বৃটিশদের উচ্চ পদস্থ কর্মচারিরা বিচার ও শাসন বিভাগীয় সমস্যা লাঘব করার উদ্দেশ্যে কতগুলো প্রাচ্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠান তৈরির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাছাড়া ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে যতদিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসেনি ততদিন কোম্পানি মিশনারিদের পৃষ্ঠপোষকতায় বন্ধু হিসেবে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের সূত্র ধরেই এ সময় শিক্ষা বিস্তারের কাজে সাহায্য করে। কোথাও তারা চেষ্টা করেছে শিক্ষার মধ্যদিয়ে ধর্মপ্রচার করতে, কোথাও ধর্মান্তরিতদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে।[১৪৬]

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে বাংলাদেশে চার প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। (১) ব্রাহ্মণ বা উচ্চ শ্রেণির জন্য টোল, (২) সর্বশ্রেণির হিন্দুর জন্যে সংস্কৃত মাধ্যম বা চন্ডি মন্ডপ কেন্দ্রিক শিক্ষা (৩) অভিজাত মুসলমানদের জন্য মাদ্‌রাসা শিক্ষা (৪) গ্রামগঞ্জে পেশাজীবী মুসলমানদের জন্য মক্তব শিক্ষা। মাদ্‌রাসা অভিজাত মুসলমানদের দানে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হতো। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অবহেলা ও অসহযোগিতার কারণে মুসলমানদের অনেক মাদ্‌রাসা ও মক্তব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।[১৪৭]

---

১৪৬ রনজিৎ ঘোষ, *আধুনিক ভারতের শিক্ষার বিকাশ* (কলকাতা: সামা বুক এজেন্সি, ২০২১৫খ্রি.), পৃ. ৪৯

১৪৭ মাওলানা আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদ্‌রাসার ইতিহাস* (ঢাকা: গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ, ১৯৫৮খ্রি.), পৃ. ২৭

১৮৫৪ সালের শিক্ষা নীতির মাধ্যমে ভারতবর্ষের আধুনিক শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়। এই প্রথম সুনির্দিষ্ট সরকারীর নীতির প্রতিফলন দেখা যায় ভারতীয় শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে। এরপর ১৮৮২ সালের হান্টার কমিশন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটি কারিকুলামের গাইড লাইন দেয়। ১৮৯৮ সালে কার্জনের শিক্ষা সংস্কার, ১৯১৭ সালে ম্যাডলার কমিশন, ১৯৪৩ সালের সার্জেন্ট পরিকল্পনা, ভারতবর্ষের শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

**বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার উদ্ভব**

মুসলিম শাসনামলে বাংলায় শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফার্সি এবং ফার্সি ছিল সরকারি ভাষা। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আরবি ও উর্দু ভাষারও চর্চা করা হত। তবে নানা কারণে বাংলার মুসলমানদের নিকট ফার্সি ছিল প্রিয় বিষয়।[১৪৮] মুসলিম আমলের শেষ পর্যায়ে ফার্সি শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় হিন্দুদের মধ্যেও এ শিক্ষা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।[১৪৯] তবে হিন্দু ছাত্রদের জন্য পাঠশালা, টোল বা চতুষ্পাটির ব্যবস্থা ছিল যেগুলোতে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হত।[১৫০] শিক্ষকদের অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ। ছাত্রদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য থাকলেও কায়স্থ, বৈদ্যসহ অন্যদেরও অধ্যয়নের অধিকার ছিল।

১৭৫৭ সালে পলাশীর পট পরিবর্তনের পর বাংলার এই শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং এদেশে ফার্সির পরিবর্তে পাশ্চাত্যের ইংরেজি ও সেই সাথে দেশীয় ভাষাও স্থান করে নিতে থাকে। তবে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসনভার হাতে নেয়ার পর সরকারিভাবে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল এ দেশবাসীর শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন থাকে। বরং ভারতবর্ষের নাগরিকদের জন্য কোন রকম শিক্ষা দেয়া কোম্পানির স্বার্থের পরিপন্থি ও তার সাম্রাজ্যের জন্য সমূহ বিপদ বলে মনে করে। কোম্পানির প্রশাসন মনে করেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করলে দেশীয় সমাজ ও প্রচলিত ধর্মে আঘাত লাগবে এবং জনগণ এতে বৃটিশ বিরোধী হয়ে পড়বে। ফলে বৃটিশদের শাসন ক্ষমতা হারাতে হবে।[১৫১]

কিন্তু কোম্পানির কিছু প্রশাসক ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং দেশীয় সংস্কৃতি চর্চায় আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতার কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আবেদনক্রমে ১৭৮০ সালে আরবি ও ফার্সি শিক্ষার প্রসারকল্পে কোলকাতা মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। কাশীর প্রশাসক জনাথন ডানকান ১৭৯২ সালে বারানসী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। স্যার উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৪ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন।[১৫২]

---

১৪৮ M.A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Vol. 1, Karachi, 1967, p. 149-160

১৪৯ W. Adam, *Reports on the State of Education in Bengal*, Anath Nath Basu (ed.), Calcutta University, 1941, p. 156.

১৫০ সুশীল কুমার গুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ* (কলিকাতা: ১৯৭৭খ্রি.), পৃ. ১৫৪

১৫১ Syed Mahmood, *A History of Education in India* (1781-1893), Aligarh, 1895, p. 2.

১৫২ সুশীল কুমার গুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

তবে কোম্পানির প্রশাসক কিংবা কোম্পানির পক্ষ থেকে সরকারি ভাবে উদ্যোগ নেয়ার অনেক পূর্বেই বাংলায় বেসরকারিভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের কাজ শুরু হয়। জনসাধারণের মধ্যে ইউরোপীয় শিক্ষার প্রসার প্রধানত খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টায় আরম্ভ হয়। বস্তুত বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে খ্রিস্ট্রীয় ধর্ম প্রচারক বা মিশনারিদের অবদান ছিল ব্যাপক ও গভীর। ১৭১৯ সালে The Society for Promoting Christian Knowledge নামে একটি মিশনারি সমিতি কলকাতায় আগমন করে। এ সমিতির উদ্যোগে ১৭৩১ সালে কলকাতায় একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বাংলায় এটিই হচ্ছে পাশ্চাত্য জাতীয় প্রথম স্কুল।[১৫৩] ১৭৫৮ সালে Zacharich Kierhander নামে সুইডেনের এক পাদ্রী কলকাতায় আরেকটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। অল্পকালের মধ্যেই স্কুলটি জনপ্রিয় হয়েছিল এবং চার মাসের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা ৪০ জন বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১৫৪] ১৭৮০ সালে মি. আর্চার শুধু বালকদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ইয়র্কশায়ারের এক কৃষক সন্তান মি. ব্রাউন কলকাতায় এই সময়ে একটি স্কুল স্থাপন করেন যেখানে হিন্দু ছাত্ররা বেশি সুযোগ পেত। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এদেশীয় জনগণের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার শুরু হয়।

কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শিক্ষা বিস্তারের দিকে এ সময়ে দৃষ্টি দেয়নি। বরং কোম্পানি খ্রিস্টান মিশনারিদের কাজে বাধার সৃষ্টি করে। মি. ব্রাউন ১৭৮৭ সালে কলকাতায় আসার পর Orphan Institute এর শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি ধর্মযাজক হিসেবে কাজ করছেন এ অভিযোগে অল্পদিনের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ তাঁকে অপসারিত করেন।[১৫৫] বিট্রিশ শিক্ষাবিদ চার্লস গ্রান্ট ধর্ম ও শিক্ষা প্রচারে সরকারের সহযোগিতা কামনা করলে সরকার তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর ১৭৯০ সালে তিনি ইংল্যান্ড গমন করেন। এছাড়া, এই সময়ে ঠমাস নামে এক চিকিৎসক শিক্ষা ও ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করলে কোম্পানি তাঁকে কলকাতা ত্যাগে বাধ্য করে। ফলে তিনিও ১৭৯২ সালে ইংল্যান্ড ফিরে আসেন এবং উইলিয়াম কেরি (১৭৭১-১৮৩৪), চার্লস গ্রান্ট প্রমুখকে নিয়ে ১৭৯৩ সালের অক্টোবরে ব্যাপ্টিস্ট মিশন সোসাইটি নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।[১৫৬] কোম্পানির বিরোধিতা সত্ত্বেও মিশনারিদের মধ্যে কোন হতাশা আসেনি। তারা বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য উইলভার ফোর্স ও চার্লস গ্রান্টের নেতৃত্বে ভারতে মিশনারিদের প্রবেশাধিকার এবং ধর্ম ও শিক্ষা প্রচারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। শিক্ষাবিদ মিশনারিগণ হিন্দু সম্প্রদায়ের সতীদাহ, শিশু সন্তান হত্যা প্রভৃতি কুসংস্কার দূর

---

১৫৩ কাজী আব্দুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* (রাজশাহী: ১৯৬১ খ্রি.), খ.১, পৃ. ৮

১৫৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১৫৫ J.C. Marshman, *Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, Vol-II, London, 1859, p. 2.

১৫৬ কাজী আব্দুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* (রাজশাহী: ১৯৬১ খ্রি.), খ.১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-৩২।

করতে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার ও খ্রিস্টধর্মের প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন।[১৫৭] মিশনারিদের দাবি ১৭৯৩ সালের চার্টারে বাস্তবায়নের জন্য উইলভার ফোর্স পার্লামেন্টে আবেদন করলে তা কার্যকর হয়নি। কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ তখন ইংরেজি শিক্ষা প্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করেন।[১৫৮]

পার্লামেন্টে সমর্থিত না হলেও উইলভার ও গ্রান্টের অদম্য প্রচেষ্টায় কেরি, জন ক্লার্ক ম্যার্শম্যান (১৭৯৪-১৮৭৭), উইলিয়াম ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারিগন গোপনে অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে বাংলায় আগমন করেন এবং ১৮০০ সালে তাঁরা শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন করেন।[১৫৯] এই সময়ে গভর্নর ওয়েলসলিও তাঁদেরকে বিনা দ্বিধায় পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। যদিও তখন পর্যন্ত শিক্ষার ব্যাপারে কোন আইন তৈরি হয়নি। ওয়েলেসলি উইলিয়াম কেরিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন।[১৬০] এ অবস্থায় বৃটিশ পার্লামেন্টও ভারতবাসীর শিক্ষা ব্যাপারে বেশিদিন উদাসীন থাকতে পারেনি। প্রধানত খ্রিস্টান মিশনারি ও তাদের সমর্থনে অন্যান্য মহলের পক্ষ থেকে দাবির মুখে শেষ পর্যন্ত ১৮১৩ সালে চার্টারে ভারতীয় শিক্ষাখাতে বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত হয় এবং বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কোম্পানিকে মিশনারিদের কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার নির্দেশ দেন।[১৬১]

১৮১৩ সালের পর মিশনারিদের তৎপরতা পুরোদমে শুরু হয় এবং সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিগণের সহায়তায় তাঁরা দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত খ্রিস্টান মিশনারি ও কিছু মানবতাবাদী ইউরোপীয়ান কর্তৃক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে বেশ কয়েকটি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। এগুলোর ভেতর কলকাতার কবরখানার কাছে জর্জ ফার্লির স্কুল, কসাইটোলা স্ট্রিটে মি. হোমসের একাডেমি, মি. পিট্রাস, ড্রেপার ও ড. ইয়েট্রসের স্কুল ছিল উল্লেখযোগ্য।[১৬২] তবে ১৮১৩ সালে কোম্পানির অনুমতি পাওয়ার পর থেকে শ্রীরামপুরসহ অন্যান্য মিশনারি সংগঠনগুলোর শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। লন্ডন মিশনারি সমিতিগুলোর উদ্যোগে ১৮১৪ হতে ১৮১৮ সালের ভিতর কলকাতা, ঢাকা, বর্ধমান, যশোর, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, হুগলিসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ১৮০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং যেগুলোর ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩,৩৪৭ জন।[১৬৩]

---

১৫৭ যোগেশ চন্দ্র বাগল, *ডিরোজিও* (কলিকাতা, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ১৪-১৫।

১৫৮ Syed Mahmood, *A History of Education in India*, (1781-1893), Aligarh, 1895, p. 2.

১৫৯ Mohammad Mohar Ali, *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities* (1833-1857), Chittagong, 1965, p. 2.

১৬০ মৌলভী নূর মোহাম্মদ আযমী, 'ইংরাজী শিক্ষার গোড়ার কথা', *মোহাম্মদী*, ২২শ বর্ষ, জৈষ্ঠ, ১৩৫৮, পৃ. ৪৫৮

১৬১ মোহাম্মদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা*, অনুবাদ-মুস্তফা নুরউল ইসলাম (ঢাকা: ১৯৬৯ খ্রি.), পৃ. ১০

১৬২ স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস* (১৮২৬-১৮৫৬) (কলিকাতা: ১৯৭৫ খ্রি.), পৃ. ৯-১০

১৬৩ সুশীল কুমার চ্যাটাজী, *বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তার পরিজন* (কলিকাতা: ১৯৭৪ খ্রি.), পৃ. ১৯

খ্রিস্টান মিশনারিদের শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রম দেশীয় জনগণের মধ্যে বিশেষত বাঙালি হিন্দু সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করে, যার ফলে এক পর্যায়ে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে উঠে। স্কটল্যান্ডের অধিবাসী ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২) নামক এক উদারচেতা ও বিচারপতি এডওয়ার্ড হাইডইস্ট এর উদ্যোগে ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে গণ্য করা হয়।[১৬৪]

১৮৩০ সালে স্কটিশ মিশনারি রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ কলকাতায় আসার পর মিশনারিদের প্রচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের নতুন বেগ সঞ্চারিত হয়। ডাফ ১৮৩০ সালে কলকাতায় ফিরিঙ্গী কমল বোসের গৃহে জেনারেল এসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন নামে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে ১৮৩৫ সালে এটি তাঁর নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে পরিণত হয়।[১৬৫] এছাড়া, এই সময়ে জেসুইট মিশনারিগণ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।[১৬৬] এর ফলে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার অনেক সহজতর হতে থাকে।

অন্যদিকে, ১৮২৩ সালে কোম্পানি সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য General Committee of Public Instructiion গঠন করেন। ১৮৩৩ সালে বৃটিশ পার্লামেন্ট উক্ত কমিটিকে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা শিক্ষাবাবদ খরচের নির্দেশ দেয়। এই টাকা কিভাবে ব্যয় হবে তা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। কারণ, কোম্পানি সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নিলেও কোন শিক্ষার মাধ্যমে এই টাকা ব্যয় হবে কিংবা শিক্ষার প্রকৃতিই কি ধরণের হবে-এ ব্যাপারে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছিল না, যার ফলে সরকারিভাবে অর্থ বরাদ্দ হলেও পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে এতদিন তেমন কোন কার্যক্রম গ্রহণকারী হয় নি। কমিটির পাঁচজন সদস্য প্রাচ্যবিদ্যার পক্ষে এবং বাকি পাঁচজন পাশ্চাত্য শিক্ষা দেয়ার পক্ষে অভিমত পেশ করেন। এ মতভেদই ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে Anglicist Orientalist Controversy বলে খ্যাত। শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে কমিটিতে মতভেদ থাকলেও একটি বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল না। তাঁরা সবাই মনে করতেন যে, এ দেশে প্রথম শুধু উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং পরে তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।[১৬৭]

---

১৬৪ রাজ নারায়ণ বসু, *হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত* (কলিকাতা: ১৩৭৬ খ্রি.), পৃ. ২০

১৬৫ Mohammad Mohar Ali, *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities* (1833-1857), Chittagong, 1965, p. 5

১৬৬ স্বপন বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

১৬৭ A.R. Mallick, *British Policy and the Muslims In Bengal*, 1775-1856, Dacca, 1977, p. 225-23.

কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমর্থকদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। প্রাচ্য শিক্ষার সমর্থকগণ মনে করেন যে, ভারতীয়দের জন্য তাদের নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বজায় রাখা উচিত এবং এ শিক্ষার সাথে কিছুটা ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করলে তারা উপকৃত হবে। পাশ্চাত্যপন্থিগণ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।[১৬৮] কোম্পানির কর্মকর্তাদের অধিকাংশই ও দেশীয় জনগণ তথা বাঙালি হিন্দু সমাজও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি জানান। হিন্দু সমাজের মধ্যে এ ব্যাপারে রামমোহন রায় অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেন।[১৬৯] এ অবস্থায় খ্রিস্টান মিশনারিগণও ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম ও সরকারি ভাষা করার দাবি জানান। মিশনারিগণ মনে করেন যে, পাশ্চাত্য  জ্ঞান লাভ করলে হিন্দুগণ মূর্তি পূজার অসারতা বুঝতে পারবে ও তাদেরকে খ্রিস্ট ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করা যাবে। এ ব্যাপারে আলেকজান্ডার ডাফ প্রধান ভূমিকা পালন করেন।[১৭০]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যপন্থিদের বিতর্কের এ পরিস্থিতিতে ১৮৩৪ সালে সুপ্রিম কাউন্সিলের আইন উপদেষ্টা লর্ড টমাস ব্যরিংটন মেকলে (১৮০০-১৮৫৯) শিক্ষা পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ঘোর পাশ্চাত্যবাদী। ১৮৩৫ সালে ২ ফেব্রুয়ারি মেকলে প্রাচ্য শিক্ষার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে অভিমত পেশ করে লর্ড বেন্টিংকের কাছে একটি Minute পেশ করেন।[১৭১] বড়লাট বেন্টিংকও নিজে ইংরেজি শিক্ষাকে সরকারি শিক্ষানীতি হিসেবে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মেকলের Minute এর সাথে পুরোপুরি একমত হন এবং ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ এক রেজুলেশনে ঘোষণা করেন যে, এখন থেকে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থ ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে। এর দুই বৎসর পর ১৮৩৭ সালে ফার্সির স্থলে ইংরেজি রাজভাষা হিসেবে কার্যকর হয়[১৭২] এবং ১৮৪৪ সালে সরকারি চাকরির যোগ্যতা হিসেবে ইংরেজি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়।[১৭৩] পরবর্তীকালে বৃটিশ সরকার শিক্ষার উন্নয়নের পদক্ষেপ হিসেবে ১৮৪২ সালে Council of Education গঠন এবং ১৮৫৪ সালে বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উডের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন, যা Wood's Despatch নামে পরিচিত। উডের Despatch কে

---

১৬৮ Ibid, P. 224-225.

১৬৯ H. Sharp (ed.), *Selections from Educational Records* (1771-1839), Part-I, Calcutta, 1920, p. 99-101.

১৭০ Abdul Karim, *Mohammadan Eduction in Bengal*, Calcutta, 1900. p. 2-3; Mohar Ali: op.cit, p. 57-60.

১৭১ Thomas Babington Macaulay, *Minules on Education in India, written in the year 1835*, 1836 and 1837, by H. Woodrow, Calcutta, 1862.

১৭২ H. Sharp, op, cit.

১৭৩ J.A. Richey (ed.), *Selection from Educational Records* (1840-1859), Part-II, Calcutta, 1922, p. 90.

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রধান সনদ বা Magna Carta-র সাথে তুলনা করা হয়।[১৭৪] এ ডেসপ্যাচের সুপারিশেই ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারত উপমহাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয়ভাবেই পাশ্চাত্য শিক্ষার উৎপত্তি প্রথম বাংলাতেই ঘটে।[১৭৫] তবে সরকারিভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার উদ্ভব বিলম্বিত হয় এবং বেসরকারিভাবে খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারাই প্রথম ইংরেজি শিক্ষার কাজ শুরু হয়। কিন্তু মিশনারিদের পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের পিছনে প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল এদেশীয়দের খ্রিস্টধর্মের দিকে আকৃষ্ট করা এবং এ বিষয়ে ইংরেজ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিও একই ছিল।[১৭৬] মিশনারিদের শিক্ষা কার্যক্রমের প্রভাব এদেশীয়দের মধ্যে বিশেষত বাঙালি হিন্দু সমাজের একাংশের উপর এতবেশি পড়েছিল যে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, লালবিহারী দে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ প্রকাশ্যভাবে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অন্যরা ধর্ম ত্যাগ না করলেও খ্রিস্টান ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন।[১৭৭] ১৮৫৪ সালের পর থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে সরকারি কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলে মিশনারিদের প্রচেষ্টার গুরুত্ব ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। তবুও বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা ও প্রসারের ক্ষেত্রে খ্রিস্টান মিশনারিদের অবদান চিরস্মরণীয়। প্রধানত মিশনারিদের আন্দোলনের ফলেই বৃটিশ সরকার বাংলায় ১৮১৩ সালে শিক্ষা বিস্তারের কাজ প্রথমবারের মত শুরু করেছিলেন এবং পরে ১৮৩৫ সালে ইংরেজির মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

**কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা**

১২ আগস্ট ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী লাভ করলেও মুসলমানদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের তাৎক্ষণিক পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু মুসলমানদের উপর নানান ধরনের অত্যাচার, নির্যাতন শুরু হয়। যার ফলে মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা। মুসলিম সাম্রাজ্যের পতনে বেসরকারি উদ্যোগে যে মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল তা ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। এ অবস্থায় এক সময় রাজকার্য সম্পাদনের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাব হতে পারে ভেবে বিচক্ষণ ইংরেজ গভর্নর লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস দেশের প্রশাসনিক এবং বিচারব্যবস্থার সার্বিক প্রয়োজনে ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদরাসার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হয় শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ও নিযামিয়ার প্রবর্তক মোল্লা নিযামুদ্দীনের

---

১৭৪ *Despatch from the Court of Direction of the East India Company to the Government General of India in Council on the subject of the Education of the people of India*, Simla, 19th July, 1854, p. 1-4

১৭৫ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, *বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার উদ্ভব ও খ্রিস্টান মিশনারীদের ভূমিকা*, *ইতিহাস অনুসন্ধান-১৮*, পৃ. ৩৯৪

১৭৬ T.B. Macaulay, *Minutes on Education*, op, cit.

১৭৭ রাজনারায়ণ বসু, *একাল আর সেকাল* (কলিকাতা: ১৯৫১ খ্রি.), পৃ. ১২

শিষ্য মোল্লা মাজদুদ্দীনকে। জনসাধারণের কাছে তিনি মৌলভী মদন নামে পরিচিত ছিলেন।[১৭৮] কলকাতা আলিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্টিংস এর ৭ জুন ১৭৮১ খ্রি. বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর কাছে প্রদত্ত একটি বিবরণ সংরক্ষিত আছে। বিবরণটি নিম্নরূপ:

"১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল আমার সহিত সাক্ষাৎ করে এবং আমাকে অনুরোধ করে যে, প্রেসিডেন্সীতে মোল্লা মাজদুদ্দীন নামক জনৈক ব্যক্তিকে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে রাখিবার জন্য আমি যেন সচেষ্ট হই, যাহাতে এখানকার মুসলমান ছাত্ররা প্রচলিত ইসলামি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারে। এই প্রতিনিধি দল আমাকে অবহিত করে যে, এই ব্যক্তি ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগাধ বুৎপত্তি সম্পন্ন এই ধরনের গুণীলোক সচরাচর পাওয়া যায় না।"[১৭৯]

১৭৮০ সালে মাদরাসা স্থাপিত হওয়ার পর ১৭৯০ সাল পর্যন্ত ১০ বছর কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় দরসে নিযামিয়ার পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করা হয়েছিল। কিন্তু ১০ বছর যেতে না যেতেই ১৭৯১ সালে মাদরাসা পরিচালনায় ব্যর্থতার অভিযোগ এনে মোল্লা মাজদুদ্দীনকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে ইংরেজ অধ্যক্ষ নিয়োগ দেওয়া হয় এবং দরসে নিযামিয়ার শিক্ষাধারা পরিবর্তন করে মাদরাসার পাঠ্যসূচি থেকে তাফসির ও হাদিস বাদ দেওয়া হয়। এতে ইংরেজদের প্রকৃত উদ্দেশ্য দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১১৮ বছর পর ১৯০৮ সালে কলকাতা মাদরাসায় তাফসীর ও হাদিস চালু করা হয় এবং সর্বোচ্চ ডিগ্রীকে "টাইটেল" নাম দেয়া হয়। মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ১৪৭ বছর পর ১৯২৭ সালে প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ হিসাবে শামসুল উলামা কামাল উদ্দীন আহমদকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে প্রথম অধ্যক্ষ ড. স্প্রেন্টার হতে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন পর্যন্ত মোট ২৫ জন ইংরেজ অধ্যক্ষ দায়িত্ব পালন করেন। লক্ষ্ণৌর অধিবাসী দরসে নিযামিয়ার প্রবর্তক মোল্লা নিযামুদ্দীন ছাহালুভীর শিষ্য মোল্লা মাজদুদ্দীন কলকাতা মাদরসায় তাঁরই উস্তাদ প্রণিত শিক্ষাক্রম-ই চালু করেন। যেটি তৎকালে সবচেয়ে জনপ্রিয় পাঠ্যসূচি হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছিল।[১৮০]

১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে ওয়ারেন হেস্টিংস এর প্রাথমিক নির্দেশে শিয়ালদা রেল স্টেশনের পাশে ভাড়া বাড়িতে কলকাতা আলিয়া মাদরাসার কার্যক্রম শুরু হলেও মোল্লা মাজদুদ্দীনের কর্মতৎপরতা ও আগ্রহ দেখে ওয়ারেন হেস্টিংস নিজস্ব তহবিল থেকে বৌদ্ধ পুকুর নামক স্থানে একখণ্ড জমি ক্রয় করে মাদরাসার জন্য একটি ভবন নির্মাণ করে মাদরাসার স্থায়ী রূপ দান করেন। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রতিমাসে ছয় টাকা থেকে পনের টাকা পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হতো। তাছাড়া ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতরের সময় খরচাদির জন্যও গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন ছিল।[১৮১] কিন্তু এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল তাদের রাজকার্যের কিছু কর্মচারী তৈরি করা।

---

১৭৮ আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৫খ্রি.), পৃ. ৩৪

১৭৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

১৮০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

১৮১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

**লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত**

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন ইংরেজরা দেখেন যে দেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ সম্পত্তি খাজনাবিহীন এবং সেই সম্পত্তিগুলোর আয় দিয়ে মুসলমানদের মসজিদ, মাদরাসা, মক্তবসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় একটা স্থায়ী পদ্ধতি নির্ধারণ করেন। এছাড়া ১৭৯৩ সালে ইংরেজ সরকার সকল লাখেরাজ সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যে এগুলোর সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অজুহাতে সকল নিষ্কর জমির দানপত্রের উপযুক্ত প্রমাণ দাখিলের জন্য এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। কিন্তু মুসলমান সমাজের অধিকাংশই এ সকল দানপত্র যথাসময়ে দাখিল করতে ব্যর্থ হলে ইংরেজ সরকার নানা আইন প্রবর্তন, বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন মিথ্যা মামলা সাজিয়ে, মিথ্যা সাক্ষ্য সংগ্রহ করে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত একের পর এক লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন।[১৮২] ফলে মুসলমানদের প্রায় জমিদারী হিন্দুদের হাতে চলে যায়। কোম্পানী সরকারের এই ষড়যন্ত্রের ফলে অগনিত মাদ্‌রাসা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। কেননা প্রধানত ঐ সকল নিস্কন্টক জমির আয়ের উপর ভিত্তি করে মাদ্‌রাসাসমূহ পরিচালিত হত।[১৮৩]

**মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা**

১৮৭১ সালে বৃটিশ সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কিত এক প্রস্তাব পাশ করে।[১৮৪] মূলতঃ এই সময় থেকে বাংলায় মুসলিম শিক্ষা বিস্তার শুরু হয় এবং সরকারের পক্ষ থেকেও মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৮২ সালে বৃটিশ সরকার উইলিয়াম হান্টারের (১৮৪০-১৯০০) সভাপতিত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে এর উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করা। এই কমিশনের নিকট মুসলিম নেতৃত্বের স্মারকলিপি, সাক্ষ্য প্রদান ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে উইলিয়াম হান্টার ১৮৮৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তাঁর রিপোর্টে 'মুসলিম শিক্ষা' শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে ১৭টি সুপারিশ পেশ করেন।[১৮৫] হান্টারের সুপারিশ সমূহকে মুসলিম শিক্ষাবিদ স্যার আজিজুল হক (১৮৯২-১৯৪৭) বাংলার মুসলমানের শিক্ষা অধিকারের সনদ বলে উল্লেখ করেন।[১৮৬]

---

১৮২ ড. মো: আবদুল্লাহ আল- মাসুম, *বৃটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২২

১৮৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

১৮৪. *Resulotion of the Govt. of India*, 7 August, 1871, para-2, *India Education Proceedings*, August, 1871.

১৮৫ *Report of the Indian Education Commission, 1890-91*, p. 93.

১৮৬ মোহাম্মদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা*, অনুবাদ-মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (ঢাকা: ১৯৬৯ খ্রি.), পৃ. ৮০১

হান্টার কমিশনের সুপারিশ সমূহ, নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলী কর্তৃক সরকারের নিকট স্মারকলিপি ও অন্যন্য মুসলমান নেতাদের ব্যক্তিগত আবেদন-নিবেদন বিবেচনা করে ১৮৮৫ সালে বড় লাট ডাফরিন (১৮২৩-১৯০০) মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে কিছু প্রস্তাব পাশ করেন। এই সব প্রস্তাবে বলা হয় যে, জনশিক্ষা বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টে মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ে পৃথক আলোচনার ব্যবস্থা থাকবে এবং তা হতে ভারত সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা জেনে সময়োচিত কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করতে পারবে। মুসলিম উচ্চ শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তির প্রয়োজন স্বীকৃত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করতে মুসলিম পরিদর্শক নিয়োগের আবশ্যকতা উপলব্ধি করা হয়। এছাড়া ধর্মীয় শিক্ষাকে পাঠক্রমে অন্তর্ভূক্ত করতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় এবং মক্তবগুলোতে গ্রান্টস-ইন-এইড এর ব্যবস্থা করা হয়। তবে স্থানীয় ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যেসব মক্তব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে শুধু সেসব প্রতিষ্ঠানকেই গ্রান্টস-ইন-এইড দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[১৮৭] সৈয়দ আমীর আলী ডাফরিনের গৃহীত প্রস্তাব সমূহকে মুসলিম অধিকারের Magna Charter হিসেবে অভিনন্দিত করেন।[১৮৮]

১৮৮৫ সালে সরকারি প্রস্তাব সমূহ বাংলার মুসলিম সমাজের শিক্ষার অগ্রগতিতে বেশ উৎসাহের সৃষ্টি করে। এই সময় বাংলাদেশে পাঠ চাষ ও পাটের মূল্যও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৮৯৪ সালের দিকে পাটজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। পাটের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মূলতঃ মুসলিম প্রধান উত্তর ও পূর্ববঙ্গের চাষীরাই মিটিয়েছিল।[১৮৯] এই অর্থকরী ফসলের মাধ্যমে এই অঞ্চলের মুসলিম চাষীরা নগদ অর্থের মুখ দেখতে পায়। তাতে মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারে দীর্ঘদিনের প্রতিবন্ধক যে দারিদ্র, তা ধীরে ধীরে অপসারিত হতে থাকে এবং অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের সন্তানেরা বিদ্যালয়ে যেতে শুরু করে।

মুসলিম নেতৃবৃন্দের শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন প্রয়াস, সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা এবং মুসলমান কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সহ আধুনিক শিক্ষার প্রতি সমাজ মানসের পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্বে যে অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তা অনেকাংশে অপসারিত হয় এবং শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, ১৮৭১ সাল থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ১২১৪৮ (১৪.৪%) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮২ সালে ২৬১১০ (২৩%) জনে দাঁড়ায়।[১৯০] পরবর্তীকালে ১৮১৯ সালে পূর্বের ১০ বছরের তুলনায় মুসলিম শিক্ষার হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪.৫%-এ উন্নীত হয়।[১৯১]

---

১৮৭ *General Report on Public Instruction in Bengal, 1890-91*, p. 93.

১৮৮ অমলেন্দু দে, *বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ* (কলিকাতা: ১৯৭৪ খ্রি.), পৃ. ১৭৫।

১৮৯ Raqib Uddin Ahmed, *The Progress of the Industry and Trade* (1855-1966). Dacca, 1966, p. 3.

১৯০ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

১৯১ Abdul Karim. *Muhammadan Education in Bengal*, Calcutta, 1990, Appendix.

বিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষার অগ্রগতির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কনফারেন্স, কমিটি গঠন ইত্যাদি মাধ্যমে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হয়। ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়নের ব্যাপারে কলকাতা মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল রোজের সভাপতিত্বে বিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্মেলন আহবান করা হয়। উপস্থিত অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলাম (১৮৪৮-১৯২৩), খান বাহাদুর আ.ফ.ম. আব্দুর রহমান, আব্দুল করিম (১৮৬৩-১৯৪৩), মোহাম্মদ ইব্রাহিম, মৌলভী আব্দুল লতিফ এবং মৌলভী মোহাম্মদ ইসহাকসহ আরো কয়েকজন। সভায় মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনা করা হয় এবং যেসব শিক্ষার্থী ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষাগ্রহণ করছে তাদেরকে সরক্কারি সাহায্য দেয়ার প্রস্তাব করা হয়।[১৯২] সভার সুপারিশক্রমে শিক্ষা পরিচালক আলেকজাণ্ডার পেডলার ১৯০৪ সালের ১ জুলাই মুসলিম প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক এক স্কীম পেশ করেন। এই স্কীমের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল: ১) বেশ কিছু মডেল মক্তব প্রতিষ্ঠা; ২) মক্তবে সাহায্য প্রদান; ৩) বেশ কিছু পরিদর্শক মৌলভী নিয়োগ।[১৯৩]

অতঃপর সরকার ১৯০৫ সালে ২২ সেপ্টেম্বর পেডলারের প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের অনুমোদন দেন।[১৯৪] এই নির্দেশের আওতায় ৭টি মডেল মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয়, ৬ জন মৌলভী পরিদর্শক নিয়োগ করা হয় এবং ১৪৭৫০ টাকা বিভিন্ন জেলার মক্তবে বরাদ্দ দেয়া হয়।[১৯৫] এছাড়া মক্তবসমূহকে বিভিন্ন প্রকৃতিতে বিভক্ত করে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণে প্রলূব্ধ করার চেষ্টা করা হয়। পেডলারের সুপারিশের প্রেক্ষিতে মক্তবের সিলেবাসকেও পরিমার্জন করা হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ফলে অনেক মক্তব জনশিক্ষা বিভাগের শিক্ষা কোর্স গ্রহণ করে এবং মক্তবের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।[১৯৬]

১৯০৮ সালে ২২ এপ্রিল জনশিক্ষা পরিচালক হার্ল ক্যান্সলি আর্ল মুসলিম শিক্ষা উন্নয়নমূলক একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এতে মুসলিম প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে প্রস্তাবগুলো ছিল নিম্নরূপ-

১। পাঁচজন অতিরিক্ত মৌলভী পরিদর্শক নিয়োগ করা।

২। অনুদানবিহীন মক্তবগুলোকে অনুদানের আওতায় নিয়ে আসার জন্য আরও অতিরিক্ত ৭০০০ টাকা বরাদ্দ করা।

৩। যে সব স্থানে মক্তব ও কোরআনভিত্তিক স্কুলের সংখ্যা ৯০ এর বেশি সে সব অঞ্চলের ৯টি জেলায় আরও ৯জন পরিদর্শক নিয়োগ করা এবং তাদের মাসিক বেতন ৫০ টাকা নির্ধারণ করা।

---

১৯২ *Progress of Education in Bengal*, 1902-03 to 1906-07, Third Quinquennial Reveiw, pp. 156.

১৯৩ *Report on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal* (1861- 1977), Vol. 3; Dr. M. Sekandar Ali Ibrahimy (ed.) Dhaka, 1985, p. 75.

১৯৪ *Progress of Education in Bengal*, Op.cit. p. 156.

১৯৫ *Report on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal* (Op.cit. p. 75.

১৯৬ *Progress of Education in Bengal*, Op.cit. p. 156.

৪। বাংলার বিভিন্ন জেলায় আরও ১৪টি সরকারি মক্তব প্রতিষ্ঠা করা।

৬। সংস্কারকৃত সিলেবাস মক্তবগুলোতে সরকারের মাধ্যমে কিংবা বেসরকারি উদ্যোগে প্রবর্তন করা।[১৯৭] আর্ল স্কিমে মক্তবগুলোকে অনুমোদিত ও অননুমোদিত এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। ১৯০৮ সালের ২৭ আগস্ট আর্ল স্কিম সরকারি অনুমোদন লাভ করে।[১৯৮] তবে আর্ল স্কীম শুধু পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় সীমাবদ্ধ থাকে।[১৯৯]

এদিকে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়। এ সময় নতুন প্রদেশের সরকার মুসলিম শিক্ষার উন্নতির জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন-

১। মনোনীত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উর্দু প্রচলন;

২। উদার অনুদান;

৩। বৃত্তি সংরক্ষণ;

৪। আবাসিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ;

৫। শিক্ষাবিভাগে বেশি করে মুসলিম নিয়োগ দান।[২০০]

নতুন প্রদেশ গঠনের পর মুসলিম শিক্ষা পর্যালোচনা করতে ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর লে. গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারের (১৮০৫-১৯৩১) সভাপতিত্বে বরিশালে একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে এই মর্মে প্রস্তাব নেয়া হয় যে, পূর্ব বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয়ে মুসলমানদের জন্য পঠনযোগ্য বিষয় প্রবর্তনের চেষ্টা করা প্রয়োজন। এ পদ্ধতিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চ ক্লাসে উর্দু শিক্ষা অনুমোদনযোগ্য হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে শিক্ষকগণ ইচ্ছা করলে কোরআন শিক্ষা দিতে পারবেন।[২০১] উক্ত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ফলে মুসলমানরা উর্দুতে লেখা ইংরেজি বই পড়তে পারে এবং তাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মুসলিম ছাত্র সংখ্যাও অনেক বেড়ে যায়।[২০২]

নবগঠিত প্রদেশে অনেক নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। পূর্ব বাংলা ও আসামের সকল জেলায় যাতে প্রতি নয় মাইলে একটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তদুদ্দেশ্যে সরকার জেলা বোর্ডকে সাহায্য করেন।[২০৩] যেহেতু পূর্ব বাংলা ও আসাম ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল, সেহেতু এসব অঞ্চলে উন্নয়নের ফল মুসলমানরাই বেশি ভোগ করে।

---

১৯৭ *Progress of Education in Bengal*, 1907-08 to 1911-12, Fourth Quinquennial Reveiw, pp. 148-50.

১৯৮ Ibid, *Report on Public Instruction in Bengal*, 1909-10, p. 46.

১৯৯ *Report on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal* op.cit. p. 76-78.

২০০ *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam*, 1906-07 to 1911-12, Vol. 1, p. 117.

২০১ M.K.U. Molla, *The New province of Eastern Bengal and Asam*, Rajshahi University, IBS, 1981, p. 199-200.

২০২ Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam, op.cit, p. 117.

২০৩ *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮ই মাঘ, ১৩১৫.

মুসলিম সমাজে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এসময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, সভা-সমিতি ব্যাপক ভূমিকা রাখে। ১৯০৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি মুসলিম শিক্ষার উন্নতিকল্পে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি গঠিত হয়।[২০৪] আলোচ্য সময়ে বাংলার বিভিন্ন স্থানে এই সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এসব সম্মেলনে মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহিত হয়। বঙ্গভঙ্গের পর এই সমিতির অনুরূপ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি গঠিত হয়। নবাব সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫) এর সভাপতি এবং নবাব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯) সেক্রেটারি মনোনীত হন।[২০৫]১৯০৬ সালের এপ্রিলে ঢাকায় এ সমিতির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[২০৬] এসব সম্মেলনে মুসলিম প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়। এভাবে সরকারি-বেসরকারি প্রচেষ্টার ফলে আলোচ্য সময়ে বাংলার মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য হারে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়-

**সারণি-১**

| বাংলায় মুসলিম প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি, ১৯০৬-০৭ থেকে ১৯১১-১২[২০৭] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **সাল** | **অঞ্চল** | **প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা** | **মোট ছাত্র** | **মুসলিম ছাত্র** | **মুসলিম হার** |
| ১৯০৬-০৭ | পূর্ব বাংলা ও আসাম | ১৭৫৩১ | ৫৬০৭১১ | ৩০১২৭৯ | ৫৩.৭৩ |
| ১৯১১-১২ | ঐ | ১৭৭২৩ | ৭০৪৩৫৩ | ৩৯৪৫৮২ | ৫৬.০২ |
| ১৯০৬-০৭ | পশ্চিম বাংলা* | --- | --- | --- | --- |
| ১৯২১-২২ | ঐ | ১৪৩৪৮ | ৫১১২৪৪ | ৮৭৯৮৮ | ১৭.২ |

উক্ত তথ্যে বাংলার মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি সন্তোষজনক। পশ্চিম বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার হার কম হলেও সে সময়ের জনসংখ্যার তুলনায় তা আশানুরূপ বলা যায়।[২০৮] মুসলিম প্রাথমিক শিক্ষার এই উল্লেযোগ্য বিস্তারের পেছনে বাংলার মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সরকারি সহযোগিতা ব্যাপকভাবে কাজ করেছে।

---

২০৪ এস.উব্লিউ হোসেন, '*বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি*, *ইসলাম প্রচারক*, পঞ্চম বর্ষ, ৯-১০ম সংখ্যা ও ১১শ সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ও অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩১০।

২০৫ মোহাম্মদ ইসমাঈল ইসলামাবাদী, *নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ*, *মাসিক মোহাম্মদী*, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৩৭, পৃ. ৪০।

২০৬ *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ই এপ্রিল, ১৯০৬ খ্রি.।

২০৭ *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam*, 1907-08 to 1911-12, Vol. II, p. 89. *Supplement to the progress of Education in Bengal*, 1912-13 to 1916-17 Fifth Quinquennial Reveiw, pp. 70-71.

২০৮ ১৯১১-১২ সালে পশ্চিম বাংলায় মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১৭.০৬%। দেখুন, *Progress of Education in Bengal*, op.cit, p. 146.

বিশ শতকের শুরুতে মুসলিম মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। ১৯০৩-০৪ সালের সরকারি শিক্ষা রিপোর্টে জানা যায় যে, মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলার মুসলিম ছাত্রদের হার মাত্র ৯%। এই পশ্চাৎপদতার জন্য শিক্ষা রিপোর্টে মুসলমানদের গোঁড়ামী ও অনীহাকে দায়ী করা হয়।[২০৯] ১৯০৫ সালের পর নতুন প্রদেশে মুসলমানদের মাধ্যমিক শিক্ষায় অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়। জনশিক্ষা পরিচালক মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রমকে আধুনিক উপায়ে সংশোধন করে। নতুন পাঠক্রমে কোন কোন বিষয়ে কথোপকথনের (Conversation) জোর দেয়া হয়। কিছু বিষয়ে যেমন, ভুগোল ও ইতিহাস মৌখিক ও পঠনের (Oral & reading) ক্ষেত্র বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়। ইংরেজি শেখানো জন্য (Conversation) -এর উপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়।[২১০]

সরকার শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সুষ্ঠুভাবে কর্ম সম্পাদনের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেন।[২১১] ১৯১১ সালে এই কলেজ হতে ৩৭ জন ডিগ্রি লাভ করে যার মধ্যে ৯জন ছিল মুসলিম এবং ২৮জন হিন্দু।[২১২] শিক্ষকদের সুবিধার জন্য সরকার সরকারি-বেসরকারি সকল স্কুল শিক্ষকদের জন্য বেতন বৃদ্ধি করেন। ১৯০৬ সালের দিকে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের সর্বোচ্চ বেতন ছিল ২৫০ টাকা।[২১৩] ১৯১১-১২ সালের দিকে এই বেতন ৪০০ টাকায় উন্নীত হয়।[২১৪] বেতন বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার অনেক সমস্যা দূর হয় এবং শিক্ষকগণ শিক্ষাদানে উৎসাহিত হন।

মুসলিম ছাত্রদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে উর্দু ও ফারসি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ১৯০৫ সালের বরিশাল সম্মেলনে এ বিষয়টির উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ.কে.ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) এ প্রসঙ্গে প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেনঃ "জেলা বোর্ড বা সরকারি বিভাগ হতে এই সকল বিদ্যালয়ে মঞ্জুরী প্রদানের পূর্বে এই শর্তারোপ করতে হবে যে, মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে উর্দু ও ফারসী শিক্ষাদানের জন্য একজন

---

২০৯ *Progress of Education in Bengal, 1902-03 to 1906-07*, Third Quinquennial Review, pp. 153-159.

২১০ *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam*, op.cit, p. 50.

২১১ Ibid.

২১২ Ibid.

২১৩ P.C. Lyon, Chief Secretary, *Government of Eastern Bengal and Assam, to Government of India, Home Department*, No. 1137E, Shillong, 18 May, 1908: *Eastern Bengal and Assam Education Proceding*, 1908.

২১৪ *Progress of Education in India*, 1907 to 1912, Vol. II, Parliamentary Papers (House of Commons), 1914, cd. 7486, Vol. 6, p. 243.

যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।"[২১৫] সম্মেলনের সভাপতি লে. গভর্নর ফুলার এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

নতুন প্রদেশের সরকার কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৭ সালে ঢাকার উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের ছাত্রদের সুবিধার্থে আরমানিটোলায় একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২১৬] ১৯০৮ সালে কক্সবাজারের পশ্চাৎপদ মুসলমান ছাত্রদের উন্নতির জন্য সেখানকার অনুদানপ্রাপ্ত মাধ্যমিক স্কুলকে সরকারিকরণ করা হয়।[২১৭] সুরমা উপত্যকার স্কুলটি এ সময় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় উন্নতি লাভ করে। সরকার মাধ্যমিক স্কুলে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ দেন। যেমন ১৯১১ সালে ১,৫০,০০০ টাকা মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয়।[২১৮]

তবে পূর্ব বাংলার মুসলমান ছাত্রদের জন্য শহরে প্রতিষ্ঠিত এসব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা সমস্যার সৃষ্টি হত। যেহেতু মুসলমানদের সিংহভাগ ছিল কৃষিজীবি এবং তারা গ্রামে বাস করত। এই সমস্যার সমাধানে সরকার প্রদেশের বড় বড় শহরের বিদ্যালয়গুলোতে মুসলিম ছাত্রদের জন্য সংযুক্ত হোস্টেল বা ছাত্রাবাস স্থাপন করেন। ফলে মুসলমান ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা অনেকটা লাঘব হয়।[২১৯]

আবাসিক সমাধান ব্যতীত সরকার মুসলিম ছাত্রদের জন্য বিনা বেতনে অধ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বিনা বেতনের পরিমাণ ১৩%-এ বর্ধিত করা হয় এবং এগুলো হিন্দু-মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ৮:৫ অনুপাতে বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[২২০] সরকারের এসব সংস্কার কার্যের ফলে পূর্ব বাংলা ও আসামে মুসলমানদের মাধ্যমিক শিক্ষার অনেক উন্নয়ন সাধিত হয় এবং মুসলিম ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়-

---

২১৫ *Proceedings of Muhammadan Educational Conference*, 19 December, 1905, para-5, *Eastern Bengal and Assam Education Proceedings*, June, 1906.

২১৬ M.K.U. Molla, op.cit, p. 188.

২১৭ Ibid.

২১৮ *Government of India*, E.D. to Chief Secretary, *Government of Eastern Bengal and Assam*, Telegram No. 7, 13, January, 1911. *Eastern Bengal and Assam Education Proceedings*, 1911.

২১৯ *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam*, op.cit, p. 119.

২২০ Ibid. pp. 118-19.

**সারণি-২**

নতুন প্রদেশে মাধ্যমিক শিক্ষায় মুসলিম ছাত্রের অগ্রগতি, ১৯০৬-০৭ থেকে ১৯১১-১২[২২১]

| প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠান সংখ্যা | মোট ছাত্র | মুসলিম ছাত্র | প্রতিষ্ঠান সংখ্যা | মোট ছাত্র | মুসলিম ছাত্র | বৃদ্ধির হার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উচ্চ বিদ্যালয় | ২১২ | ৪৭,১৩০ | ৮৮৬৯ | ২২৪ | ৭৪৫৫৭ | ২০৭২৯ | ১৩৩.৭ |
| মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় | ৫১১ | ৪১,৯৭৩ | ১৪১০০ | ৭৩৮ | ৮৮২১৯ | ৩৮৬৯৫ | ১৭৪.৪ |

উক্ত পরিসংখ্যানে মাধ্যমিক স্কুলে মুসলমান ছাত্রের বৃদ্ধি লক্ষণীয়। এই বৃদ্ধির আনুপাতিক হার সবচেয়ে বেশি দেখা যায় মধ্য ইংরেজি স্কুলে। এতে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অধিক আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। অপরদিকে ১৯১১-১২ সালে পশ্চিম বাংলায় মুসলিম মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা ছিল নিম্নরূপ-

**সারণি-৩**

পশ্চিম বাংলায় মুসলিম মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা, ১৯১১-১২[২২২]

| প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠান সংখ্যা | মোট ছাত্র | মুসলিম ছাত্র | মুসলিম হার |
|---|---|---|---|---|
| উচ্চ বিদ্যালয় | ৩০০ | ৭৬১৪৭ | ৭৫৫৬ | ৯.১২ |
| মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় | ৫৭০ | ৪৮১৪৩ | ৬৭৯৮ | ১৪.১২ |

উক্ত তথ্যেও পশ্চিম বাংলায় মুসলিম মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা আশানুরূপ বলা যায়। এ পরিসংখ্যানেও মধ্য ইংরেজি স্কুলে মুসলিম ছাত্রের হার বেশি দেখা যাচ্ছে। জনশিক্ষা পরিচালক ১৯০৬-০৭ সাল থেকে উক্ত সময় পর্যন্ত মুসলমানদের মাধ্যমিক শিক্ষায় তুলনামূলক অগ্রগতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।[২২৩]

---

২২১ *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam*, 1907-08 to 1911-12, Vol. II, p. 89.

২২২ Supplement to the progress of Education in Bengal, 1912-13 to 1916-17 Fifth Quinquennial Reveiw, pp. 70-71; *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam*, 1906-07 to 1911-12, Vol. II, p. 89.

২২৩ *Progress of Education in Bengal*, 1907-80 to 1911-12, *Fourth Quinquennial Review*, p. 147.

বাংলা বিভাগের পূর্বে পূর্ব-বাংলার কলেজ শিক্ষার অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। সরকারি কলেজগুলোর আবাসিক ব্যবস্থা ছিল অপর্যাপ্ত, ব্যবস্থাপনা দুর্বল এবং শিক্ষক ছিল কম। বেসরকারী কলেজগুলোর ব্যবস্থা ছিল আরো শোচনীয় এবং সেগুলো চালানোই ছিল কষ্টকর।[২২৪] লে. গভর্নর হেয়ার (১৮৪৯-১৯২২) নব প্রদেশের কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই নিম্নমানের, সরকারি প্রতিষ্ঠানের অবস্থা খুবই খারাপ এবং বেসরকারী কলেজগুলো আরো শোচনীয় বলে অভিমত প্রকাশ করেন।[২২৫] এই অবস্থায় সরকার কলেজগুলোর উন্নতির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার প্রসারের চেষ্টা চালান। এজন্য সরকারকে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯০৪) বিবেচনা করতে হয়। কারণ এ আইনে উচ্চ শিক্ষার বিধি ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে ন্যস্ত ছিল।[২২৬] তাই সরকার এ শর্তে উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব নেন যে, যেসব কলেজের ভাল ভবন এবং পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে ভবন সংস্কার, শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি যোগান দেয়া হবে।[২২৭]

চট্টগ্রামের প্রথম শ্রেণির অর্থাৎ ডিগ্রি মানের কোন কলেজ ছিল না। লে. গভর্নর হেয়ার ১৯০৬ সালে চট্টগ্রাম সফর করলে সেখানকার স্থানীয় মুসলমানরা তাঁর নিকট প্রথম শ্রেণির কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। মুসলমানরা এর পিছনে যুক্তি দেখায় যে, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ছাত্র সংখ্যা বেড়েই চলছে এবং চট্টগ্রামেই ছাত্র সংখ্যা বেশী। এর ফলে ১৯১০ সালের জুন মাসে চট্টগ্রাম কলেজকে প্রথম স্তরের কলেজে পরিণত করা হয়।[২২৮] আসামের গৌহাটি কলেজেও ১৯০৯-১০ সালে ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়।[২২৯] এছাড়া ঢাকা ও রাজশাহী কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয় এবং কলা ও বিজ্ঞান অনুষঙ্গদের বিভিন্ন বিষয়ে এম.এ. ক্লাস প্রচলন করা হয়।[২৩০] কলেজের পঠিত বিষয়সমূহ ছিল ফার্সি, সংস্কৃত, অংক, পদার্থ, রসায়ন, ইংরেজি, যুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি ও ইতিহাস। পাঠের বিষয় হিসেবে ইতিহাসকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে লে. গভর্নর বলেন যে, ইতিহাস পাঠ সাম্প্রতিক ঘটনাবলি ও দেশের অবস্থা সম্পর্কে ভাল ধারণা নিতে সাহায্য করবে।[২৩১]

---

২২৪ *Progress of Education in India*, 1907 to 1912, *Parliamentary Papers*, 1904, cd. 2181, Vol. 65, p. 51.

২২৫ Here to Victory, 20 February, 1911 (Private and Confidential) *Hardinge Paper*s, Vol. 113-23.

২২৬ Sufi ahmed, *Muslim Community in Bengal* (1884-1912), Dacca, 1974, p. 95-96.

২২৭ M.K.U. Molla, op.cit, p. 162.

২২৮ Ibid. pp. 166.

২২৯ Ibid. pp. 167.

২৩০ *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam*, op.cit, p. 27-28.

২৩১ Chef Secretary, *Government of Eastern Bengal and Assam, to Secretry, Government of India*, Home Department, No, 4836, Shillong, 12 May, 1910. *Eastern Bengal and Assam Education Proceedings*, 1910.

সরকারি কলেজগুলোর পাশাপাশি প্রাইভেট কলেজগুলোকেও উন্নয়নের পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়। সরকার বেসরকারি কলেজগুলোর জন্য ০১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেন।[২৩২] অনুদানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে সরকার দুটি শর্ত বসিয়ে দেন। প্রথমত: প্রতি কলেজে আরবি, ফার্সি, বা উর্দু পড়ানোর জন্য মাসিক কমপক্ষে ৭৫টাকার বিনিময়ে মৌলভী শিক্ষক নিয়োগ করা। দ্বিতীয়ত নির্মাণাধীন হোস্টেলে মুসলিম ছাত্রদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত রাখা।[২৩৩] আমরা এতে ধারণা করতে পারি যে, কলেজগুলোতে অনুদান দেয়ার ফলে মুসলমান ছাত্ররা যাতে উৎসাহিত হয় তার প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন। এ ছাড়া মুসলিম ছাত্রদের আবাসিক সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধানকল্পে সরকার প্রতি কলেজে মুসলিম ছাত্রাবাস স্থাপন করেন।[২৩৪] আবাসিক সমাধান ব্যতীত মুসলিম ছাত্রদের জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়। ১৯১০ সালে ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে মুসলিম ছাত্রদের জন্য ১৫টি বৃত্তি বরাদ্ধ দেয়া হয়।[২৩৫] সরকারি প্রচেষ্টা ও মুসলমানদের উৎসাহের ফলে আলোচ্য সময়ে বাংলার মুসলিম উচ্চ শিক্ষার অনেক অগ্রগতি হয়-

**সারণি-৪**

| বাংলায় মুসলিম উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতি, ১৯০৬-০৭ থেকে ১৯১১-১২[২৩৬] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **সাল** | **অঞ্চল** | **প্রতিষ্ঠানের নাম** | **মোট ছাত্র** | **মুসলিম ছাত্র** | **মুসলিম হার** |
| ১৯০৬-০৭ | পূর্ব বাংলা ও আসাম | আর্টস কলেজ | ১১৯৭ | ৭১ | ৫.৯৩ |
| ১৯১১-১২ | ঐ | ঐ | ২৯৮৯ | ৩৬০ | ১২.০ |
| ১৯০৬-০৭ | পশ্চিম বাংলা | --- | --- | --- | --- |
| ১৯২১-২২ | ঐ | ঐ | ৮২৮৬ | ৪৬৭ | ৫.৬৩ |

উক্ত পরিসংখ্যানে আর্টস কলেজে মুসলমানদের সংখ্যা কম হলেও পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে এর বৃদ্ধির হার লক্ষণীয়। পশ্চিম বাংলায়ও উচ্চ শিক্ষায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের অবস্থা আশানুরূপ বলা যায়। ১৯০৬-০৭ সালে পশ্চিম বাংলায় মুসলিম শিক্ষার বিস্তারিত তথ্য না পাওয়া

---

২৩২ D.P.I, *Eastern Bengal and Assam to Chief Secretary, Government of Eastern Bengal and Assam*, No, 203, Shillong, 4 April, 1907, Eastern Bengal and Assam Education Proceedings, 1907.

২৩৩ M.K.U. Molla, op.cit, p. 176.

২৩৪ *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam*, op.cit, p. 119.

২৩৫ *Report on the Fourth Session of the Provincial Mohamedan Education Conference*, Held at Rangpur, April, 1911, p. 60

২৩৬ *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam*, Vol. II, p. 80; Supplement to the progress of Education in Bengal, 1912-13 to 1916-17 Fifth Quinquennial Reveiw, pp. 70-71

গেলেও জনশিক্ষা পরিচালকের মতে, সেই সময় হতে ১৯১১-১২ সাল পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষায় মুসলিম ছাত্র সংখ্য ও হার বৃদ্ধি পেয়েছে।[২৩৭]

বিশ শতকের সূচনায় বাংলার মুসলিম নারী শিক্ষার অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। এই সময়ে বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) মুসলিম নারী শিক্ষার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নারী শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর বেগম রোকেয়া মাত্র ৫জন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে প্রথম সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। তবে বিভিন্ন সমস্যার কারণে ১৯১০ সালে ভাগলপুর ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন।[২৩৮] অতঃপর ১৯১১ সালে তিনি ব্যারিস্টার আব্দুর রসুলসহ (১৮৭০-১৯১৭) অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবর্গের সহযোগিতায় ওয়ালী উল্লাহ লেনের ছোট বাড়ীতে মাত্র ৮ জন ছাত্রী ও দুইখানা বেঞ্চ নিয়ে পুনরায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল-এর কাজ শুরু করেন। স্কুলের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বেগম রোকেয়া নানা সুবিধা প্রদান করে ছাত্রী সংগ্রহ করেছেন[২৩৯] এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে যোগ্য শিক্ষিকা নিযুক্ত করেন।[২৪০] প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, যানবাহন সমস্যা, এমন কি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকার অভাব থাকা সত্ত্বেও বেগম রোকেয়ার ঐকান্তিক সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে স্কুলের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।[২৪১]

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ব্যতীত ১৯০৯ সালে কলকাতায় সোহরাওয়ার্দী বালিকা বিদ্যালয় নামে আরেকটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এটি বাঙালি মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাতা খুজিস্তা আখতার বানু[২৪২] প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুল উদ্বোধন করে তৎকালীন ভাইসরয় পত্নী লেডি মিন্টো[২৪৩]

আলোচ্য সময়ে বাংলার সরকারও নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বাস্তবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নারী শিক্ষার সমস্যা অনুসন্ধান ও উন্নয়নের সুপারিশ পেশ করার জন্য নতুন প্রদেশের সরকার একটি 'নারী শিক্ষা কমিশন' গঠন করেন। সর্বস্তরে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সংস্কার সাধনের জন্য বৃহৎ পরিকল্পনা হাতে নেয়া ছাড়াও এই কমিটি স্কুলের পরিদর্শন, উন্নত শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার, ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধন, মেয়েদের শিক্ষা অর্জনে উৎসাহী করতে 'লেডিস কমিটি'

---

২৩৭ *progress of Education in Bengal*,op.cit, p. 176

২৩৮ মোশফেকা মাহমুদ, *পত্রে রোকেয়া পরিচিতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৬৫খ্রি.), পৃ. ৩৭

২৩৯ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ* (ঢাকা: ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৫৩৯

২৪০ শামসুন নাহার, *বেগম রোকেয়া জীবনী* (ঢাকা: ১৯৫৮ খ্রি.), পৃ. ৪২-৪৩

২৪১ The Musslaman, Vol, XI, March 23, 1917, No-17, p. 5.

২৪২ তাঁর মা ছিলেন সামাজিক সুসংগঠক বিশিষ্ট উর্দু সাহিত্যিক খুজিস্তা আখতার বানু।

২৪৩ *বাংলা বিশ্বকোষ* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৬খ্রি.), খ.৩, পৃ. ২৬০-২৬১

গঠন এবং জেনানা শিক্ষাপদ্ধতি চালু করার কাজে ব্রতী হয়।[২৪৪] এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আলোচ্য সময়ে বাংলায় মুসলিম নারী শিক্ষার যথেষ্ট অগ্রগতি হয়-

**সারণি-৫**

| পূর্ব বাংলা ও আসামে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় মুসলিম নারী সমাজের অগ্রগতি[২৪৫] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **সাল** | **শিক্ষার স্তর** | **প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা** | **মোট ছাত্রী** | **মুসলিম ছাত্রী** | **মুসলিম হার** |
| ১৯০৬-০৭ | প্রাথমিক | ২৭৮১ | ৫১১৮০ | ২২২২৩ | ৪৩.৪২ |
| ১৯১১-১২ | ঐ | ৪৯৫৬ | ১১০৮১৭ | ৫৬৫৭৫ | ৫১.০৫ |
| ১৯০৬-০৭ | মাধ্যমিক | ১৮ | ১৫০৩ | ৪৮ | ৩.১৯ |
| ১৯২১-২২ | ঐ | ২২ | ২৪৮০ | ১০৮ | ৪.৩৫ |

**সারণি-৬**

সারণীতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় মুসলিম নারীদের অবস্থা, ১৯১১-১২[২৪৬]

| **শিক্ষার স্তর** | **প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা** | **মোট ছাত্রী** | **মুসলিম ছাত্রী** | **মুসলিম হার** |
|---|---|---|---|---|
| প্রাথমিক | ১৮৫৭ | ৪৯০৮৫ | ২০৮৫০ | ৪২.৪৭ |
| ঐ | ৩৪ | ৪১৩১ | ৬৫ | ১.৫৭ |

উক্ত পরিসংখ্যানেও প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলিম নারীদের অগ্রগতি সন্তোষজনক হলেও মাধ্যমিক শিক্ষায় মুসলিম নারীদের অবস্থা মোটেই আশানুরূপ ছিল না। এ ছাড়া আলোচ্য সময়ে কলেজ শিক্ষায় সমগ্র বাংলায় মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র একজন।[২৪৭] পর্দা প্রথা, গোঁড়ামী, বালিকা স্কুল-কলেজের স্বল্পতা, যোগ্য শিক্ষিকার অভাব, যাতায়াত ও আবাসিক সমস্যা, দারিদ্র ইত্যাদি কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় আলোচ্য সময়ে বাংলার মুসলিম নারীগণ অগ্রসর হতে পারেনি।[২৪৮]

---

২৪৪ *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam*, 1907-08 to 1911-12, Vol. 1, p. 92.

২৪৫ Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam, 1907-08 to 1911-12, Vol. II, p. 89.

২৪৬ Supplement to the progress of Education in Bengal, 1912-13 to 1916-17 Fifth Quinquennial Reveiw, pp. 70-71; Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam, 1906-07 to 1911-12, Vol. II, p. 89y.

২৪৭ *Supplement to the progress of Education in Bengal*, 1912-13 to 1916-17 Fifth Quinquennial Reveiw, pp. 71

২৪৮. মো: আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, বাংলায় মুসলিম নারী শিক্ষা, ১৯০৯-১৯৩১, *ইতিহাস অনুসন্ধান*-১৬, পৃ. ৫০৩-৫১০

আমরা লক্ষ্য করেছি, ঊনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার শুরু হয়। ফলে বিশ শতকের প্রথম পাদে তারা এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে এবং বাঙালি মুসলিম সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এঁরাই পরবর্তীকালে এ অঞ্চলের মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানে এগিয়ে আসেন।

**প্রাথমিক শিক্ষা**

ভারতে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য স্যার এডামসের নেতৃত্ব ১৮৩৫, ১৮৩৬ এবং ১৮৩৮ সালে সম্পাদিত ৩টি জরিপ রিপোর্টে দেখা যায়, তৎকালে বাংলা ও বিহারে সাধারণ ও পারিবারিকসহ ১ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতি ৪০০ জন মানুষের জন্য একটি বিদ্যালয় ছিল। দেশীয় বিদ্যালয়গুলো স্থানীয় বিত্তবানদের আর্থিক সহায়তা ও দান-দক্ষিণায় চলত। শিক্ষকরা ৪১০ টাকা পর্যন্ত বেতন পেতেন। এ সব বিদ্যালয়ে উচ্চ শ্রেণির ছাত্ররা নিম্নশ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে সহায়তা করত। এ পদ্ধতি 'মনিটরিয়াল পদ্ধতি' নামে ইংল্যান্ডে খ্যাতি লাভ করে। ড. বেল এই শিক্ষাদান পদ্ধতি ইংল্যান্ডে প্রবর্তন করেছিলেন। দেশীয় এই শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার ও উন্নয়নের মাধ্যমে এ দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তর সম্ভব বলে এডাম বিশ্বাস করতেন। তাই দেশী শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে তিনি কতিপয় সুপারিশও রিপোর্টে উল্লেখ করেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক মাতৃভাষায় রচনা, প্রতি জেলায় একজন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং শিক্ষকদের বসবাসের জন্য জমি প্রদান ইত্যাদি এ সুপারিশগুলোর অন্যতম ছিল। লর্ড মেকলের বিরোধিতার কারণে দেশীয় শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশ আমলে লর্ড ময়রা, লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং লর্ড ডালহৌসি যথাক্রমে ১৮১৫, ১৮৪৪ ও ১৮৫৩ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ সময়ে বাংলাদেশে ১০০টি ভার্নাকুলার বিদ্যালয় এবং কলিকাতায় একটি নর্মাল স্কুল ও তৎসংলগ্ন একটি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। এ সব তৎপরতার মধ্যে এ দেশের শিক্ষার প্রসারকল্পে ১৯৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচ নামে একটি শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই ডেসপ্যাচের সুবাদে ১৮৫৫ সালে ভারতের ৫টি বিভাগে শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিভাগের প্রধান ছিলেন একজন জনশিক্ষা পরিচালক। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত এই ঐতিহ্যবাহী পদটি বাংলাদেশে বিদ্যমান ছিল। উডের এই ডেসপ্যাচ অনুসারে দেশে বহু মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপরে ডেসপ্যাচে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে ১৮৫৭ সালে ঢাকায় ১টি এবং ১৮৬৯ সালে চট্টগ্রামে ১টি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। নর্মাল স্কুলে বিভিন্ন মেয়াদে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হয়।

**মাধ্যমিক শিক্ষা**

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক পড়াশোনা করত। এই সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থী ১৮৫৭ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করত। পরবর্তী সময়ে স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯২১ সালে সর্বপ্রথম "বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন" নামে ঢাকায় একটি শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নবপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা বোর্ড ঐ সময় থেকেই এই অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য ম্যাট্রিকুলেশন (Matriculation) এবং ইন্টারমিডিয়েট (Intermediate) পরীক্ষা গ্রহণ শুরু করে। পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ইংরেজি-২০০, বাংলা-১০০, গণিত-১০০, ইতিহাস-১০০, ভূগোল-১০০ এবং একটি অতিরিক্ত বিষয়-১০০ নম্বরসহ মোট ৭০০ নম্বরে একজন পরীক্ষার্থীকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হতো।[২৪৯]

**উচ্চ শিক্ষা**

এ সময়ে (১৯১৬-১৭ হতে ১৯৪৬-৪৭) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয় এবং সমগ্র একক ও অধিভুক্ত ধরনের ১৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচির অংশবিশেষ। নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসনিক অঙ্গের গণতন্ত্রায়ণ ঘটে। নতুন নতুন অনুষদ, পাঠ্যক্রম ও গবেষণা প্রকল্পগুলি চালু হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়। এর ফলে মহাবিদ্যালয় এবং তালিকাভুক্ত ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ছাত্রদের শারীরিক শিক্ষা এবং চিত্তবিনোদনকারী কর্মকান্ডের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পর্ষদ গঠন এবং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় কার্যকলাপের উন্নয়নের জন্য শিক্ষাঙ্গনে নতুন গতি সংযোজিত হয়।

**হাণ্টার কমিশন ও লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার**

ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তারের জন্য উইলিয়াম হাণ্টারের নেতৃত্বে প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। ভারতীয় ও ইংরেজ মিলে এই কমিশনে ২২ জন সদস্য ছিলেন। ১৮৮৩ সালে কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ-

---

২৪৯ আবুল খায়ের খান চৌধুরী, মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে ক্রমবিকাশ, হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা* (ঢাকা: সূচিপত্র প্রকাশনী, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১১৭-১১৮

১. সরকার কর্তৃক কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিবর্তে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়কে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

২. স্থানীয় প্রশাসনের অধীনে স্কুল বোর্ড গঠন করে প্রাথমিক শিক্ষার সকল দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করতে হবে।

৩. শিক্ষাখাতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় মিটাতে জেলা ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে আলাদা অর্থ ভান্ডার সৃষ্টি করতে হবে। সরকার এ ব্যাপারে সাহায্য করবে।

৪. স্বায়ত্তশাসিত বোর্ডগুলোকে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে তাদের সমগ্র ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশে ব্যয় করতে হবে।

৫. প্রাথমিক শিক্ষা শিখনের সকল ব্যয় সরকারকে বহন করতে হবে। এজন্য প্রতি মহকুমায় মহকুমা পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে একটি করে শিক্ষক শিখন স্কুল থাকবে।

৬. দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে শিক্ষাক্রমে দেশীয় গণিত, হিসাব নিকাশ, জমি জরিপ, সাধারণ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

**লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার**

১৯০১ সালে লর্ড কার্জন শিমলা সম্মেলনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তার উল্লেখযোগ্য কাজগুলো ছিল:

- প্রাথমিক শিক্ষার খরচের এক তৃতীয়াংশের পরিবর্তে সরকারের অর্ধাংশ ব্যয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান।
- শহর ও গ্রামাঞ্চলের জন্য আলাদা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন।
- ফলভিত্তিক সরকারী অনুদান বিলোপ করে স্কুলভিত্তিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয়গুলোকে এককালীন ও পৌনপুনিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করা।

শিক্ষা সম্প্রসারণ বিষয়ক এক জরিপ রিপোর্টে দেখা যায় ১৯০১-১৯০২ সাল পর্যন্ত সময়ে ভারতে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৮৩০০০। আবার ১৯১১-১৯১২ সাল পর্যন্ত সে সংখ্যা ১,১৮,০০০ এরও বেশি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থায় ৪০ বছর ব্যাপী একটি পরিকল্পনা জন সার্জেন্টের নেতৃত্বে রচিত হয়। এতে ছয় বছরের কম বয়সী শিশুদের নার্সারী স্কুল এবং ৬-১৪ বয়সীদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ ছিল। কিন্তু এই রিপোর্ট বাস্তবায়নের পূর্বেই ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভেঙ্গে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

**পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা**

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত বৃটিশ শাসনের কবল থেকে স্বাধীন হয়ে আলাদা রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। তখন পাকিস্তান সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের জন্য সত্যিকার অর্থে একটি আদর্শ ইসলামি প্রজাতন্ত্র তৈরি করা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) মুসলমানরা আশান্বিত হয়। মুসলমানরা প্রত্যাশা করেছিল নতুন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতিতে তাদের হারানো ঐতিহ্য ও শৌর্য ফিরে আসবে। আর এ লক্ষ্যে বহু শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তুপরিতাপের বিষয় দীর্ঘ ২৫ বছর পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। তারা এদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়।

ফলে দেশের নাম ও শাসক পরিবর্তন হলেও এদেশের পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতিসহ প্রায় সব কিছুতেই বৃটিশ শিক্ষাব্যবস্থার একটি ছাপ থেকে গিয়েছিল। পাকিস্তান শাসনামলে শিক্ষাব্যবস্থার কোন সংস্কারই জাতীর আশা আকাঙ্ক্ষা ও ঐতিহ্যের পরিপূরক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি।

**পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক শিক্ষা**

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের ফলে ভারত ও পাকিস্তান এ দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ড তখন পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে জাতীয় প্রয়োজনে পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠন তখন একান্তভাবে প্রয়োজন হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করাচিতে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাবিদদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে কতিপয় মৌলিক বিষয় ছাড়া প্রাদেশিক সরকারকে শিক্ষা বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই সম্মেলনে স্পষ্ট করে বলা হয়-ইসলামের প্রদর্শিত আদর্শের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিৎ।"[২৫০]

২৫০ *Proceedings of the Pakistan Education Conference* held at Karachi from 27 November to 1st December 1947, Education Division, Government of Pakistan, p.29.

**মাধ্যমিক শিক্ষা**

দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা শহর ছাড়া বাংলায় মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি শিক্ষা বিভাগের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব বাংলায় স্কুল কলেজের উপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ রহিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র আবাসিক ও শিক্ষামূলক বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় এর অধিভুক্তিকরণের ক্ষমতা ছিল না। তাই সরকার "পূর্ববঙ্গ শিক্ষা অধ্যাদেশ, ১৯৪৭" নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করে।[২৫১] এই অধ্যাদেশ বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধিভুক্তিকরণের ক্ষমতা লাভ করে। এই অধ্যাদেশের দ্বারা ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেন্ডারি শিক্ষা বোর্ডের স্থলে পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হয়। এই বোর্ডের উপর মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রেডের বহু কলেজ, টেকনিক্যাল ও পেশাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ১৩০০ স্কুল পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের আওতায় আসে।[২৫২] দেশ বিভাগের পরবর্তী তিন বছর, অর্থাৎ ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষায় ব্রিটিশ আমলের শিক্ষাক্রমই অনুসরণ করা হয়। এই সময় বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরীক্ষার নাম পরিবর্তন করে ম্যাট্রিকুলেশন (Matriculation Examination) করা হয় এবং একই বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষাক্রমে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। বাংলা ১০০ নম্বরের স্থলে ২০০ নম্বরের দুই পত্র করা হয় এবং ধর্মীয় ভাষা হিসেবে ১০০ নম্বরের একটি নতুন বিষয় আবশ্যিক বিষয় হিসেবে এই শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে এই কোর্সে বিষয়ের সংখ্যা ৭টি এবং পূর্ণমান ৯০০ করা হয়।[২৫৩]

**উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল**

এ সময় নবম ও দশম এই দুটি শ্রেণি শিক্ষার্থীদের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হতো। অন্যদিকে ৭ম ও ৮ম শ্রেণির উদ্দেশ ছিল উচ্চ শ্রেণির জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাধারণত ১০টি শ্রেণি ছিল। নিম্নের স্তরটি মিডল ও প্রাথমিক শিক্ষার এবং উপরের স্তরটি উচ্চ মাধ্যমিক ছিল। প্রাদেশিক সরকার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তিনটি মাধ্যমে, যথা কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা (Executive Officers), শিক্ষা বিভাগ (Education Board) এবং পূর্ব বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (East Bengal Secondary Education Board)। উচ্চ বিদ্যালয়ের অনুদান দেওয়া এবং না দেওয়ার ক্ষমতা ছিল পূর্ব বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের। এছাড়াও ৯ম ও ১০ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ, পাঠ্যসূচি নির্বাচন এবং প্রবেশিকা

---

২৫১ *East Bengal Education Ordinance,* Ordinance no. 1, 1947.

২৫২ *Report on Public Instruction* in East Bengal for the Period from August 15, 1947 to March 31, 1948, pp. 20-22.

২৫৩ আবুল খায়ের খান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯

পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করত পূর্ব বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। ১ম থেকে ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণে পাঠ্যপুস্তক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষা বিভাগ নির্দেশ দিত। শিক্ষা বিভাগ উচ্চ বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন, গ্রান্ট-ইন-এইড ছাড়াও ছাত্রদের ভর্তি এবং বদলি, বিনা বেতনে অধ্যয়নের অনুমতি প্রদান করত। বালকদের উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করত বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক। তবে জেলা পরিদর্শককেও মাঝে মাঝে উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিদর্শনের ক্ষমতা প্রদান করা হত। বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম চালু ছিল। পূর্ব বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সরকারি পরিদর্শকের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বিদ্যালয় অধিভুক্তকরণ ও অনুমোদন দান করত।[২৫৪]

**মাদ্‌রাসা শিক্ষা**

পাকিস্তান আমলে ইংরেজদের রেখে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হলেও এ ভূখণ্ডের জনগণের চাহিদা মোতাবেক উন্নতি সাধিত হয়নি। তবে প্রাচীনকাল হতেই হতেই সরকারি ব্যবস্থাপনার বাইরে ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেসব প্রতিষ্ঠান এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাট অবদান রাখতে শুরু করে। দিল্লি, দেওবন্দ, সাহারানপুর, লক্ষ্মৌ, রামপুর, মুরাদাবাদ, আলীগড়, লায়লপুর, করাচি ইত্যাদি এলাকায় বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২৫৫] এসব মাদরাসাই পরবর্তীকালে কওমি বা দরসে নিজামি মাদরাসা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এসব মাদরাসায় কুরআন, হাদীস, ফিকহ, আকাইদ, ফারায়িজ, ফালসাফা, হিকমত, আরবি ব্যাকরণ, তাসাউফ, আরবি সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস, মুনাযারা, ইলমে কালাম, উর্দু, ফারসি ইত্যাদি পড়ানো হতো।

**সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসা**

অপর দিকে ১৭৮০ খ্রি. কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এদেশে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক মাদরাসা শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। যে মাদরাসাটি ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন। পাকিস্তান আমলে এসে এ মাদরাসাটি নিয়মতান্ত্রিক মাদরাসা শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভারতবর্ষে এটাই ছিল সর্বপ্রথম সরকারি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মুসলিম আমলে কোনো সরকারি মাদ্‌রাসা ছিল না। তখন ইসলামী শিক্ষা গড়ে উঠেছিল মসজিদ-মক্তবকে কেন্দ্র করে। আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার আগে আমির ও ধনীদের দানে ছোটবড় ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয়, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নিজস্ব

---

২৫৪ *Report on Public Instruction in East Bengal* for the year 1948-1949, p.12

২৫৫ মাওলানা মুশতাক আহমদ, *তাহরীকে দেওবন্দ* (ঢাকা: ১৯৯২খ্রি.), পৃ. ৩৬-৪০।

তহবিল থেকে মাদ্‌রাসাসমূহের ব্যয় নির্বাহ করা হতো।[২৫৬] আর এই মাদরাসাকে অনুসরণ করে পূর্ব পাকিস্তানে মাদরাসা শিক্ষার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠে। আজও বাংলাদেশের আনাচে কানাচে যে সকল মাদ্‌রাসা রয়েছে সেগুলো এ প্রক্রিয়ারই মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ।

**ওল্ড ও নিউ স্ক্রিম মাদ্‌রাসা**

১৯১৪ খ্রি. 'মাদরাসা সংস্কার পরিকল্পনা' নামে একটি পরিকল্পনা (Reformed madrasha scheme) গ্রহণ করা হয়।[২৫৭] ১৯২১ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর এখানকার পাঠ্য বিভাগে একটি বিভাগ 'ইসলামি শিক্ষা' (Department of Islamic Studies) নামে চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই বিভাগে ছাত্র-ছাত্রী যোগান দেওয়ার জন্য 'ফিডার প্রতিষ্ঠান' হিসেবে তার পাঠ্যক্রমের সঙ্গে মাদরাসা সমূহের পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী তদানীন্তন হাইস্কুল ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমপর্যায়ভুক্ত করে 'হাই মাদরাসা ও জুনিয়র মাদরাসা' নামে নতুন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়। এসব মাদরাসাই 'নিউ স্ক্রীম মাদরাসা' (New Scheme Madrasha) নামে অভিহিত হয়। অপর দিকে কলিকাতা আলীয়া মাদরাসার আদলে পূর্ব থেকে প্রচলিত মাদরাসাগুলো নতুন সংস্কারকৃত পাঠ্যক্রম অনুসরণ না করে পূর্ববর্তী পাঠ্যক্রম ও নিয়মে থেকে যায়। এ মাদরাসাগুলো 'ওল্ড স্কিম মাদরাসা' (Old Scheme Madrasha) নামে অভিহিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৯ খ্রি. 'আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশনের' আলোকে 'নিউ স্কীম মাদরাসা'গুলো উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হয়ে হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়। আর ওল্ড স্কিম মাদরাসাগুলো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সহকারে আজও আলিয়া মাদরাসার শিক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে চালু আছে।[২৫৮]

**উচ্চ শিক্ষা**

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের পূর্ব খন্ডে (পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান) যে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যাত্রা শুরু, উনিশ শতকে তার গোড়াপত্তন ঘটে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত সকল কলেজে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত পাঠ্যক্রম অনুসৃত হয়েছে, ছাত্ররা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমানায় যে একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় পড়েছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তার কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল ঢাকা পৌরসভার সীমানার মধ্যে। এর বাইরে সারা দেশের সম্পূর্ণ উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাই যুক্ত ছিল যে বৃহত্তর ব্যবস্থার সঙ্গে, তার শীর্ষ অবস্থানে ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

---

২৫৬ আবদুস সাত্তার, *তারীখ-এ-মাদ্রাসা-এ-আলীয়া* (ঢাকা: ১৯৫৯খ্রি.), পৃ. ৫২।

২৫৭ Dr. Sekender Ali Ibrahimi, *Report on Islamic education and Madrasha education in Bengal*, I. F. B. Dhaka 1987, Vol. IV P. 32-37.

২৫৮ Ibid, p. 32-37.

দেশ বিভাগের কারণে এই অধিভুক্তির দায়িত্ব পালনকারীর ব্যাপক ভূমিকা বর্তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। ঢাকার সমস্যা ছিল অনেক। জন্ম থেকেই ঢাকা একটি এককেন্দ্রিক (Unitary) ও শিক্ষাপ্রদায়ী (Teaching) বিশ্ববিদ্যালয় পরিচয় নিয়ে চলেছে। এর দূরবর্তী মডেল ছিল অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ। এর আবাসিক হলগুলি ছিল অক্সফোর্ড-ক্যাম্ব্রিজের কলেজের অনুকৃতি। এর ৩ বছরব্যাপী অনার্স কোর্সও ওই দুটি মডেল থেকে ধার করা। এর টিউটোরিয়াল ব্যবস্থাও ছিল ওদের প্রচলিত টিউটোরিয়ালের ছকে তৈরি। সংক্ষেপে, শিক্ষাগত ও কাঠামোগত, উভয়তেই, অর্ধশতাধিক বছর পূর্বেকার লন্ডনের মডেলে গঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকার পার্থক্য ছিল স্পষ্ট। এখন ঢাকার সমস্যা হলো দুটি ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা। বাস্তব বিবেচনায় কলেজগুলিকে তাদের পূর্ব প্রচলিত কোর্স নিয়ে চলতে দেওয়া ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আর কোন বিকল্পপন্থা ছিল না। কলেজে বজায় রইল ২ বছর মেয়াদী পাস ও অনার্স কোর্স। বিশ্ববিদ্যালয়ে বহাল রইল ৩ বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদেশের দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৫৪ সালে, রাজশাহী শহরে; তৃতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫ সালে, চট্টগ্রামে, শহর থেকে কিছুটা দূরে। উভয় বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার দৃষ্টান্তে ৩ বছরের অনার্স ও ১ বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স গ্রহণ করে। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ই কলকাতার ২ বছরের অনার্সকে ৩ বছরে উন্নীত করে অন্তত অনার্স ধারাকে এক জায়গায় মিলাতে সচেষ্ট হয়। এর ফলে দারুণ চাপ পড়ে সেই কলেজগুলির ওপর, যারা দীর্ঘকাল কলকাতার অধীনে ও পরবর্তী সময়ে কিছুকাল ঢাকার অধীনে ২ বছরের অনার্স কোর্স চালু রেখেছিল। এই চাপের কারণে কোন কোন কলেজ অনার্স কোর্স বন্ধ করে দেয়, যারা চালু রাখে তারা বেসামাল হয়ে পড়ে, তবে হাল ছাড়ে না।

রাজশাহী ও চট্টগ্রামের নতুন বিশ্ববিদ্যালয় দুটি সাংগঠনিকভাবে প্রধানত ঢাকার অনুগামী হয়। ঢাকা এতদিনে পূর্ব চরিত্র হারিয়ে পরিণত হয়েছে মিশ্রচরিত্রের প্রতিষ্ঠান, একাধারে শিক্ষাপ্রদায়ী ও অধিভুক্তির দায়িত্ব পালনকারী বিশ্বদিল্যালয়ে। একই মিশ্রচরিত্র নিয়ে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম ঢাকার সঙ্গে যুক্ত হয়। এ ছাড়াও, দুটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব বিস্তৃত ক্যাম্পাস গঠনের গুরু দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে চলে। ক্যাম্পাসে থাকবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসিক হল, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক বৃহদংশের জন্য আবাসন ব্যবস্থা। ঢাকাকে এই জন্মযন্ত্রণা সইতে হয় নি, যেহেতু একটা তৈরি ক্যাম্পাস নিয়েই তার যাত্রা শুরু হয়েছিল। এ সৌভাগ্য অন্যদের হয় নি। তাদের শুরু করতে হয়েছে শূন্য থেকে।

পাকিস্তান পর্বের (১৯৪৭-৭০) শেষ দিকে প্রদেশে আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রাশুরু করে: ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬১) ও ঢাকায় ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনলজি (১৯৬২)। দ্বিতীয়টি একেবারে নতুন নয়, পূর্বতন আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উন্নীত রূপ। পাকিস্তান পর্বের এই বছরগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাভিত্তিক কলেজসমূহের সমন্বয়ে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। এই বিকাশ ছিল যতোটা রৈখিক (Linear) ততোটা উল্লম্ব (Vertical) নয়।

আইয়ুব শাসনের দশকে দুটি কমিশন, কমিশন অন ন্যাশনাল এডুকেশন (১৯৫৯) ও কমিশন অন স্টুডেন্ট প্রবলেম্‌স অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার (১৯৬৪-৬৬), বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সচেতনতার সাক্ষর রেখেছিল। প্রথমটা ছিল সামরিক শাসন-সুলভ সংস্কার চিন্তাভাবনা উৎসাহের ফলশ্রুতি। শরীফ কমিশন (CNE-র সমধিক প্রচলিত নাম) রিপোর্টে উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত অধ্যায়টি ছিল দীর্ঘতম, ৪৬ পৃষ্ঠা। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ছিল ৩৬ পৃষ্ঠা। আর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মাত্র ছয় পৃষ্ঠা। এই ভারসাম্যহীনতা অর্থবহ।

পূর্ব পাকিস্তানে বহুলভাবে নিন্দিত হলেও কমিশন উচ্চ শিক্ষার এই বিষয়গুলির উপর কিছু প্রণিধানযোগ্য কথা বলেছে; যা ইন্টারমিডিয়েটের ঝামেলামুক্ত; ডিগ্রি পাস ও অনার্সের মেয়াদ ৩ বছরে বর্ধিতকরণ; ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ও সে উদ্দেশ্যে প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব মডার্ন ল্যাংগুয়েজস গঠন; পরীক্ষা ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন; গবেষণা; শিক্ষকের কাজ ও শিক্ষক নির্বাচন নিয়োগ ও পদোন্নয়ন; ছাত্র কল্যাণ ও শৃংখলা; বিশ্ববিদ্যালয় উপযোগী প্রশাসনিক কাঠামো। এরই পরিণতি হিসেবে আসে ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্সসমূহ (১৯৬১) ও ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে গঠিতব্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পূর্ব পূর্বাভাস।

CNE রিপোর্টটি সুলিখিত। এর একটা ত্রুটি, ঢালাও মন্তব্যের প্রবণতা, মন্তব্যের সমর্থনে তথ্য উপাত্ত পরিবেশনে ব্যর্থতা। এটি প্রকাশের পর এর বেশ কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল: (i) ডিগ্রি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট অংশ বিচ্ছিন্ন করা এবং পূর্ব পাকিস্তানে প্রক্রিয়াটি শুরু হয় সরকারি কলেজ দিয়ে; (ii) ৩ বছর মেয়াদী পাস কোর্স প্রবর্তিত হয়, যার মধ্যে ভাষা শিক্ষা গুরুত্ব পায়; (iii) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয় আইন রদ করে সেস্থলে নতুন অর্ডিন্যান্স প্রবর্তিত হয় (১৯৬১)।

বেশ কিছু সুপারিশ ছিল ব্যাপক সংস্কারমুখী ও বিতর্কিত। কিন্তু কৌশলে, সরকারি নির্দেশে ও গোপন সার্কুলারে তর্ক-বিতর্কের দ্বার রুদ্ধ করা হয়। পাবলিক ডিবেট-এর কোন সুযোগ থাকে না।

রিপোর্টের মূল সুর ছিল অতিমাত্রায় নির্দেশনাপূর্ণ। এ ছাড়া ৩ বছর মেয়াদী পাস কোর্স নিয়ে তীব্র সমালোচনার ঝড় ওঠে, শিক্ষাঙ্গনে ও বাইরে সরকারের প্রতি বিরূপতার দ্রুত বিস্তার ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানে ইতোমধ্যেই যে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল তা অগ্নিশিখায় পরিণত হয়। ফলে, উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় কমিশন গঠিত হলো। সভাপতি বিচারপতি হামুদুর রহমান, যিনি ইতোপূর্বে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদাভিষিক্ত ছিলেন। অন্য ৩ জন সদস্য সকলেই ছিলেন সাংবিধানিক পদাধিকারী। শিক্ষাবিদ কেউ নন। তবে যখন কাজী আনওয়ারুল হক ভিন্ন দায়িত্বে চলে গেলেন তখন তাঁর শূন্য আসনে যোগ দিলেন ড. মমতাজ উদ্দীন আহমেদ। চার সদস্যের কমিশনে একমাত্র শিক্ষাবিদ।

ছাত্র অন্তোষে কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করছিল এবং দিনে দিনে ক্যাম্পাসসমূহ প্রচণ্ড বিক্ষোভের রূপ গ্রহণ করছিল। এর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে কমিশন নজর দিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিষয়ক বৃহত্তর প্রসঙ্গের প্রতি। এই কাজ করতে গিয়ে কমিশনের মনে হলো, পূর্ববর্তী কমিশনের কোন কোন সুপারিশ সবিশেষ আদেশাত্মক, যা যুক্তিসিদ্ধ নয়। ছাত্রদের অভিযোগ ছাড়াও শিক্ষকদের অভিযোগও বিবেচনায় আনে কমিশন। পূর্ববর্তী কমিশন যে সুনির্দিষ্ট কাজের সময় বেঁধে দিয়েছিল, তার প্রয়োজনীয়তা দেখা গেল না। একই সময়ে শৃংখলা বিষয়ক নীতিমালার সমর্থন করা হলো এই বিবেচনায় যে, এর মধ্যেই আছে শিক্ষকদের চাকরির নিরাপত্তা। এতে অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয় না এবং শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদারও হানি হয় না।

কমিশনের কার্যকালে, সেপ্টেম্বর ১৯৬৫-তে, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষটি মাত্র ১৭ দিন স্থায়ী হলেও এর ফলে রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল কেঁপে ওঠে। তাসখন্দ চুক্তি সাক্ষর ও যুদ্ধবিরতির পর সারা দেশে এক রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের দুই খন্ডেই ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। এতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের পতন ত্বরান্বিত হয়। ফলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা করায়ত্ত হয় জেনারেল ইয়াহিয়ার ও কিছুদিনের জন্য ফিরে আসে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। একজন এক ভোট, এই ভিত্তিতে দেশ যখন অপেক্ষা করছে সাধারণ নির্বাচনের জন্য, তখনই এয়ার ভাইস-মার্শাল নূর খানকে দেয়া হলো একটি নতুন শিক্ষা নীতি প্রণয়নের দায়িত্ব। নয়া শিক্ষানীতি (The New Educational Policy, 1969) ছিল সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট, ইতিবাচক চিন্তায় সমৃদ্ধ ও এর মধ্যেই ছিল একটি সংস্কারমূলক বিশ্ববিদ্যালয় আইনের রূপরেখা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষকদের পূর্ণ অংশগ্রহণ, সিনেটের পুনর্বাসন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠন-এ সবই ঠাঁই পেল NEP-র সুপারিশ মালায়। রিপোর্টটি মূল্যবান এ জন্য যে, এর সুর ইতিবাচক এবং এর মধ্যেই ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পূর্বাভাস রয়েছে।

১৯৫১ সালে মাওলানা আকরাম খানের নেতৃত্বে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে। ১৯৫২ সালে কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে যে সকল সুপারিশ করেন, তার মধ্যে নিম্নবর্ণিতগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আকরাম খান কমিটির সুপারিশ-

১. প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন মহুকুমা পর্যায়ে বিন্যাস করা হোক, প্রতি মহুকুমায় একজন মহুহকুমা/শিক্ষা অফিসার নিয়োগ করা হোক।

২. প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হোক।

৩. প্রতিটি থানায় সাব ইন্সপেক্টর অব স্কুলস এর পরিবর্তে এটেনডেন্স অফিসার নিয়োগ করা হোক।

৪. প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হোক।

৫. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ করা হোক।

৬. প্রাথমিক শিক্ষকদের যোগ্যতা ন্যূনতম প্রবেশিকা পাশ সহ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।

৭. শিক্ষক প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২ বছর হবে এবং প্রশিক্ষণ কোর্সে তাত্ত্বিক বিষয় অপেক্ষা ব্যবহারিক কাজের ওপর বেশি জোর দিতে হবে।

৮. স্কুল ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

পরবর্তীতে আকরাম খান কমিশনের বেশ কিছু সুপারিশ পরবর্তী সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৯৫২ সালের পর অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ১০ বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রতি বছর গ্রামাঞ্চলে ২৫০০টি করে ১০ বছরে ২৫০০০ প্রাথমিক বদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হয়। ১৯৫২ সালেই পূর্বপাকিস্তানে ৫০৫৮টি অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হয়। আবার ১৯৫২ সালেই সারা দেশে ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম চালু করা হয়। আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন ১৯৫৪ সালে জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষার উন্নয়নে আর একটি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন পূর্বপাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন '৫১' এর ওপর বিশেষ জোর দেয়। এই কমিশন ৬-১৫ বছর বয়সী ছেলে- মেয়েদের ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করে। স্কুলের শ্রেণি ও সেকশন অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করে। শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে বেতন প্রদান এবং প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১ বছরের স্থলে ২ বছরের প্রস্তাব করা হয়।

এদিকে প্রাদেশিক সরকার এক অর্ডিনান্স বলে ১৯৫৯ সালের ১৮ আগস্ট বাধ্যতামূলক বিদ্যালয়গুলোকে মডেল স্কুলে পরিণত করেন। এ সময়ে সাব-ইন্সপেক্টার অব স্কুলের পরিবর্তে সার্কেল এডুকেশন অফিসার এর পদ সৃষ্টি করা হয়।

## শিক্ষা বিস্তারে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট বৃটিশ অপশাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে করাচীতে একটি শিক্ষা অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। এতে দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদগণ অংশগ্রহণ করেন। এ অধিবেশনে ইংরেজদের প্রবর্তিত ত্রুটিপূর্ণ ও ভারসাম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সংগতি রেখে একটি সময়োপযোগী আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এ সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল:

১. প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। অর্থের সংকুলান হলে পর্যায়ক্রমে আট বছর করা হবে।

২. শিক্ষার মাধ্যম কি হবে তা নির্ধারণ করবে প্রাদেশিক সরকার।

৩. মুসলমান ছেলে মেয়েদের জন্য ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৪. অমুসলিম ছেলে মেয়েদের জন্য তাদের চাহিদা অনুসারে ধর্মশিক্ষা চালু করতে।

৫. মাদ্‌রাসাগুলোকে সংস্কারপূর্বক প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার গতিধারায় চালু করতে হবে।[২৫৯]

## শিক্ষাক্রম

১৯৫২ সালে একটি সংশোধিত পাঁচ বছরের কোর্স সম্বলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম চালু করা হয়। সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন সংশোধিত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি চালু করা হয়। উক্ত শিক্ষাক্রমে অর্ন্তভুক্ত বিষয়গুলো হলো:

১. মাতৃভাষা
২. গণিত
৩. সমাজপাঠ (ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরনীতি)
৪. প্রাথমিক বিজ্ঞান
৫. কলা ও হস্তশিল্প
৬. শরীর বিদ্যা
৭. খেলাধুলা ও সংগীত
৮. ধর্মশিক্ষা
৯. উর্দু (চতুর্থ শ্রেণি হতে)।[২৬০]

---

২৫৯ মোহাম্মদ ইলিয়াছ আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

২৬০ Proposal for a New Education Policy, Ministry of Education and Scientific Research, Islamabad, July 1969, p. 11. .

**শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য**

স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১৯৪৭-৪৮ পর্যন্ত শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান এগিয়ে ছিল। কিন্তু ১৭ বৎসরে অবাস্তব, অযৌক্তিক শিক্ষানীতির ফলে শিক্ষার মান নিচে নেমে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানে সকল স্তরে শিক্ষার অগ্রগতির চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অগ্রগতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। এই জন্য মূলত: সরকারের একপক্ষীয় নীতিই দায়ি ছিল। ১৯৬৫-৬৬ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২১৪৬৯০০০ জন অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা ১৭ লাখের বেশি। পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশিকা পাশের সংখা ৪৭১৭৫ জন অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা ৪৮১৮১১ জন। পূর্ব পাকিস্তানে উচ্চ মাধ্যমিকের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়ে ৫২৭৯৩ জনে দাঁড়ায় অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯০,২৩৩৭১ জন। পূর্ব পাকিস্তানে গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা কমে ৩২.৩% এবং গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮,০৭০ জন। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে ১০ বছর পূর্বে এই সংখ্যা ছিল ৪১৪৮০ জন। পশ্চিম পাকিস্তানে গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ২১.৩% এবং গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা ৫৪ হাজার। ১০ বৎসর পূর্বে এই সংখ্যা ছিল ৪৪ হাজার। পূর্ব পাকিস্তানে স্নাতকোত্তরের সংখ্যা কমেছে ১২% এবং বর্তমানে এই সংখ্যা ৭১৪৬ জন। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮.৬% প্রতিবছর এবং বর্তমানে এর সংখ্যা ২৪৩২৪ জন। পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চতর স্তরে নারী শিক্ষাও পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় সাতগুণ বৃদ্ধি পায়। পূর্ব পাকিস্তানে গ্র্যাজুয়েট ও পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট নারীদের সংখ্যা যথাক্রমে ১২১৭৬ ও ৩৪ জন অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা ছিল ৭০৫৫ জন এবং ২৭৪৯ জন।[২৬১]

১৯৬৯ সালে নূর খান কমিশন তথা নতুন শিক্ষা নীতির জন্য প্রস্তাবনায় কলেজের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় উভয় পাকিস্তানে সাধারণ শিক্ষায় কলেজের সংখ্যা মোট ৫০০টি, যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ২২৫টি ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রি কলেজসহ। পূর্ব-পাকিস্তানে বেসরকারি কলেজের সংখ্যা ৯০ ভাগ অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ৫০:৫০ ভাগ। ১৯৬৮ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা ৭টি ও ডিগ্রি কলেজের সংখ্যা ১৪টি। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় উচ্চ শিক্ষায় পূর্ব পাকিস্তান কতটা উপেক্ষিত ছিল। বলা যায় পূর্ব পাকিস্তানে উচ্চ শিক্ষায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার কোন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেনি উপরন্ত শিক্ষাকে সংকোচনের চেষ্টা করা হয়েছে।

---

২৬১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

উচ্চশিক্ষায় ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত উভয় পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১০টি। পূর্ব পাকিস্তানে ৪টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৬টি। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয় তার মধ্যে দু'টি পূর্ব পাকিস্তানে ও ১টি পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানের একটি জাহাঙ্গীরনগরে ও অন্যটি চট্টগ্রামে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ইসলামাবাদে। জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ (১৯৫৯) বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২টি কারিগরি ও ২টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ সালে যথা- লাহোরের পশ্চিম পাকিস্তান কারিগরি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, লায়ালপুরে পশ্চিম পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান কারিগরি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ময়মনসিংহে পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর (১৯৪৭) শিক্ষা ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) কাঠামোর প্রাদেশিক বিষয়। পূর্ব পাকিস্তান সরকার আইনগতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নতুন শিক্ষানীতি রচনার অধিকারী ছিল। কিন্তু নতুন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক লক্ষ্য কি হবে এই নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে গুরুতর মত পার্থক্য থাকায় কোন নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ দেখা যায়নি। ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত করাচিতে শিক্ষা সম্মেলনে উপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করে জাতীয় স্বার্থে একটি গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন সুপারিশ করা হয়নি বা শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক কোন পরিবর্তনের কথা বলা হয়নি। এই সম্মেলনে পাকিস্তানে একটি ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার বেশ কয়েকটি কমিটি ও কমিশন গঠন করলেও কমিশনের সুপারিশসমূহ অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি। কমিশনের সুপারিশসমূহে সমাজের চাহিদা ও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে দূরদর্শী কোন শিক্ষানীতি প্রণনের কথা বলা হয়নি। তবে কমিশনের সব সুপারিশ যে দূরভিসন্ধিমূলক ছিল তা নয়, যেমন তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রি কোর্স পশ্চিম পাকিস্তানে গৃহীত হলেও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের চাপে তা বাতিল করতে সরকার বাধ্য হয়। পূর্ব পাকিস্তানে এই প্রস্তাবটিকে শিক্ষা সংকোচনের সরকারি চক্রান্ত হিসেবে দেখা হয়েছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশে তিন বৎসরের ডিগ্রির কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। যেহেতু সরকারের প্রতি জনগণের জনসমর্থন ও আস্থা ছিল না তাই অনেক খারাপ কাজের মাঝে কিছু ভাল কাজ থাকলেও জনগণ তা বিশ্বাস করতে পারেনি। ১৯৪৭ সালের সম্মেলনে সর্বজনীন ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হলেও কমিশনসমূহের

সুপারিশে এটি দ্রুত বাস্তবায়নের জোর তাগিদ দেওয়া হয়নি আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণ দেখিয়ে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৭০ সালে ৭ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সপ্তাহে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে আয়োজিত আলোচনা সভায়। এই সভায় সভাপতির ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন ডি.পি.আই আব্দুল হাকিম সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বলেন যে, ১৯৩০ সালের বেঙ্গল রুরাল প্রাইমারি এডুকেশন এ্যাক্টে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও তা বিভিন্ন কারণে বাস্তবায়ন হয়নি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০ ভাগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৩০০ ভাগ। আর্থিক সমস্যার কারণ দেখিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে অনেক স্কুল বন্ধ করা হয়, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বহুগুণ। পূর্ব-পাকিস্তানে প্রথম শ্রেণির ১০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৪৮ জন ও পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মাত্র ১৫ জন পৌঁছায় অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পৌঁছায় শতকরা ৩৮ জন। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি বরাদ্দ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক গুণ বেশি। যেমন ১৯৫৮-৫৯ সালে (১৫ মাস) শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ ছিল ২৫৩ মিলিয়ন রুপি যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ১৬ মিলিয়ন রুপি। ১৯৬২-৬৩ সময়ে সরকারি বরাদ্দ ছিল ৫৬০ মিলিয়ন রূপি যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ১৩৮ মিলিয়ন রুপি। ১৯৬৩-৬৪ সালে ৬৫০ মিলিয়ন রুপি ব্যয়ের আীধকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে বহুমাত্রিক কোর্স যেমন-পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের ৫০০টি কলেজের মাধ্য অধিক জনসংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানে ২২৫টি ও পশ্চিম পাকিস্তানে ২৭৫টি। ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি পূর্ব পাকিস্তানে এবং ৭টি পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## বাংলায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ

# দ্বিতীয় অধ্যায়
# বাংলায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ

শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ এবং সমাজের জন্য তাকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করা। প্রতিটি সমাজেই যুগ ও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষাদর্শন ও তার প্রয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। ভারতীয় উপমহাদেশে, বিশেষত বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ একটি দীর্ঘ, জটিল এবং বৈচিত্র্যময় ইতিহাস বহন করে।

প্রাচীনকাল থেকে গুরুকুল বা টোল ভিত্তিক যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তা ছিল মূলত ধর্মকেন্দ্রিক এবং ঐতিহ্যবাহী। মধ্যযুগে মক্তব-মাদ্রাসা এই ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু, আধুনিক অর্থে বাংলা ভাষায় নূতন শিক্ষাচিন্তার সূত্রপাত হয় মূলত উনিশ শতকে। এই সময়েই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং দর্শন সমন্বয়ের এক অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা শুরু হয়।

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া, এবং শিক্ষাকে কুসংস্কারমুক্ত করে বিজ্ঞানমনস্ক করার প্রয়াস ছিল সেই সময়ের শিক্ষাচিন্তার মূল ভিত্তি। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম,  বেগম রোকেয়া-এর মতো চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদরা এই ধারাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁরা শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেননি, বরং শিক্ষণ পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে গভীর ভাবনা প্রকাশ করেছেন।

ফলস্বরূপ, শিক্ষাচিন্তার এই ক্রমবিকাশের পথ ধরেই বাংলা ভাষা কেবল একটি সাহিত্য ও যোগাযোগের ভাষা না হয়ে জ্ঞান বিতরণের মূল বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই প্রবন্ধে এই ঐতিহাসিক পটভূমি এবং বিভিন্ন যুগে শিক্ষাবিদদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান নিয়ে আলোচনা করা হবে।

**শিক্ষার পরিচয়**

শিক্ষা হলো মানব জীবনের এক মৌলিক ভিত্তি এবং সমাজের সার্বিক উন্নতির চাবিকাঠি। এটি কেবল নির্দিষ্ট জ্ঞান বা তথ্য অর্জন করার প্রক্রিয়া নয়, বরং ব্যক্তির সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন ও জীবনব্যাপী অনুশীলনের এক নিরন্তর যাত্রা।

সাধারণভাবে, শিক্ষা বলতে বোঝায় কোনো কিছু জানা বা বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা। তবে এর ব্যাপক অর্থে, শিক্ষা হলো একটি পদ্ধতিগত ও জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া যা একটি ব্যক্তিকে তার ভেতরের সুপ্ত গুণাবলীকে বিকশিত করতে উৎসাহ দেয়। এটি ব্যক্তিকে সমাজের একজন উৎপাদনশীল সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা অর্জনে সহায়তা করে।

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ শিক্ষাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। মূলত, শিক্ষা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোকের পথে নিয়ে আসে। এটি শুধু কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে না, বরং একজন ব্যক্তির মানবিক, সামাজিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সহায়তা করে, যার মাধ্যমে সে একটি উন্নত ও অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে। এভাবে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ের জন্যই প্রগতি ও পরিবর্তনের পথ খুলে দেয়।

বাংলা "শিক্ষা" শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে সংস্কৃত ধাতু "শাস" থেকে যার অর্থ শাসন, নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশ বা উপদেশ দেয়া।[১] আর শিক্ষা শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো-অভ্যাস, অনুশীলন, চর্চা প্রভৃতি দ্বারা আয়ত্বকরণ, বিদ্যাভ্যাস, অধ্যয়ন, জ্ঞানার্জন, উপদেশ, নির্দেশ।[২] বাংলা ভাষায় 'শিক্ষা' শব্দটির দ্বারা নানা অর্থ প্রকাশ পায়। 'শিক্ষা' শব্দটির দ্বারা চর্চা, অনুশীলন বা অভ্যাসের মাধ্যমে কোন বিশেষ কর্মে দক্ষতা অর্জন বা কোনকিছু আয়ত্ত করাকে বোঝায়। আবার এর দ্বারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন বা কোন বিধি নির্দেশ পালনের কথাও বোঝায়।

শিক্ষা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Education। উৎপত্তিগত অর্থের দিক থেকে ইংরেজি Education শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Educare থেকে এসেছে। যার অর্থ to lead out বা to draw out আবার কেউ কেউ বলেছেন Education শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Educere থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যার ভাবার্থ হলো to bring up অথবা to train অথবা to mould। আবার ল্যাটিন শব্দ Educo কে কেউ কেউ ইংরেজি Education শব্দের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন। এখানে E অর্থ out এবং duco অর্থ to lead হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।[৩]

শিক্ষার্থীর যথার্থ লালনের মাধ্যমে তার পরিপূর্ণ বিকাশের সার্বিক কার্যক্রমকেই শিক্ষা বা Education বলা হয়। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের মতে-

"শিক্ষা হলো মিথ্যার অপনোদন এবং সত্যের আবিষ্কার"।[৪]

প্লেটো বলেছেন- শিক্ষা বলতে শিশুর নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী দেহ ও মনের সার্বিক বিকাশ সাধন করা বুঝায়।[৫]

দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন-

"দেহ ও মনের সুপ্ত বিকাশই শিক্ষা"।[৬]

---

১ ড. আবদুল মালেক, মরিয়ম বেগম, ফখরুল ইসলাম ও শেখ শাহবাজ রিয়াদ, *শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা* (ঢাকা: অনুপম প্রিন্টার্স, ইউজিসি প্রকাশনা, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ২

২ এম.এ. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলিত), *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৪ খ্রি., সং.৪), পৃ. ৬৩৮।

৩ *শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৪ আব্দুল হাই, *প্রাসঙ্গিক ভাবনা শিক্ষা* (ঢাকা : ঐতিহ্য, ২০১৬), পৃ. ৯

৫ Plato, *The law (Book-1),* Trans: R.G. Bury (New York: G.P Patamas sons, 1926), p. 65.

দার্শনিক প্লেটো বলেছেন,

"শিক্ষা হলো সঠিক মুহর্তে আনন্দ ও বেদনা অনুভব করতে পারার ক্ষমতা বা শক্তি এবং দেহ ও আত্মার পূর্ণতা সাধনের ব্যবস্থা।" হার্বার্ট বলেছেন, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধন।"[৭]

জন মিল্টন বলেছেন,

"I call a complete and generous Education that which fits a mans to perform justly skilfully magnani mously all the offices both private and public of peace and war". [৮]

আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের যুগান্তকারী মতবাদের স্রষ্টা রুশো বলেছেন, জন্ম গ্রহণের সময় মানব শিশু যে জিনিসের অভাববোধ করে এবং পরিপূর্ণ মানুষের পর্যায়ে পৌঁছাতে আমাদের যা দরকার তাই শিক্ষা।[৯]

আধুনিক শিক্ষা দার্শনিক বাট্রান্ড রাসেল বলেছেন: আদর্শ চরিত্র বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য এবং এই আদর্শ চরিত্র বিকাশের জন্য তিনি কতিপয় সর্বজনীন গুণ মানুষের মধ্যে বিকাশিত হওয়া বাঞ্চনীয় বলেছেন। গুণগুলো হলো প্রাণশক্তি, সাহস, শৌর্য, সংবেদনশীলতা ও বুদ্ধিজ্ঞান।[১০] শিক্ষা হল মানুষের নৈতিক উন্নতির সাহায্যে ইহলোকের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি। আর সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য সুখ লাভ করাই মানুষের শেষ লক্ষ্য।

আল্লামা ইকবালের মতে,

মানুষের রূহকে উন্নত করার প্রচেষ্টার নামই শিক্ষা। শিক্ষা হল মানুষের নৈতিক উন্নতির সাহায্যে ইহলোকের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি। আর সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য সুখ লাভ করাই মানুষের শেষ লক্ষ্য। সাধারণ অর্থে শিক্ষার অর্থ করা যায় অথবা আমরা বলতে পারি, বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে যেসব কার্য সম্পাদিত হয় যেমন, শিক্ষাক্রম, শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ইত্যাদি দ্বারা যেসব উদ্দেশ্য অর্জিত হয় তাই শিক্ষা। একজন মানুষের সুপ্ত গুণাবলীর বিকাশ ও একজন মানুষকে উৎপাদনশীলতা অর্জনে সহায়তা করাকেই শিক্ষা বলা হয়।

---

৬ Aristotle, *The Politics (book vii)* (Trans: Errets Barker), (Oxford: Clarendon press, 1946), p. 321-22

৭ রঞ্জিত কুমার রায়, *টিচিং মেথোডস অ্যা অ্যান্ড লার্নিং রিসোর্সেস* (ঢাকা: কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ২০০০খ্রি.), স. ১, পৃ. ৭

৮ John Milton, *Milton's Tractate On Education*, p. 48.

৯ Jan Jacques, *Roussesu*, Trans. Barbara Foxtey (London: J.M. Dent and Sons ltd, Jan Jacques, 1966), p. 6

১০ Bertrand Russel, *On Education* (London: Unwin paparbooks, 1985), p. 46

**শিক্ষাচিন্তা**

প্রত্যেকটি জাতি তাদের নিজস্ব দর্শনের উপর ভিত্তি করেই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করে থাকে। রাশিয়ান চিন্তাবিদ M. C. Govern বলেন,

"রাশিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান বৈশ্বিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি সাধারণ অংশ নয়, বরং এই জ্ঞান-বিজ্ঞান হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র ও আলাদা ভাগ, অন্যদের জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে এটা সম্পূর্ণ আলাদা। আলাদা হওয়ার কারণ আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান একটি সুনির্দিষ্ট দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু যে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার পিছনে ভিত্তির প্রয়োজন থাকে তাই আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তি হচ্ছে আমাদের বস্তুবাদী দর্শন যা আমাদের আদর্শের মহান নেতা কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিন পেশ করে গিয়েছেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণার সংগ্রামে আমরা যখন অবতীর্ণ হবো, তখন আমাদের হাতে অবশ্যই এই দর্শন থাকবে এবং এই দর্শনের বিরোধিতায় যারাই আমাদের সামনে আসবে তাদেরকে কঠিন হাতে দমন করতে হবে।"

অন্যদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে গ্রহণ করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"শিক্ষাবিদগণ এই বিষয়ে একমত যে, কোন দেশ বা জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা এমন কোন পণ্য নয় যা অন্যদেশ বা বাইরে থেকে আমদানি করা যেতে পারে, বরং শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যা প্রতিটি জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য, দর্শন-উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে তৈরি করতে হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে এটা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অভিভাবক ও শিক্ষকগণ তাদের নিজেদের বোধ-বিশ্বাস, ইমান-আকিদা, জীবন-জগতের প্রতি তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তাদের নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করে থাকে।"[১১]

F. W. Garford তার Education and Social Purpose (1962) গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

"শিক্ষা ব্যবস্থার সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ণয়ের মানদন্ড হচ্ছে সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটা ও না ঘটা।[১২] সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধের মাঝে কোন ধরনের দুরত্ব ও ব্যবধান থাকতে পারে না। আরেক শিক্ষাবিদ Vernon Mallinson (1910-1991) তার "An Introduction to The Study of Comparative Education" (1957) গ্রন্থে একই ধারণা পেশ করেছেন।"[১৩]

---

১১ সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদভী, *আহাম্মিয়া নিযাম আত-তারবিয়্যাহ ওয়াত-তা'লীম ফিল আক্বতার* (ইন্ডিয়া: আল-মাজমা' আল-ইসলামী আল-ইলমী, ২০১৪খ্রি.), পৃ. ২২

১২ F. W. Garford, *Education and Social Purpose* (London: 1962), p. 123.

১৩ **Vernon Mallinson**, *An introduction to the study of comparative education* (London: Heinemann Educational, 1975), p. 59.

Dr. J. B. Conant তার Education and Liberty (শিক্ষা ও স্বাধীনতা) গ্রন্থে বলেন,

"শিক্ষা ব্যবস্থা কোন লেনদেন বা ক্রয়-বিক্রয় এর মত কোন বিষয় নয়, এবং এমন কোন ব্যবসায়িক পণ্যও নয় যা বাইরে রপ্তানী করা যায় বা বাইরের থেকে আমদানী করা যেতে পারে। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা যে, ইংল্যন্ড, ইউরোপ থেকে শিক্ষা ব্যবস্থার ধারণা গ্রহণ করার কারণে একটা দীর্ঘ সময় আমাদের বেশ ক্ষতি হয়ে গেছে।"[১৪]

**শিক্ষার লক্ষ্য**

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক F. W. Garforth শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "শিক্ষা একটি সমাজের মূল লক্ষ্য হতে পারে না, বরং শিক্ষা হচ্ছে মূল লক্ষ্য পর্যন্ত উপনীত হওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম বা ওসিলাহ"।

এর উপর তিনি তিনটি মন্তব্য পেশ করেছেন। এখানে উল্লেখ করা হল-ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ Sirpercy Ninn এর মন্তব্য যা তিনি উইকপিডিয়াতে উল্লেখ করেছেন,

"তারবিয়াহ এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিজ্ঞজনেরা দূরের কাছের বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন, তবে তাদের সকলের সংজ্ঞার মূলকথা এটাই যে তারবিয়াহ এর মূল ধারণা হচ্ছে যে কোন জাতির অভিভাবক শ্রেণির পক্ষ থেকে তাদের নতুন প্রজন্মকে তাদের নিজস্ব জীবন-দর্শনের উপর তৈরি করার জন্যে প্রচেষ্টা করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হচ্ছে পূর্ববর্তী প্রজন্মের জীবন-দর্শন, জীবনধারা, কৃষ্টিকালচার নতুন প্রজন্মের হাতে অর্পণ করা।"

আরেক মার্কিন শিক্ষাবিদ Jhon Dewuy তার Democracy and Education গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "একটি জাতি সংস্কারের মাধ্যমে টিকে থাকে আর সংস্কারের ভিত্তি হচ্ছে শিশু-কিশোরদের শিক্ষা দেওয়া। একটি জাতি বিভিন্ন উপায়ে নিরক্ষর মানুষদেরকে তাদের নিজস্ব জীবন-দর্শন, বোধ-বিশ্বাসের উপযুক্ত ধারক বাহক হিসাবে গড়ে তুলে থাকে"।

এ প্রসঙ্গে Prof. Clark এর মন্তব্য, "তারবিয়াহ এর ধারণা পেশ করতে যত কিছুই বলা হোক না কেন, তারবিয়াহ এর শেষ কথা এটাই যে, এর মাধ্যমে প্রতিটি জাতির জীবন ও জগতের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষা করা হয় এবং এটা পরবর্তী প্রজন্মের হাতে অর্পন করার সংগ্রাম করা হয়ে থাকে।" যুগ যুগ ধরে বঙ্গে শিক্ষাগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়েছে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ব্যাকরণ চর্চার জন্য বঙ্গ খ্যাতি লাভ করে। তাম্রলিপ্তিতে অধ্যয়ন করতে আসা চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং

১৪ **James Bryant Conant,** ***Education and liberty: the role of the schools in a modern democracy*** *(*Harvard University Press, 1953), p. 110.

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ভাষাবিজ্ঞান।[১৫] পূর্ববঙ্গ ছিল হাতীদের বিচরণের জন্য একটি প্রাকৃতিক স্থান। কৌটিল্য থেকে আরম্ভ করে গ্রীক ঐতিহাসিক এবং হিউয়েন সাং পর্যন্ত ইতিহাসবিদ ও লেখকগণ এ অঞ্চলকে হাতীদের খেলার মাঠ হিসেবে বর্ণনা করেন। এমনকি সেনাবাহিনীর একটি দুর্দান্ত শক্তিশালী বাহিনী এলিফ্যান্টাইন গড়ে ওঠে এবং এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই হস্তিবিষয়ক শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। এর ফলস্বরূপ রচিত হয় হস্ত্যায়ুর্বেদ গ্রন্থ, এটা ছিল অঙ্গ নগরীর রাজা রমাপদ এবং সাধু পালকম্প্য-এর মধ্যকার কথোপকথন। এটি লিখিত হয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীতে এবং বিষয়বস্তু ছিল হাতীদের অসুস্থতা ও তার প্রতিকার। গ্রন্থটি লেখকের জন্য যথেষ্ট সুনাম বয়ে আনে।

অলঙ্কারযুক্ত কবিতার ধারার উদ্ভব ঘটে ৭ম শতাব্দীতে এবং পাল আমলে এর চরম বিকাশ ঘটে। সমকালীন শিলালিপি এবং চতুর্ভুজের হরিচরিত কাব্য থেকে জানা যায় যে, বঙ্গে জ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যা, ব্যাকরণ, বেদ, আগাম, নীতি, মীমাংসা, বেদান্ত, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের চর্চা হতো। জ্ঞানের চর্চা কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। মন্ত্রী, সেনা কর্মকর্তা এবং রাজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণও যথেষ্ট বিদ্বান ছিলেন।[১৬]

**মুসলিম শিক্ষা**

বাংলা অঞ্চলের মুসলমানদের শিক্ষাভাবনা ও সচেতনতার ক্রমধারা অনুসন্ধান করলে আমাদের সামনে ব্যবহারিকভাবে বা প্রয়োগিকভাবে দুই ধরণের শিক্ষাভাবনা প্রকাশ পায়। এক. ধর্মীয় শিক্ষাচিন্তা ও দুই. সাধারণ শিক্ষাচিন্তা। উপরে 'ব্যবহারিক বা প্রয়োগিকভাবে' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য এই দিকে ইঙ্গিত করা যে নীতিগতভাবে বা তাত্ত্বিকভাবে ইলম বা শিক্ষাকে 'ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা' হিসাবে বিভাজনের বিষয়টি আমাদের সাধারণ চিন্তায় বিদ্যমান অবস্থা থেকে যে মূলত ভিন্ন সেই দিকে ইঙ্গিত করা। ধর্মীয় শিক্ষাভাবনা এই অঞ্চলের সাধারণ ধর্মপ্রাণ ও শিক্ষিত মুসলমান শ্রেণির সাথে ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করেই জড়িত। দেখা যায় যখনই এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ ইসলামের আলোর পরশ পেয়েছেন তখনই এখানে ইসলাম শিক্ষার প্রচার-প্রসারের জন্যে শিক্ষাকেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কুরআন শিক্ষার সাথে সাথে ইসলামের মৌলিক বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করার উদ্দেশ্যে মক্তব, মাদ্রাসা, খানকাহ গড়ে উঠেছে এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে। বহু শতাব্দীকাল ধরে চলে আসা ভারতীয় মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী প্রাথমিক শিক্ষা তথা মক্তব, প্রাইমারি মাদ্রাসা, মসজিদ ও খানকাহভিত্তিক ধর্মীয় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চলে আসছে। নিম্নে এই অঞ্চলের মুসলমানদের শিক্ষার বিষয়ে চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোকপাত করা হলো:

---

১৫ R.C. Majumar (ed.), *The History and Culture of the Indian People: The Classical Age.* (Bharatiya Vidza Bhavan, Bombay, 1954). (Third edition 1970), p. 319

১৬ সম্পাদনায় এমাজউদ্দীন আহমদ ও হারুন-অর-রশিদ, *রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৩, ২০০৭), পৃ. ২৩৭

**ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা**

ভারত উপমহাদেশ ও এই বাংলা মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ভারতীয় মুসলমানদের অতীত ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় যে, যখন কোন সন্তানের বয়স চার বৎসর চার মাস ও চার দিন হতো, তখন তার বিদ্যাশিক্ষার সূচনা করা হতো। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ শিশুকে পাঠ করে শুনানো হতো এবং শিশু তা পুনরাবৃত্তি করতো। এ ছিল প্রতিটি মুসলিম পরিবারের অপরিহার্য প্রথা। মি. স্মিথ এই ধরণের অনুষ্ঠান ১৮০১ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে স্বচক্ষে দেখেছেন যা তিনি তাঁর 'চাহার দরবেশ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।'[১৭]

যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বেশী, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে মক্তব খোলা হতো এবং মুসলিম শিশুরা সেখানে আরবী, ফার্সি ও ইসলামী শিক্ষা লাভ করতো। বিশেষ করে বাংলার সুলতানগণ বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অধিকতর অনুরাগী ছিলেন এবং শিক্ষা প্রসারের জন্যে তারা সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্যে রাজ্যের বিভিন্নস্থানে প্রভূত পরিমাণ লাখেরাজ ভুসম্পদ দান করা হতো। এমন কোন মসজিদ অথবা ইমামবাড়ী ছিল না যেখানে আরবি ও ফার্সি ভাষার অধ্যাপকগণ অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন না। সম্ভ্রান্ত মুসলিম প্রধানগণ তাদের নিজ নিজ এলাকায় মক্তব, মাদরাসা কায়েম করতেন এবং এসবের ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রভূত ধনসম্পদ ও জমিজমা দান করতেন।

মুসলিম শাসনামলে (১২০৩-১৭৫৭) দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা জন্যে যেসব অগণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মক্তব, মাদ্রাসা, কলেজ প্রভৃতি ছিল, তার সঠিক বিবরণ পাওয়া বড়ই দুস্কর। মুসলিম শাসনের অবসানের পর সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রায় বিলুপ্ত হয় যায়। ছিটে ফোঁটা যা বিদ্যমান ছিল তার কিঞ্চিত বিবরণ পাওয়া যায় বুকানন হ্যামিন্টন ও ডাব্লিউ এডাম কর্তৃক প্রণিত শিক্ষা সম্পর্কিত রিপোর্টে যা তারা প্রণয়ন করেন যথাক্রমে ১৮০৭ থেকে ১৮১৪ সালের মধ্যে এবং ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ সালের মধ্যে।

ডাব্লিউ এডাম বলেন, রাজশাহী জেলার কসবা বাঘাতে বিয়াল্লিশটি গ্রাম দান করা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনসেবামূলক কাজের জন্যে। কসবা বাঘার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব ছাত্র পড়াশুনা করতো তাদের যাবতীয় খরচপত্রাদি, যথা বাসস্থান, আহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, কালি-কলম প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বহন করা হতো।

---

১৭ আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪খ্রি.), পৃ. ১৪০

কুরআন-হাদীস ও ইসলামী শিক্ষাদান পুণ্যকাজ বলে বিবেচনা করা হতো এবং প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সমুদয় ব্যয়ভার বহনকরা হতো, সরাসরিভাবে দান, ওয়াকফ বা ট্রাস্টের মাধ্যমে। এভাবে মুসলমানদের বহু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল যেসবের ব্যয়ভার বহন করতেন বিত্তশালী ও দানশীল ব্যক্তিগণ। শিক্ষকমণ্ডলী ও এসব মহানুভব দানশীল ব্যক্তিদের এ দৃষ্টিভংগি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যেতো যে, শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য জীবিকা অর্জন ছিল না, বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে জাতির ধর্মীয় ও নৈতিক মান উন্নয়ন করা।

ডাব্লিউ এডামের রিপোর্টে এ কথাও সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, সেকালে প্রতিটি মসজিদ ছিল মুসলিম জনগণের কেন্দ্রীয় আকর্ষণস্থল এবং মসজিদে মসজিদে যেসব মাদ্রাসা ছিল, সেখানে যে কেউ বিনে পয়সায় লেখাপড়া শিখতে পারতো। ইংরেজদের আগমনের পর খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলসমূহে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হতো। সেখানে কেউ বিনা বেতনে পড়াশুনা করতে পারতো না। কেউ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলে -তার সন্তানাদির বিনা বেতনে পড়াশুনার সুযোগ দেওয়া হতো। মুসলমানদের এই যে বিনা পয়সায় অথবা অতি অল্প খরচে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ ছিল-তার একমাত্র কারণ হলো মুসলমান শাসকগণ এবং বিত্তশালী মুসলমানগণ বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে অকারতে ধনসম্পদ জমিজমা প্রভৃতি দান করতেন।[১৮]

ইংরেজ আমলে এডওয়ার্ড এডাম প্রাচীন বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরির সময় রাজশাহীর বাঘা থানায় যান এবং মাদ্রাসা সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রদান করেন।[১৯] এতে তিনি উল্লেখ করেন-

"এ সময় মাদ্রাসায় ফার্সি ও আরবি উভয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হতো। ফারসি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন নিসার আলী, আরবী শিক্ষক ছিলেন আব্দুল আযীম। ফার্সি বিভাগে ছাত্র ছিল ৪৮ জন, তাদের মধ্যে ১২ জন বাঘার আর বাকি ৩৬ জন অন্য স্থান থেকে আগত। ফার্সি বিভাগে ছাত্ররা অক্ষরজ্ঞান থেকে শুরু করে কুরআন পাঠ, পদ্মনামা, আদমনাম, গুলিস্তাঁ, বোস্তা, ইউসুফ জুলেখা, জামি-উল-কওয়ানিন, ইনশা-ই-ইয়ার মুহাম্মদ, সিকান্দরনামা, বাহার দানিশমান্দ ও আবুল ফজল রচিত পুস্তকাদি পাঠ করত। অন্যদিকে আরবি বিভাগের ছাত্র ছিল মাত্র ৭ জন, দুই জন বাঘা গ্রামের আর অন্যরা অন্য স্থান থেকে আগত। আরবির ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক ছিল- মিজান, মুনশায়িব, সরফ মীর, শরহে মিয়াতে আমিল। তবে ছাত্রদের শ্রেণিবদ্ধ কোন নিয়ম ছিল না। প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক পাঠ গ্রহণ করত।"[২০]

---

১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১-৪৪

১৯ WilliamAdam, Second Report on the State of Education in Bengal: District of Rajshahi, Cal-cutta: Bengal Military Orphan Press, 1836

২০ ড. মো. আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪খ্রি.), ১ম সং, পৃ. ১১২-১১৩

মধ্যযুগের বাংলায় শিক্ষার যে ঐহিত্যগত ধারার বিকাশ ঘটে, মুসলমানদের পতনের পর থেকে ধীরে ধীরে তা অবক্ষয় ঘটতে থাকে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগণ ক্ষমতা লাভের পর নিজেদের প্রয়োজনে প্রাচ্য ভাষা সমূহের শিক্ষা বজায় রাখে। কারণ তাদের প্রশাসনিক কাজের জন্য ফারসি, সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় দক্ষ কর্মচারির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এতদিনের প্রচলিত শিক্ষাধারা ক্রমশ লোপ পেয়ে যায় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।[২১]

ইংরেজি শিক্ষা-সভ্যতা-সাহিত্যের প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা-লগ্নেই বাঙালি হিন্দু সমাজে নবজাগরণের উন্মেষ ঘটে। এ নবজাগরণের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন কয়েকজন হিন্দু বুদ্ধিজীবী। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণ ঘটে এর প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল পর। কারণ, ১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধে পরাজয়ের পর ইংরেজদের বৈরী আচরণের ফলে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষভাব ছিল। এ কারণে তারা ইংরেজি শিক্ষা লাভে অগ্রসর হয়েছে অনেক পরে। মূলত: ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ ব্যর্থতা বরণের পর বাঙালি মুসলমানগণ অনেকটা নিরুপায় হয়ে ভাগ্যোন্নয়নের উদ্দেশ্যে ইংরেজি শিক্ষা লাভে তৎপর হয়।

নিজেদের সাম্রাজ্য ও স্বাধীনতা হারিয়ে মুসলমানরা একে একে এসব কিছু হারায়। ছোট বড় সব রকম চাকরি ক্রমে ক্রমে মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্য সম্প্রদায় বিশেষত হিন্দুদের দেয়া হয়। ব্যবসায়–বাণিজ্য হতে মুসলমানরা বিতাড়িত হয়। এরূপে শিক্ষা–সংস্কৃতি, ব্যবসায়–বাণিজ্য ও প্রভাব–প্রতিপত্তির সকল ক্ষেত্রে মুসলমানরা (পঞ্চাশ বছরের মধ্যে) নিমজ্জিত হয় এক মহাদুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায়।[২২] এসময় তৎকালীন ভারতের গোটা মুসলিম জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলার মুসলমানগণ। হান্টার বলেন,

"I am best acquainted, and in which, so far as I can learn, the Muhammadans have suffered most severely under British Rule" [২৩]

১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলার দেওয়ানি (রেভিনিউ) অধিগ্রহণের ফলে রাজস্ব বিভাগ এবং ঐ বিভাগীয় চাকরি-বাকরি মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এতে তাদের ঐসব আয়ের উৎস রুদ্ধ হয়ে পড়ে, যদ্ধারা এযাবত তারা বিভিন্ন জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ও তাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষাব্যয় বহন করে আসছিল। তদুপরি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক জনশিক্ষাব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে মুসলমান সৃষ্ট লাখেরাজ ওয়াকফ সম্পত্তিসমুহের বাজেয়াপ্তকরণের ফলে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা স্থবির হয়ে দাঁড়ায়।

---

২১ সম্পাদনায় এমাজউদ্দীন আহমদ ও হারুন-অর-রশিদ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

২২ ড. এমাজ উদ্দীন, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা* (ঢাকা: বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি., ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ৬০২

২৩ Hunter, W. W., Indian Mussalmans, pp. 141

খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যকলাপকে মুসলমানেরা যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখতেন। মিশনারিদের শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য ছিল এদেশীয়দের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করা এবং এক্ষেত্রে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর চিন্তাধারা একই ছিল।[২৪] এজন্য মুসলমানরা মিশনারি ও ইংরেজদের অভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিজেদেরকে মিশনারিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতেন।[২৫] অপরদিকে হিন্দুসমাজ ছিল এক্ষেত্রে অনেক উদার। তাঁরা মিশনারি ও ইংরেজদের শিক্ষা পদ্ধতি সহজেই গ্রহণ করেন এবং খ্রিস্টান মিশনারিগণও নিজেদের ধর্ম প্রচারে হিন্দুদেরকেই বেছে নেন।[২৬] অ্যাডাম ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে মন্তব্য করেন যে, তাঁরা নিজেদের স্বভাবজাত বৈষম্যবাদ, বিনয় এবং মৌলিক ধর্মীয় মতবাদ বজায় রেখে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন।[২৭] মুসলিম স্বার্থের বিরোধী নীতি, মিশনারিদের ইংরেজির মাধ্যমে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচার, শিক্ষিত হিন্দুদের খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ, ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলো মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজির প্রতি এক প্রকার বীতশ্রদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি করে। এ পরস্থিতিতে মুসলিম সমাজ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণকে সর্বোপরি ধর্মনাশের কারণ বলে চিহ্নিত করে এবং অভিভাবকগণ নিজেদের সন্তানদেরকে আধুনিক বিদ্যালয়ে পাঠানো থেকে বিরত রাখেন।[২৮] দরিদ্রতা সমসাময়িক বাংলার মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার জন্য অন্যতম কারণ ছিল। হান্টারের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী "কোম্পানি আমলের পূর্ববর্তী সময়ে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত লোকের সন্ধান পাওয়া দুরূহ ছিল, অর পঁচাত্তর বছরব্যাপী ইংরেজ শাসনের পর তাদের মধ্যে স্বচ্ছল পরিবার পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে।[২৯]

তৎকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই উচ্চ শ্রেণি ও নিম্নশ্রেণি বিরাজ করছিল। হিন্দুদের মধ্যে উচ্চ বর্ণ, নিম্নবর্ণ, ইত্যাদি বিভাজনতো বহু আগে থেকেই ছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইসলাম যদিও সাম্যের ধর্ম, তথাপি বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ হিন্দুদের দেখাদেখি মুসলমানদের মধ্যেও 'আশরাফ' ও 'আতরাফ' শ্রেণি বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছিল। এ সময়কার শিক্ষা আশরাফ বা অভিজাত শ্রেণির পরিবার গুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নিম্নবর্ণের

---

২৪ Mallick, A. R., *British Policy*, p. 192; Hampton, H. V., *Biographical Studies*, p. 8; J.C. Marshman, *Advantages of Christianity in Promoting the Establishment and Prosperity of the British Government in India; Containing Remarks Occasioned by reading a Memoir on the Vellore Mutiny*, London, 1813, p. 6.

২৫ T.B. McCully, *English Education*, p. 46, M. Wylie, *Bengal as a Field of Missions*, London, 1854, p. 128.

২৬ মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮খ্রি.), পৃ. ৫৩

২৭ Narendra Krishna Sinha (ed.), *The History of Bengal*, ibid, p. 432

২৮ Obaidullah Al Obaidi, *Muhammadan Education in Bengal*, p. 310; কাজী আব্দুল ওদুদ, *বাংলার মুসলমানদের কথা* (কলকাতা: ১৩৮৪), পৃ. ২২

২৯ W. W. Hunter,., Indian Mussalmans, pp. 117

হিন্দুর মত আতরাফ বা অনভিজাত শ্রেণির মুসলমানদের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চা ছিল না। শেখ, সৈয়দ, মোঘল, পাঠান বংশোদ্ভূত লোকেরা নিজেদের অভিজাত মনে করতেন। কৃষক, মাঝি-মাল্লা, জেলে-জোলা, মুটে-মজুর ছিল আতরাফ শ্রেণিভুক্ত। দেশের এরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। শিক্ষা এদের কাছে প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। গ্রামের কোন কোন পরিবারের ছেলেরা মক্তব মাদ্রাসায় লেখা পড়া করতো বটে, কিন্তু সেটি ছিল ধর্ম নির্ভর। অর্থাৎ তারা শিক্ষা বলতে নামাজের সূরা ক্বিরাত, দোয়া দরূদ, ও ধর্মীয় প্রাথমিক মাসলা-মাসায়েলকেই বুঝাতো। বৈষয়িক উন্নতি কিংবা জ্ঞান চর্চার জন্য ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার মনোভাব তাদের মধ্যে প্রায় অনুপস্থিত ছিল। এই ছিল তৎকালীন বঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র। মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ না করার ফলে এদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাগ্য আরও সম্পসারিত হয়ে ওঠে। যুগোপযোগি শিক্ষানীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে বিত্তবান হিন্দুগণ বরাবরই উদারতার এবং জাগতিক বাস্তবতার তাগিদে ব্রিটিশ ব্যবস্থাকে মেনে নেয়ার পরিচয় দিয়েছেন। সরকারি সুযোগের নানা সদ্ব্যবহার করে তাঁরা ইংরেজদের স্নেহভাজনে পরিণত হন।[৩০] এ সময়ে বাংলার হিন্দু সমাজ ও শিক্ষা বিষয়ে কতিপয় চিন্তা-ধারা তথা মতবাদের উদ্ভব ঘটে। এগুলোর মধ্যে র‍্যাডিকেল ধারাটি অন্যতম স্থান লাভ করে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার সমাজচিন্তায় র‍্যাডিকেল ধারার সূচনা ঘটে। হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও[৩১] (১৮০৯-১৮৩২ খ্রি.) এ ধারার জনক। তাঁর চিন্তা-চেতনা একটি বিশেষ মতবাদে রূপ লাভ করে। এ সূত্রে তাঁর অনুসারীরা 'ডিরোজিয়ান' নামে খ্যাত হন। তাঁরা 'ইয়ং বেঙ্গল' ও 'ইয়ং ক্যালকাটা' নামেও পরিচিত ছিলেন। ডিরোজিও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁর শিষ্যরা সকলেই উচ্চবর্ণ হিন্দু পরিবারের সদস্য ছিলেন। তাঁরা ডিরোজিওর চিন্তা- চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দু সমাজ সংস্কারে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এঁদের মধ্যে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ১৮৫৭ সালে 'সিপাহী বিদ্রোহ'-এর পর মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এ ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে সমাজের সম্বিৎ ফিরে আসে। বাংলার মুসলিম শিক্ষিতদের নেতা ও একটি অংশ অনুভব করেন যে, ব্রিটিশদের সাথে সহযোগিতা করে তাদের শিক্ষা ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ না করলে মুসলমানরা আরও পশ্চাৎগামী হয়ে পড়বে। এই

---

৩০ মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৩১ হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল কোলকাতায় এক ফিরিঙ্গি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ফ্রান্সিস ডিরোজিও ছিলেন পর্তুগিজ এবং মাতা সোফিয়া জনসন ছিলেন ইংরেজ। তাঁর পিতা কোলকাতায় 'জে স্কট অ্যান্ড কোং' নামক একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদস্থ চাকুরে ছিলেন। এ সূত্রে তিনি কোলকাতার ফিরিঙ্গি সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত ছিলেন।

অবস্থায় আধুনিক শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে যে ক'জন মুসলিম নেতা ও বুদ্ধিজীবী এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), সৈয়দ আমির আলী (১৮৪৯-১৯২৮) ও সৈয়দ আমির হোসেন (জ. ১৮৪৩) প্রমুখের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।[৩২]

এ সময় মাওলানা শিবলী নোমানী (১৮৫৭-১৯১৪) ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং ইসলামের প্রাচীন শিক্ষা ও ইউরোপের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টির আওয়াজ তোলেন। তাঁর সমন্বয়ের চিন্তাধারা অন্যান্যের মতো শুধু লেখনী, বক্তৃতা-বিবৃত্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তিনি বাস্তবধর্মী পদক্ষেপের মাধ্যমে তাঁর চিন্তাধারার বাস্তবায়নের প্রয়াস পেয়েছিলেন।[৩৩] শিবলী নোমানীর উক্ত চিন্তাধারায় পূর্ব বাংলায় সর্বপ্রথম প্রভাবান্বিত হন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শামসুল উলামা আবূ নসর মুহাম্মদ ওহীদ (১৮৭২-১৯৫৩)।

বিপ্লব উত্তরকালে অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের পর থেকে নিয়ে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালি মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনার সুবিধার্থে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা (১) বিত্তবান জমিদার ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত শিক্ষা ধারা; (২) নওয়াব আবদুল লতিফ ও অন্যান্য সুধীবর্গের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠা শিক্ষা ধারা; (৩) সভা-সমিতি, পত্রপত্রিকা, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদিভিত্তিক শিক্ষাধারা এবং (৪) সরকারিনীতি ও আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষাধারা।

**সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা**

ইংরেজরা যখন এই অঞ্চলে উপনিবেশ কায়েম করে তখন এখানে তাদের নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনায় গড়া প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল 'কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা'। প্রথমে তারা এই প্রতিষ্ঠানকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সনাতন পদ্ধতি ও রুপেই চালু করে। ধীরে ধীরে সেখানে পরিবর্তন ঘটানোর চিন্তা করে। ইংরেজরা এই অঞ্চলের শিক্ষাক্ষেত্রে দুই ভাবে পরিবর্তন সৃষ্টি করে। এক এই অঞ্চলে বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার আদি রুপে সৃষ্টি করে তার মধ্যে নতুন ধারা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা, আর দ্বিতীয় রুপ ছিল নতুন করে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, যেমন 'এংলো ইন্ডিয়ান কলেজ', 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' ইত্যাদি।

ইংরেজদের পক্ষ থেকে যখন আলিয়া মাদ্রাসায় সংস্কার ও পরিবর্তনের চেষ্ঠা করা হয় তখন মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে তার বিরোধিতা করা হয়। মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা চালু, বা প্রাচীন ফালসাফা ও হিকমতের কিতাব বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সহজেই মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-শিক্ষক ও চিন্তাশীল সমাজ মেনে নেননি, যার ফলে প্রথম দিকে পরিবর্তন প্রক্রিয়া বাঁধা প্রাপ্ত হয়।

---

৩২ মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৩৩ ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬খ্রি.), পৃ. ২৯

এক পর্যায়ে আলিয়া মাদ্রাসায় ইংরেজি ক্লাস চালু হয়। সামান্য কিছু সংখ্যক মুসলমান সেই ইংরেজি ক্লাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ও উপকৃত হয়। সাধারণ শিক্ষার ব্যাপারে, বাঙ্গালী মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের শিক্ষা চিন্তা এখান থেকে শুরু হয় বলে আমাদের মনে হয়। যারা ইংরেজি শিক্ষা অর্জন করে উপকৃত হয়েছিলেন -বস্তুগত ভাবে বা চাকুরি লাভ করতে- তারা মুসলিম সমাজকে বুঝাতে শুরু করেন যে, ইংরেজি শিক্ষা করা আমাদের জন্য জরুরি এবং এই শিক্ষা আমরা অবহেলা করতে পারি না। ১৮৫৩ সালে নবাব আব্দুল লতিফ একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন যার শিরোনাম ছিল 'মুসলিম ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষার উপকার'। সমগ্র দেশ ব্যাপী এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে মুসলিম সমাজে সচেতনতার সৃষ্টি করা।[৩৪]

এর দশ বছর পরে "১৮৬৩ সালে তিনি (খান বাহাদুর আব্দুল লতিফ) 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি'[৩৫] নামে একটি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সোসাইটি মাঝে মাঝে মুসলমানদের চলমান শিক্ষা ও বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সমস্যার উপর সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করতো। ফলে আধুনিক শিক্ষা ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি সচেতনতার সৃষ্টি হয়। এছাড়া বাঙালী মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদের অপবাদ থেকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে ও মুসলমানদের সার্বিক উন্নতির জন্য সোসাইটি প্রতি বছর কলিকাতা টাউন হলে আলোচনা সভার আয়োজন করতো। বৃটিশ শাসকবর্গ

---

৩৪ নবাব আবদুল লতিফ ১৮৫২-৫৩ সালে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন এবং সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য এশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। এর বিষয় ছিল ভারতীয় মুসলমান যুবকদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার উপকারিতা এবং এর জন্য গ্রহণযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের সকল স্থানের শিক্ষিত মুসলমানদের মতামত জানার জন্য তিনি ফার্সি ভাষায় প্রবন্ধ আহবান করেন। বহুমুসলমান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। বোম্বাইর স্যার জামশেদজী জিজিবাই স্কুলের শিক্ষক মৌলভী আব্দুল প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। অধিকাংশ প্রবন্ধ লেখক ইংরেজি শিক্ষার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন। এ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপানার সৃষ্টি করেছিল। (দ্র. মোহাম্মদ আজিজুল হক, অনু. মোস্তফা নূরুল ইসলাম, বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯খ্রি.), পৃ. ৪-৬)

৩৫ বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং দাবি-দাওয়া আদায়ের সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ছিল নবাব আবদুল লতিফ কর্তৃক ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি'। এটি ১৮৬৩ সালের ২রা এপ্রিল ১৬ তালতলা লেনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক সভায় নওয়াব আবদুল লতিফ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। সোসাইটির সেক্রেটারি আবদুল লতিফের কলকাতার ১৬ নং তালতলার বাসভবনে সোসাইটির সদর দপ্তর ছিল। মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ছিলেন মহীশূরের প্রিন্স মুহম্মদ রহিমুদ্দীন এবং সহ-সভাপতি ছিলেন অযোধ্যার প্রিন্স মির্জা জাহান কাদের বাহাদুর ও মহীশূরের প্রিন্স মুহম্মদ নাসিরুদ্দীন হায়দার। কমিটির মোট ১২ জন সদস্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অযোধ্যার প্রিন্স মির্জা আসমান জাহ বাহাদুর ও প্রিন্স মুহম্মদ জাহ আলী বাহাদুর এবং মহীশূরের প্রিন্স মুহম্মদ হরমুজ শাহ ও প্রিন্স মুহম্মদ বখতিয়ার শাহ। বাংলার ছোটলাটকে সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক করা হয়েছিল। সমগ্র ভারতবর্ষের পাঁচ শতেরও বেশি মুসলমান সোসাইটির সাধারণ সদস্যভুক্ত ছিল। সোসাইটির মাসিক সভার কার্যক্রম উর্দু, ফারসি, আরবি ও ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত হতো। দীর্ঘদিন পর্যন্ড় মুসলমানদের সম্প্রদায়ের কোন মুখপাত্র না থাকার কারণে তাঁদের পক্ষে কথা বলার বা তাঁদের অভাব অভিযোগ সমূহ সরকারের নিকট তুলে ধরার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এ সোসাইটি মুসলমানদের এ প্রয়োজন মেটায়। এই সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমে বিভিন্ন ধর্মের প্রথিতযশা গুণী ব্যক্তিরাও অংশগ্রহণ করতেন। মুসলমানদের জন্য গঠিত এ সাহিত্য সমিতির গঠনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে উৎসাহ প্রদান করা। আবদুল লতিফ এটির মাধ্যমে মুসলমানদের মৌলিক সমস্যার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। (দ্র. Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal* (1884-1992), First Published, Dacca, 1974, p. 170)

নবাব আব্দুল লতিফের এরুপ আয়োজনকে স্বাগত জানায় এবং তাঁর প্রস্তাবিত সমস্যাবলীকে গুরুত্বের সাথে দেখার আশ্বাস দেয়" ।[৩৬]

বিস্তারিতভাবে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-ভাবনার কিছু নমুনা পাওয়া যায় ১৮৮২ সালে হান্টার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে। সেই রিপোর্টে বাংলা অঞ্চলের দুইজন বিশিষ্ট নাগরিক নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর মতামত জানতে চাওয়া হয় ।[৩৭] দুজনই ছিলেন মুসলমানদের শিক্ষা দীক্ষার পৃথিকৃৎ। তারা মুসলমানদের সংখ্যানুপাত, শিক্ষায় অমনোযোগিতার কারণ চিহ্নিত করেন। মক্তব, মাদ্‌রাসা, সাধারণ শিক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি শিক্ষার প্রচলিত রীতিনীতি, মুসলমানদের অমনোযোগী হওয়ার কারণ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাকে লোভনীয় করতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন ।[৩৮]

নবাব আবদুল লতিফ বিস্তারিত পরামর্শে বলেন, 'উচ্চ পদের সরকারি চাকুরি লাভের চাবিকাঠি হলো উচ্চ শিক্ষা। যে সব পেশা জ্ঞান সম্পর্কিত, সেগুলোর জন্যও উচ্চ শিক্ষা আবশ্যক। সুতরাং মুসলমান সম্প্রদায় যাতে উচ্চ শিক্ষা লাভের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পায়, গুরুত্ব সহকারে তার ব্যবস্থা করা উচিত ।[৩৯] সৈয়দ আমির আলী বলেন,

"A deed Weight, However, Seems still to press down the Moslem Community. The mistake which was Committed in 1872, was not to make English Compulsory on all students. Who sought middle class and high education the consequence is that the only kind of education which is necessary to enable them to retrive the ground they had lost within the last 50 years, is in a most unsatisfactory condition. I think, it has been satisfactory proved that the scheme devised by Sir George Campbell in 1872 to promote a purely Oriental education..... the Moslems, has proved a practical faiture".[৪০]

১৮৮২ সালে লর্ড রিপন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন বৃটিশ ইন্ডিয়ার সামগ্রিক শিক্ষা, বিশেষভাবে মুসলমানদের শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও 'আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমান' গ্রন্থের লেখক ডব্লু ডব্লু হান্টারকে এই কমিশনের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। কমিশন বাংলাদেশের শিক্ষা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য ডব্লু ক্রাফট এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি এই দেশের শিক্ষা প্রসঙ্গে দুইজন বিশিষ্ট

---

৩৬ মওলানা আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৮; বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

৩৭ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী* (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশনী, ২০০০খ্রি.), পৃ. ১৬৬।

৩৮ ড. মো. আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪; আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

৩৯ Enamul Hoque, *Nowab Bahadur Abdul Latif, Ritings and Related documents*, p. 224

৪০ *Report of the Moslem Education Advisory Committee 1934*, p.73

ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সেই দুইজন ছিলেন নওয়াব আব্দুল লতিফ খান বাহাদুর সি.আই.এ ও সৈয়দ আমীর আলী। এই অঞ্চলের মুসলমানদের শিক্ষা ও বিশেষকরে আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষা সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা পেশ করা হল-

**মক্তব**

মক্তবে মূলত কুরআন শরীফ পড়ানো হয়। এই মক্তবে নিম্নবিত্তদের চেয়ে মধ্যবিত্তের সন্তানরা বেশী পড়াশুনা করে। অতএব এই মক্তবে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করা হলে মধ্যবিত্তের মাঝে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা সম্প্রসারণ বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু নিম্নবিত্তরা এর মাধ্যমে মোটেই উপকৃত হবে না। এ ব্যাপারেও আমরা পুরাপুরি ধারণা পাই যে, বাংলার মামুলী পাঠশালা ব্যবস্থা সাধারণ মুসলমান কৃষকদের পক্ষে কতটুকু উপকারী হবে? কেননা, এই সব পাঠশালা বা চন্ডিমন্ডপে হিন্দুদের পদ্ধতি ও রীতি-রেওয়াজের প্রাধান্যই বেশী। এইসব পাঠশালার গুরু হিন্দুরাই থাকেন। ছাত্ররাও বেশির ভাগ হিন্দু, অতএব এই পাঠশালা মুসলমানদের ছেলে-মেয়েদের জন্য উপযোগি নয়। ইন্ডিয়ান মুসলমান গ্রন্থের লেখক তাঁর পুস্তকের ১৭৮ পৃষ্ঠায় এর একটি চমৎকার চিত্র তুলে ধরেছেন-

"মুসলমানদের তিনটি প্রধান ভাবাবেগের দরুন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পদে পদে ব্যর্থ হতে চলেছে। প্রথমত শিক্ষার মাধ্যম যেহেতু বাংলা চালু করা হয়েছে, এইজন্য মুসলমানরা এই ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেন, কেননা শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মুসলমানরা এটা খুবই অপছন্দ করেন। দ্বিতীয়ত এইসব স্কুলের শিক্ষকরা প্রায় সকলেই হিন্দু। এইসব স্কুল শিক্ষকরা যখন মুসলমান ছাত্রদের সাথে জোড়াতালি দিয়ে উর্দু বলার চেষ্ঠা করেন তখন এক হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত হিন্দু শিক্ষকদের ব্যবহার ও শিক্ষা পদ্ধতি মুসলমান ছাত্রদের মনে শ্রদ্ধার চেয়ে বরং অশ্রদ্ধার সৃষ্টিই বেশি করা। কিছু দিন আগে একজন মুসলমান কৃষক জনৈক ইংরেজি অফিসারকে জানায় যে, দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নেই যে মুসলমানদেরকে হিন্দু শিক্ষকদের কাছে পড়তে বাধ্য করতে পারে।"[৪১]

**প্রাথমিক বিদ্যালয়**

শিক্ষা কর্তৃপক্ষের ১৮৮০-৮১ সালের রিপোর্টের ১০৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছিল যে, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার প্রাইমারি স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা ১,৫৬,০৮১ অথচ মুসলমানদের সর্বমোট জনসংখ্যা ২ কোটি ১০ লক্ষের কাছাকাছি। এখন স্কুলের সংখ্যা সম্পর্কে আপনারাই বিবেচনা করুন। আমার মতে বাংলাদেশের কৃষক-মজুর শ্রেণির জন্য সত্যিকার অর্থে কোন প্রাইমারি স্কুল নাই।

প্রাইমারি শিক্ষা বাংলা ভাষার মাধ্যমে হওয়া উচিত। কিন্তু সেই বাংলা কি তথাকথিত পাঠশালার সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলা? সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলা হিন্দুদের চিন্তা, ধ্যান-ধারণা ও মানসিকতার ফসল। এইসব পাঠশালার ভাষা এমন ধরণের বাংলা হতে হবে যে, তা সংস্কৃত ও পুঁথির মাঝামাঝি পর্যায়ের হবে।

---

৪১ W. W. Hunter, *The Indian Musalmans*,( London: Trubner & co. 1871 ) p. 178

কেননা পুঁথি সাহিত্যে আরবি-ফার্সি শব্দ ও প্রবাদাদি রয়েছে। আরবি-ফার্সির সংমিশ্রণে তৈরি মাঝারি ধরণের বাংলাভাষা হিন্দু-মুসলিম উভয়ের বোধগম্য হয়। এবং এটাই যেন প্রকৃত মাতৃভাষায় পরিণত হয়েছে। কাজেই মুসলমানদের পাঠশালাতে সংস্কৃত ঘেঁষা কোন বাংলা পুস্তক যেন না থাকতে পারে।

মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য এখন হতে মুসলমান ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়োগ করতে হবে। ১৮৮০-৮১ সালের শিক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, নর্মাল স্কুলগুলিতে (যা লেঃ গভর্নরের অধীনস্থ) ৩০ জন মুসলমান, ৫৩৭ জন হিন্দু ও ৭৫ জন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী শিক্ষক ছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশের মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম।

ড. হান্টার এই ব্যাপারেও তাঁর গ্রন্থের ২০৫ পৃষ্ঠায় বিশদ আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে, বাংলাদেশের নিম্নস্তরের লোকদের কাছেও প্রাইমারি শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু মুসলমানদের সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তার সাথে একমত পোষণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বলেন,

"আমার একান্ত বিশ্বাস যে, সরকার অতি অল্প খরচে সকল পর্যায়ের মুসলমানদের জন্য বেশ ভাল শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে পারবেন। এই শিক্ষায় উত্তম, মধ্যম ও নিম্নমান -এই তিন ধরণের বন্দোবস্ত থাকবে। এই ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করার ততখানি প্রয়োজন নাই যতখানি মুসলমানদের অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রগুলির জন্য প্রয়োজন রয়েছে। সরকার এই কথা ঘোষণা করে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন যে, প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর একটি স্কুল থাকতে হবে। পাঁচ মাইলের মধ্যে কোন স্কুল থাকলে সরকার তাতে সাহায্য করবেন না। কেননা এই ধরণের ব্যয়ে মূলত সরকারের আর্থিক ক্ষতি হবে এবং অনর্থক জট তৈরির সুযোগ হবে।"

চতুর হিন্দুরা এই ক্ষেত্রেও অন্যান্য ব্যাপারের মত অগ্রগামী। তারা সারা দেশের আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মত এমন সব স্কুল পত্তন করেছে যে, তাতে তাদেরই প্রয়োজন সাধিত হবে এবং পক্ষান্তরে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাই এই পাঁচ মাইলের আইনকে কিছুটা শিথিল করা উচিত, যাতে মুসলমানদের স্কুলগুলি গ্র্যান্ট লাভ করতে পারে। এই স্কুল যত ব্যবধানের মাঝখানেই হোক না কেন, যেখানে আলাদা স্কুলের প্রয়োজন নেই সেখানে সরকার মুসলমানদের বিশেষ বন্দোবস্ত করতে পারেন। ওখানকার হিন্দু স্কুলগুলিতে একজন স্বল্প বেতনের মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। সাপ্তাহে পাঁচ শিলিং-এর বিনিময়ে এই ধরণের মুসলমান শিক্ষক পাওয়া যাবে।

পুর্বাঞ্চলের জেলাগুলির প্রাইমারি শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন, মুসলমান কৃষক মহল পর্যন্ত যোগসুত্র স্থাপনের জন্য সরকার একটি বিভাগের পত্তন করবেন। এক সময় হিন্দুদের জন্যেও এই ধরণের সংস্থার প্রয়োজন ছিল। এই সময় লর্ড হার্ডিংজ বিভিন্ন জেলাতে অসংখ্য সরকারি স্কুলের পত্তন

করেন। স্থানীয় লোকেরা এই ধরণের স্কুল নিজেদের খরচে চালাতে পারত না। ১৮৬৬ সালে এই ধরণের প্রায় ৩৮টি স্কুল আমার পরিচালনাধীন ছিল। এইসব স্কুলে সরকারের বার্ষিক ১১ শত পাউন্ড খরচ হত। যদিও এইসব স্কুল স্থানীয় জনগণের একক প্রচেষ্ঠায় চলতে পারত না, তবুও এই স্কুল প্রতিষ্ঠায় যে উপকার হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। সেখানেই কৃষক শ্রেণি, গরীব, অসহায় ও শিক্ষাক্ষেত্রে নিতান্ত গোঁড়া ছিল সেখানে অস্থায়ীভাবে একটি হার্ডিংজ ইন্সটিটিউটের পত্তন করা হত এবং প্রথম দিকে গ্রাম্য লোকেরা বিনা পয়সায় শিক্ষালাভ করত। এরপর যখন তারা শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরত, তখন তাদের কাছ থেকে ফিসও আদায় করা হত। এরপর কয়েক বছরের একটি সাহায্যমূলক স্কুলের বদলে একটি হাই স্কুল জন্ম লাভ করত। অতঃপর এই হার্ডিংজ স্কুল দেশের অন্য অনুন্নত অঞ্চলের জন্য স্থানান্তর করা হত। এইভাবে বাংলা দেশের পশ্চিম-দক্ষিণাঞ্চলের অজপাড়াগাঁয়েও ক্রমশ শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। ১৮৬৫-৬৬ সালে এতদঞ্চালে ২৮০টি স্কুল ছিল এই সব স্কুলের সর্বমোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৬,০৪৩ জন।

উত্তরাধিকার সুত্রে সরকার এবং প্রচলিত শিক্ষার বিরোধিতা পোষণকারী এই গোঁড়া এবং আদিম লোকদের মধ্যে গ্রান্ট ইন এইড কোনরকম কার্যকরী হতে পারে না। তবে সস্তা ধরণের গোটা দশেক স্কুলের পত্তন করে তাতে স্বল্প বেতনের মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ করলে এবং এর বেশির ভাগ ব্যয় যদি সরকার বহন করতেন তাহলে পুর্ব বাংলার লোকদের মনোভাব এক পুরুষের আমলেই পরিবর্তিত হত। এই ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রথমত তেমন সাফল্য লাভ করতে পারবে না। কিন্তু আস্তে আস্তে মুসলমান কৃষক শ্রেণির যুবকদের মন এতে আকৃষ্ট হবে। এবং স্বল্প বেতনভোগী মুসলমান শিক্ষকদের প্রতিও তারা অনুরক্ত হয়ে যাবে। এইভাবে আমরা আমাদের বিরোধিতা পোষণকারী এই জাতিকে অতি সহজেই আয়ত্তে আনতে পারি।

তিনি আরো উল্লেখ করেন, আমাকে প্রাইমারি শিক্ষার সমস্যাদি সম্পর্কে পুরাপুরি ব্যাখ্যা করতে হলে, এর রাজনৈতিক দিকও পর্যালোচনা করতে হবে।" পাক-ভারতের ওহাবী আন্দোলন বাংলাদেশের কৃষক-মজুরদের মনে কি প্রভাব বিস্তার করেছে সেই সম্পর্কে ড. হান্টার তাঁর গ্রন্থের ১৪৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন- এই ধ্বংসাত্মক আন্দোলন মুসলমানদের কৃষক শ্রেণির মাঝে যে প্রভাব বিস্তার করেছে, এর কারণ তাদের শিক্ষার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অন্যায়মূলক অমনোযোগিতা।"

তিনি আরো বলেন, আমি গত বিশ বছরে এই ব্যাপারে প্রচুর গবেষণা করেছি এবং প্রায় এই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। যদিও বিপ্লবের সকল দাবানল সরকারী প্রচেষ্ঠা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ যেমন মাওলানা কেরামত আলী ও তাঁর পুত্র মৌলবি হাফেজ আহমদের উপদেশ ও বক্তৃতার গুণে চাপা পরিয়াছে, কিন্তু জনসাধারণ যদি এইভাবে ভ্রান্ত পথেই অগ্রসর হতে থাকে (খান বাহাদুর আব্দুল লাতিফের মন্তব্য) তাহলে সব সময় রাজনৈতিক বিশৃংখলার আশংকা থাকবে।"[৪২]

---

৪২ Ibid. p. 177-200

**মাধ্যমিক শিক্ষা**

বাংলার মধ্যবিত্তদের শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি এবং ছাত্র সংখ্যা সম্পর্কে জনশিক্ষা বিভাগের রিপোর্টে একটি পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়েছে। আমার মতে এইসব স্কুল দ্বারা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্ররা যথাযথভাবে উপকৃত হতে পারে না দুটি কারণেঃ প্রথমত বেতন দানের অক্ষমতা, দ্বিতীয়ত স্কুলের দূরত্ব। সেই সাথে এটাও মনে রাখার বিষয় যে, সাধারণ স্কুল মুসলমানদের উদ্দেশ্যমূলক বিষয়াদি শিক্ষা দিতে পারে না। ইংরেজি তো মুসলমানরা অবশ্যই শিখবে -এই ব্যাপারে আর কোন কথার অবকাশ নেই। কেননা অন্য কোন উপকার থাকুক বা না থাকুক জীবিকা ও চাকুরির প্রশ্নে মুসলমানদের ইংরেজি শিখতে হবে। বিশেষভাবে বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে বাংলাও শিখতে হবে। কেননা এই ভাষা তাদের নিত্যকার ভাষা। আবার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে মুসলমানদেরকে উর্দুতে ভাল দক্ষতা ও ফার্সিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হবে এবং সম্ভব হলে কিছু আরবিও শিখতে হবে।

**উচ্চ শিক্ষা**

মুসলমানদের মাঝে উচ্চ শিক্ষার পরিস্থিতি খুবই নগণ্য। মাধ্যমিক শিক্ষাও তেমন সন্তোষজনক নয়। কেননা মাধ্যমিক পড়ার পর খুব কম ছাত্রই উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায়। ইংরেজি পড়াশুনা করেছে এমন মুসলমান ছাত্র বিরল। অধিকাংশ ছাত্রই দারিদ্র ও অনাটনের দরুন আর এদিকে অগ্রসর হতে পারে না। হালে লে. গভর্নর মুসলমান ছাত্রদের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ মোহসিন ফান্ড হতে দেওয়ার যে নির্দেশ দিয়েছেন তা মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার দিকে ধাবিত করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ ছাত্র নিজেদের খরচ বহন করতে সম্পুর্ণ অপারগ। কলিকাতা শহরে থাকা-খাওয়া ও বইপুস্তক কিনে পড়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য এই সব ছাত্রদের নেই। এই কথা অনস্বীকার্য যে, উচ্চ শিক্ষাই উচ্চ পদস্থ সরকারি চাকুরির একমাত্র পথ। অতএব উচ্চ শিক্ষার প্রতি মুসলমানদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত করতে হবে।

**মাদ্রাসা শিক্ষা**

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের এই অনগ্রসরতাকে শুধু রাজনৈতিক কারসাজির ফলশ্রুতি বলা যেতে পারে না। আজ হতে পঁচিশ বছর আগে মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষাক্ষেত্রে ততখানি আগ্রহশীল ছিলেন না, যতখানি বর্তমানে দৃষ্ট হয়। মুসলমানরা শুধু আরবি ও ফার্সির জন্যই উৎসর্গ প্রাণ, ইংরেজির প্রতি তাদের কোন টান ছিল না। সেকালে এই অঞ্চলে মাত্র দুটি মাদ্রাসা ছিল। একটি কলিকাতায় ও অপরটি হুগলিতে। শুধু দ্বীনী শিক্ষা লাভের মানসেই যে এই ছাত্ররা এই দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে ভর্তি হত, তা নয়, বরং এতে একটি পার্থিব উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। কেননা, ছাত্ররা সিনিয়র স্কলারশিপ

পাস করার পর মুসান্নিফ বা ছদরুল ইয়ামিন মতো দুটি বড় পদে চাকুরি লাভ করতে পারত। দূর-দুরান্তের ছাত্ররা হুগলি বা কলিকাতায় শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে আসলে, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করতেন। যাকে স্থানীয় ভাষায় 'জায়গির' বলা হত। এই ধরণের ছাত্রদেরকে মাদ্রাসার ফিসও দিতে হত না। শতকরা পঞ্চাশ জন ছাত্রই তাদের শিক্ষা জীবনের খরচ এইভাবে নির্বাহ করত। ব্রিটিশ সরকারের রেকর্ড হতে জানা যায় যে, মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রাপ্ত এ ধরণের শতকরা পচিশ জন ছাত্রই জীবিকা ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত এবং ভাল সরকারি পদে চাকুরি ভাল করত। এই মাদ্রাসার ছাত্রদের তুলনায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররা চাকুরির ক্ষেত্রে তেমন সুবিধা করতে পারতেন না।

**উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা**

জর্জ ক্যাম্পবেল পুর্ব বাংলায় বিশুদ্ধ ইসলামি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তা সম্পুর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অতএব সরকারকে বর্তমানে দুইটির যে কোন একটি পন্থা অবলম্বন করতে হবে। রাজশাহী ও চট্রগ্রামের মাদ্রাসার শিক্ষার মান কমিয়ে দিতে হবে, অথবা এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে জেলা স্কুলের সাথে একীভূত করে দিতে হবে।

তাদের মতে, মিডল স্কুল, হাই স্কুল ও কলেজগুলিতে ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। এদেশের লোকদের ইংরেজি বাদ দিয়ে শুধু প্রাচ্য দেশীয় শিক্ষা দেওয়ার ফল খুবই খারাপ হবে। শুধু এই ধরণের পড়াশুনায় কোন চাকুরি বা জীবিকার সংস্থান হয় না।

দ্বিতীয়ত আলিয়া মাদ্রাসাকে কলেজের পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। দুর্ভাগ্য বলতে হবে যে, হুগলি মাদ্রাসার শিক্ষা-দীক্ষার পদ্ধতি মুসলমানদের সীমারেখার বাইরে চলে গেছে। আমার মতে মুসলমানি বিষয়ের শিক্ষা আর মাদ্রাসায় না রাখাই ভালো। হুগলির মাদ্রাসা বন্ধ করে দিলে অনেক টাকা বেঁচে যাবে। এই টাকা হতে হুগলী কলেজ, কলিকাতা কলেজ ও শিরপুরের কলেজের মুসলমান ছাত্রদের জন্য বৃত্তি বরাদ্দ করা যেতে পারে।"[৪৩] উক্ত দুইজন মনীষীর রিপোর্টে তৎকালীন বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

**বাংলার কয়েকটি হাইস্কুল ও কলেজ**

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা অঞ্চলে বেশ কিছু হাইস্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, উদাহরণ হিসাবে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল (১৮২৮), বরিশাল জিলা স্কুল (১৮২৯), ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল (১৮৩৫) অন্যদিকে বাংলার প্রথম তিন কলেজও প্রায় এই সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়, ঢাকা কলেজ, ১৮৪১ সালে উপমহাদেশের প্রথম আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম কলেজ, ১৮৬৯ সাল, রাজশাহী কলেজ,

৪৩ আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০খ্রি.), পৃ. ১২৮-১৪২

১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। হাইস্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে দেখা যায় যে, সেখানে মুসলমান ছাত্রদের চেয়ে হিন্দু ও খ্রিস্টান ছাত্রদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। এর একাধিক কারণের মধ্যে একটি কারণ এই ছিল যে, এই সকল প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে খ্রিস্টান মিশনারির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হত, এবং এখানে বেশির ভাগ শিক্ষক হিন্দু অথবা খ্রিস্টান ছিল। তাছাড়া ব্রিটিশ ভারতে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই অঞ্চলের মানুষের শিক্ষা নিয়ে আলাদা ভাবে চিন্তা প্রথম দিকে করা হয়নি, তাই দেখা যায় যে, প্রথম দিকে হয়ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে আগের নিজের অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, অথবা খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে।

**বিদ্যোৎসাহীদের প্রয়াস**

বাংলা শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বেগম রোকেয়ার অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সময় ও প্রেক্ষাপটে নীতি- নৈতিকতা, মানবীয় মূল্যবোধ এবং নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

**রাজা রামমোহন রায় ( ১৭৭২-১৮৩৩)**

বাংলায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ শতকের শুরুতে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশের অগ্রগতির জন্য আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা অপরিহার্য। তাই তিনি প্রাচীন কুসংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী মনোভাব গড়ে তুলতে বাংলায় আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলনকে উৎসাহিত করেন। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অগ্রণী ভূমিকা আধুনিক উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে দেয়। তিনি বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশে উদ্যোগী হন, যাতে সাধারণ মানুষ নিজ ভাষায় জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়। ইংরেজি শিক্ষা, গণিত, বিজ্ঞান ও দর্শনের মতো জ্ঞানচর্চা বাংলায় ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তিনি শিক্ষার মান ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। তাঁর উদ্যোগই পরবর্তীতে বাঙালি সমাজে আধুনিক শিক্ষা আন্দোলনকে গতিশীল করে তোলে।

**ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)**

বিদ্যাসাগর ছিলেন বাংলা শিক্ষার আধুনিক রূপকার। তিনি নৈতিকতা, মানবিকতা ও যুক্তিবাদ ভিত্তিক শিক্ষার প্রবক্তা। তাঁর প্রবর্তিত পাঠ্যবই যেমন 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা' ইত্যাদি শিশুদের নৈতিক ও ভাষাগত বিকাশে সহায়ক ছিল। তিনি বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন, যা শিক্ষার মানবিক দিককে জোরদার করে।[৪৪]

৪৪ এন. চৌধুরী, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: জীবন ও কর্ম* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি), পৃ. ৫৫

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)**

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে সৃজনশীলতা, মানবিকতা ও আত্মবিকাশের মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি ধর্মীয় সহনশীলতা ও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলেন। তাঁর মতে, "শিক্ষা মানে শুধু তথ্য নয়, বরং জীবনের উপলব্ধি।" তিনি ধর্মীয় বিভাজনের বিপরীতে বিশ্বমানবতার শিক্ষা প্রচার করেন।[৪৫]

**কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)**

নজরুল ছিলেন ধর্মীয় সহনশীলতা ও মানবতার কবি। তাঁর রচনায় ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের মূল্যবোধের সম্মিলন দেখা যায়। "বিদ্রোহী" কবিতায় তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং মানবিক মূল্যবোধের জয়গান করেছেন। তাঁর শিক্ষা ভাবনায় সাম্য, স্বাধীনতা ও নৈতিকতা ছিল কেন্দ্রীয়।[৪৬]

**বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২)**

বেগম রোকেয়া ছিলেন নারী শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের অগ্রদূত। তিনি ১৯১১ সালে কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যা মুসলিম নারীদের শিক্ষায় বিপ্লব ঘটায়। তাঁর রচনায় যুক্তিবাদ, নারীবাদ ও ধর্মীয় সমতা গুরুত্ব পেয়েছে। "সুলতানার স্বপ্ন" ও "অবরোধবাসিনী" প্রবন্ধে তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যুক্তিনির্ভর শিক্ষা প্রচার করেন।[৪৭]

শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী হিসেবে নবাব আবদুল লতিফের পরবর্তী বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে শ্রেষ্ঠতম অবদানের অধিকারী হচ্ছেন নওয়াব সলিমুল্লাহ। নওয়াব সলিমুল্লাহ স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তারচেয়েও বড় কথা শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি নিঃস্বার্থভাবে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তাতে করে এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, তাঁর অন্যান্য কর্মকান্ড ও অবদানের কথা বাদ দিলেও শুধু শিক্ষার জন্য তিনি বাঙ্গালী মুসলমানের নিকট চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। নওয়াব সলিমুল্লাহর পর ময়মনসিংহের ধনবাড়ীর জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯)। তিনি একজন বিত্তবান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জমিদার হয়েও ব্যক্তিগত ভোগবিলাশ ও আরাম আয়েশ ভুলে স্বজাতির কল্যাণ প্রচেষ্টায় বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর কাজে আজীবন নিমগ্ন ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য, তিনি প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির

---

৪৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শিক্ষা* (কলকাতা: বিশ্বভারতী প্রকাশ, ১৯৩০খ্রি.), পৃ. ১০

৪৬ কাজী নজরুল ইসলাম, *বিদ্রোহী* (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯২২খ্রি.), পৃ. ২২

৪৭ বেগম রোকেয়া, *অবরোধবাসিনী* (কলকাতা: সাখাওয়াত মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ১৯২৯খ্রি.), পৃ. ৫৫

সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থানুকুল্যে ছোট বড় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়েছে। মুসলমান লেখকের লেখা বিদ্যালয়ের পাঠ্যোপযোগী পুস্তকের অভাব ছিল। তিনি ঐরূপ পুস্তক রচনায় লেখকদের উৎসাহিত করেন এবং মুদ্রণে আর্থিক সাহায্য দেন। শুধু তাই নয়, তিনি এবং কাজী ইমদাদুল হক শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব খাটিয়ে সেগুলিকে পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন।

নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে মুসলিম জাতির উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অনেক অবদান রেখেন গেছেন। নওয়াব সলিমুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দেখে যেতে পারেনি। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সৈয়দ শামসুল হুদা, ধনবাড়ীর জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও শামসুল উলামা আবু নসর ওহীদ (১৮৭২-১৯৫৩খ্রি.) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অমূল্য অবদান রাখেন।[৪৮]

বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে অন্যান্য যে সকল বিদ্যোৎসাহী জমিদার ও শিক্ষাবিদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে রংপুর জেলার মহীপুরের জমিদার আবদুল মজিদ চৌধুরী, করটীয়াস্থ পন্নী পরিবারের হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী, ফরিদপুরের মীর মোহাম্মদ আলী, বীরভূমের জমিদার সৈয়দ এরফান আলী, বগুড়ায় নওয়াব অবদুস সোবহান চৌধুরী, টাংগাইলের দেলদুয়ারের জমিদার পত্নী করিমুন্নেসা খানম (১৮৫৫-১৯২২), ত্রিপুরার হোমনাবাদের জমিদার ফয়েজুন্নেসা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৪), জলপাইগুড়ির জমিদার আবদুর রহিম বক্স পেস্কার, শ্রীহট্টের জমিদার মোহাম্মদ বখত মজুমদার (১৮৬৭-১৯৩৬), ফরিদপুরের বেলগাছির জমিদার আলিমুজ্জামান চৌধুরী (মৃ. ১৯৩৬) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ পর্যায়ে উচ্চশিক্ষিত সুধী যাঁরা বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষা সংস্কার কার্যক্রমের সাথে উৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে খান সাহেব আবদুল ওয়ালী (১৮৫৫-১৯২৬), বরিশালের হেমায়েতউদ্দীন আহমদ (১৮৬০-১৯৪১), কুমিল্লার সৈয়দ শামসুল হুদা (১৮৬২-১৯২২), যশোহরের আবদুস সালাম (১৮৬১-১৯৪১), ফেনীর আবদুল আজিজ (১৮৬৩-১৯২৬), মেদেনীপুরের আবদুর রহিম (১৮৬৭-১৯৫২), সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন (১৮৭০-১৯৩৪), শামসুল উলামা আবু নসর ওহীদ (১৮৭২-১৯৫৩), শ্রীহট্টের কাজী মোহাম্মদ আহমদ ও গজনফর আলী খান (১৮৭২-১৯৬৯), মির্জা সুজাত আলী বেগ, সৈয়দ ওসমান আলী এবং কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানার খান বাহাদুর মোশাররফ হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪৮ শামসুল আলম, নওয়াব সৈয়দ শামসুল হুদা, *ইসলামি ফাউণ্ডেশন পত্রিকা*, জুলাই-সেপ্টেম্বর-১৯৮৫ খ্রি, পৃ. ৭২-৭৯

তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণমূলক বিভিন্ন সভা-সমিতি, সংঘ বা আঞ্জুমানের সাথে জড়িত ছিলেন। আবার কেউ কেউ নিজের উদ্যোগেই ঐ জাতীয় সংগঠন গড়ে তোলেন। এঁরা নিজ নিজ পেশায় দক্ষতার সাথে কার্যসম্পাদন করার পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজে বিশেষতঃ স্বীয় সম্প্রদায়কে শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে যথাসাধ্য পরিশ্রম করে গেছেন।

ব্যক্তি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বিভিন্ন সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা, সোসাইটি ও এসোসিয়েশন বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি উৎসাহী করে তুলতে ভূমিকা রেখেছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

মুসলমানদের সর্বপ্রথম সংগঠন 'কলিকাতার 'মহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৫৫) যা পরে 'মহামেডান লিটারারি সোসাইটি' (১৮৬৩), 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৭৭), 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (১৮৮৩), 'চট্টগ্রাম মোসলমান শিক্ষা সভা;' 'আঞ্জুমনে হেমায়েত ইসলাম' (বরিশালে), 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান প্রধানতঃ শিক্ষা-প্রচার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলির মধ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির উদ্যোগ ও কর্মসূচী ছিল ব্যাপক। বিভিন্ন সমিতির বার্ষিক সম্মিলনের আয়োজন করে উদ্যোক্তাগণ জনসাধারণের মনে আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে কৌতূহল জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৪৯] হুগলির দেলওয়ার হোসেন আহমদ, কুমিল্লার সিরাজুল ইসলাম ও সৈয়দ শামসুল হোদা, শ্রীহট্টের আবদুল করিম, মেদিনীপুরের আবদুল রহিম ও ওবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, বর্ধমানের আবদুল জব্বার খান বাহাদুর প্রমুখ সরকারী অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সভা সমিতিতে প্রভাব বিস্তার করেন।[৫০]

**মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা (১৮৬৩)**

১৮৬৩ সালের ২রা এপ্রিল ১৬ তালতলা লেনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক সভায় নওয়াব আবদুল লতিফ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় শিক্ষা-বিস্তার ও শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রেও মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ১৮৬৯ সালে স্যার উইলিয়াম গ্রে কলিকাতা মাদ্রাসার পশ্চাৎমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে একে কিভাবে পুর্নগঠিত করা যায় সে-সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য একটি তিন সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা-কমিশন গঠন করেন। সি.এইচ ক্যাম্বেল প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার), জে. সাটক্লিফ প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ) ও আব্দুল লতিফ ঐ কমিটিতে ছিলেন। সোসাইটি একটি সাধারণ সভায় এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কমিশনকে প্রদান করে। সোসাইটির অধিকাংশ সুপারিশ কমিশন গ্রহণ করেন।[৫১] ১৮৮২ সালের

৪৯ ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা* (ঢাকা: ১৯৮৩খ্রি.), খ.২, পৃ. ১১০

৫০ প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১৪০

৫১ Nawab Bahadur Abdul Latif, *His Writing and Related Document*, p. 152

হান্টার কমিশনের কাছেও সোসাইটি বক্তব্য পেশ করেছিল। মুসলমানদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে এরূপ আশঙ্কার কথা জানিয়ে সোসাইটি জনশিক্ষা পরিষদের গৃহীত নতুন শিক্ষানীতির সমালোচনা করে। ধর্মীয় শিক্ষা ও সৎকার্যে ব্যয় হয়, সে বিষয়ে সোসাইটি কয়েকটি ছাত্রবৃত্তি ও পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করে। ১৮৮৩ সালের ২ শে ফেরুয়ারি লর্ড রিপন কলিকাতা মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য ২০ টাকা করে দুটি বার্ষিক পুরুস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। তা ছাড়া, সোসাইটি ও সোসাইটির ১১ জন সদস্যের প্রদেয় চাঁদার টাকায় (প্রায় ১৭,০০০ টাকা) আরও কয়েকটি ছাত্রবৃত্তি ও পুরস্কার ঘোষিত হয়।[৫২] ঐ সময় লর্ড রিপনকে দেওয়া এক স্মারকপত্রে আমীর আলীর নেতৃত্বে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধী প্রস্তাবের নিন্দা করা হয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষা চালু রাখার সপক্ষে সুপারিশ জানান হয়।[৫৩]

নওয়াব আবদুল লতিফ এই সোসাইটির মাধ্যমে মুসলমানদের মৌলিক সমস্যাবলির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসার এবং মহসিন ফান্ডের টাকা কেবলমাত্র মুসলমানদের শিক্ষার কাজে ব্যয় করার সরকারি সিদ্ধান্ত মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির উল্লেখযোগ্য সাফল্য। নওয়াব আবদুল লতিফ নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারা মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটিকে মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি অর্জনের ফোরাম হিসেবে গড়ে তোলেন। 'মুসলিম ইনস্টিটিউট অব ক্যালকাটা' নামে মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি মুসলমানদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুকেন্দ্র হিসেবে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল।

**বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি (১৯০৩)**

বিংশ শতাব্দীর আগ থেকেই বাংলা অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা সহ সকল ক্ষেত্রে সংস্কার ও সচেতনতামূলক চিন্তা গভীর ভাবে প্রকাশ পায়। যা বিভিন্ন ধরণের সমিতি, সোসাইটি, সংঘটনের রুপে প্রকাশ পেতে শুরু করে। বাঙ্গালি মুসলমানদের শিক্ষা নিয়ে সচেতনতা ও সংস্কারমূলক কাজ করার উদ্দেশ্যে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বিচারপতি আমীর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'ক্যালকাটা মোহামেডান ইউনিয়ন' এর বার্ষিক অধিবেশনে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি' নামে বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সমিতি গঠন করা হয়।

---

৫২ Ibid, p. 152

৫৩ *Report of the Indian Education Commission*, 1883, p. 307

'ক্যালকাটা মোহামেডান ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রেক্ষাপট ছিল এই যে, বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পর, পুর্ব বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা দেখা-শোনার জন্য মিঃ সার্পকে প্রধান করে, পৃথক ডাইরেক্টরি গঠন করা হয়। পুর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারবাদীরা পৃথকভাবে এদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারে তৎপর হয়। তাদের সেই তৎপরতার পদক্ষেপ হিসাবে এই ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই ইউনিয়নের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি' গঠন করা হয়।

১৯০৪ সালের ২রা ও ৩রা এপ্রিল রাজশাহী কলেজ প্রাঙ্গণে এই সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে বাংলাদেশের ঢাকা, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, যশোর, রংপুর সহ বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় চার হাজার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'কে স্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার পৃষ্ঠপোষকসহ একটি কার্যকমিটি গঠন করা হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির ১৯০৪ সালে অনুষ্ঠিত রাজশাহীর সন্মেলনে কার্যনির্বাহী কমিটি ছাড়াও, বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য ১৫ দফা কর্মসুচির প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবাবলীর শিরোনাম ছিল: (ক) গরীব ছাত্রদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে প্রতি জেলায় শিক্ষা তহবিল গঠন ও কৃষি শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান; (খ) সাধারণ শিক্ষার সাথে ধর্ম শিক্ষার সংযুক্তকরণ; (গ) শারীরিক শিক্ষার প্রচলন; (ঘ) নারী শিক্ষার প্রচারণা জোরদার করা; (ঙ) সহজ বাংলায় পাঠ্যপুস্তক লেখা ও ছাত্রদের হাতে পৌঁছানোর পদ্ধতি সহজীকরণ; (চ) মক্তব মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার করে আধুনিক মানে উন্নীত করা। সর্বোপরি এই সন্মেলনে বাংলাদেশে শিক্ষাকে একটি মৌলিক অধিকার, সামাজিক সচেতনতা ও মানবিক বিকাশের আন্দোলনে পরিণত করা হয়।

১৯০৫ সালের ২১ ও ২২ শে এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির পরবর্তী অধিবেশন কুমিল্লা জেলার লাকসামের পশ্চিম গাঁয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সর্ব সম্মতভাবে ১৯০৪ সালের সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহের সাথে আরও কিছু নতুন প্রস্তাব সন্নিবেশ করা হয়। এতে নিম্ন শ্রেণিসমূহে বাংলায় শিক্ষাদান ও দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে মাদ্রাসার উচ্চ শ্রেণিসমূহে ইংরেজি শিক্ষাদান, মুসলমান ছাত্রদের ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষাদান, সরকারি-আধাসরকারি মক্তব মাদ্রাসায় ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের নিয়ম প্রবর্তন, মক্তব মাদ্রাসার জন্য পরিদর্শক মাদ্রাসার পড়ুয়াদের মধ্য থেকে নিয়োগ দান, এছাড়া একটি ইউনানি মেডিকেল স্কুল স্থাপন উল্লেখযোগ্য ছিল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি বঙ্গভঙ্গের পর, পুর্ববঙ্গ ও আসাম মুসলমান শিক্ষা সমিতি হিসাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশে এই সমিতির তৃতীয় অধিবেশন ১৯০৬ সালের ১৪ ও ১৫ এপ্রিল ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নওয়াব বাহাদুর খাজা

সালিমুল্লাহ। এই সম্মেলনে মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, চাকরি-বাকরির সুযোগ-সুবিধা, ওয়াকফ সম্মত্তির ব্যবহার, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, উর্দু শিক্ষা, বোডিং ঘর, মুসলিম নারী শিক্ষা, কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার জন্য সার্বক্ষণিক অধ্যক্ষ নিয়োগ, ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন পরীক্ষায় আরবি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এভাবে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বাংলাদেশের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা যুগোপযোগী করার বেসরকারি উদ্যোগে কার্যক্রম চলতে থাকে।

এছাড়া লেখক সমাজ মুসলমান সমাজে শিক্ষার গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন; সরকারের নিকট শিক্ষা সংক্রান্ত আবেদন নিবেদন তুলে ধরেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-মীর মশাররফ হোসেন, মুন্সী মেহেরুল্লা, শেখ জমিরুদ্দীন, শেখ ফজলুল করিম ও শেখ ওসমান আলী, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মীর্জা ইউসুফ আলী প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা লেখা-লেখি ও বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণের কাছে ধর্মীয় ও যুপোগযোগী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেছেন। তাঁরা ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি কৃষি, শিল্প, কারিগরি ও আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তুলে ধরেছেন। এঁদের ব্যাপক প্রচার-প্রচারণের ফলে রক্ষণশীল মুসলমানদের ইংরেজি ভাষা ও আধুনিক শিক্ষার প্রতি গোঁড়ামী প্রশমন হয়েছিল।[৫৪]

**মুসলিম সাহিত্য সমাজ (১৯২৬)**

১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম হল ইউনিয়ন কক্ষে কতিপয় শিক্ষক-ছাত্রের উদ্যোগে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর (১৮৮৫-১৯৬৯) সভাপতিত্বে মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠত হয়।[৫৫] সূচনা-সভায় সবাই সমাজের অগ্রগতির জন্য সাহিত্যচর্চার আবশ্যকতার কথা বলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাহিত্য সমাজের ভাবযোগী বলে অভিহিত কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) ও সমাজের অন্যতম কর্ণধার আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮) সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য চিন্তা চর্চা ও জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও রুচি সৃষ্টি এবং তদুদ্দেশ্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নবীন পুরাতন সর্ব প্রকার চিন্তা ও জ্ঞানের সমন্বয় ও সংযোগ সাধন।ও

উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশ থেকে বাঙালি মুসলমানদের মাঝে জাগরণ প্রয়াসের শুরু হয়। যাঁরা সাহিত্য সমাজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন তাঁরা সকলেই চাকরিসূত্রে ঢাকা এসেছিলেন। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিরাও ঢাকার বাইরে থেকে এসেছিলেন। শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের অনেকেই তখন

---

৫৪ ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৮১; খ. ২, পৃ. ১১২; B. B. Misra, *The Indian middle classes: their growth in modern times* (London: 1961), p. 376-377; আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর* (ঢাকা: ১৯৮৭খ্রি.), পৃ. ২৬৯

৫৫ আহমদ নূরুল ইসলাম, কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত ০৩ মাঘ ১৩৩২, ইংরেজি ১৭ জানুয়ারি ১৯২৬ খ্রি.

মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠ। আবুল ফজল ঢাকার মুসলিম অধ্যাপকদের সম্পর্কে লিখেছেন, "ঢাকায় তখন যে সব মুসলমান অধ্যাপক ছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন স্ব-সমাজ সম্বন্ধে সচেতন-সাহিত্যের ভিতর দিয়ে সমাজ সংস্কার আর সামাজিক উন্নতি সাধনই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য।

বাংলার শিক্ষার চিন্তার ইতিহাসে ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর একটি বিশেষ স্থান আছে। এই সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেই ইসলাম ও মুসলমান সমাজের যে-সব বিধি-বিশ্বাস, প্রথা-সংস্কার তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের এবং একই সঙ্গে সমাজ ও দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেগুলিকে যুক্তি ও বুদ্ধির আলোয় বিচার-বিশ্লেষণ করে দূর করতে চেয়েছিলেন। মিশরের ড. ত্বাহা হোসেন, আল রাজিক, ভারত উপমহাদেশের সৈয়দ আমীর আলী, মোহাম্মদ ইকবাল, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ চিন্তাবিদ যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে ইসলামকে বুঝতে চেয়েছিলেন এবং সেই আলোকেই মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির সম্ভাবনা দেখেছিলেন। ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের কর্ণধার যাঁরা ছিলেন তাঁদের চিন্তাও প্রায় ঐ একই খাতে প্রবাহিত ছিল।[৫৬]

**সরকারি নীতি ও পৃষ্ঠপোকতা**

সিপাহী বিপ্লবের কিছু পূর্ব থেকে সমগ্র ভারতব্যাপী কোম্পানি সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায়। স্যার চার্লস উডের ১৮৫৪ সালের বিখ্যাত 'শিক্ষা ডেসপ্যাচ'-এ শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুতর সংস্কারনীতি সূচিত হয়। তদ্বারা যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তার নীতির পূর্ণ সমর্থন করা হয়, তেমনি উচ্চশিক্ষার বিস্তার প্রশমিত করে জনশিক্ষার প্রসার এবং দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের নীতি স্বীকার করা হয়। অবশ্য এ 'শিক্ষা ডেসপ্যাচ'-এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। এবং তদনুযায়ী ১৮৫৮ সালে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।[৫৭]

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের অব্যবহিত পর ১৮৫৮ সালে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে মি. গর্ডন ইয়ং নামক ডি-পি-আই এর রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তাৎক্ষনিকভাবে মাদ্রাসার আরবি বিভাগ বিলুপ্তির প্রস্তাব পেশ করেন। হ্যালিডে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ পোষণ করতেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, মাদ্রাসার ছাত্ররা ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের সাথে জড়িত ছিল। তিনি মনে করতেন 'ফিকাহ'-এর কিতাবসমূহে জিহাদ, জিম্মি, 'দারুল হরব' ও 'দারুল ইসলাম' সম্পৃক্ত মাসয়ালা-মাসায়েল শিক্ষা দেওয়া হয়। ফলে মুসলমানদের মনে বিদেশী শাসকদের প্রতি হিংসা ও ঘৃণারভাব জন্ম নেয়। তারা জনসাধারণের মনেও এই হিংসার বীজ ছড়াতে সাহায্য করে।

---

৫৬ 'বার্ষিক বিবরণী', *শিখা*, ১ম বর্ষ চৈত্র, ১৩৩৩, পৃ. ২২

৫৭ হাবিব রহমান, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর বার্ষিক অধিবেশনসমূহে সভাপতির ভাষণ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৪০৬), পৃ. ০৭-২২; *সংবাদ প্রভাকর*, ১৯.১২.১২৫৪, বিনয় ঘোষের সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র।

এবং যেহেতু এরা সরকারি চাকুরি পাওয়ারও যোগ্যতা রাখে না, তাই তারা স্বাধীনভাবে জনমনে ইংরেজদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজে লিপ্ত থাকে। সুতরাং, তাঁর মতে, এহেন ধ্বংসাত্মক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লালন করা বৃটিশ সরকারের পক্ষে মোটেও সমীচীন নয়।[৫৮] কিন্তু শেষ পর্যন্ত গভর্ণর জেনারেল হ্যালিডে-এর যুক্তি ও প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে মাদ্রাসাকে টিকিয়ে রাখেন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা বলেন। তিনি বলেন:

"Thus the Madrasah system of education in Bengal was saved from total extinction and in this matter the then Principal of the Calcutta Madrasah Captain William Nassa Lees played a great role." [৫৯]

শিক্ষাদীক্ষায় মুসলমানদের অনগ্রসরতার কথা উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন,

"The Government of India, in their resolation No.300 of the Year 1871 regretted that, it is much to be regretted that so large and important a class, possessing a classical literature replete with works of profound learning and great value, and counting among its members a section specially devoted to the acquisition and diffusion of knowledge, should stand aloof from active co-operation with our educational system and lose the advantages, both material and social which others enjoy."[৬০]

এই পরিবর্তিত নীতির প্রেক্ষিতে সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন না করে বা মুসলমানদের জন্য উপযোগী সংস্কার না করে সরকার বরং মাদ্রাসা শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হয়। ১৮৭৪ সালে কলিকাতা মাদ্রাসার মডেলে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আরো তিনটি মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়। যদিও এ তিনটি মাদ্রাসা মহসিন ফাণ্ডের টাকায় পরিচালিত হতো, তবুও তা সরকারি পৃষ্ঠাপোষকতা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না। রাজশাহী মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার দরুণ প্রাদেশিক সরকার ১৮৮৩ সালে মাদ্রাসটি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের তীব্র প্রতিবাদের মুখে মাদ্রাসাটিকে জুনিয়র মাদ্রাসার মর্যাদায় রাজশাহী কলেজের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। ১৮৮৫ সালের ৩১ মার্চ এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, মোট দশটি মাদ্রাসায় ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩৮৬ জন। তন্মধ্যে ১০৫৭ জন সরকারি মাদ্রাসাসমূহে এবং বাকীরা সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদ্রাসার।

---

৫৮ মাওলানা আবদুস সাত্তার, *তারীখ-ই-মাদ্রাসা-ই-আলিয়াহ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১১৯

৫৯ A. K. M. Ayyub Ali, *History of traditional Islamic education in Bangladesh* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1983), p. 54

৬০ Ibid, p. 55

উনবিংশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে মাদ্রাসা ও মুসলিম শিক্ষার উন্নয়ন কল্পে কতিপয় কমিটি গঠিত হয়। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে অনেক পত্র বিনিময় হয় এবং সরকার বেশ কয়েকটি রেজুলেউশন, ডেসপ্যাচ ও মিনিট জারি করেন। এতে অনেক মূল্যবান সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মাদ্রাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও অংক, ভূগোল এবং দেশীয় ভাষা শিক্ষাকে উৎসাহিত করা হয়। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মুসলমান ছাত্রদের জন্য অনেকগুলি বৃত্তি প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৫৭ সালের পর বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় বেশ কয়টি কলেজ স্থাপিত হয় যেমন: (১) রাজশাহী কলেজ (১৮৭২), (২) জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা, (১৮৮৪); (৩) বি এম কলেজ, বরিশাল, (১৮৮৪); (৪) ভিক্টোরিয়া কলেজ, নড়াইল, (১৮৮৬); (৫) এ্যাডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা (১৮৯৮): (৬) ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা, (১৮৯৯); (৭) এম সি কলেজ, সিলেট, (১৮৯২); (৮) এ এম কলেজ, ময়মনসিংহ, (১৯০১); (৯) বি এল কলেজ, খুলনা, (১৯০২)। এছাড়া হুগলিস্থ মহসিন কলেজ ১৮৩৩ সালে স্থাপিত হলেও এতদিন তা মহসিন ফান্ডের টাকায় পরিচালিত হতো। ১৮৭৩ সালে সরকার কলেজটির পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং মহসিন ফান্ডের ঐ টাকায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে একটি করে মাদ্রাসা স্থাপিত ও পরিচালিত হয়।[৬১]

**নারী শিক্ষা উন্নয়নে গঠিত সংস্থা**

হিন্দু সমাজে রামমোহন রায়ের উদ্যোগে বাংলার নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। ধর্মসংস্কারের তিনি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫)। এর চূড়ান্তরূপ হিসেবে ১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাহ্ম সমাজ।[৬২] এ ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে নারী শিক্ষা কেন্দ্র চালু ও অবরোধ প্রথা অবসানের আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে চালু হয় অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা লাভ সভা। ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকা প্রসঙ্গে Elizabeth Cooper লিখেন,

"The members of the Brahmo Samaj, that progressive off shoot of Hinduism, have broken caste and allow their women to go about freely". [৬৩]

ঊনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিশ শতকের প্রারম্ভে নারী জাগরণ, নারী স্বাধীনতা, স্ত্রী শিক্ষা এবং অবরোধ প্রথা প্রসঙ্গে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তায় মননে যে প্রগতিবাদ, পাশ্চাত্য প্রীতি এবং নব্য শিক্ষিত মুসলিমদের ইসলামকে অবজ্ঞা করার যে প্রবণতার উদ্ভব হয়েছিল তাতে অধিকতর রক্ষণশীল মানসিকতার মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ শংকিত হয়ে পড়েন। মুসলিম আলিমগণ ইসলামি

---

৬১ Ibid, p. 61

৬২ ড. বদরুল হাসান, *ঊনিশ শতক: নবজাগরণ ও বাংলা উপন্যাস* (কলকাতা: জগৎমাতা পাবলিশার্স, ১ম সং, ১৯৮৯খ্রি.), পৃ. ৬৫

৬৩ Elizabeth Cooper, *The Harim and The Purdah* (Delhi. Bimla publishing House. Delhi First Published in 1915. Reprinted in 1983). p. 91

হিজাব অক্ষুণ্ন রেখে স্ব-সমাজে ইসলাম প্রদত্ত স্বাধীনতার পূর্ণ রূপায়ণে প্রত্যয়ী ছিলেন। নারী শিক্ষা এবং নারী প্রগতির পক্ষে তাঁদের কণ্ঠ উচ্চকিত ছিল। ইসমাইল হোসেন সিরাজী অবরোধ প্রথাটি হিন্দুধর্ম হতে উৎসারিত হয়ে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট বলে এবং কন্যাদের উচ্চশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার অন্তরায় বলে এই অনিষ্টকর, সংহারক প্রথাটির উচ্ছেদ কামনা করেছেন। তিনি বলেন, "এই অস্বাস্থ্যকর পাপ-প্রথা কেমন করিয়া আমাদের সমাজ-দেহকে পচাইয়া তুলিতেছে এবং স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার সাথে কিরূপ নিদারুন কণ্ঠকারোপন করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।"[৬৪] ধর্মীয় মূল্যবোধে দৃঢ় বিশ্বাসী সিরাজী শরীয়ত সমর্থিত পর্দা প্রথার সমর্থন করে তিনি আরো বলেন,

> "ভারতবর্ষে নানা জাতীয় বিধর্মীর বাস এবং স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা, পুরুষ ও চরিত্র বিষয়ে মুসলমানোচিত নহে, তদ্ব্যতীত সর্বত্রই পাপদৃশ্য, কুৎসিৎ বাক্য, অশ্লীল সঙ্গীত কুলটা এবং লম্পট যুগের সাতিশয় আবির্ভাব। পরিচ্ছদ আদিও মুসলমান সভ্যতা অনুযায়ী নহে, এজন্য পর্দার একান্ত আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হয়।"[৬৫]

সমকালীন মুসলিম বিদ্বোৎসমাজের মধ্যে যাঁরা নারীর শিক্ষায় অবদান রেখেছিলেন তাঁদের উল্লেখযোগ্য হলেন-ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, মীর মশাররফ হোসেন, মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, কাজী নজরুল ইসলাম, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন প্রমুখ। বিংশ শতকের প্রারম্ভে মুসলিম বুদ্ধিজীবিগণ পর্দার সাথে মুসলিম নারীদের শিক্ষার প্রতি এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। মুসলিম বিদ্বুৎ সমাজ তথাকথিত অবরোধের কূপমন্ডূকতা পরিহার করে ইসলামী হিজা সহ নারী শিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী হন। বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতির প্রথম অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, পর্দা রক্ষার পাশাপাশি নারীদেরকে ধর্ম ও নীতি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।[৬৬]

**ফিমেল এডুকেশন কমিটি**

১৯০৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি নারী শিক্ষার উন্নতিকল্পে পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক রবার্ট নাথানের নেতৃত্বে 'ফিমেল এডুকেশন কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়।[৬৭] এ কমিটিতে ঢাকার নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীসহ আরো কতিপয় বিশিষ্ট বিদ্যোৎসাহী ইংরেজ, হিন্দু ভদ্রলোক, হিন্দু মহিলা ও মুসলিম পুরুষ সদস্য নিযুক্ত হন।[৬৮] এ কমিটি নারী শিক্ষা সংক্রান্ত যে সকল প্রস্তাব প্রাদেশিক সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের নিকট

---

৬৪ *আল্-এসলাম*, ২য় ভাগ, ১০ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৩

৬৫ *ইসলাম প্রচারক*, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০০ খ্রি.

৬৬ *ইসলাম প্রচারক*, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ

৬৭ *The Eastern Bengal and Assam Government's Resolution* No. 260E, Dated the 17th February, 1908; The Eastern Bengal and Assam Gazette, February, 1908; Ali, p. 32.

৬৮ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *নওয়াব আলী চৌধুরী, জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

পাঠানো হয়, ভারত সরকার সে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৬৯] এ কমিটির চেষ্টায় নারী শিক্ষার প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৯১১ সালের 'কুইনকুইনাল রিপোর্টে' জনশিক্ষা পরিচালক তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।[৭০]

**স্পেশাল সাব-কমিটি ফর মোহামেডান ফীমেল এডুকেশন**

বঙ্গদেশে মুসলিম সমাজে কিভাবে নারী শিক্ষা বিস্তার লাভ করতে পারে এবং ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকই বা কি ধরনের হতে পারে বা হওয়া উচিত, এ সকল বিষয় বিবেচনা করার জন্য ১৯০৮ সালে গঠিত 'ফিমেল এডুকেশন কমিটি'র অধীনে ঐ বছরই 'এ স্পেশাল সাবকমিটি ফর মোহামেডান ফীমেল এডুকেশন কমিটি' নামে একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়। এ সাব-কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ এবং সেক্রেটারি ছিলেন নওয়াব আলী চৌধুরী।[৭১] দু'জন সদস্য ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল পরিদর্শক আহছান উল্লাহ (১৮৭৩-১৯৬৫) এবং 'মোসলেম ক্রনিকেল' পত্রিকার সম্পাদক আব্দুল হামিদ।[৭২] এ সাব-কমিটি ঢাকা শহরে অবস্থিত প্রাইমারি বালিকা বিদ্যালয়গুলোর সুবন্দোবস্ত, মধ্য বাংলা ও মধ্য ইংরেজি স্কুল প্রভৃতিতে শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ, শিক্ষয়িত্রীদের সংখ্যা ও তাঁদের বেতন-ভাতার হার নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ের প্রেক্ষিতে মতামত ও মন্তব্য স্থির করেন; মুসলিম শিক্ষয়িত্রীদের জন্য ট্রেনিং স্কুল স্থাপন এবং মুসলিম প্রধান এলাকায় মহল্লা-ক্লাস প্রবর্তনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। তা ছাড়া এ সাব-কমিটি ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ও জেনানা স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করেন।[৭৩] ১৯০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি এ সাব-কমিটি সরকারি খরচে ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, ১৯১০ সালে ৬ই মার্চ ঢাকায় ইডেন গালর্স হাই স্কুল (১৮৮০)-এর সাথে ছাত্রীদের জন্য একটি উত্তম হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করা এবং ১৯১১ সালের ১০ই জুন তারিখে একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়কে বা ভাল মনে করলে বগুড়া জেলার যে কোন একটি উচ্চ বিদ্যালয়কে প্রাদেশিকীকরণের জন্য সুপারিশ করেন।[৭৪] রংপুর ও কুমিল্লার বালিকাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করাও কর্তব্য মনে করেন। মুসলিম সমাজের মহিলাদের

---

৬৯ *Report of the Third Provincial Muhammadan Educational Conference. Eastern Bengal and Assam,* held at Bogra on 26th & 27th of March, 1910, p.29..

৭০ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *নওয়াব আলী চৌধুরী: জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩; নওয়াব আলী চৌধুরী, পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক *শিক্ষা সমিতির কার্যবিবরণী ও সমালোচনা* (১৯০৬-১২), কোলকাতা, এপ্রিল, ১৯১৪, পৃ. ৩৩

৭১ *A Short Note by Nawab Ali Chowdhury on Muhammadan Female Education to be considered by the Muhammadan Education Committee*, 1914-12.

৭২ *Proceedings of the Sub-Committee for Female Education among Muhammadans*, 1908, p.11.

৭৩ নওয়াব আলী চৌধুরী, *পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির কার্যবিবরণী ও সমালোচনা* (১৯০৬-১২), কোলকাতা, এপ্রিল ১৯১৪, পৃ. ৩০; Proceedings of the Provincial Muhammadan Educational Conference, 1910, Pp. 39-40

৭৪ নওয়াব আলী চৌধুরী, *পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির কার্যবিবরণী ও সমালোচনা* (১৯০৬-১২), কোলকাতা, এপ্রিল ১৯১৪, পৃ. ৩০-৩১

পর্দা ব্যবস্থা রক্ষা করে যাতে বালিকারা নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে উপদেশ পেতে পারে এবং ইচ্ছা করলে উর্দু-ফারসি ভাষা শিক্ষা লাভ করতে পারে, সে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও সাবকমিটি সরকারের নিকট সুপারিশ করেন। সাব-কমিটির সমষ্টিগত রিপোর্ট ছাড়াও নওয়াব আলী চৌধুরী পৃথকভাবে ফিমেল এডুকেশন কমিটির বিবেচনার জন্য কতগুলো মতামত ও মন্তব্য উপস্থাপন করেন।[৭৫] 'জেনারেল কমিটি সাব-কমিটি'র প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করেন। ভারত সরকারও জেনারেল কমিটির সুপারিশসমূহ সমর্থন করেন। বহুবিদ সামাজিক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও নওয়াব আলী চৌধুরী ও তার সহযোগীরা মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে শিক্ষা বিষয়ক সংস্কার ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়া আরম্ভহয়। স্বল্প মেয়াদে সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়। সরকারের লক্ষ্যগুলোর মধ্যে ছিল, বঙ্গভঙ্গজনিত বৃহত্তর রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রতিফলন। এগুলো তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা ও কর্মসংস্থান নীতিকে প্রভাবিত করে। এ নীতির অংশ হিসেবে পূর্ব বঙ্গে উচ্চ শ্রেণির হিন্দুদের আধিপত্য খর্ব করা হয় এবং তার স্থানে একটি মুসলমান উচ্চবিত্ত শ্রেণির উত্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়। হিন্দু উচ্চবিত্ত শ্রেণি পূর্বে ভূমির ওপর তাদের কর্তৃত্ব এবং ইংরেজি শিক্ষালাভের কারণে বঙ্গের অর্থনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা, এবং পেশাগত ক্ষেত্রে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে নিজেদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। কিন্তু হান্টারের ১৮৭১ সালের বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রকাশনায় মুসলমানদের অনগ্রসরতা, বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের পশ্চাৎপদ অবস্থার বর্ণনার ফলে উল্লিখিত বিষয়গুলো ব্রিটিশ শাসকের নজরে আসে। অবিভক্ত বঙ্গে ১৯০৩-৪ সালে আর্টস কলেজগুলোর ৮০০৯ জন ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছাত্র ছিল মাত্র ৪৬৩ জন, বি.এ.-তে ২৮৪ জনের মধ্যে মাত্র ৭৩ জন এবং এম.এ. ক্লাসে ৭৯ জন স্নাতকের মধ্যে মাত্র ৫ জন ছিল মুসলমান ছাত্র। বঙ্গভঙ্গ সরকার ও তার নতুন মিত্রদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। পদমর্যাদার দিক থেকে নিচু অবস্থান এবং সংখ্যায় অধিক হওয়া মুসলমানগণ নতুন প্রদেশের উন্নয়নের সম্ভাবনাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখে। বঙ্গভঙ্গের স্থায়ী সাফল্যগুলোর মধ্যে একটি ছিল শিক্ষার অগ্রগতি।[৭৬]

বাংলা ভাষায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বেগম রোকেয়ার অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সময় ও প্রেক্ষাপটে নীতি-নৈতিকতা , মানবীয় মূল্যবোধ এবং নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

---

৭৫ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *নওয়াব আলী চৌধুরী: জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৭৬ Ahmad Zaheda, *State and Education in Sirajul Islam* (ed.), History of Bangladesh 1704-1971: Volume Three; *Social and Cultural History*. Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1997, (2nd edition), p. 117

## বাংলার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আধুনিক যুগের সূচনা পর্বে বাংলার উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ছিল ভারতীয় সমাজে জ্ঞান ও প্রগতির আলোকবর্তিকা। এই প্রতিষ্ঠানগুলির হাত ধরেই ঔপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষাপটে বাংলার তথা ভারতের শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। আধুনিক যুগের সূচনায় (বিশেষত আঠারো ও উনিশ শতকে), ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত ধরে বাংলায় যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল, তা শুধুমাত্র প্রশাসনিক প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং এটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংমিশ্রণে এক নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের বীজ বপন করেছিল। এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বাংলার সমাজকে মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা থেকে আধুনিক মনস্কতার দিকে চালিত করতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।
প্রাথমিকভাবে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি সরকার এবং স্থানীয় উচ্চবিত্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে শিক্ষিত একটি নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি করা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭), হিন্দু কলেজ (১৮১৭, পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সি কলেজ), এবং এদেশের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলগুলি এই সময়ের উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

পরবর্তীকালে, বিশ শতকের প্রথম দিকে শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণের এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১)-এর মতো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়, যা পূর্ব বাংলার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জাগরণের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি একদিকে যেমন ইংরেজি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার গুরুত্বও একেবারে অস্বীকার করেনি। ফলস্বরূপ, এই উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলি থেকে অনেক বিদগ্ধ পন্ডিত ব্যাক্তিরা উঠে আসেন, যাঁরা পরবর্তীতে নবজাগরণ (জবহধরংংধহপব)-এর পুরোধা হয়ে ওঠেন। এভাবে, বাংলার উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি কেবল ডিগ্রি প্রদানের কেন্দ্র না হয়ে, সামাজিক সংস্কার, রাজনৈতিক চেতনা এবং স্বাধীন চিন্তাধারার উন্মেষের মূল ভিত্তি হয়ে উঠেছিল।

### আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল (১৯০৫)

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার উদ্দেশ্যে বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। বর্তমান বুয়েট (বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯০৫ সালে খাজা আহসানউল্লাহ বিশেষ অনুদানে প্রতিষ্ঠিত হয়। "১৯০৫ সালে ঢাকার তৎকালীন খাজা আহসানউল্লাহ এ বিদ্যালয়ের প্রতি (এই বিদ্যালয়টি প্রথমত ১৮৭৬ সালে 'ঢাকা সার্ভে স্কুল' নামে ব্রিটিশ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল) আগ্রহী হন এবং মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রগতির জন্য বিদ্যালয়ে ১.১২ লক্ষ টাকা দান করেন। তার মহৎ

অনুদানে এটি পরবর্তীতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষালয় হিসেবে প্রসার লাভ করে এবং তার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯০৮ সালে বিদ্যায়নটির নামকরণ করা হয় আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল। আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল তিন বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স দিতে শুরু করে পুরকৌশল, তড়িৎকৌশল, এবং যন্ত্রকৌশল বিভাগে।

**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১)**

১৮৩৫-৩৮ খ্রিস্টাব্দের এডামস্ রিপোর্ট, ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের উড-ডেসপ্যাচ, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লব, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের হান্টার রিপোর্ট, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলিম রেনেসাঁ, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ, এবং ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ রদ ইত্যাদি বিভিন্ন পট-পরিক্রমার মাধ্যমে বৃটিশ সরকার পূর্ব বঙ্গের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার সুযোগদানের নিমিত্তে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ। উদ্দেশ্য ছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ এবং দুই বঙ্গের একত্রীকরণের প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের মন থেকে ভয় দূর করে তাদের বিক্ষুব্ধ অনুভূতিকে শান্ত করা।[৭৭] ভাইসরয় এর সাথে সাক্ষাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন জানিয়ে ছিলেন ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ, ধনবাড়ির নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ব্যারিস্টার আর. নাথানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল, ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয় নাথান কমিটির ইতিবাচক রিপোর্ট এবং সে বছরই ডিসেম্বর মাসে সেটি অনুমোদিত হয়। ১৯১৭ সালে গঠিত স্যাডলার কমিশনও ইতিবাচক প্রস্তাব দিলে ১৯২০ সালের ১৩ মার্চ ভারতীয় আইন সভা পাশ করে 'দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট (অ্যাক্ট নং-১৩) ১৯২০'। নাথান কমিটি রমনা অঞ্চলে ৪৫০ একর জায়গায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দেয়। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সরকারের কাছে অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল পেশের আহ্বান জানান। ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ গভর্নর জেনারেল এ বিলে সম্মতি দেন। এ আইনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। এ আইনের বাস্তবায়নের ফলাফল হিসেবে ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পিছনে ব্রিটিশ সরকারের অনেক উদ্দেশ্যই লুকায়িত ছিল, ইতোপূর্বে দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে থাকা এবং চাকরি-বাকরিসহ সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত পূর্ব-বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জাগরণের জন্য, মুসলিম জনসাধারণের মাঝে শিক্ষার ক্ষেত্রে আস্থা স্থাপনের জন্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে হিন্দুদের একচেটিয়া আধিপত্য খর্ব করার জন্য এবং কলিকাতা

৭৭ ibid, p. 119

বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক একদল মুসলিম বুদ্ধিজীবী তৈরি ইত্যাদি কারণে বৃটিশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল।

বিভিন্ন সোসাইটি, সমিতি, পরিষদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, বাংলার মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক সচেতনতার পাশাপাশি শিক্ষা-সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক সচেতনতার প্রকাশ পরিপুর্ণরুপে প্রকাশ পায়। নিজেদেরকে একটি শিক্ষিত, সচেতন ও আধুনিক জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করতে শুরু করেন। একটি মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের পরিপুর্ণ বিকাশ ঘটতে শুরু করে।

আঠারো শতকের শেষেরদিক থেকে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার বাণিজ্যিক মূল্য ও উপযোগিতা যতই বাড়লো, ততই ক্রমশ অবনতি হতে থাকল ঐতিহ্যসম্মত শিক্ষার। ধর্মপাল-এর মতে, অষ্টাদশ শতকের ভারত জন-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ছিল এবং মেকলের বিধানে ঊনিশ শতকের গতিধারায় এই দেশীয় ঐতিহ্যের অবক্ষয় হয়। কাজী শহীদুল্লাহ উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় স্থানীয় জন-সম্প্রদায়ের প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহারিক শিক্ষাপ্রদানের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পাঠশালাগুলির প্রশংসা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে সরকারি হস্তক্ষেপ এই ব্যবস্থার ধংসসাধন করেছিল। সমাজতত্ত্ববিদ হেটুকার ঝা দেখিয়েছেন যে ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বিহারেরও গ্রাম্য জীবনের অঙ্গ ছিল এই পাঠশালাসদৃশ বিদ্যালয়, যেখানে বিভিন্ন জাতের ও সম্প্রদায়ের কৃষকগোষ্ঠীর শিশুরা তাদের পেশাগত কার্যকলাপ চালাতে যথেষ্ট কর্মদক্ষতার সঙ্গে প্রস্তুত হত। তিনি তাঁর যুক্তির সমর্থনে James Ray Hagen-এর গবেষণার উল্লেখ করেছেন যে যখন এই দেশীয় স্কুলগুলোর কিছু ১৮৭০ এর ব্রিটিশ শাসনাধীনে সৃষ্ট ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, বাদবাকি অর্থাভাবে দ্রুত অবক্ষয়ের মুখে পড়ে। পরমেশ আচার্য্য তাঁর দেশজ শিক্ষাধারা সম্পর্কিত গবেষণায় এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন যে বাংলায় দেশীয় পাঠশালা ব্যবস্থা দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনগুলো মেটাতো এবং শ্রেণিবিন্যস্ত সামাজিক কাঠামো ও সমাজে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য বজায় রাখতেও এর ভূমিকা ছিল।

১৮৫৭ সাল উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পলাশীর প্রান্তরে যে স্বাধীনতা অপহৃত হয়েছিল, তার পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা মীর কাসিমের নেতৃত্বেই শুরু হয়েছিল এবং ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হয়ে ১৮৫৭ সালে এসে তা এক ব্যাপক এবং বিদেশি শাসক গোষ্ঠীর জন্য ভয়াবহ রূপ লাভ করে। সুতরাং এ বিপ্লব ছিল আযাদী-পুনরুদ্ধার সংগ্রামেরই একটি বৃহত্তর ও নবতর অধ্যায়। এ সংগ্রামের সফল পরিণতি ঘটেছিল ১৯৪৭ সালের মধ্য আগষ্টে ভারত ও পাকিস্তান নামক দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিল্লবের পর বিদ্যুৎসাহী বিত্তবান জমিদার, নব্যশিক্ষিত ব্যক্তি, লেখক ও বিভিন্ন গোষ্ঠীভূক্ত ব্যক্তিবর্গের একক ও সমবেত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সূচিত হয়। এ বিবর্তন মূলত নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী, নওয়াব নবাব আলী চৌধুরী ও দেলোয়ার হোসেন প্রমুখের শিক্ষা আন্দোলনের হাত ধরেই। তাছাড়া বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, শিক্ষক, লেখক, সভা-সমিতি, সোসাইটি, আঞ্জুমান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদানে ক্রমান্বয়ে বাংলার শিক্ষার ক্রমোন্নতি কাঙ্ক্ষিত বিবর্তনের পথে এগিয়ে গেছে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ভারত এবং পাকিস্তান এই দুইটি স্বাধীন দেশের পরিকল্পনাবিদদের উপর শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের একটি পরিকল্পিত ও ব্যাপক দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং তারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি দূরীকরণের জন্য এগিয়ে আসেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মহলেও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের বা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বিষয়টি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হলো। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার কাগজে-কলমে স্বীকৃতি পেলেও বাস্তবে তা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সরকার উপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত কোনো পরিবর্তনের দিকে না গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের রাজনৈতিক উদ্দেশে, দর্শন, বিজ্ঞান ও মূল্যবোধের প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মান প্রদর্শন না করে শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করে। উপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে জাতীয় স্বার্থে একটি গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের আন্তরিকতার অভাব ছিল।

মোটকথা প্রাচীনকাল থেকেই বঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। যার প্রমাণ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতার প্রত্যেক পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। আর্যরা এক সময় দলে দলে ভারতের ভৌগলিক সীমার বাইরে থেকে এসে স্থানীয় শাসকদের পরাজিত করে বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের পূর্বতন বাসস্থানের সাথে আর কোন সম্পর্ক রক্ষা করেনি। তারা সাথে করে যে শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে এসেছিলো সেটা আর মৌলিক থাকেনি। আর্য সাহিত্যে সুন্দরভাবে স্থান করে নেয় দেশজ গণদেবতারা। কারণ যাযাবর আর্য উপজাতি উপমহাদেশে এসেছিলো কিন্তু সাথে পর্যাপ্ত সংখ্যক নারীকে আনতে পারেনি। ফলে বংশবৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনেই তাদেরকে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে মিশতে হয়েছিল। ফলে শিক্ষাও হয়ে উঠে দেশজ। শাসনকে বিস্তৃত করতে, বর্ণপ্রথাকে সমাজে প্রোথিত করতে সেই সময়ের শাসকগণ ধর্মের নামে তাদের মতাদর্শের শিক্ষা ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়। জনগণ স্রষ্টার অমোঘ নিয়ম বলে মানতে থাকে চর্তুবর্ণ। শুদ্ররা লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়েও স্রষ্টার বিধান বলে নিজেকে সমর্পন করে শাসকের বেদিমূলে।

ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মক্তব ও মাদ্রাসার উদ্ভব হয়েছিল আরব দেশে ইসলাম অভ্যুদয়ের সাথে সাথেই। এদেশ জয় করবার পর মুসলমান শাসকেরা এদেশে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে। এ অর্থে ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা যা ব্রিটিশরা এদেশে চালু করেছিল সেটি দেশজ না হলে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশজ বলা যায় কিনা এ প্রশ্নটি মৌলিক। আসলে উপমহাদেশে ইসলামী আমল ও ব্রিটিশ আমলের মধ্যে বিরাট গুণগত পার্থক্য আছে। ব্রিটিশরা এদেশ জয় করে একে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন তাদের উপনিবেশে পরিণত করে। উদ্দেশ্য এদেশ থেকে সম্পদ আহরণ করে নিজ দেশে প্রেরণ। অপরদিকে মুসলমান শাসকেরা এদেশে এসে বাসিন্দাদের পরাজিত করে শাসনক্ষমতা দখল করেন এবং এদেশের বাসিন্দা হিসেবে থেকে যান। বিরাট সংখ্যক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় মুসলমান শাসন স্বাভাবিক রূপ নেয় ও ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন হয়। প্রথম দিকে এ শিক্ষা শাসকদের উদ্যোগে বিস্তার ঘটলেও পরবর্তীতে এর উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিলনা। এ শিক্ষা ব্যবস্থা তখন দেশে প্রচলিত অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে পাশাপাশি চলছিল। ফলে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা দেশীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। আর্য শাসন এবং মুসলিম শাসন দুটি শাসন ব্যবস্থাই স্থানীয় শাসনব্যবস্থা হিসেবে রূপ নেয়। উভয় গোষ্ঠীর শাসনব্যবস্থাতেই ভারতের স্বাধীন সত্ত্বা বজায় থাকে। এজন্য তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও ছিলো দেশজ। তবে উভয় গোষ্ঠীই তাঁদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জনমানসে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপনে রত ছিল। জনসমাজ দুইগোষ্ঠীর শাসক দ্বারা শোষিত হলেও সে শোষণকে নিজের অজান্তেই ধর্মের আবরণে বৈধ শাসন বলে বৈধতা দিয়েছিল। এই দুই শিক্ষা ও শাসন ব্যবস্থার অনুসারীদের মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যে ক্ষমতাগত ও তত্ত্বগত লড়াই তা আজও বিদ্যমান। দুইগোষ্ঠীর এই লড়াই এর মাঝেই ব্রিটিশরা সুকৌশলে তাদের জায়গা করে নেয় এবং তাদের ক্ষমতাকে সুরক্ষিত রাখতে জনমানসে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। আর এ কারণেই প্রয়োজন হয় তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। তারা এদেশে বহিরাগত এবং এদেশকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করে। এ কারণে তাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য থাকে তাদের উপনিবেশিক শাসন ও শোষণকে বৈধতা প্রদান। এজন্য এদেশে ব্রিটিশ শিক্ষার ভূমিকা অন্য দুটি শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন এমন এক কেন্দ্রীয় কাঠামোর আওতায় শিক্ষাকে আনা হয় যার ফলে দেশজ শিক্ষাব্যবস্থার অপমৃত্যু ঘটে। দেশজ সাধারণ ব্যবহারিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রারম্ভিক স্তর হিসেবে কেতাবী শিক্ষার যে প্রাথমিক স্কুল গড়ে ওঠে তার সঙ্গে কায়িক শ্রমের সাধারণ মানুষের কোনো যোগ থাকেনা। ফলে বেশিরভাগেরই শিক্ষার আঙ্গিনা থেকে বিদায় নিতে হয়। সাধারণের সুযোগ সংকুচিত হওয়ার পর উপরতলার একটি বিশেষ শ্রেণি শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। ব্রিটিশ শিক্ষানীতির প্রণেতা মেকলে আর বেন্টিংক চেয়েছিলেন ইংরেজিভাবে ভাবিত ও অনুগত এক শ্রেণির

প্রজা তৈরি করতে। অনুগত এসব প্রজা এদেশে ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষা করতে ভূমিকা নেবে। ইংজেদের এই শিক্ষানীতির ফলে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু ব্যক্তি আর বাদবাকি আপামর জনসাধারণের মধ্যে গড়ে ওঠে এক বিরাট ব্যবধান। ইংরেজি জানা লোকেরা নিজেদেরকে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে শুরু করে। তারা নিজেদেরকে সাধারণ জনগণ থেকে আলাদা করে ফেলেন। এদেশীয়দের মনোজগতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সফল হয় ব্রিটিশদের। বাঙালিরা কেরাণি জন্মকে শ্রেষ্ঠ জন্ম ভাবতে শুরু করেন।

উত্তরাধিকার সুত্রে আমরা পেয়েছি ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা। ব্রিটিশ শাসনামলে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষাকে পেছনে ঠেলে এবং স্থানীয় জ্ঞানকে গুরুত্বহীন করে এ অঞ্চলে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে প্রধান করে তোলা হয়েছে। ভারতবাসীও ধীরে ধীরে এতে অভ্যস্ত হয়েছে কারণ সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির যে কাঠামো গড়ে উঠেছিল সে সময়ে, সেগুলোর সঙ্গে শিক্ষার কাঠামোকে সমভাবে তৈরি করা হয়েছে। ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে গেলে সেই লয়ে আপাত ছেদ পড়ে সত্যি, কিন্তু দেখা যায়, পাকিস্তান আমলের শিক্ষানীতির ইতিহাস মূলত পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক শিক্ষার মাধ্যমে শোষণ করতে চাওয়ার ইতিহাস। শিক্ষার মাধ্যমে কীভাবে একটি জনগোষ্ঠীকে দমিয়ে রাখার পরিকল্পনা করা যায়, তার উদাহরণ হতে পারে পাকিস্তান আমলের শিক্ষানীতিগুলো। পাকিস্তান আমল থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত সরকার ওই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঘষে মেজে শাসকগোষ্ঠির অনুকুলে করার চেষ্টা করেছে মাত্র। ব্রিটিশ বিদায় হওয়ার পর থেকে সমস্ত শাসকগোষ্ঠীর কাছেই ব্রিটিশ প্রদত্ত শিক্ষানীতি সমাদৃত। কারণ সমাজ বিচ্ছিন্ন এই শিক্ষানীতির ফলে যে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে তাদের সমাজের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা থাকছেনা। তাদের সমস্ত দায়বদ্ধতা শাসক শ্রেণির জন্য। শাসকশ্রেণির মনোরঞ্জন করে আখের গোছানোর যে ধারা ব্রিটিশরা শুরু করেছিল আজও তা বহমান। নিজের অজান্তেই শিক্ষিত শ্রেণির মনোজগতে এখনও ব্রিটিশ রাজ। শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া শিক্ষিত গোষ্ঠীর মনোজগত পরিবর্তিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

# তৃতীয় অধ্যায়

## প্রাক-স্বাধীনতা শিক্ষাকমিশন ও সরকারি শিক্ষানীতিতে ধর্মীয়নীতি ও মূল্যবোধ প্রসঙ্গ

# তৃতীয় অধ্যায়
# প্রাক-স্বাধীনতা শিক্ষাকমিশন ও সরকারি শিক্ষানীতিতে ধর্মীয়নীতি ও মূল্যবোধ প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের শিক্ষানীতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গেলে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের শিক্ষা কমিশন সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ, ব্রিটিশ আমল থেকেই শিক্ষানীতি ও শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের শিক্ষা কমিশন এবং সরকারিভাবে গৃহীত শিক্ষানীতিগুলি কেবল প্রশাসনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়নি, বরং সমাজের ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রশ্নগুলিকেও গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবর্তন যখন ভারতীয় সমাজের চিরাচরিত শিক্ষাধারাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছিল, তখন শিক্ষানীতি নির্ধারকদের সামনে এক কঠিন দ্বন্দ্বর সৃষ্টি হয়েছিল। আধুনিকতার নামে ধর্ম নিরপেক্ষতা নাকি ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান জানিয়ে ধর্মীয় নৈতিকতার অন্তর্ভুক্তি।

এই সময়ে, চার্লস উডের ডেসপ্যাচ (১৮৫৪) থেকে শুরু করে হান্টার কমিশন (১৮৮২), স্যাডলার কমিশন (১৯১৭) এবং সর্বশেষ সার্জেন্ট প্ল্যান (১৯৪৪) পর্যন্ত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক নথি এই বিতর্ককে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক সরকার একদিকে যেমন খ্রিস্টান মিশনারিদের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, তেমনই স্থানীয় হিন্দু ও মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করার জন্য সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুস্পষ্ট ধর্মীয় নির্দেশনা বা অনুশীলন নিষিদ্ধ করেছিল। তবে, ধর্মীয় নীতি ও মূল্যবোধের অনুপস্থিতি বা বর্জন নিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মীয় নেতারা বারবার প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁদের মতে, কেবল জাগতিক জ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন ও নৈতিক উৎকর্ষতা সম্ভব নয়।

এই বিতর্কিত পরিস্থিতিতে, প্রাক-স্বাধীনতা শিক্ষানীতিগুলি ধর্মীয় নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কীভাবে নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষাকে সমন্বিত করা যায়–সেই বিষয়ে বারবার দিকনির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ফলস্বরূপ, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরাসরি ধর্ম শিক্ষা না হলেও, সাধারণ নীতিশাস্ত্র, মূল্যবোধ এবং সাহিত্যের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রসারের বিষয়টি এই কমিশনগুলোর সুপারিশে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। নিম্নে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে গঠিত শিক্ষা কমিশন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো-

## ব্রিটিশ আমল (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.)

### ভারতের প্রথম শিক্ষানীতি

ঊনবিংশ শতকের শুরুতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি অ্যাক্ট অনুযায়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতে শিক্ষা বিস্তারে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোম্পানির ডিরেক্টরবৃন্দ ৩ জুন ১৮১৪ সালে গভর্নর জেনারেলকে ভারতের শিক্ষা খাতে উক্ত ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করার নির্দেশ দেন। কিন্তু এই নির্দেশনায় স্বভাবতই মুসলমানদের শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দ করার কোন উল্লেখ ছিল না। মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে ইংরেজদের এই উদাসীনতা ইচ্ছাকৃত। কেননা তারা স্থানীয় মুসলমানদের তাদের শত্রু মনে করত এবং স্থানীয় হিন্দুদের তাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী মনে করত। ১৮১৩ সালের সনদ আইনে অস্পষ্টতার কারণে পাশ্চাত্য শিক্ষাধারা বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন সহজসাধ্য হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার বীজ বপিত হয়।

তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতে যে সকল ব্রিটিশ কর্মকর্তা শিক্ষার সাথে জড়িত ছিলেন তাদের প্রায় সকলেই এদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে অকেজো, প্রাণহীন ও অচল বলে মনে করতেন এবং এ দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করতেন। এদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা বাতিল করে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও  তথাকথিত আধুনিক শিক্ষার নামে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি এদেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ফলে ১৮৩৫ সালে উইলিয়াম বেন্টিংক ও তার কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য হবে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং এ লক্ষ্যে সরকারি শিক্ষা বাজেটের সব টাকা খরচ করতে হবে ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্যেই।[১] ফলে ১৮৩৫ সালে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা করে আইন পাশ করা হয় এবং ১৮৩৭ সালে ১ এপ্রিল থেকে সরকারীভাবে ইংরেজির ব্যবহার শুরু হয়।

আর ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এই উপমহাদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজিকে মর্যাদা প্রদান করা হয়।[২] শিক্ষা ক্ষেত্রে ইংরেজদের এ নীতি এদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষত ইসলামি শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মন মানসিকতার পরিবর্তন ও বিপ্লবী চেতনা দমন। আর এ ক্ষেত্রে ইংরেজরা যথেষ্ট সফল হয়েছে বলে মনে হয়।

---

১ মোহাম্মদ ইলিয়াছ আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

২ আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

**১৮৩৫ সালে পাক ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ প্রবর্তিত ১ম শিক্ষানীতির পর্যালোচনা**

- এ শিক্ষা ব্যবস্থায় যে Down Filtaration Theory বা নিম্নগামী পরিস্রবন নীতি বা চুঁইয়ে নামা নীতি অবলম্বন করা হয় তাতে এদেশের মুষ্টিমেয় কতিপয় অভিজাত ব্যক্তিদের শিক্ষিত করার মাধ্যমে ইংরেজদের অনুগত দাস তৈরী করা হয়। যার ফলে এদেশের অধিকাংশ জনগণ শিক্ষার সুফল থেকে বঞ্চিত হয়।
- এদেশের আপামর জনসাধারণের ঐতিহ্যে লালিত ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা এদেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তাতে হিন্দুরা মেনে নিলেও মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজি ভাষাকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি-বাকরি সব দিক দিয়ে অধঃপতিত হয়।
- ধর্মীয় ও নীতি শিক্ষার অভাবে এদেশের সমাজে অত্যাচার অনাচার চরম আকারে পৌঁছে।
- "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড" এ সত্যটি ইংরেজরা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিল। তাই তারা মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে মুসলমানরা যাতে আর কখনো মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে ব্যবস্থা করেছে।
- ব্রিটিশ (Divide and Rule) "ভাগ কর শাসন কর" নীতি আশ্চর্যজনক ও সার্থকভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে সেক্যুলার ও ধর্মভিত্তিক দুইভাগে বিভক্ত করা ছাড়াও বাংলার ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে খন্ড-বিখন্ড করেছে। এ শিক্ষানীতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র।
- এ শিক্ষানীতির ফলে মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সাহায্য বঞ্চিত ও অবহেলিত হয়। এ দেশের ভাষাগুলোও অবহেলিত হয়। এ পর্যন্ত দেশীয় ভাষার যে উন্নয়ন শুরু হয়েছিল তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়।
- এ শিক্ষাব্যবস্থার অসারতা সম্পর্কে লর্ড মেকলে নিজেই মন্তব্য করেন যে, "আমরা এমন সব পুস্তকাদি ছাপাইয়া থাকি (বোর্ড কর্তৃপক্ষ) উহার মূল্য যেমন কম তেমনি কাজও অত্যন্ত বাজে আর আমরা কৃত্রিম ও মিথ্যা অনুপ্রেরণা, মিথ্যা ইতিহাস, অবান্তর বিজ্ঞান, অকেজো দর্শন এবং ভ্রান্ত মতবাদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছি।"[৩] ফলে ভারতে এক হযবরল শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়। যা জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে কোন ভূমিকাই রাখেনি। বরং যুগ যুগ ধরে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ রেখেছে।

---

৩ আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

**প্রাথমিক শিক্ষা**

ব্রিটিশ সরকার প্রথমবারের মত ১৮৫৪ সালে উড ডেসপ্যাচের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এই ডেচপ্যাচে বিদ্যমান দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উৎসাহদানের জন্য বেশ কিছু শর্ত সাপেক্ষে গ্রান্ট-ইন-এইড এর ব্যবস্থা ছিল। শর্তগুলো হলো-

১. স্কুলগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রদান করবে।

২. স্কুলগুলোর জন্য স্থানীয় উত্তম পরিচালন ব্যবস্থা থাকবে।

৩. স্কুলগুলো সরকারি পরিদর্শন ও সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তাদি মেনে চলবে এবং

৪. স্কুলগুলো সচ্ছলভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষার্থীদের নিকট হতে কিছু কিছু বেতন আদায় করবে।[৪]

এ শিক্ষানীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী চক্রান্ত। আজও এদেশে এর প্রভাব লক্ষণীয়।

**ভারতীয় জাতীয় শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশন-১৮৮২ খ্রি.**

পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন হলো হান্টার কমিশন। লর্ড রিপনের নির্দেশে ১৮৮২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি এদেশের শিক্ষার অগ্রগতি ও শিক্ষানীতি নির্ধারণের জন্য স্যার উইলিয়াম হান্টারকে সভাপতি করে এ কমিশন গঠন করেন। সভাপতির নামানুসারে এ কমিশন হান্টার কমিশন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৮৮৩ সালে ২২২টি প্রস্তাবনা সম্বলিত মূল রিপোর্টে ৬০০ পৃষ্ঠায় এবং প্রাদেশিক কমিটিগুলোর রিপোর্টসহ প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠার বিস্তারিত রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করা হয়।[৫]

কমিশনের সুপারিশ মালার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক ছত্রিশটি সুপারিশের অন্যতম ছিল প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার সুপারিশ। এছাড়া পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান, সম্ভবপর স্থানে নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন, গ্রামীণ পরিবারের সুবিধানুযায়ী বিদ্যালয়ে অবস্থানের সময় নির্ধারণ, ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ প্রভৃতি সুপারিশ উল্লেখযোগ্য।

সমাজের সুষম অগ্রগতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মতো উচ্চশিক্ষারও সমভাবে প্রয়োজন আছে মনে করে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়েও তেইশটি সুপারিশ করে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র থেকে

---

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৫ W.W. Hanter, *Report of the Indian Education Commission*, 1883; Report of the Indian Education Commission 182, Calcutta: *The Superintendent of Government Printing, 1883*.

সরকারি নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ শিথিল করে শিক্ষাকে বহুমুখি ধারায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কমিশন সেভাবে পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করার সুপারিশ করে। ভারত সরকার হান্টার কমিশনের দেওয়া প্রায় সকল সুপারিশই অনুমোদন করে। কিন্তু কমিশনের অনেক সুপারিশই যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। তবুও আধুনিক ভারতের ইতিহাসে প্রথম শিক্ষা কমিশন হিসেবে হান্টার কমিশনের গুরুত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কেননা, হান্টার কমিশনই এদেশে সর্বপ্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে স্বীকার করে এর ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে। বলা যায়, কমিশনের সুপারিশসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার মন্থর অগ্রগতির ক্ষেত্রে নতুন গতিশীলতা আনয়ন করে। অন্যদিকে কমিশন কর্তৃক উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহদানের সুপারিশের ফলে উপমহাদেশের উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষারও ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। এ কমিশন শিক্ষার বিভিন্ন ধারা, ধরণ ও স্তরভিত্তিক বিভিন্ন সুপারিশ পেশ করেন। এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষক শিক্ষণ, বিশেষ শিক্ষা, ধর্মশিক্ষা ইত্যাদি। নিচে ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

**ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত সুপারিশ**

উক্ত কমিশনের বলা হয়-ধর্মীয় নীতির উপর ভিত্তি করে এমন একখানি নৈতিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে, যা সরকারি ও বেসরকারি কলেজে শিক্ষা দেয়া যেতে পারে।[৬]

**ধর্মশিক্ষা**

ধর্ম শিক্ষার ব্যাপারে কমিশন ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণের সুপারিশ করে। সরকারি স্কুল ও কলেজে ধর্মশিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করতো সেখানেই সরকারি অনুদান মঞ্জুর করা হতো। তবে নৈতিকতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সজাগ করার জন্য কিছু নির্দেশনা প্রদান করা হয়-

ক. সকল ধর্মের সাধারণ নীতির ওপর পাঠ্যপুস্তক রচনার পরামর্শ দেয়া হয়।

খ. প্রতিটি কলেজে নাগরিক ও মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অন্তত একজন অধ্যাপক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।[৭]

**জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন- ১৯০২ খ্রি.**

শিক্ষার প্রতি লর্ড কার্জনের অনুরাগ ছিল। তিনি ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষার সমস্যাবলী অত্যন্ত যত্নসহকারে অনুধাবন করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, ভারতের তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে সামগ্রিক অবস্থা ছিল আরও হতাশাব্যঞ্জক।

---

৬ *শিক্ষা কমিশন সমূহের সম্বলিত ও সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন* (১৮১৩-২০০৩) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), পৃ. ০৩

৭ মোহাম্মদ ইলিয়াছ আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৬

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান আশানুরূপ না থাকাতে তার জের মহাবিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাদানের মানেও আঘাত হেনেছিল। মহাবিদ্যালয়ে সুষ্ঠু প্রশাসনের অভাব, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব ও অস্বাস্থ্যকর পরিবশে, মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা মানুষের কাছে কোন আবেদন জানাতে পারতনা। প্রযোজনীয় যোগাযোগ সংরক্ষণের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনুমোদিত মহাবিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার পরিবেশের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হতোনা। বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের আকৃতি আশাতীতভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে সিন্ডিকেটের আইনানুগ ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। তাছাড়া ব্রিটিশ প্রদত্ত শিক্ষার ভেতর থেকে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে দেশের নেতৃস্থানীয় অনেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ ও সম্প্রসারণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। এমনি এক পটভূমিতে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতে বড়লাট হয়ে আসে কার্জন। ব্রিটিশ শাসকদের নিকট কার্জন ছিলেন উপযুক্ত ব্যক্তি, যিনি ভারতের জাতীয়তাবাদের বিকাশকে অবদমিত করতে সক্ষম হবেন। লর্ড কার্জন এখানে এসেই সকল স্তরের সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষামূলক কর্মসূচি সামগ্রিক কার্যক্রমের একটি অংশ মাত্র।[৮]

**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি- ১৯১২ খ্রি.** (Dacca University Committee, 1912)

বঙ্গভঙ্গ রদ হবার ফলে সৃষ্ট মুসলিম সমাজের নৈরাজ্য ও ক্ষোভ প্রকাশের লক্ষ্যে বঙ্গভঙ্গ রদ হবার অব্যবহিত পরই মুসলমানদের সান্তনা দেবার জন্য লর্ড হার্ডিঞ্জ ৩১ শে জানুয়ারি, ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে আসেন। তিনি কলকাতায় ফিরে গেলে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি স্যার রাশবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে একটি দল তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের সামনে তিনি ভাবগাম্ভীর্য্যের সাথে সরকারিভাবে ঘোষণা করেন যে, যখন আমি ঢাকা পরিদর্শন করি তখন এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা মুসলমানদের মাঝে একটা প্রকট উৎকণ্ঠাবোধ উপলব্ধি করি। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলশ্রুতিতে যাতে শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা এর চলমান গতিকে শ্লথ না করে দেয়, সে ব্যাপারেই তারা বেশী উদ্বিগ্ন। আমি সেখানে মুসলমানদের একটি সাক্ষাৎ প্রার্থী দলের সামনে বলেছি সরকার চিন্তাভাবনা করছে, যে প্রদেশে কিছুদিন পূর্বে শিক্ষার এত অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে, সেখানে শিক্ষার এ বেগবান ধারাকে অব্যাহত রাখা ও পূর্ববাংলার শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ কর্মকর্তা নিয়োগসহ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেক্রেটারি অব স্টেটস-এর নিকট সুপারিশ পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বঙ্গভঙ্গের এ সীমিত সময়ে নবসৃষ্টি (১৯০৫-১৯১২ খ্রি.) পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের সরকার শিক্ষার উন্নয়নে কতকগুলো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে ফলে এ

৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

সময়ে শিক্ষার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। এর অল্প কিছুদিন পর ভারত সরকার ঢাকায় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেন। ঘোষণার সাথে সাথে আরো পরামর্শ দেন যে, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি শিক্ষা নামে একটি অনুষদও খোলা হবে। সরকার ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে প্রস্তাবিত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কিম তৈরির জন্য স্যার রবার্ট নাথনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি তার সুপারিশমালায় বর্ণনা করেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ০৭টি বিভাগে পাঠদান কর্মসূচী খোলা হয়। (১) কলা (২) বিজ্ঞান (৩) ইসলামী শিক্ষা (৪) আইন (৫) প্রকৌশল (৬) চিকিৎসা (৭) শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

ইসলামী শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কে বলা হয়, এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ ধরণের স্বতন্ত্র বিভাগ হবে, যে বিষয়ে ভারত সরকারও তার চিঠিতে আলোকপাত করেছে, তা সংশ্লিষ্ট সাব কমিটিতেও সুবিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়।সাব কমিটির সদস্যবৃন্দ আশা পোষণ করেন যে, শিক্ষার্থীরা উক্তকোর্স সম্পাদন করবে সে যেন একজন সুযোগ্য পন্ডিত ও আদর্শ সংস্কৃতির ধারক হয়ে বিজ্ঞ পেশার একজন সরকারী কর্মকর্তার যোগ্যতা নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেন।

**হার্লে কমিটি- ১৯১৫ খ্রি.**

ইসলামী শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়গুলোর কাম্যমান সম্পন্ন শিক্ষাদান নিশ্চিত করণার্থে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তদানীন্তন সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। মি. এ.এইচ. হার্লে ছিলেন এ কমিটি প্রধান। বিধায় কমিটি "হার্লে কমিটি" নামেই সুপরিচিত।[৯]

**কমিটির সুপারিশ**

কমিটি মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে যে সুপারিশমালা সরকারের কাছে পেশ করেন। তার প্রেক্ষিতে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতি ও সংস্কৃতির লক্ষ্যে দীর্ঘদিনের মুসলমানদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা করেন। তার সাথে ঘোষণা করা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে পাঠদানকারী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে ঐ অঞ্চলের মুসলমানদের দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত ইসলামী শিক্ষার চাহিদা পুরণ হবে। এ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পর্যায়ে একটি একটি ইসলামী শিক্ষা অনুষদ থাকবে। কিন্তু পরবর্তীতে মি: নাথনের হস্তক্ষেপে অনুষদটি একটি বিভাগে রূপান্তরিত হয়।[১০] এছাড়াও উক্ত কমিটি আরো কয়েকটি বিষয়ে সুপারিশ পেশ করেন-

---

৯ Dr. A.K.M. Ayb Ali, History of Traditional Islamic Education in Bangldesh, p. 93

১০ মোহাম্মদ ইলিয়াছ আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

১. জেলা বোর্ডের শিক্ষা কমিটি, অর্থ কমিটি এবং শিক্ষা পরিদর্শক বিভাগে জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলিম প্রতিনিধি নিয়োগ

২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রদের নৈতিক ও ধর্মশিক্ষা প্রদান

৩. ধর্মশিক্ষা প্রদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা

৪. বিদ্যালয়ে পাঠদানকালীন সময়ে প্রতি শুক্রবারে এক ঘন্টা এবং সপ্তাহের অন্য দিনে ১/২ ঘন্টা করে প্রার্থনার জন্য বিরতি

৫. পাঠ্যপুস্তক কমিটিতে প্রয়োজনীয় হারে মুসলিম সদস্য সংযুক্তকরণ

৬. মুসলিম লেখকদের রচিত বই পাঠ্যপুস্তক হিসেবে প্রচলন

৭. সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ

৮. যে সকল অঞ্চলে মাতৃভাষা বাংলা সেখানে বাংলা ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান এবং যেখানে উর্দু মাতৃভাষা (যেমন, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে) হিসেবে প্রচলিত সেসব স্থানে উর্দুর মাধ্যমে শিক্ষাদান। তবে কুরআন অধ্যয়নের সুবিধার্থে উর্দু ভাষায় প্রাথমিক ধর্ম তত্ত্বগুলো সাধারণভাবে সকল বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা।[১১] বাংলা সরকার মুসলমানদের সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে হর্নেল কমিটির সুপারিশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন এবং অধিকাংশই বাস্তবায়ন করেন।

### শামসুল হুদা কমিটি- ১৯২১ খ্রি. (The Shamsul Huda Committee, 1921)

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা স্থাপনের পর থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই একের পর এক কমিটি নিয়োগ করে কলকাতা মাদরাসার সার্বিক সমস্যা সমাধান করার প্রয়াস চালিয়েছেন। সরকার ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ শে ফেব্রুয়ারি নওয়াব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদাকে প্রেসিডেন্ট করে একটি কমিটি নিয়োগ করেন।[১২]

শামসুল হুদা কমিটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালের ১৫ই এপ্রিল এবং ২য় বৈঠক হয় ১৯২১ সালের ৬ই জুলাই। শেষোক্ত বৈঠকে দুটি সাব-কমিটি গঠিত হয়, একটি প্রশাসনিক ও অপরটি কারিকুলাম বিষয়ক। উভয় কমিটি নিজ নিজ বিষয়ের রিপোর্ট মূল কমিটির নিকট পেশ করেন। মূল কমিটি ১৯২৫ সালের ২৩শে নভেম্বর জন শিক্ষা বিভাগে রিপোর্ট পেশ করেন।

রিপোর্টের প্রথমেই মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি মনোভাব তুলে ধরা হয়। বলা হয়, একটি জাতি হিসেবে মুসলমানরা এমন সব শিক্ষাবিদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, যারা সত্যিকারভাবে

---

১১ ড. মো: আবদুল্লাহ আল-মাসুম, *বৃটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮খ্রি.), পৃ. ১৫৪

১২ মোহাম্মদ ইলিয়াছ আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ। মুসলমানদের প্রাণের দাবির প্রেক্ষিতে গভর্নর ইন কাউন্সিল এমন একটি সরকারি মাদরাসা থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, যেখানে বিশেষভাবে ইসলামী শিক্ষা দেওয়া হবে। এখানে ইংরেজি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে থাকবে বা থাকবে না, এ ব্যাপারে মুসলমানদের মতামত আহ্বান করা হলে আলিয়া মাদরাসা কলিকাতার নামই সবাই উল্লেখ করেন। অতএব এজন্য একটি আলাদা স্থায়ী স্কীম তৈরি করা হলো। যাতে নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আলিয়া মাদরাসার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়।[১৩]

## হার্টোগ কমিটি রিপোর্ট- ১৯২৯ খ্রি. (The Hartog Committee Report, 1929)

প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিতেই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস সংস্কার আন্দোলনের যুগে পদার্পণ করে। মহাযুদ্ধের সময় ভারত তার ধন ও জনবল দিয়ে সাহায্য করার পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছিল, এরই ফলশ্রুতিতে হল ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মন্টেগুফোর্ড শাসন সংস্কার। এ শাসন সংস্কারের ফল ভারতে প্রাদেশিক সরকারের উত্থান। তখন থেকে ভারতে প্রাদেশিক সরকারের দ্বৈতশাসন প্রবর্তিত হল। সংরক্ষিত বিষয়গুলো রইল গভর্নরের শাসন-পরিষদের হাতে। আর হস্তান্তরিত বিষয়গুলো গেল ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে। শিক্ষা হল হস্তান্তরিত বিষয়গুলোর অন্যতম। প্রাদেশিক দ্বৈত-শাসন জনগণকে বিক্ষুব্ধ করল। এ সময় দমনমূলক রাউলার্ট আইন (১৯১৯), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯২১), প্রভৃতি রাজনৈতিক ঝঞ্ঝার মধ্যে সরকার ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত-শাসন আইনের ফলাফল পরীক্ষা করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তাই ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে নিয়োজিত হল সাইমন কমিশন। ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে পরীক্ষা করাই ছিল কমিশনের উদ্দেশ্য। আবার স্বীয় দায়িত্বকে সহজ করার জন্য ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে 'সাইমুন কমিশন' শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শের জন্য নিয়োগ করেন 'হার্টোগ কমিটি'। স্যার ফিলিপ হার্টোগ ছিলেন উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত সরকারের আইন অনুযায়ী আইন সংস্কারের জন্য ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে একটি 'রয়েল কমিশন' গঠিত হয়। কিন্তু ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের সংস্কারগুলো অসন্তোষজনক বলে চিহ্নিত করে ক্রমাগত আন্দোলন চলার ফলে ভারতের শিক্ষার অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করার জন্য ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে 'স্যার জন সাইমনের' সভাপতিত্বে 'রয়েল কমিশন' গঠিত হয়।[১৪] কমিটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বয়স্ক শিক্ষার উন্নয়ন কল্পে বিভিন্ন সুপারিশ করেন। তাছাড়া চাকরির শর্তাবলীর উন্নতির ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ পেশ করেন।

---

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩-৮৪; Dr. A.K.M. Ayb Ali, *History of Traditional Islamic Education in Bangldesh*, ibid, p. 94

১৪ মোহাম্মদ ইলিয়াছ আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

**সাইমন রয়েল কমিশন**

কমিশনকে তার কাজের সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যকারি কমিটি নিযুক্ত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। প্রদত্ত ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে 'রয়েল কমিশন' স্যার ফিলিপ হার্টোগের সভাপতিত্বে একাট উপ-কমিটি বা উপ-কমিশন গঠন করেন। 'স্যার ফিলিপ হার্টোগ' বেশ কয়েক বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রয়েল কমিশনকে সাহায্য করার জন্য ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এ কমিটি Auxillary Commitee of the Indian Statutory Commision ভারতের শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তদন্ত করে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে এক তথ্য বহুল রিপোর্ট প্রণয়ন করে, যা হার্টোগের নামানুসারে জনসাধারণের কাছে 'হার্টোগ কমিটি' বা 'হার্টোগ রিপোর্ট' নামে সুপরিচিত। হার্টোগ কমিটির মতে, তদনীন্তন ভারতে একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব দেশীয় মন্ত্রী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ওপর ছেড়ে দেয়ার ফলে জনসাধারণের দাবীর প্রেক্ষিতে উপমহাদেশে শিক্ষা যথেষ্ট সম্প্রসারণ সাধিত হয়। এর ফলে শিক্ষা শুধু একচেটিয়া ধনী, বিত্তবান ও উচ্চশ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অনুন্নত সম্প্রদায়ও শিক্ষার দিকে এগিয়ে আসার সুযোগ লাভ করে। এ সময় মুসলমানদের মধ্যেও শিক্ষার চাহিদা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।[১৫]

## মুসলিম এডুকেশন এডভাইজারি (মোমিন) কমিটি, ১৯৩১-৩৪ খ্রি. (The Muslim Education Advisory (Momin) Committee, 1931-34)

বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আগস্ট তারিখের সিদ্ধান্তের আলোকে ভারত সরকার বাংলার জনগণের উন্নতি সাধনকল্পে কি নীতি অবলম্বন করা যায় এ সম্পর্কে সরকারের নিকট সুপারিশ করার জন্য ১৯৩১ খ্রি. এর ৩ ফেব্রুয়ারি খান বাহাদুর মৌলভী মুহাম্মদ আব্দুল মোমিনের নেতৃত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি মোমিন কমিটি হিসেবে পরিচিত। এ কমিটি মুসলিম প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে যেসকল সুপারিশ পেশ করেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ-

১. হিন্দু-মুসলিম মিশ্রিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। যে বিদ্যালয়ে দু'জন শিক্ষক থাকবে সেখানে অবশ্যই একজন মুসলিম থাকবে।

---

১৫ Dr. Sekander Ali, *Report on Islamic Education and Madrasah Eduction in Bangladesh*, p. 25

২. যে কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতি ক্ষুন্ন হতে পারে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন কোন ধর্মীয় প্রতীকের প্রদর্শন বা ধ্বনির ব্যবহার বন্ধের জন্য বিধি প্রণয়ন করা উচিত।

৩. প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচি সংস্কারের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য আরও উপযোগী করে তোলা এবং প্রতি বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষাকে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

৪. স্থানীয় সংস্থার শিক্ষা কমিটিতে এবং প্রাথমিক শিক্ষা আইনের আওতাভুক্ত স্কুলসমূহে মুসলিম সমাজের যথাযথ প্রতিনিধি থাকা উচিত।

৫. মক্তব বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ছাত্ররা মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রে যোগ্য হিসেবে গড়ে ওঠে।

৬. জেলা স্কুল বোর্ডের অন্তত অর্ধেক সদস্য মুসলমান থাকা উচিত।[১৬] সরকার মোমেন কমিটির বিবরণ ও সুপারিশ বিশেষভাবে বিবেচনা করে এবং ঐ রিপোর্ট সরকারিভাবে প্রকাশ করে। কমিটির প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের জন্য একজন বিশেষ শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ করেন।

**মাদ্রাসা শিক্ষা (মওলা বখস) কমিটি- ১৯৪১ খ্রি.** (The Madrasha Educaiton (Mawla Baksha) Committe, 1941)

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে জুলাই সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে নিম্নের সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উদ্দেশ্য হল, এ প্রদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে উদ্ভূত সমস্যাদি চিহ্নিত করা এবং এতদসংক্রান্ত সুপারিশমালা পেশ করে। কমিটি পুরাতন স্কীম মাদরাসার পাঠ্যবিষয়ের সংস্কারের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কতকগুলো সুপারিশ পেশ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

১. কলকাতায় একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, যার আওতায় থাকবে ওল্ড-স্কীম ও নিউ-স্কিমভুক্ত সকল প্রকার মাদরাসা ও ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব। কমিটি অনুধাবন করেন যে, এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ছাড়াও ইসলামি শিক্ষার উন্নয়ন, প্রসার ও গবেষণাসহ সমকালীন সাধারণ শিক্ষার আধুনিক বিষয়েও জ্ঞানার্জন প্রয়োজন।

২. যখন প্রস্তাবিত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে, তখন প্রাথমিকভাবে তা একটি এফিলিয়েটিং ইউনিভার্সিটি হবে। পরবর্তীতে এটাকে এমনভাবে উন্নীত করতে হবে, যাতে পর্যায়ক্রমে এটি একটি শিক্ষাদানকারী ও গবেষণা পরিচালনাকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

---

১৬ ড. মো: আবদুল্লাহ আল-মাসুম, *বৃটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

৬. কমিটি জোর সুপারিশ করেন যেন সরকার এ ধরনের প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনীয় "এ্যাক্ট" দ্বারা এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল যে, কমিটির সুপারিশের ব্যাপারে সরকার কোন বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এখানে উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে তদানীন্তনকালের বাংলার বাঘ বিখ্যাত জাতীয় নেতা জনাব এ.কে. ফজলুল হক ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিত বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন, যার প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ও সহযোগিতায় মাওলা বখশ কমিটি গঠিত হয়। কলকাতা মাদরাসার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান উপলক্ষে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঘোষণা করেন যে,

> "My earnest desire to develop Madrasah Education may I intend to bring into existence an Arabic University. I am waiting for the report of the which has been set up for the purpose and I shall do whatever is possible for the implemention of the recommendations of the Committee." [১৭]

**মাদ্রাসা সিলেবাস (সৈয়দ মুয়াযযাম উদ্দীন হোসেন) কমিটি- ১৯৪৭ খ্রি.** (Sayed Muazzamuddin Hossain) Committee, 1947)

মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য যে সব কমিটি এতদিন হয়েছিল তার মধ্যে মুয়াযযাম উদ্দীন কমিটি বাস্তবিক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। এই কমিটি গঠিত হয় ১৯৪৬ সালের ৪ জুলাই।[১৮] উক্ত কমিটি শিক্ষা সংস্কারে নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করে।

**সুপারিশমালা**

১. বাংলার মুসলমানদের যথাযথ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে একটি "মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপন করা অপরিহার্য, যাতে মুসলমানরা তাদের লালিত ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাক্রমে ধর্মীয় বিষয়ক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং সর্বোপরি মাদরাসা শিক্ষা একটি সুষ্ঠুভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে সে ব্যাপারে সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে।

---

১৭ মোহাম্মদ ইলিয়াছ আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯-২০

১৮ Dr. A.K.M. Ayb Ali, *History of Traditional Islamic Education in Bangldesh*, ibid, p. 121

ক. মুসলমান ছেলে-মেয়ের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় সাধারণ বিদ্যালয়গুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হবে। আর তা হবে ইসলাম ধর্মের আদর্শের আলোকে। মুসলমান ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য মক্তবগুলোকে পুনর্গঠন করতে হবে।

খ. মুসলিম ছেলে-মেয়েদের জন্য চিহ্নিত স্কুলগুলোতে তৃতীয় শ্রেণি হতেই বাধ্যতামূলকভাবে আরবি বিষয় পড়াতে হবে।

গ. সাধারণত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা ইসলামি নীতিশিক্ষাসহ পবিত্র কুরআন পাঠের জন্য সুযোগ-সুবিধা রাখতে হবে।

ইংরেজ শাসনের অবসান হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য যুগে পূর্বপাকিস্তানের জনসাধারণ এদেশের শিক্ষার উন্নতিতে যে আশা পোষণ করতেন তাতো পূরণ হয়নি বরং তাদেরকে নানান সময়ে নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে। ফলে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার সুফল থেকে বঞ্চিতই রয়ে যায়। তারা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সৃজনশীলতা ও উদ্দীপনার সঙ্গে কাজ করে যেতে সক্ষম হয়নি। তাই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিতদের অধিকাংশরই কাম্য ছিল শুধু সরকারি চাকরি। তাই আলোচ্য যুগে উচ্চশিক্ষার ব্যাপক বিস্তারলাভ হলেও তা জীবনের চাহিদার জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ এদেশের মানুষ ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হলেও কারো কারো স্বেচ্ছাচারিতা, সুযোগপ্রিয়তা এবং আঞ্চলিকতা প্রভৃতি কলুষতা সাধারণ্যে বিস্তার লাভ করতে থাকে। ফলে ঈপ্সিত আশা-আকাঙ্ক্ষার সন্তুষ্টি সাধন সম্ভব হয়নি। তাই এ ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার দরুন একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা, উদ্যম ও উদ্যোগের অভাব দেখা দেয়, অন্যদিকে তেমনই দুর্নীতি, স্বার্থপরতা ও শঠতার প্রসার লাভ করে। ফলশ্রুতিতে এর প্রতিকারকল্পে নিপীড়িত বাঙ্গালীদের পক্ষে সক্রিয় আন্দোলন করা ছাড়া বিকল্প কিছুই ছিল না। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এহেন জনগুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আশু সমাধান না করে সংখ্যাগুরু জনমতকে দমিয়ে রাখার প্রয়াস ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক। অবশ্য পাকিস্তান সরকার শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনও গঠন করে এর সমাধানের উপায় খুঁজে বের করেছেন। কিন্তু সুপারিশগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হবার ফলে সমস্যা সমস্যাবর্তে রয়ে গেছে, কোন সুরাহা হয়নি।

**ব্রিটিশ বাংলায় সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয় শিক্ষা অর্ন্তভুক্তকরণ**

১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে এ.কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি সরকার গঠন করলে এ.কে. ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বও পান। সারা বাংলার শিক্ষাব্যবস্থায় এক নব জাগরণ শুরু হয়। তিনি মুসলিম প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য মক্তবগুলোকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রুপান্তরের

উদ্যোগ নেন। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বেশ কিছু মক্তবকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজান। ১৯৩৮ সালে প্রাথমিকের নতুন পাঠ্যসূচি প্রকাশ করেন। এতে সকল ধর্মের শিক্ষাকে পাঠ্যসূচির অর্ন্তভুক্ত করা হয়।[১৯]

১লা জানুয়ারি ১৯৪১ সালে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন পাঠ্যক্রম চালু হয়। ফলে মক্তব ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে আর কোন বৈষম্য থাকল না। মুসলমানদের দাবির মুখে আধুনিক পাঠ্যসূচির পাশাপাশি ধর্মীয়শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনামলে প্রথমবারের মত পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয়শিক্ষা অর্ন্তভুক্ত হয়। মুসলিম প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এই যুগান্তকারী পদক্ষেপের জন্য ফজলুল হক সরকার মুসলমানদের নিকট স্মরণীয় হয়ে আছেন।

**পাকিস্তান আমলঃ ১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.**

পাকিস্তান আমলে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রচলন না করে প্রাক-স্বাধীনতা আমলের বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠন করে এবং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ সকল কমিশন ও কমিটির সুপারিশ যদিও কখনো পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি তথাপি তাদের সুপারিশসমূহ শিক্ষার উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে এবং শিক্ষার ভৌত অবকাঠামো তৈরি, সিলেবাস-কারিকুলাম প্রস্তুত, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও শ্রেণিবিন্যাসে সাহায্য করে। এ সমস্ত কমিটি ও কমিশনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল:

**মাওলানা আকরাম খান কমিটি (১৯৪৯-৫১)**

শিক্ষা জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির চাবিকাঠি এবং দেশের দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট তারিখে এ উপমহাদেশে স্বাধীন গণতান্ত্রিক ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে এ সদ্যজাত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারায় এক ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। এ পরিবর্তন অবস্থার চাহিদা পূরণার্থে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার ও গ্রাদেশিক সরকার বহু শিক্ষাকমিশন ও কমিটি গঠন করে। দেশে প্রচলিত ব্রিটিশ প্রবর্তিত ত্রুটিপূর্ণ ও ভারসাম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার জন্য প্রয়াস চালান। কারণ স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর থেকেই একটি স্বাধনি মুসলিম দেশে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় ভেবে ইসলামি ভাবধারায় নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য জনগণও সোচ্চার দাবী তোলেন।

---

১৯ ড. মো: আবদুল্লাহ আল-মাসুম, *বৃটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।

**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে জাতীয় পর্যায়ে সারা দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে করাচিতে একটি শিক্ষা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেই অধিবেশনের সুপারিশমালার আলোকে দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও সময়োপযোগী একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জনগণের অনুভূতির প্রতি অনুকূল সাড়া দিতে গিয়ে সরকার ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই মার্চ শিক্ষাম সমস্যাকে ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানে দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খানের সভাপতিত্বে ১৭ সদস্যের একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেন। কমিটির সভাপতির নামানুসারে এটি 'আকরাম খান শিক্ষা কমিটি' নামে পরিচিত। এ কমিটি প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা, নারীশিক্ষা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন, পরীক্ষা সংক্রান্ত শিক্ষা প্রশাসন ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে সুপারিশ পেশ করে।

**ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত সুপারিশ**

**মাধ্যমিক শিক্ষা**

ধর্মকে মুসলমান শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক বিষয় করার জন্য সুপারিশ করা হয়। অমুসলমানদের ক্ষেত্রেও নৈতিক শাস্ত্রকে সাধারণ বিষয় হিসেবে দেয়া যেতে পারে যদি তারা স্বীয় ধর্মে অধ্যয়ন করতে না চায়।[২০] বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের মাঝে মানবিকতা ও নৈতিকতা মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় মাওলানা আকরাম খানের এ সুপারিশ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়।

**পূর্বপাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন -১৯৫৭ খ্রি.**

তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানের চীফ মিনিস্টার জনাব আতাউর রহমান খানকে চেয়ারম্যান করে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠন করার লক্ষ্যে ১৯৫৭ সালের ৩রা জানুয়ারি সরকার 'শিক্ষা সংস্কার কমিশন" নামে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করে।

**জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট-১৯৫৯ খ্রি. এস.এম. শরীফ কমিশন**

পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার উপর ভিত্তি করে জাতীয় শিক্ষার সুসংবদ্ধ ও সুষম উন্নয়নের স্বার্থে উপনিবেশিক আমলের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনে ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা সচিব এস.এম

২০ মোহাম্মদ ইলিয়াছ আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯।

শরীফকে এ কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। চেয়ারম্যানের নামানুসারে এ কমিশন শরীফ কমিশন নামে পরিচিত। ৫ জানুয়ারি ১৯৫৯ সালে ১১ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিশনের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান। তিনি আধুনিক সুযোগ সুবিধার সমন্বয়ে একটি যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা পেশ করার আহ্বান জানান। এ কমিশনের অনেকগুলো লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষাকেও গুরুত্ব প্রদান করা হয়। যেমন:

১. সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষা বর্তমান থাকতে হবে।

২. শিক্ষাব্যবস্থাকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা, সংহতি ও শক্তি ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে এবং ইসলামিক, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

এই কমিশন দীর্ঘদিন ধরে দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রশ্নমালা প্রেরণের মাধ্যমে বহুসংখ্যক শিক্ষাবিদ, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিনিধি, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক অফিসার, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করেন। উক্ত পরামর্শগুলোর ব্যাপক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে ১৯৬০ সালে সরকারের নিকট একটি রির্পোট পেশ করেন। সাধারণ শিক্ষাধারায় ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে শরীফ কমিশনের সুপারিশসমূহ:

১. প্রথম শ্রেণি হতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা মুসলমান ছাত্রদের জন্য আবশ্যক করা হয়। যার সিলেবাস হলো:

ক. সকল ছাত্র পবিত্র কুরআন শরীফ পাঠ করা শিখবে।

খ. কালিমা, নামাজে ব্যবহৃত সুরাসমূহ শিক্ষা করাসহ আরো কিছু আয়াত মুখস্থ করা সকল মুসলিম ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়।

গ. আকর্ষণীয় ও সহজ সরল ভাষায় পবিত্র কুরআন মজিদ, মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনী, ইসলামের ইতিহাস, শিক্ষা ও সাহিত্য হতে গৃহীত উপাখ্যান ও উপদেশপূর্ণ গল্প ইসলামিয়াত সম্পর্কিত বিষয়াদী পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত হবে।

ঘ. পবিত্র কুরআনের সামাজিক সৎকর্ম ও সাধুতা বিষয়ক আয়াতসমূহ অর্থসহ পাঠ্যভুক্ত করে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

২. নবম-দশম শ্রেণিতে ধর্মীয় শিক্ষাকে ঐচ্ছিক হিসাবে রাখা হয়।

৩. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের অবশ্যই ইসলামিয়াত পাঠদানের যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং এ ইসলামিয়াত অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

৪. একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ধর্মীয় শিক্ষা ইসলামিক স্টাডিজ এর অঙ্গীভূত হবে এবং তা ঐচ্ছিক হিসাবে থাকবে।

৫. ইসলামকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সহকারে বিশ্লেষণের যোগ্যতা অর্জন ও আধুনিক জীবনের সমস্যা সমাধানে যথাযথ ইসলামি জ্ঞানের প্রয়োগ করতে হবে।

৬. শিক্ষার্থীদের কুরআন মজিদ, হাদিস, ইসলামি আইন, মুসলিম ইতিহাস ও দর্শন সিলেবাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে শিক্ষা দিতে হবে।

৭. ইসলামের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইসলামি শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগের উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৮. এ দেশের বেশিরভাগ জনগণই মুসলমান। এ কারণে ইসলামধর্ম শিক্ষা এদেশে একটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। তাই পাকিস্তানকে তার বিবেক ও আত্মার কাছে পরিচ্ছন্ন থাকতে হলে তাকে ইসলাম এবং ইসলামি নীতি ও আদর্শকে প্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

উল্লেখ্য অন্যান্য কমিশনের মতোই শরীফ কমিশনের মাত্র কয়েকটি সুপারিশ বাস্তবায়ন হলেও বেশিরভাগ সুপারিশ আলোর মুখ দেখেনি। তবে এটা বলা যায় যে জ্ঞানের ইসলামীকরণে শরীফ কমিশন অন্যান্য কমিশনের তুলনায় বেশি ভূমিকা রেখেছে।[২১]

**ইসলামি-আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি- ১৯৬৩-৬৪ খ্রি.**

মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ পাদপীঠ হিসেবে দেশে একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মাদ্রাসা ছাত্র ও ইসলামদরদী জনতার আন্দোলন দিনদিন তীব্রতর হতে থাকে। এ আন্দোলনের চাপের মুখে বাধ্য হয়ে তদানীন্তন সরকার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশ্বাস প্রদান করেন। সরকার তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে মে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর এবং আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি পূর্ণ এক বছর কঠোর পরিশ্রম করে কর্ম পরিধি মোতাবেক কার্য সম্পাদন করতঃ ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর রিপোর্ট জমা দেন।

**কমিটির উদ্দেশ্যঃ** মাদ্রাসা শিক্ষার পুনর্গঠনের প্রশ্নটির ব্যাপারে সরকার পূর্ব থেকেই চিন্তা ভাবনা করে আসছিল। এ ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং একটি কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশন মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা পূর্বক সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি উপযুক্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন করে সরকারের নিকট পেশ করেন।

এ উদ্দেশ্যে সরকার ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন নিয়োগ দান করেন। এ কমিশনের সভাপতি করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বিভাগের প্রধান ড. এস.এম. হোসেনকে। তার নামানুসারে এ কমিশন "মুয়াযযাম হোসাইন কমিটি" নামেও খ্যাত।

---

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২-৩০৪।

**কমিটির কর্মপরিধি**

১. বর্তমানে মাদ্রাসায় প্রদত্ত ইসলামি শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার বৃহত্তর আঙ্গিকে সমন্বয় সাধন করতে হবে, যাতে বাস্তব ইসলামি শিক্ষার প্রসার ঘটানো যায় তার উপায় খুঁজে বের কতে হবে।

২. কমিটির সুপারিশক্রমে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার আঙ্গিকে মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সর্বস্তরে আনতে হবে যাতে মাদ্রাসার শিক্ষিতরা কর্মজীবনে সম্মানজনকভাবে কর্মে নিয়োজিত হয়ে সমাজে অর্থবহ অবদান রাখতে সক্ষম হয় তার কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে।

৩. ইসলামি শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে এবং ইসলামি বিষয়ে গবেষণার উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি নিশ্চিত করতে হবে।

৪. দেশে প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও উপরোক্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সুপারিশ পেশ করতে হবে।

**কমিটির সুপারিশমালা**

১. যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্থায়ী অনুষদ ও প্রয়োজনীয় বাসস্থান, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতিসহ আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু আরবি ও ইসলামি শিক্ষা অনুষদের কার্যক্রম ঢাকা মাদরাসা-ই-আলিয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে শুরু করে চালু রাখতে হবে। বাকী তিনটি অনুষদ নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে খুলতে হবে।

২. সুপারিশ করা হয় যে, মাদ্রাসা শিক্ষার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. মাদ্রাসায় প্রচলিত নিম্নমানের শিক্ষার উন্নয়নকল্পে বর্তমান শিক্ষার ব্যাপ্তি আরো দুই বছর বাড়ানো প্রয়োজন। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের ব্যাপ্তি হবে নিম্নরূপ-

| স্তরের নাম | ব্যপ্তিকাল | গমমান |
|---|---|---|
| দাখিল (আপার) | ২ বছর | মাধ্যমিক স্তরের অষ্টম শ্রেণি |
| আলিম | ২ বছর | মাধ্যমিক স্তর |
| ফাযিল | ২ বছর | উচ্চ মাধ্যমিক স্তর |
| কামিল | ২ বছর | বি.এ. (পাশ) |
| কামিল (সম্মান) | ৩ বছর | বি.এ.(সম্মান) |
| তাখাসসুস | ১ বছর | এম. এ. |

৪. ডিগ্রি স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা বাংলা, আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ, অনুষদের উচ্চ স্তরে শিক্ষার মাধ্যম আরবি কিংবা বাংলা হতে পারে।

৫. বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

৬. দেশে প্রচলিত তিনটি সরকারি মাদ্রাসায় বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগ চালু করতে হবে।

৭. মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলির সৎ পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে কারিগরি ও শিক্ষা পরিদপ্তরের ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য একটি পৃথক ডাইরেক্টরেট স্থাপন করার জোর সুপারিশ করা হল।

৮. মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে অতীতের যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নানা কারণে প্রশ্নাতীত ছিল না ফলে তা থেকে সন্তোষজনক সুফল ও পাওয়া যায়নি। প্রায় দু'হাজারের অধিক মাদ্রাসা লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর জন্য এটা অতীব প্রয়োজন যে, ইসলামি শিক্ষার সাথে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় সমন্বয় ঘটিয়ে ইসলামিক শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার দ্বার উন্মোচন করার লক্ষ্যে দেশে একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা একান্ত অপরিহার্য।

৯. এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম অনতিবিলম্বে শুরু করতে হবে আপাতত ঢাকার মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়ায় প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উপযুক্ত অবস্থান ও এলাকা নির্ধারণ করতঃ স্থায়ী ক্যাম্পাস ও প্রয়োজনীয় দালান কোঠা নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ পর্যায়ক্রমে এগিয়ে নিতে হবে।

১০. এ বিশ্ববিদ্যালয় হবে একটি পাঠদানকারী, আবাসিক ও অনুমোদনদানকারী (এফিলিয়েটিং) বিশ্ববিদ্যালয়।

১১. এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মূল লক্ষ্য হল যে, এ বিশ্ববিদ্যালয় এমন হবে যেখান থেকে আধুনিক জ্ঞান সমৃদ্ধ ইসলামিক স্কলার্স ও অত্যন্ত বিজ্ঞজন পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব বের হয়ে আসবে যারা ইসলামকে বর্তমান বৈজ্ঞানিক বিশ্বের অধুনা বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে চিত্রিত করে ব্যাখ্যাদানে সক্ষম এবং একই সাথে মর্যাদাপূর্ণ সুন্দর জীবন যাপনের উপকরণ অর্জনে পারঙ্গম হবেন।

১২. এর অন্যান্য লক্ষ্য হবে এদেশের যুবক ও তরুণদের সমকালীন আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বাস্তব শিক্ষাসহ ইসলামি বিষয়ে জ্ঞানসমৃদ্ধ উন্নত চরিত্রের অধিকারী নাগরিক সৃষ্টি করা। যাতে তারা নিজেদেরকে সুযোগ্য ও উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়।

১৩. ইসলামিক-আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পাঠ্যপুস্তক, জার্নাল ও অন্যান্য ডকুমেন্ট নিয়মিতভাবে ছাপার জন্য প্রেস এন্ড পাবলিকেশন ডিপার্টমেন্ট থাকবে। তদুপরি সেখানে লেখক, সংকলক ও অনুবাদকদের জন্য একটি ভিন্ন ব্যুরোও থাকবে।

১৪. প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে মাদরাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কার্যক্রমের সাথে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে ও যোগসূত্র স্থাপন রক্ষার্থে পূর্ব-পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন।

**এয়ার মার্শাল এম. নূর খান কমিশন (১৯৬৯)**

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত শিক্ষার উন্নয়নে যত কমিটি, কমিশন গঠন করা হয়েছে সবগুলোই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। বেকারত্বের হারও বেড়েছে বহুগুণে। তাছাড়া শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে জনমনে নানা ধরনের অশান্তি বিরাজ করছে। তাই এ অবস্থার উন্নয়নে ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা, বেকারত্ব দূরীকরণ ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল এম. নূর খানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি নিউ এডুকেশন পলিসি বা নূর খান শিক্ষা কমিশন নামে পরিচিত। এ কমিশন ইসলামের ধর্মীয় ভাবধারার সাথে সঙ্গতি রেখে সকলের জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা পেশ করেন। ইসলামি শিক্ষার ব্যাপারে যেসব সুপারিশ পেশ করেন তা হলো:

১. মাদরাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং তা হবে ইসলামি ভাবধারার চাহিদার আলোকে।

২. সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইসলামিক স্টাডিজ বাধ্যতামূলক থাকবে। পরবর্তী স্তরগুলোতে ঐচ্ছিক হিসাবে থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইসলামি বিষয়ে গবেষণার সুযোগ তৈরি করতে হবে।

৩. সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার সাথে মাদরাসা শিক্ষা অঙ্গীভূত হবে এবং এর সর্বস্তরের সাথে সাধারণ শিক্ষার স্তরভিত্তিক সমতা বিধান করতে হবে। যাতে মাদরাসা শিক্ষিতরা সাধারণ শিক্ষিতদের মতো সমসুযোগ সুবিধা ও চাকুরি লাভের সুযোগ পায়।

ইসলামি শিক্ষায় এ কয়েকটি সুপারিশ ছাড়া নূর খান কমিশনের উল্লেখযোগ্য কোন অবদান বা সুপারিশ ইসলামের পক্ষে ছিলনা। বস্তুত ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান তৈরির কোন পদক্ষেপ এই শিক্ষানীতিতেও নেয়া হয়নি। আর পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) পাকিস্তান আমল থেকেই ইসলাম বিরোধীদের কূটকৌশল সমর্থনে সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থার দিকে ধাবিত হয়। আর ইসলামি শিক্ষা বিষয়ক সংস্কার কাগজে কলমেই রয়ে যায়।[২২]

---

২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০-৩১২

**শামসুল হক কমিটি- ১৯৭০ খ্রি.**

শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমস্যা নিরসন, শিক্ষার্থীদের সমস্যা দূরীকরণ ও জাতীয় চাহিদার আলোকে শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক বিষয়ে নিবিড় পর্যালোচনার লক্ষ্যে ১ জানুয়ারি ১৯৭০ সালে জনাব শামসুল হকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের সুপারিশের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা তথা ইসলামি শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ পেশ করেন। উক্ত কমিটি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করে।

**সুপারিশমালা**

১. ধর্মীয় শিক্ষাকে যুগের চাহিদা অনুসারে পুনর্বিন্যাস করা দরকার। যাতে ইসলামের শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের মাঝে এমনভাবে প্রতিফলিত করতে হবে যাতে তা অনুপ্রেরণার উৎস ও চালিকা শক্তি হিসেবে দেশের একতা, সংহতি ও উন্নতি সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সেজন্য যথাযোগ্য একটি কারিকুলাম কমিটি গঠন করা দরকার যার তত্ত্বাবধানে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য একটি উপযুক্ত শিক্ষাক্রম তৈরি করা যায়। অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার্থীরা যেন স্ব স্ব ধর্ম শিক্ষা পেতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

২. উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় বিষয়ের বুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জন করে।

৩. নির্বাচিত কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট ফর ইসলামিক স্টাডিজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে পাঠদান, গবেষণা ও প্রকাশনার সুযোগ থাকবে।

এ শিক্ষানীতির সুপারিশমালা পেশ করার পর বাস্তবায়নের সুযোগই পাওয়া যায়নি। কারণ তখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব। দেশ বিভাগের পর থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত ইসলামি শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন গঠিত হলেও কাজের অগ্রগতি কিছুই হয়নি। বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় আবেগ, অনুভূতির যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি।[২৩]

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১-৪২

.

# চতুর্থ অধ্যায়

## স্বাধীনতা পরবর্তী শিক্ষাকমিশন ও সরকারি শিক্ষানীতিতে ধর্মীয়নীতি ও মূল্যবোধ প্রসঙ্গ

# চতুর্থ অধ্যায়
# স্বাধীনতা পরবর্তী শিক্ষাকমিশন ও সরকারি শিক্ষানীতিতে ধর্মীয়নীতি ও মূল্যবোধ প্রসঙ্গ

প্রাচীন বাংলার পরিচয় গঠনে ভূগোল, জনজাতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক বিন্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রাচীন গ্রিক, রোমান ও চীনা ভ্রমণকারীদের বিবরণে "গৌড়", "পুণ্ড্র" ও "বঙ্গ" নামে পরিচিত এ অঞ্চল ছিল নদীনির্ভর কৃষি, নৌবাণিজ্য ও নগরজীবনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। পাল ও সেন যুগে বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের সাংস্কৃতিক বিকাশ, স্থাপত্যশিল্প এবং পুঁথি-সংস্কৃতি বাংলার প্রাচীন পরিচয়কে শেকড়গাঁথা করে। মধ্যযুগে সুফি-দরবেশদের সামাজিক সম্পৃক্ততা ও মুসলিম শাসকদের প্রশাসনিক কাঠামো বাংলা ভাষা, কৃষি-উন্নয়ন ও আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। পরবর্তী মুঘল শাসন নগরায়ন, রাজস্বনীতি ও যোগাযোগব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে, যা বাংলার অর্থনৈতিক পরিচয়কে আরও সুসংগঠিত করে। ব্রিটিশ আমলে আধুনিক শিক্ষা, শিল্পায়ন ও প্রশাসনিক কাঠামোর উদ্ভব হলেও উপনিবেশিক শোষণ জাতীয় চেতনাকে উজ্জীবিত করে। ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন সংগ্রাম এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিসত্তা একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রিক পরিচয়ে রূপ নেয়। এভাবে যুগে যুগে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশের পরিচয় একটি ঐতিহাসিকভাবে গঠিত, বহুস্তরীয় ও গবেষণাযোগ্য বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে।

**বাংলাদেশের পরিচয়**

বাংলার ইতিহাস অতিপ্রাচীন, কিংবদন্তী ও ঐতিহ্যমণ্ডিত। বাঙালির ও অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর সভ্যতার ইতিহাসও অতিপ্রাচীন। প্রাচীনকালে অনেক জনপদ নিয়ে বাংলা ভাষাভাষী জনগণের এই দেশ গঠিত। প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে পরিচিতি ছিল। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের আগে কোনো রাষ্ট্রীয় নামের পরিচিতির চেয়ে বাংলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নামে পরিচয়ই অধিক পরিচ্ছন্ন ও বোধগম্য ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

প্রাচীনকাল থেকে আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ, সপ্তম শতক পর্যন্ত এই দেশ গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, বরেন্দ্র, তাম্রলিপ্ত, সমতট ও হরিকেল ইত্যাদি আঞ্চলিক বা জনপদের নামে বিভক্ত ছিল। পরবর্তীকালে যেটা বাঙালির আবাসভূমি 'বঙ্গদেশ' নামে অভিহিত হত, সেটা প্রাচীনকালের বহু জনগোষ্ঠীর আবাসস্থান হয়ে বহুজনপদে বিভক্ত ছিল। বাংলা বলতে বিস্তৃত এক ভূ-খণ্ডকে বোঝাতো। ১৯৪৭- এর পূর্বে ব্রিটিশ ভারতের 'বেঙ্গল' প্রদেশের ভূখণ্ডই বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এ ভূখণ্ডের একটি আঞ্চলিক সত্তা ছিল এবং ভূগোলবিদগণও এই উপমহাদেশের মধ্যে

'বাংলা'-কে একটি ভৌগলিক অঞ্চল বলে স্বীকার করেন। প্রায় ৮০ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত নদী বিধৌত পালি দ্বারা গঠিত এক বিশাল সমভূমি এই বাংলা। এর পূর্বে ত্রিপূরা, গারো ও লুসাই পর্বত মালা; উত্তরে শিলং মালভূমি ও নেপাল; পশ্চিমে রাজমহল ও ছোট নাগপুর পর্বতরাজির উচ্চ ভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।[১]

একসময় বাংলাদেশ ভারত বর্ষের অংশ ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলিম বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি বাংলার উত্তর-পশ্চিমাংশে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। এরপর সুদীর্ঘকাল বাংলায় মুসলিম শাসন বহাল থাকে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্যদিয়ে বাংলার ১৯০ বছরের (১৭৫৭-১৯৪৭খ্রি.) ব্রিটিশ শাসনের সূচনা হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালির আবাসভূমিকে বলা হত 'বঙ্গদেশ'। ইংরেজিতে বলা হত 'বেঙ্গল' (Bengal)। 'বেঙ্গল' (Bengal) নামটা দিয়েছিল ইংরেজরা। তারা এটা নিয়েছিল পর্তুগিজদের দেওয়া 'বেঙ্গালা' শব্দ থেকে। 'বেঙ্গালা' শব্দটি মুসলামনদের দেওয়া 'বঙ্গালাহ' শব্দের রূপান্তর মাত্র। বহু সংঘাতপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার মাঝ দিয়ে 'বঙ্গ' শব্দটি থেকেই এদেশের নাম নানা সময়ে হয়েছে বঙ্গ, বঙ্গদেশ, বঙ্গীয় এলাকা, বঙ্গ প্রদেশ, পূর্ব বঙ্গ, পূর্ব বাংলা (পূর্ব পাকিস্তান), বাঙালি, এবং দীর্ঘ নয় মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামে রূপান্তরিত হয়েছে।[২]

ব্রিটিশ শাসনামলে এ ভূখণ্ডটি পূর্ববঙ্গ এবং পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান নামেও আখ্যায়িত হয়ে আসছিল। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে নতুন বাংলাদেশের জন্ম হয়।[৩] তিস্তা, সুরমা, কর্ণফুলি, গঙ্গা, যমুনা ও মেঘনার অববাহিকায় ২০° ৩৪ ও ২৬° ৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° ০১ ও ৯২° ৪১ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত দীর্ঘ প্রসারিত সমতল ভূখণ্ডটি হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশ।[৪] এর উত্তরে হিমালয় ও মেঘালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ভারত ও মিয়ানমারের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ও পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। বাংলাদেশের সীমানা নানা সংঘাত, বিবর্তন, উত্থান-পতনের বেড়াজাল পেরিয়ে আয়তন ও সীমানা বারবার বদলেছে।[৫]

---

১ মুহাম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৫), পৃ. ১৭

২ পরিতোষ কুমার কুন্ডু, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা : অর্ণব পকাশনী, ২০০৩) পৃ. ২৪৮

৩ Government of The People's Republic of Bangladesh, *Statistical Yearbook of Bangladesh 2015*, Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics & Information Division (SID), Ministry of Planning, 35th Edition, May 2016, p.51

৪ পরিতোষ কুমার কুন্ডু, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা : অর্ণব পকাশনী, ২০০৩) পৃ. ২৪৮

৫ ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষা প্রসার উন্নয়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫খ্রি.), পৃ. ৬০

## শিক্ষানীতির পরিচয়

শিক্ষা ও জীবন সমার্থক। জন্ম থেকেই মানুষের শিক্ষা শুরু হয় এবং আমরণ তা ব্যাপৃত থাকে। মানবজন্মের উষালগ্ন থেকে এই শিক্ষার সূত্রপাত। প্রাথমিক যুগে মানুষকে জীবনধারণের জন্য বিভিন্ন উপায়, কৌশল এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হত। প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য, খাদ্য সংগ্রহের জন্য, বন্যপশুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকার কলা-কৌশল ও অভিজ্ঞতাকে প্রয়োগ করার নামই হচ্ছে শিক্ষা।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অন্যতম উপাদান হচ্ছে পাঠ্যবিষয়। শিক্ষণীয় বিষয় শিশুদের নিকট আনন্দদায়ক হওয়া প্রয়োজন। কারণ পাঠ্যবিষয় যদি কঠিন হয় এবং শিশু যদি তার মধ্যে কোনরূপ আনন্দ খুঁজে না পায়, তা হলে সে শিক্ষা শিশুর জন্য কার্যকরী হবে না। পাঠ্যসূচি শিশুমনের উপযোগী না হলে, শিশুরা তা কখনও পড়তে আগ্রহী হবে না। শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন অর্থাৎ শিশুর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। প্রত্যেক শিক্ষকের শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।[৬]

আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক। জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে শিশুর ভবিষ্যতের উপর। শিশুকে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষকের ভূমিকা অনন্য। শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ এ দুয়ের সমন্বয়ে শিক্ষা পরিপূর্ণ রূপ লাভকরে। প্রত্যেক জাতি তথা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতির দ্বারা পরিচালিত। শিক্ষাব্যবস্থার এই নিয়মনীতি জাতীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটেই রচিত হয়ে থাকে। শিক্ষাব্যবস্থা সূচারুরূপে পরিচালনার জন্য এই সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন গুলোকেই শিক্ষানীতি বলা হয়।

## জাতীয় শিক্ষা কমিশন-১৯৭২ খ্রি. (কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন)

১৯৭২ সালের ২৫ জুলাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এক প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, দেশের সীমিত সম্পদের কথা বিবেচনায় রেখে কমিশন শিক্ষার এমন এক দীর্ঘ মেয়াদী রূপরেখা প্রণয়ন করবেন যা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সঠিক ও সুদূরপ্রসারী সংস্কার সাধনে সাহায্য করবে। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরত-এ খুদাকে এ কমিশনের সভাপতি করা হয়। সভাপতির নামানুসারে এটি "কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন" নামে পরিচিত। বিভিন্ন সময়ে রদবদলসহ পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন মিলে ২৩ জন সদস্য এ কমিশনের জন্য নিবেদিত ছিলেন। এ শিক্ষা কমিশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল সংবিধানের চার মূলনীতির আলোকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা।

---

৬ প্রফেসর আনসার আলী, *শিক্ষানীতি পরিক্রমা* (ঢাকা: ১৯৯৫খ্রি.), পৃ. ১-২

জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এ চার মূলনীতিসহ নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ, বিজ্ঞানমনস্ক জাতিগঠন ও মানবতাবাদী এক বিশ্বনাগরিক তৈরির অঙ্গীকার ছিল এ শিক্ষাব্যবস্থার। এ লক্ষ্যে দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাবলী চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নানাবিধ সংস্থা, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ও পেশাজীবী ও প্রশাসকগণের নিকট প্রশ্নমালা প্রেরণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মতামতগুলো ব্যাপক বিশ্লেষণসহ বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের স্মারকলিপি, নিবন্ধ ও সমালোচনাও রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়। এছাড়া ভারত সরকারের আমন্ত্রণে কমিশনের সভাপতির নেতৃত্বে কমিশনের সদস্যরা ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে মাসব্যাপী ভারত সফর করেন। এ সফরে তাঁরা ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। দীর্ঘ প্রায় ২ বছর পর্যালোচনা করার পর জাতীয় শিক্ষা পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে কমিশন সুচিন্তিত সুপারিশমালা ৩০ মে ১৯৭৪ সালে রিপোর্ট আকারে সরকারের কাছে পেশ করেন।

এ কমিশনের সুপারিশগুলো শিক্ষাব্যবস্থার গতিশীলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও এ কমিশনে ধর্মশিক্ষা তথা ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। যেমন-সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক শাখায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে ধর্মশিক্ষা আবশ্যিক হলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে ধর্মশিক্ষা বাদ দিয়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে। ধর্মশিক্ষার পরিবর্তে ললিতকলা প্রাধান্য পেয়েছে সর্বস্তরে। উচ্চ মাধ্যমিক শাখায়ও ধর্মশিক্ষাকে ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে।

এছাড়া এ শিক্ষাব্যবস্থায় মাদ্‌রাসা শিক্ষার কোন আলোচনা-ই স্থান পায়নি। মাদ্‌রাসা শিক্ষা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট মতামতও পেশ করা হয়নি। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা শিক্ষা কমিশনের কোন অংশেই ফুটে উঠেনি। বরং শিল্পকলা চর্চা ও উৎকর্ষতার নামে অশ্লীল রুচি ও অঙ্গভঙ্গির প্রদর্শনী ছড়িয়ে পড়েছিল, ফলে সচেতন অভিভাবকদের মাঝে অস্থিরতা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত এদেশে মুসলমানদের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী মাদ্‌রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে টোল শিক্ষার সাথে তুলনা করে খাটো করা হয়েছে। মাদ্‌রাসা শিক্ষা শিশু শ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও কল্যাণকর শিক্ষাব্যবস্থা হলেও এ কমিশনে সুকৌশলে মাদ্রাসা শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।[৭] সুতরাং দেশীয় আচার, জাতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এ শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

৭ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর, *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি* (ঢাকা: বুক পয়েন্ট, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ২৫৪

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের মূল আদর্শিক ভিত্তি ছিল বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র। এসব মূলনীতির ভিত্তিতেই শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছিল যাতে শিক্ষার্থীর মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা ও তার ব্যবহারিক জীবন ঐসব আদর্শের আলোকে গড়ে ওঠে। কমিশনের ভাষায় 'আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তার বাস্তব জীবনে যাতে এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে' (অধ্যায়- ১.২)। চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সুস্পষ্ট বোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত করে তাকে সুনাগরিক রূপে গড়ে তোলাই হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য' (অধ্যায়-২.৪)।

দেশপ্রেম সৃষ্টির জন্য কমিশন 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আদর্শের সম্যক উপলব্ধি অর্জনকে' সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে (অধ্যায়-২.১৩)। এভাবে তদানীন্তন চার রাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করার লক্ষ্যে শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছিল।

ড: কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে ধর্মীয় মূল্যবোধকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি তার কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো-

**শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন**

চার মূলনীতি তথা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম নির্ধারণ ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের উপর কমিশন অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে। কমিশনের ভাষায় পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করার সময় দেখতে হবে তাতে যেন আমাদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের সঠিক প্রতিফলন হয় (অধ্যায়-২৮.৭)। বিশেষ করে সাহিত্য, ইতিহাস, পৌরনীতি ও অর্থনীতির পাঠ্যসূচিতে এ ধরনের বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত করতে হবে (অধ্যায়-২.৪)। এতে ধর্মীয়নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি।

**প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ধর্মের অবস্থান**

কমিশন প্রাক-প্রাথমিক স্তরকে মানব জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে আখ্যায়িত করে সময়কালীন শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবিত শিক্ষার ধারণায় ও ব্যবস্থাপনায় ধর্মবোধের বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত (অধ্যায়-৬.৪)। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে গানবাজনা ইত্যাদি থাকলেও ধর্ম ও নৈতিক চর্চার প্রয়োজন বোধ করা হয়নি (অধ্যায়-৬.৬)।

কমিশন শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জন করার জন্য প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত একই মৌলিক পাঠ্যসূচিভিত্তিক এক ও অভিন্ন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করার কথা বলেছে (অধ্যায়-৭.৯)। এই অভিন্ন ধরনের শিক্ষার রূপ হচ্ছে- প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা হবে (অধ্যায়-৭.১০)। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সপ্তাহে মাত্র দুটো পিরিয়ড ধর্ম শিক্ষার/নীতি শিক্ষার জন্য বরাদ্দ থাকবে (অধ্যায়-৭.১০)।

**মাধ্যমিক শিক্ষা (নবম-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত)**

- মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে কোন ধর্ম শিক্ষা থাকবে না (অধ্যায়-৮.১১)।
- নবম ও দশম শ্রেণিতে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবেও ধর্ম শিক্ষা থাকবে না, যদিও ঐ দু'বিভাগের সাথে সম্পর্কহীন ইতিহাস ও পৌরবিজ্ঞানের মত বিষয়কেও ঐচ্ছিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (অধ্যায়-৮.১১)।
- একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে কোন বিভাগেই ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে 'ধর্ম শিক্ষা' নেয়া যাবে না (অধ্যায়-৮.১১)। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইত্যাদির মত একটি ধর্ম শিক্ষা বিভাগ রাখা হয়েছে কিন্তু সে বিভাগের ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা হয়নি বরং কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।
- বৃত্তিমূলক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প, কাঠের কাজ, কেশ-বিন্যাস, নৃত্য ইত্যাদি ৪১টি কোর্সের মধ্যে 'ধর্ম শিক্ষা' হবে একটি।

**মাদ্রাসা শিক্ষা**

- সাধারণ শিক্ষার মত মাদ্রাসার প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত কোন ইসলামি শিক্ষা থাকবে না।
- ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সপ্তাহে ইসলামি শিক্ষার জন্য দুটো পিরিয়ড থাকবে।
- মাদ্রাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র ও ঐতিহ্যের আলোকে এবং ইসলামী জ্ঞান সমৃদ্ধ শিক্ষার্থী তৈরির উপযোগী সুপারিশ করা হয়নি।[৮]

**জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট-১৯৭৬ খ্রি.**

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও সামগ্রিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ১৯৭৪ সালে কুদরত-এ-খুদা কমিশন শিক্ষার যে সুপারিশ পেশ করেন তা পুংখানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উপযুক্ত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালে সরকার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে কার্যক্রম শুরু

৮ মোহাম্মদ ইলিয়াছ আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭১-৭৪

করেন। দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের সমন্বয়ে সর্বমোট ৪৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন স্তর ও বিষয়ের নির্বাচিত ১০টি উপ-কমিটি ও ২৭টি বিষয় কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ২১০০ পৃষ্ঠার ৭ খণ্ডের দীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করেন। সরকারও সেগুলো বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়েছিল। ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কমিটির সুপারিশ উল্লেখ করা হলো:

সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক শাখায় মাতৃভাষা বাংলা, গণিত, পরিবেশ শিক্ষা, ইংরেজি, মিউজিক, শারীরিক শিক্ষা, আর্টস এণ্ড ক্রাফট্স এর পাশাপাশি আবশ্যিক হিসেবে ধর্মশিক্ষা রাখা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে সাপ্তাহিক ৩ পিরিয়ডে ১.৩০ ঘণ্টা ধর্মশিক্ষার জন্য বরাদ্দ রাখা হয় যা সাপ্তাহিক মোট পিরিয়ডের ১০ শতাংশ। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে সাপ্তাহিক ৩ পিরিয়ডে ১.৭৫ ঘণ্টা ধর্মশিক্ষার জন্য বরাদ্দ রাখা হয় যা সাপ্তাহিক মোট পিরিয়ডের ৮.৮৬ শতাংশ। সাধারণ শিক্ষার নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে (৬ষ্ঠ-৮ম) শ্রেণিতে মাতৃভাষা বাংলা, গণিত, ইংরেজি, সাধারণ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি ধর্মশিক্ষা আবশ্যিক হিসেবে রাখা হয়। সাপ্তাহিক ২ পিরিয়ডে ১.৩০ ঘণ্টা ধর্মশিক্ষার জন্য বরাদ্দ রাখা হয় যা সাপ্তাহিক মোট পিরিয়ডের মাত্র ৫ শতাংশ।[৯]

- সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক শাখায় ইসলাম ধর্মসহ সকল ধর্মীয় বিষয়কে ৭৫ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক বিষয় রাখা হয়। এই ঐচ্ছিক বিষয়ের জন্য সাপ্তাহিক ৩ পিরিয়ড বরাদ্দ রাখা হয়।
- প্রাথমিক থেকে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত ধর্মশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক রাখা হলেও পাঠদানের সময় যথেষ্ট হয়নি। ধর্মের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের মত কমপক্ষে সাপ্তাহিক ৬ পিরিয়ড সময় বরাদ্দ রাখা উচিত ছিলো। আর মাধ্যমিক শাখায় ধর্মশিক্ষাকে ঐচ্ছিক হিসেবে রেখে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা করা হয়েছে।

'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি' ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য ভাষা, সাহিত্য ও পরিবেশ পরিচিতি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করে এবং প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পাঠ্যভূক্ত করার সুপারিশ করে। বাংলাদেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্বর সাথে পাঠ্যসূচিতে স্থান দেয়া হয়। মাদ্রাসা শিক্ষায় সাধারণ ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাকে শিক্ষার সকল দিক ও বিভাগে যথাযথ গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা হয়নি।

---

৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭

**ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্কীমঃ (ডঃ এম. এ. বারী) কমিটি, ১৯৭৭ খ্রি.**

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের অধিকাংশই অর্থকরি কর্মক্ষেত্রে সম্পৃক্ত হলেও ইসলামি ভাবধারায় ও ধর্মীয় আচার-আচরণ অনুশীলনের ক্ষেত্রে তাদের প্রায়শই উদাসীন বলে পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষার অনুপ্রবেশ না থাকাই হয়ত এর মূল কারণ। তাই এ অসঙ্গতি দূরীকরণার্থে মুসলমানদের জন্য এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চিহ্নিত করতে হবে, যে শিক্ষায় ইসলামি শিক্ষা ও আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় সাধিত হয়, যা হবে উভয় ধারার সমন্বিত এক সুসামঞ্জস্য শিক্ষা। এ পর্যায়ে একদিকে যেমন আধুনিক শিক্ষাকে ইসলামি ভাবধারায় সমৃদ্ধ করতে হবে, তেমনি ইসলামি শিক্ষাকে করতে হবে আধুনিক জীবন চাহিদার উপযোগী। আর তা বাস্তবায়ন করতে হলে একটি ডিগ্রি প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যম ও সহযোগিতা ছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়। এ ধরনের প্রয়োজনীয়তার কথা শুধু আজকের নয়, বরং সুদূর অতীত থেকেই পাক-ভারত উপমহাদেশের সচেতন মুসলমান নেতৃবৃন্দ এর জন্য সংগ্রাম করে আসছেন। এদেশে অতীতে যে শিক্ষা কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়েছে তার অধিকাংশ রিপোর্টেই এ ব্যাপারে মূল্যবান সুপারিশ এসেছে। আবার কোন কোন কমিশনে এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও রয়েছে। ১৯৩৮-৪১ খ্রিস্টাব্দের মাওলা বখশ কমিটিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হিসেবে প্রস্তাব করা হয় যে, কলকাতায় ইসলামি শিক্ষার জন্য এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, যার অধীনে থাকবে বাংলাদেশের যাবতীয় ওল্ড ও নিউ স্কীম মাদ্রাসা ও ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজসমূহ।

ভারত বিভাগের প্রাক্কালে ১৯৪৬-৪৭ খ্রিস্টাব্দের অবিভক্ত বাংলার তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ মুয়াযযাম উদ্দিন হোসেনের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি সুপারিশে অবিলম্বে একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়, যা বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার উন্নয়ন সাধন করবে এবং ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক জ্ঞান দান করবে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দেও মাওলানা আকরাম খান কমিটিতেও অনুরূপ সুর ধ্বনিত হয়েছে। তারপরেও ঢাকায় ও করাচিতে কয়েকটি কমিটি ও কমিশনও ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত মূল্যবান সুপারিশ করেন। এতসব সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও সকল সুপারিশই ফাইলবন্দী অবস্থায় পড়ে থাকে। এমনি করে যুগের পর যুগ অতিবাহিত হল, দেশের পর দেশ পরিবর্তিত হল দেশের প্রশাসন ব্যবস্থারও পরিবর্তন হলো। ভারত বিভাগের প্রাক্কালেও মুসলমানদের দাবির মুখে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে ভারতের বুক চিরে বেরিয়ে আসে মুসলমানদের জন্য আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তান। কিন্তু সেখানেও এতদসংক্রান্ত দাবী অগ্রাহ্য হল। তারপর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে আমরা পাকিস্তানের শাসনের নাগপাশ হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হই। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলীয়

জেলাগুলো ও আসামের কয়েকটি থানা সমন্বয়ে যে পূর্ববঙ্গ গঠিত হয় তা কালের পরিক্রমায় ও যুগের দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট পূর্ববঙ্গ নামটি পরিবর্তিত হয়ে পূর্বপাকিস্তান নামধারণ করে। ফলে দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, বৃটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে মুসলমানগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে শুরু করে কিন্তু তাদের প্রাণের দাবী ইসলামি শিক্ষার জন্য উন্নতমানের একটি স্বতন্ত্র ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি এখানে গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়নি।

ইসলামি শিক্ষা বাড়লেও গতানুগতিক ধারায় প্রচলিত শিক্ষা মুসলমানদের এতদিনের লালিত আস্থা ও বিশ্বাসে কঠিনভাবে কুঠারাঘাত করে এবং মুসলমানদের অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ অসন্তোষ ক্রমেই সারা পাকিস্তানকে আন্দোলিত করে নানা ইস্যুতে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও, দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। তাই দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দাবি উত্থিত হয়েছিল তা স্বাধীনতার বিশ বছর পর ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ('চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর) জিয়াউর রহমান ঘোষণা দেন যে, দেশে একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা জাতির লক্ষ্য ও অধুনা যুগের চাহিদার সাথে যুগপৎ ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে প্রধান ভূমিকা পালন করবে।

ড.এম.এ. বারীর নেতৃত্বাধীন এ কমিটি একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা জোরালো ভাবে উপস্থাপন করে। কমিটি আধুনিক জ্ঞান ও ইসলামী জ্ঞান এ দু ধারার জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে নৈতিক ও মূল্যবোধ সম্পন্ন মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব দানের উপযোগী শিক্ষার্থী তৈরির জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব সুস্পষ্ট করেন। কমিটি এ বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে উল্লেখ করেন যার শিক্ষার্থীর সংখ্যা হবে ২০০০ জন। যারা সবাই আবাসিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেছেন, আজকের নীতি জ্ঞান ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সময় ইসলামের নীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এ বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানের মর্যাদা প্রদান ও দিক-দিগন্তে ছায়া বিনিময়ের সেতু বন্ধনের কাজ করবে এবং এ বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বাংলাদেশের মানুষের নেতৃত্ব দিবে তাই নয় বরং সারা বিশ্বের মুসলমানদের দিক নির্দেশনা দেবে ইসলামী শিক্ষা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে। দুঃখজনক হলেও সত্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলেও তার উদ্দেশ্য লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়নি। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখার সাথে ইসলামী জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করা ছিলো এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য। আজো কলা, সমাজ বিজ্ঞান, ও বিজ্ঞান অনুষদ ভুক্ত সকল বিষয়ের সাথে বাধ্যতামূলক ইসলামীক ষ্টাডিজ রাখা হয়নি যা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যকেই

ব্যাহত করেছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হবার কথা থাকলেও তা উপেক্ষা করা হচ্ছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার পরিবর্তে দেশের একমাত্র সরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দিন দিন আঞ্চলিক বিদ্যাপীঠে পরিণত করার প্রয়াস লক্ষনীয়।

**১৯৭৮ সালের শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন**

মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মক্কায় ও.আই.সি এক শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করে। বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ঐ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ সম্মেলন শেষে প্রণীত ঘোষণায় বলা হয়-

> Believing the tenets of Islam which preach that the quest of knowledge is an obligation on all Muslims. We declare ourselves determined to co-operate spreading education more widely and strengthening educational institutions until ignorance and illiteracy have been eradicated and to take measures aimed towards the strengthening of Islamic education curriculam and to encourage research and Ijtihad among Muslim thinkers and Ulema while expanding the modern science and technologies.
>
> We also pledge ourselves to co-ordinate our efforts in field of education and culture. So that we may draw on our religious and traditional sources in order to unite the Ummah. Consolidates its culture and strengthen its solidarity. Cleanse our societies of the manifestation of moral laxity deviation by inculcating moral virtues protecting our youth from ignorance and from exploitation of the material needs of some Muslims to alienate them from their religion.
>
> Believing in the need of propagate the principles of Islam and the spread of its cultural glory through out the Islamic societies in the world as a whole and to emphasize its rich heritage. Its spiritual strength, moral values and laws conducive to progress, justice and prosperity. We are determined to co-operate to provide the Human and material means to achieve these objectives. We also pledge to exert further efforts in various cultural fields to achieve raprochment in the thinking of the Muslims and to purifz Islamic thaught of all that may be alien or divisive.

সম্মেলন শেষে দেশে ফিরে প্রেসিডেন্ট জিয়া শিক্ষা সংস্কারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৮ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী প্রথমে আবদুল বাতেন ও পরে কাজী জাফর আহমদ-এর নেতৃত্বে তিনি শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। শিক্ষার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত দেশের প্রখ্যাত ৪০ জন ব্যক্তিকে

নিয়ে গঠিত এই জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ পরিপূর্ণ শিক্ষানীতি প্রণয়ন সময় সাপেক্ষ বিবেচনায় একটি অন্তবর্তী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। সারা দেশের ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষা সচেতন মানুষের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত এই শিক্ষানীতিতে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য পৃথক বেতন কমিশন গঠন, তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পদক ও পুরস্কার প্রদানের মত বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন ঘটানোর উদ্যোগ তেমন পরিলক্ষিত হয়নি।[১০] তবে অন্তবর্তীকালীন এই শিক্ষানীতিতে যাই থাক না কেন শিক্ষা কারিকুলাম ও পাঠ্যক্রমে ইসলামী তাহজিব-তমদ্দুনের উপস্থিতি এ সময়ের পাঠ্যপুস্তকে বিদ্যমান ছিল।

বাংলাদেশের ইতিহাস, নবম শ্রেণি, প্রথম মুদ্রণ জানুয়ারী ১৯৮৪, সংশোধিত ডিসেম্বর ১৯৮৭, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৫, রচনা/সম্পাদনা, মুহাম্মদ নূরুল করিম, পৃ. ৪৭-৭৮, ৬০-এতে মধ্যযুগ সুলতানী আমল শিরোনামে একটি অধ্যায় ছিলো যেখানে ইসলামের ইতিহাস পটভূমি সহ বর্ণিত ছিলো। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এখানে মহানবী (সা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সরকার, খুলাফায়ে রাশেদিনের আমল ও উমাইয়্যা আমল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সন্নিবেশিত ছিল। সেখানে বখতিয়ার খিলজীর বাংলা অভিযানকে বঙ্গ বিজয় বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৬ পরবর্তী পর্যায়ে এ পাঠ্যপুস্তকটির আমূল পরিবর্তন করা হয়।

এরপর ১৯৮৩ সালে গঠিত মজিদ খান কমিটি এবং ১৯৮৮ সালে অধ্যাপক মফিজউদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের কথা বলা হলেও তা ইসলামী শিক্ষার পক্ষে জোরালো মত বলে বিবেচনা করা যায় না।

**বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন-১৯৮৮ খ্রি. (মফিজ উদ্দীন কমিশন)**

দেশে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অসংগতি ও সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে একটি আধুনিক ও কল্যাণকর শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালের ২৩ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৮/১০/এস,-৮/৮৬/২৭৬/১৫০ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের সভাপতি করা হয় প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মফিজ উদ্দীন আহমদকে। সভাপতির নামানুসারে এই কমিশন "মফিজ উদ্দীন কমিশন" নামে পরিচিত।

এই কমিশন সুপারিশমালা প্রণয়নের সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখার পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া ইতোপূর্বে বাংলাদেশ আমলে যে সকল শিক্ষা কমিশন ও কমিটির রিপোর্টসমূহের

১০ *অন্তরবর্তীকালীন শিক্ষা নীতি*, জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ, ১৯৭৯

সুপারিশমালা বাস্তবায়িত হয়নি সেগুলোর মধ্য থেকে কোন কোন সুপারিশ গ্রহণ করা যায় তা বিবেচনার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে বিরাজমান সার্বিক পরিস্থিতি বিশদ পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, কারিগরি ও চিকিৎসাসহ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে সুদৃঢ়, সময় উপযোগী ও উৎপাদনমুখী করার লক্ষ্যে এবং দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ দক্ষ মানবসম্পদ ও সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য সুপারিশমালা পেশ করার জন্য কমিশন কাজ শুরু করে এবং ২৪-০৭-১৯৮৭ সালে রিপোর্ট পেশ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। কমিশন গঠনের পর ০৯-০৫-১৯৮৭ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় একটি স্টিয়ারিং কমিটি, ১২টি অনুধ্যান কমিটি ও দুটি শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

এই কমিশনের রিপোর্ট প্রণয়নে দেশের শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও সুধী সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ মতামত দিয়ে সহযোগিতা করেন। এছাড়া পত্র-পত্রিকা, নিবন্ধ, সমালোচনা ও স্মারক লিপিতে যে মূল্যবান মতামত প্রকাশিত হয় তা সাদরে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

এছাড়া ইউনেস্কোর সৌজন্যে শিক্ষা কমিশনের দুই সদস্যের একটি টিম ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে থাইল্যান্ড, চীন, ফিলিপাইন ও জাপান সফর করে সে দেশসমূহের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন যা এ কমিশনের সুপারিশ প্রণয়নে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।[১১]

উক্ত কমিশনের সুপারিশে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়-

১. নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সঞ্চার করে পারস্পরিক মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা।

২. আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সঙ্গে শিক্ষার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতি শিক্ষার্থীদের সশ্রদ্ধ করে তোলা।

৩. শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মানুরাগ বৃদ্ধি করা এবং মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধসমূহের বিকাশ সাধন করা।

৪. মৌলিক চিন্তা স্বাধীনভাবে প্রকাশে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা এবং সমাজে মুক্ত চিন্তার বিকাশ ঘটানো।[১২]

---

১১ মোহাম্মদ ইলিয়াছ আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮-৫২৭

১২ বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (মফিজ উদ্দিন), ফেব্রুয়ারি-১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ৩

**উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে কমিটির সুপারিশ**

উচ্চশিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সময়োপযোগী ও সামাজিক চাহিদানুযায়ী হবে, তাতে আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থা প্রতিফলিত হবে। জ্ঞানের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় দিকই উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমে যথাযথ গুরুত্ব লাভ করবে।

কমিটি তার তার কার্যপরিধি ও শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা পূর্বক রিপোর্ট পেশকালীন ভূমিকায় উল্লেখ করেন:

> "শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে সুন্দর ও সুখী জনজীবন ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা, নৈতিক, ধর্মীয় ও আত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা এবং চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ তৈরি করা। সেই সাথে সৃজনশীল, উৎপাদনক্ষম, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি তৈরি করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে যাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল মানুষের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রাখা ও বিকশিত করা শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যাবলীর অর্ন্তভূক্ত হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর মনে তার পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করা, পরিবেশ নিষ্কলুষ রাখা ও জাতীয় সম্পদ যথাযথ সংরক্ষন সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাকে সমস্যার বাস্তব সমাধান সন্ধানে অনুপ্রাণিত করার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকবে। শিক্ষা একটি জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। কাজেই বাংলাদেশের সকল শ্রেণির মানুষের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের বাঞ্ছিত নতুন সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব। এই লক্ষ্য আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।"[১৩]

যে সকল আদর্শ বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে সেগুলি সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি মৌলিক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং দেশবাসীর ভিতর ঐক্যের বোধ শক্তিশালী করতে হবে। দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান, মুক্তি সংগ্রামের তাৎপর্য অবহিত করা, সংস্কৃতির চর্চা এবং মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধনের মাধ্যমে জাতীয় ও সমাজ চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে। জাতির গর্ব, একতা ও আশা-আকাঙ্খার প্রতীক বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটাতে হবে। এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের প্রবর্তন করতে হবে যা জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবোধকে সংহত ও প্রসারিত

---

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

করে। নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ এবং জনসেবার আদর্শ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রদর্শক ও পরিচালক শক্তি হওয়া উচিত। শুধু জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও কৌশল অর্জন নয়, শিক্ষার্থীর মনে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। কর্মে ও চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে সে যেন সর্বদা সততার পথ অনুসরণ করে, চরিত্রবান, নির্লোভ ও পরোপকারী হয়ে ওঠে এবং সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। যুব মনে মূল্যবোধ সৃষ্টি ও তাদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।[১৪]

**প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কমিটির বক্তব্য**

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কল্যাণ ও সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে শিক্ষার প্রধান দায়িত্ব হিসাবে দেশের বিপুল জনশক্তির দক্ষতা ও ক্ষমতার বিকাশ সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করছে। এ থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষা হবে মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার ও বাহন। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনে সাহায্য করা। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন শিশুর দৈহিক মানসিক, সামাজিক, আবেগিক ও নৈতিক দিক সমূহের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ধন ও অগ্রগতি নিশ্চিত হয়।" সকল মানুষেই আল্লাহর সৃষ্টি এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে বিশ্ব ভাতৃত্ব ও আর্ন্তজাতিক সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি, সকল চিন্তা ও কর্মপ্রেরণার উৎস হিসাবে সৃষ্টিকর্তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানো এবং সৃষ্টিকর্তার উপর একনিষ্ঠ বিশ্বাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ জন্মানো। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে কমিটি তার সুপারিশে উল্লেখ করেন:

প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের যেন (ক) জীবন ও সমাজের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পরিচয় ঘটে, (খ) চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, (গ) নৈতিক মূল্যবোধের ভিত সৃষ্টি হয় এবং (ঘ) কর্ম অভিজ্ঞতা লাভ হয়।[১৫]

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে কমিটির উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলো:

১. ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহ অবিলম্বে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে। এ ব্যবস্থায় নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন আবশ্যক হবে। অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলীও বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারণ করবে।

---

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

২. ফাযিল (পাস ও অনার্স) এবং কামিল (প্রথম ও শেষ পর্ব) ডিগ্রি কোর্সের বিস্তারিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রণয়ন করবে।

৩. উল্লিখিত কোর্সসমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির পূনর্গঠন করে উভয় স্তরেই সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানের মৌল বিষয় হিসাবে পদার্থ, রসায়ন, জীব ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য এ স্তরের মাদরাসা সমূহের উন্নতমানের বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি ও প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. এ স্তরে ধর্মীয় শিক্ষাকে একটি গতিশীল বিষয় হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে। যুগে যুগে দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের অগ্রগতির আলোকে ইসলামকে উপস্থাপনে সক্ষম হলেই শিক্ষার্থীরা এর গতিশীল তাৎপর্য অনুধাবনে সক্ষম হবে।[১৬]

১৯৮৭ সালে অধ্যাপক মফিজ উদ্দীন আহমদকে চেয়ারম্যান করে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠন করা হয়। কমিশনের দুটি কমিটি জাপান, চীন ও থাইল্যান্ড সফর করে সে সব দেশের শিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে। কমিশন ১৯৮৮ সালে তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে দেশের শিক্ষা সংস্কার, পুনর্বিন্যাস এবং উন্নয়নের অনেকগুলি দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। কমিটি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারণ করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও সংকট চিহ্নিত করে। রিপোর্টে অবৈতনিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ করা হয়। কমিশনের রিপোর্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ধারা সংযুক্ত হয়, তা হলঃ 'শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মানুরাগ বৃদ্ধি করা, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধসমূহের বিকাশ সাধন করা।' কমিটি শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে নৈতিক, ধর্মীয় ও আত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ, চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ তৈরি এ বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে পাশাপাশি বাংলাদেশের সকল মানুষের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রাখা ও একে বিকশিত করাকে শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলী হিসেবে চিহ্নিত করে মূল্যবোধ ও জাতীয় চেতনাকে সমুন্নত করার প্রয়াস পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কমিটি আরো কয়েকটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছে, যেমন যে সকল আদর্শ বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে সেগুলি সংরক্ষণের ব্যাপারে মৌলিক ভূমিকা গ্রহণ, দেশবাসীর ভিতর ঐক্যের বোধ শক্তিশালী করা, জনসেবার আদর্শ, কর্মে ও চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে সর্বদা সততার পথ অনুসরণ করা, চরিত্রবান, নির্লোভ ও পরোপকারী হওয়া, সর্বপ্রকার অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা, যুব মনে মূল্যবোধ সৃষ্টি ও তাদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

---

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

রিপোর্টে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস এবং শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ জন্মানোর উপর গুরুত্ব দিয়েছে যা খুবই ইতিবাচক।

কমিটি ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা সমূহকে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করার সুপারিশ করা হয়।

একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয়ের কথা বলা হয়, যা প্রশংসার যোগ্য। সর্বোপরী এ কমিটি নৈতিক ও ধর্মীয় চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির গুরুত্বারোপ করলেও শিক্ষার সকল স্তরে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেনি।

**মাদ্রাসা শিক্ষা (ড. এম.এ. বারী) কমিটি, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ (**Madrasah Education (Dr. M.A. Bari) Committee, 1989)

দেশের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সকল স্তরে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৯-৩-৯৬/২৪-৭-৮৯ইং তারিখের স্মারক নং শাঃ ১৪/৩পি-১১/৮৯/১৪৯- শিক্ষা প্রজ্ঞাপন মূলে মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি নামে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি গঠন করে।

পরবর্তীতে ১-১১-৮৯ইং তারিখে অন্য একটি প্রজ্ঞাপন বলে তিনজন এবং আরও পরে ৯-৫-৯০ইং তারিখে সংশোধিত প্রজ্ঞাপন মূলে আরো দু'জন সদস্য সহকারে মোট ২০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। কমিটি মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান বিরাজমান সার্বিক পরিস্থিতি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা পেশ করেন।

**শিক্ষা সংস্কার প্রচেষ্টা টাস্কফোর্স কমিটি গঠন (১৯৯৪)**

১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালে তৎকালীন বি এন পি সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমিরুদ্দিন সরকার (বর্তমানে মাননীয় স্পিকার) শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষত কারিকুলামকে ঢেলে সাজাবার জন্য একটি মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়।[১৭] এই টাস্কফোর্স শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। টাস্কফোর্স নতুনভাবে যে কারিকুলাম প্রণয়ন করেন তাতে সংবিধানের উল্লিখিত মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই টাস্ক ফোর্সের আওতায় নতুনভাবে যে

১৭ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের প্রতিবেদন*, ১৯৯৪

কারিকুলাম তৈরি করা হয় তা উল্লিখিত মক্কা ঘোষণার[১৮] সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হতে পারে। শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে এখানে বলা হয়:

শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গিন বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে নিচের সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী অর্জন করতে হবে:

১. শিক্ষার্থীদের মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে।

২. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অন্তরে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা।

৩. শিক্ষার্থীর মনে ধর্মীয়, আত্মিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন, অর্থাৎ সৎ, চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ আদর্শ মানুষ তৈরি করা।[১৯]

উপরোক্ত শিক্ষার ঐ পুনঃনির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধু সাংবিধানিক নয় বরং অনেকাংশে বাংলাদেশের মত একটি মুসলিম দেশের চাহিদার সাথেও সামঞ্জস্যশীল। একই সাথে ১৯৭৭ সালের মক্কা ঘোষণাকেও তা অনেকাংশে ধারণ করতে পেরেছে। কিন্তু কারিকুলামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে বিষয়টি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক হলেও বাস্তবে এর প্রতিফলন সরকারি পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় খুববেশী প্রতিফলিত হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষত ১৯৯৬ উত্তরকালে ন্যাশনাল টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা স্কুল পর্যায়ে যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে তাতে ইতোপূর্বের উল্লিখিত ১৯৯৪ সালের টাস্কফোর্সের লক্ষ্য অস্বীকার করে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী শিক্ষার বিকাশ ঘটানো হয়।[২০]

**জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি-১৯৯৭ খ্রি.**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একটি বাস্তব গণমুখী ও যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৪/০১/১৯৯৭ইং তারিখে প্রশা-১/বিবিধ:৫/৯৬/১৫৫ নং স্মারকে এক অফিস আদেশ জারি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা প্রফেসর এম.শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে ৫৬ সদস্যের একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির উদ্দেশ্য ছিল ১৯৭৪ সালে প্রস্তুতকৃত ড. কুদরত-এ-খুদা কমিশনের প্রতিবেদনকে গভীরভাবে

---

১৮ *Declaration of the 3rd Summit Conference of the Muslim Heads of States held in Holy City of Makkah*, KSA organized by the organization of Islamic Conference (25-28 January 1961).

১৯ প্রতিবেদন, *জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি*, ১৯৯৭, পৃ. ১৪; স্বপন কুমার ঢালী ও রেজা ইমাম, *শিক্ষার ভিত্তি* (ঢাকা: প্রভাতী লাইব্রেরী, নীলক্ষেত, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯খ্রি.), পৃ. ২৫৩

২০ *বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্‌রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম মক্কা ঘোষণার আলোকে পর্যালোচনা*, ২০০১

পর্যালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সেই প্রতিবেদনের প্রস্তাবসমূহকে যুগোপযোগী করে দেশের সর্বপ্রকার ও সর্বস্তরের শিক্ষা সমস্যা চিহ্নিত করে বাস্তবভিত্তিক একটি সুষ্ঠু জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা। এ কার্য সম্পাদনের জন্য কমিটিকে ৩০ এপ্রিল ১৯৯৭ পর্যন্ত সময় বেধে দেয়া হয়। কমিটির লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও কাজের সুবিধার জন্য ১৯টি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির সাব-কমিটিগুলোর মধ্যে একটি ছিল ৬ সদস্যের ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা সাব-কমিটি।[২১] কমিটির মতামতে বলা হয়- রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাকে সমকালীন বিশ্বের জ্ঞানপ্রবাহের তুল্যমানে উন্নীত করতে হলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক ও গুণগত পূর্নবিন্যাস প্রয়োজন। সেদিকে লক্ষ রেখেই তৎকালীন গণতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বগ্রহণের অল্পকাল পরেই তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শিক্ষানীতি প্রণয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে যুগোপযোগী ও গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক, চিন্তাবিদ, পেশাজীবী ও শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে ৫৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি গঠিত হওয়ার পর সদস্যগণ চব্বিশটি সভায় মিলিত হয়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অনুপুঙ্খ আলোচনা করেন, মতবিনিময় করেন এবং উনিশটি উপকমিটির প্রতিবেদন বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনার পর চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেন। এছাড়া কমিটি জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত জনগণের মতামত ও মনোভাব পর্যালোচনা করে, কমিটির চেয়ারম্যান দেশের পাঁচটি বিভাগীয় শহরে বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবী ও সংগঠনের প্রতিনিধির সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এতদ্ব্যতীত কমিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ ও জাতীয় দৈনিকসমূহের সম্পাদকবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে সভায় মিলিত হয়ে মতবিনিময় করেন ও মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।[২২]

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে:

- ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
- জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতির ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা।

২১ মোহাম্মদ ইলিয়াছ আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৪

২২ প্রতিবেদন, *জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি*, ১৯৯৭, পৃ. ৫৬৫-৬৮

এ সাব-কমিটি ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা অংশে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ পেশ করেন। যা নিম্নরূপ:

**প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা**

সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা প্রয়োজন। শিক্ষার বিষয় হবে মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ ও বিজ্ঞান। এছাড়া থাকবে চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সংগীত ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণি থেকে ইংরেজি ভাষা এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রথম শ্রেণি থেকে সহপাঠ্যক্রমিক বিষয় থাকবে।[২৩]

**ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা**

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর আচরণগত উৎকর্ষসাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিকতার প্রয়োগের মানসিকতা ও চরিত্র গঠন। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীর জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।[২৪]

**শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক**

শিক্ষার মূল প্রাণবিন্দু শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহনযোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে এটাও কাঙ্ক্ষিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনে লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠে; তাই, পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাক্রমে এগুলো প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হয়। মূলত শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঙ্ক্ষিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষাকে লক্ষ্যে পৌছানোর সোপান হচ্ছে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকেই রচিত হয় পাঠ্যপুস্তক। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম।

**সুপারিশ**

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয়, সামাজিক, মানবীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে।[২৫] প্রাথমিক স্তরে ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে কমিটি উল্লেখ করেন- বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে ধর্মশিক্ষা আবশ্যিক বিষয় হিসেবে বিদ্যমান। তবে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব ধর্মের শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হয় না বলে

---

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

২৫ প্রতিবেদন, *জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি*, ১৯৯৭, পৃ. ৩১

প্রায়শ এক ধর্মাবলম্বী শিক্ষক অন্য ধর্ম শিক্ষা দিয়ে থাকেন। অনেকে মনে করেন ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সেজন্য ধর্মশিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক অবয়বের প্রয়োজন নেই; কেউ শিশুকে ধর্মশিক্ষা দিতে চাইলে তা ব্যাক্তিগত উদ্যোগে দিতে পারেন। তাঁদের মতে মানবিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমেই হতে পারে; তার জন্য আলাদাভাবে ধর্মশিক্ষা বিষয় হিসেবে রাখার প্রয়োজন নেই। আবার অন্য মত হল আমাদের দেশে পারিবারিক পর্যায়ে অনেকক্ষেত্রে ধর্মের নামে কুসংস্কার শিক্ষা দেওয়া হয়; তাই স্ব-স্ব ধর্মশিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অংশরূপে বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষত নানামুখী শিক্ষাধারাকে একীভূত করার প্রয়োজনে তৃতীয় শ্রেণি থেকে স্ব-স্ব ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকতে পারে এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্মশিক্ষার জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষকের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য মিসেস হেনা দাস প্রাথমিক স্তরে ধর্মশিক্ষা ব্যবস্থা রাখা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষন করেন। ধর্মশিক্ষায় নিছক আনুষ্ঠানিকতার পরিবর্তে সৎ জীবনাচরণ ও নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া বাঞ্চনীয়।

**ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিটির মতামত**

ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এ লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম উপায়। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর আচরণগত উৎকর্ষসাধন এবং জীবনে ও সমাজে নৈতিকতা প্রয়োগ করে চরিত্র গঠন করা। শিক্ষার্থী নিজ নিজ ধর্মের এবং অন্য ধর্মেরও মূল বিষয়গুলো জানবে, নিজ ধর্মের আচার অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে এবং পরমসহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, জীবসেবা প্রভৃতি বৃত্তি ও গুণাবলীতে বিভুষিত হবে। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা সেই লক্ষ্যে প্রদান করা হবে।[২৬]

এ ক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশ হচ্ছে, শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অনুসারে ইসলাম শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক যথার্থভাবে প্রণয়ন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার সিফাত ও গুণাবলী, রাসূল, কিতাব, আখিরাত, কবর, মিযান, কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নাম বিষয়গুলো বিভিন্ন শ্রেণিতে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ-এর তাৎপর্য বর্ণনাসহ যথার্থভাবে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ইসলাম শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলী ও বিষয়বস্তু কেন্দ্র করে প্রত্যেক শ্রেণির প্রান্তিক যোগ্যতা চিহ্নিত করতে হবে। স্তরভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে। এরই আলোকে পাঠ্যসূচি, পাঠ্যসূচির পরিসর ও পরিকল্পিত কাজ নির্ণয় করতে হবে।

---

২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনা, শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নির্দেশনা চিহ্নিত করতে হবে। উদ্দেশ্যের আলোকেই শিখনফল, শিক্ষকের কাজ ও শিক্ষার্থীর কাজ নির্দিষ্ট করতে হবে। এরই ভিত্তিতে শিখন শেখানোর কার্যাবলি, শিক্ষা উপকরণ, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর জন্য শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[২৭]

**বিভিন্ন শিক্ষাস্তরে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা কমিটির মতামত**

**প্রাক-প্রাথমিক**

প্রাক-প্রাথমিক স্তরে মৌলিকভাবে সকল ধর্মের নৈতিক উপাখ্যান, সততা, গুরুজনকে ভক্তি করা, মানুষকে ভালবাসা প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিষয়ে মুখে মুখে পাঠদান করা হবে। শিক্ষার্থীরা শুধু শুনবেই না নিজেরা বলবেও। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন ভাষার কারণে ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকলেও সৃষ্টিকর্তা একজনই, এ কথা এ স্তরের শিক্ষার্থী জানবে। বিভিন্ন ধর্মের আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কেও একেবারেই প্রাথমিক বা পরিচয়মূলক জ্ঞান তারা অর্জন করবে।

**মাধ্যমিক স্তর (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)**

নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্মদর্শন, ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মীয় উপাখ্যান মহাপুরুষদের জীবনী, নিজ নিজ ধর্মীয় ভাষা ও সকল ধর্মের নৈতিক উপাখ্যান সংবলিত নৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে।

**ডিগ্রি ও মাস্টার্স**

ডিগ্রি ও মাস্টার্স স্তরে ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। অনুরূপ ব্যবস্থা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের জন্যও প্রবর্তন করতে হবে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিয়ন্ত্রনকারী বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি ও মাস্টার্স স্তরের হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

**ধর্মশিক্ষার সুযোগ, প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক প্রসঙ্গ**

ধর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য সমান সুযোগ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াবার ব্যবস্থা বিভাগ বা শিক্ষক না থাকার কারণে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে নির্ধারিত ধর্মশিক্ষার বিকল্প হিসেবে অন্য কোন বিষয় পড়ানোর প্রচলিত রীতির পরিবর্তন করতে হবে। বাধ্যতামূলক বিষয়ের শিক্ষক অবশ্যই রাখতে হবে।

---

২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

**শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক**

যেহেতু একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠে তাই পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় এগুলোর প্রতিফলন শিক্ষাক্রমে সুনিশ্চিত করতে হয়। মূলত শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঙ্ক্ষিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষাকে এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর সোপান হচ্ছে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকেই রচিত হয় পাঠ্যপুস্তক। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের লক্ষ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে: শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, জাতীয় দর্শন, আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা শিক্ষাক্রমে প্রতিফলন ঘটানো এবং মানবিকতাবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিকতাবোধের উজ্জীবন।[২৮]

এ রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পূর্ব থেকে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় যেখানে শিশু-কিশোরদের জন্য প্রথম শ্রেণি থেকে ইসলামী শিক্ষা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল সেখানে তৃতীয় শ্রেণির পূর্ব পর্যন্ত ইসলামি শিক্ষা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত রাখার সুপারিশ করা হয়নি। অথচ প্রচলিত ব্যবস্থায় প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত চারটি বিষয় শিশুদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল যথা- বাংলা, অংক, ইংরেজি ও ইসলাম শিক্ষা। মূলতঃ আরবী ও ইসলাম শিক্ষা একেবারে বাদ দিয়ে চারু ও কারুকলা এবং সঙ্গীত শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করে। কমিটি শিশুমনে ধর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেনি। ফলে তা শিশুদের অভিভাবকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়।

কমিটির রিপোর্টে সার-সংক্ষেপ (অধ্যায়-১) 'প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা' শিরোনামের চতুর্থ লাইন থেকে বলা হয়েছে-

"প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শ্রমের প্রতি আকর্ষণ এবং শিশুদের মধ্যে দেশপ্রেম, নাগরিকত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, কৌতূহল, সৃজনশীলতা, অধ্যাবসায়, সদাচার, ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি বাঞ্ছিত গুণাবলী অর্জন করতে সহায়তা করা হয়।"

এ ধরনের বক্তব্যে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে জানার বিষয়টি কাঙ্খিত গুণাবলীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। কমিটি এন.জি.ও পরিচালিত শিক্ষা পদ্ধতিকে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু কমিটির সুপারিশে মসজিদ বা আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তবের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

---

২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল) ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদেরকে আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুপারিশমালায় 'ইসলামি শিক্ষা' রাখা হয়নি।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিরোনামে কমিটি উল্লেখ করেছে, "ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সর্বত্র নৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এ লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম উপায়। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর আচরণগত উৎকর্ষ সাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিকতার প্রয়োগের মানসিকতা এবং চরিত্র গঠন। শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ধর্মের মূল বিষয়গুলো জানবে।" কমিটির উক্ত বক্তব্যের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম শিক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

ক. প্রাক-প্রাথমিক বা প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

খ. ইসলাম জানার মূল উৎস কুরআন ও হাদীস। তা শেখার জন্যে আরবী ভাষা জানা অপরিহার্য। অথচ প্রাক-প্রাথমিক বা প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে আরবী অক্ষর পর্যন্ত শেখানোর ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

গ. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার আড়ালে ইসলামী শিক্ষাকে গুরুত্বহীন করা হয়েছে।

শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, শিক্ষকের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব সংক্রান্ত সুপারিশে 'শিক্ষক-প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আধুনিকরণ প্রয়োজন' বলা হলেও নৈতিক শিক্ষার জন্যে অপরিহার্য উপকরণ ইসলামী শিক্ষার সুপারিশ করা হয়নি। উপরোক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কমিটি জাতীয় আশা-আকাঙ্খা ও মূল্যবোধের আলোকে রিপোর্ট তৈরি করতে পারেনি।

**শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি-২০০২**

শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি-২০০২ গঠনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে,বাংলাদেশে বর্তমানে কোন পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু শিক্ষানীতি নাই। শিক্ষাকে জাতীয় কলাণের চাবিকাঠি এবং দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি। সুপরিকল্পিত, সময়োপযোগী, পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু শিক্ষানীতি ছাড়া শিক্ষার অগ্রগতি তথা জাতীয় অগ্রগতি অর্জন সম্ভব নয়। শিক্ষানীতি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাসে সহায়তা করে এবং জাতীয় জীবনে নিয়ে আসে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন।

**প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

"শিশুকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলা।[২৯]

শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, মানবাধিকার, সহজীবন যাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মীক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে কমিটির মতামত: "প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার বিষয়সমূহ হবে মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি- সমাজ ও বিজ্ঞান। এছাড়া থাকবে চারু ও কারুকলা, শারিরীক শিক্ষা, সংগীত ইত্যাদি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ইংরেজি অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে পড়ানোর ব্যবস্থা থাকবে এবং তৃতীয় শ্রেণি থেকে তা বাধ্যতামূলক হবে। তৃতীয় শ্রেণি থেকে বাধ্যতামূলক ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রথম শ্রেণি থেকে সহপাঠ্যক্রমিক বিষয় থাকতে পারে। প্রাথমিক স্তরের শেষ তিন শ্রেণীতে অর্থ্যাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবেশের উপযোগী কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করা হবে, যাতে যারা আর বিদ্যালয় পড়বে না এ শিক্ষার ফলে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে।"[৩০]

**ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে কমিটির মতামত**

শিক্ষার্থীর ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন আচরণগত উৎকর্ষসাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন করাই ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীর জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় বিষয় শিক্ষাদানে ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এ সকল ব্যবস্থা সুসংহত ও গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান হল ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। প্রত্যেক ধর্মে ধর্মীয় মৌল বিষয় সমূহের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতার উপর জোর দেয়া হয়েছে। কাজেই ধর্ম শিক্ষা যাতে ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেয়া আবশ্যক।[৩১]

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে কমিটি বলেন: শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে এটাও কাঙ্ক্ষিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা

---

২৯ *প্রতিবেদন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০*, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ০২

৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ০৩

৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

দেশের বিরাজমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠা বাঞ্চনীয়। তাই পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষাক্রমে এগুলোর প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হয়। মূলত শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঙ্খিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর সোপান হচ্ছে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকেই রচিত হয় পাঠ্যপুস্তক। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে সামাজিক, মানবীয়, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরসহ শিক্ষার প্রতিটি স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মাতৃভাষা, আপন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটবে।[৩২]

শিক্ষার সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি-২০০২ পর্যালোচনা করে বলা যায়- উক্ত শিক্ষানীতিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। এছাড়াও বলা হয়েছে জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করার জন্যে ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার সকল শাখায় বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়নি। তাছাড়া প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত কোন ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। কোমলমতি শিশু মনে প্রথমেই ধর্ম সম্পর্কে অনীহাভাব তৈরি হবে বলে আশংকা করা যায়। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূতি সামাজিক, মানবিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিফলন ঘটবে বলা হলেও সুস্পষ্ট দিক নিদের্শনা দেয়া হয়নি। এক্ষেত্রে শিক্ষার সকল স্তরে ধর্মীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক পাঠ্যক্রম তৈরির সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রয়োজন ছিল।

চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে- চিকিৎসা পেশা অন্যান্য সকল পেশার চেয়ে স্পর্শকাতর, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট/অসুস্থতা তথা জীবন-মৃত্যুর সমস্যার সঙ্গে জড়িত বলে চিকিৎসক, সেবক-সেবিকাসহ সকল স্বাস্থ্যকর্মী যেন সংবেদনশীল, বিবেকবান মানুষ হিসাবে মানুষের সেবায় নিয়োজিত জন সেই জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু বিবেকবান মানুষ তৈরির প্রধানতম হাতিয়ার যে ধর্মীয় শিক্ষা তা উল্লেখ করা হয়নি। এক্ষেত্রে চিকিৎসক, সেবক, সেবিকা বা স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে সংবেদনশীল বিবেকবান মানুষ রূপে গড়ে তোলার জন্য চিকিৎসা শিক্ষায় ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাকে সম্পর্কিত একটি কোর্স অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা প্রয়োজন ছিল।

---

৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

আইন শিক্ষাতেও নৈতিকতার আদর্শ স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ধর্ম শিক্ষা ব্যতিরেকে কিভাবে নৈতিকতার আদর্শ সমুন্নত করা যাবে তা আমাদের বোধগম্য নয়। সামাজিক শৃঙ্খলা সুবিচার ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আইন শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই এক্ষেত্রেও নৈতিকতা ভিত্তিক জনবল তৈরির লক্ষ্যে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা কোর্সের সুপারিশ করা প্রয়োজন ছিল।

**জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩ (মনিরুজ্জামান মিয়া কমিশন)**

২০০২ সালের ২১ অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি-১৯৯৭ এর উপর বিবিধ পর্যালোচনা ও সুপারিশকে ভিত্তি করে দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাবলি চিহ্নিত করে এর উন্নতিকল্পে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে। ১৫ জানুয়ারি ২০০৩ একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়াকে কমিশন গঠনের বিষয়ে জানানো হয়। চেয়ারম্যানসহ এ কমিশনের সদস্য ছিল মোট ২৫ জন। কমিশনের পরবর্তী সভায় শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও কমিটির কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ১২টি উপকমিটি গঠন করা হয়। চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে কমিশনের সদস্যদের ৩০টি মূলনীতি সম্বলিত পরামর্শমালা বিতরণ করা হয়। এ নীতিগুলো কমিশনের সভায় আলোচিত হয় এবং কিছু সংশোধনীসহ গৃহীত হয়।[৩৩]

কমিটি তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, শিক্ষালাভ একজন মানুষের জন্মগত অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে এদেশের নাগরিকদের মৌলিক শিক্ষার অধিকার সমুন্নত রাখা হয়েছে। একজন মানুষকে তার ব্যাক্তিগত চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানো, পরিবার ও সমাজের সক্রিয় সদস্য হিসেবে যথার্থ ভূমিকা পালন, নাগরিক কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, ধর্মীয় কর্তব্য পালন এবং দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, বিশ্বমানবতা, অসাম্প্রাদায়িকতা, মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ সৃষ্টি এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলার জন্য নূন্যতম মৌলিক শিক্ষা একান্ত আবশ্যক।[৩৪]

**প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধন করা এবং তাকে উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা। শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে।

স্ব স্ব ধর্মের অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুকে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা।

---

৩৩ *জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩*, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৩০৯

৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ০২

শিশুর মনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সাম্য, সহমর্মিতা ও সহযোগিতাবোধ জাগানো এবং তাকে শান্তিময় পরিবেশের প্রতি আগ্রহী করে তোলা।

শিশুর মনে মানবাধিকার, পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, আর্ন্তজাতিকতাবোধ এবং বিশ্বশান্তি ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলা।

জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ও অন্তদৃষ্টি লাভে সহায়তা করা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা।

শিক্ষার্থীর মধ্যে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচার, মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা ইত্যাদি বঞ্চিত নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করা।

**প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে-**

১. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করতে, বাইরে যেতে বা পানি পান করতে অনুমতি নিতে পারা;

২. অনুমতি ছাড়া অন্যের জিনিসপত্র না দেওয়া

৩. অন্যের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিতে পারা

৪. অন্যদের অহেতুক বিরক্ত না করা।[৩৫]

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, "বুদ্ধিভিত্তিক নৈতিক মূল্যবোধ ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করা।"[৩৬]

সাধারণ শিক্ষা ধারার প্রাথমিক স্তরে ইসলামধর্ম শিক্ষা রাখা হলেও তা যথোপযুক্ত নয় বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিজ ধর্মের প্রতি অনুরাগী ও সচেতন করে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ঘাটতি ছিল বলে মনে হয়। কেননা-

১. ১ম শ্রেণিতে কেবল বাংলা, ইংরেজি ও গণিত শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১ম শ্রেণিতে ইসলামধর্ম শিক্ষা একেবারেই অনুপস্থিত।

২. ২য় শ্রেণিতেও বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মশিক্ষা রাখা হয়নি। কেবল মৌখিক পাঠদানের কথা বলা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক কোন পরীক্ষার ব্যবস্থাও রাখা হয়নি।

৩. ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পরিবেশ বিজ্ঞান, বাংলাদেশ পরিচিতি ইত্যাদির সাথে ইসলাম ধর্মশিক্ষা রাখা হয়েছে। কিন্তু আনুষ্ঠানিক মূল্যায়নে বাংলা, গণিত ইংরেজি ও বাংলাদেশ পরিচিতি বিষয়গুলো রাখা হয়েছে।[৩৭] এখানে ধর্মশিক্ষার আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন বা পরীক্ষা না থাকায় শিক্ষার্থীদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে উঠেছে।

---

৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ১০০ নম্বরের ইসলাম ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে ইসলাম শিক্ষা গুরুত্ব পেলেও প্রাথমিক স্তরে অবহেলিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মনে ইসলাম সম্পর্কে মজবুত ভিত্তি রচনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। সামগ্রিক বিবেচনায় এ শিক্ষানীতিতে অনেকগুলো যুগান্তকারী প্রস্তাব করা হলেও এর সম্ভাবনা ও বাস্তবায়নে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

**জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০**

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন জাতিসত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকে এ পর্যন্ত এ জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে সর্বমোট ১০টি শিক্ষা কমিশন, শিক্ষা সংস্কার কমিটি, অন্তর্বর্তীকালীন টাস্কফোর্স, শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। যেগুলো আমাদের ভাগ্য পরিবর্তনে যথেষ্ট ও যথোপযুক্ত সুপারিশ করলেও কোন সরকারের সময়েই তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে সর্বশেষ হলো জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, ৬ এপ্রিল ২০০৯ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শিম/শা:০৪/শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সেল-২/২০০৪/১২১ তারিখ ২৩-১২-১৪১৫ বঙ্গাঃ/০৬-০৪-২০০৯ খ্রি. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার লক্ষ্যে সরকার ১৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। এর চেয়ারম্যান করা হয় জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরীকে। যিনি পূর্বে কুদরত-এ-খুদা কমিশনেরও সদস্য ছিলেন। এ কমিটি মাত্র চার মাসের মধ্যে একটি খসড়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করেন। এই খসড়া শিক্ষানীতি জনগণের মতামত নেওয়ার জন্য ওয়েবসাইট ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা হয়। এতে ব্যাপক আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনা পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, রাজনীতিবিদ, আলেম-ওলামা, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ও সমাজের বিভিন্নস্তরের মানুষের মতামত, সুপারিশ ও পরামর্শ বিবেচনা করে খসড়া শিক্ষানীতির আরও সংশোধন ও সংযোজন করে ৩১ মে ২০১০, মন্ত্রীসভায় জাতীয় শিক্ষানীতির চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়। অবশেষে ৩ অক্টোবর ২০১০ জাতীয় সংসদে শিক্ষানীতির চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর সর্বসাধারণের জন্য তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদনে পাঠ্যসূচি অধ্যায়ের নম্বর বণ্টন অধ্যায়টি বাদ দেওয়ায় নতুন করে ধোঁয়াশা তৈরি হয়। কোন বিষয় কত নম্বর পড়ানো হবে তা উল্লেখ না করায় শিক্ষানীতি প্রশ্নবিদ্ধ হয়। কারণ পূর্বের সব শিক্ষানীতিতে নম্বর বণ্টন অধ্যায়টি ছিল। এমনকি কোন বিষয়ে সাপ্তাহিক কতটি ক্লাস হবে সেটিও উল্লেখ ছিল।

প্রাক্-কথন, মুখবন্ধ, আঠাশটি অধ্যায় ও দুটি সংযোজনী নিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর পরিধি। প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণিত হয়। এতে ৩০টি লক্ষ ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। এতে শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের ও অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে।

**ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি, আচরণগত উৎকর্ষ সাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ-

১. প্রচলিত ব্যবস্থাকে গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান।

২. প্রত্যেক ধমের্র ধর্মীয় মৌল বিষয়সমূহের সঙ্গে নৈতিকতার উপর জোর দেওয়া এবং ধর্মশিক্ষা যাতে শুধু আনুষ্ঠানিক আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেয়া।

**কৌশলসমূহ**

ক. ধর্মশিক্ষা অংশে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা সম্পর্কে যে সকল কৌশল বর্ণিত হয়েছে তা হলো:

১. শিক্ষার্থীদের মনে আল্লাহ, রাসুল (স) ও আখিরাতের প্রতি অটল ঈমান ও বিশ্বাস যাতে গড়ে ওঠে এবং তাদের শিক্ষা যেন আচার সর্বস্ব না হয়ে তাদের মধ্যে ইসলামের মর্মবাণীর যথাযথ উপলব্ধি ঘটায় সেভাবে ইসলাম ধর্মশিক্ষা দেওয়া হবে।

২. ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে।

৩. কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাতের তাৎপর্য বর্ণনাসহ ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক যথাযথভাবে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হবে।

৪. শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জন, সৎ, সাহস ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা হবে।

**নৈতিক শিক্ষা**

নৈতিকতার মৌলিক উৎস ধর্ম। তবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং দেশজ আবহও গুরুত্বপূর্ণ উৎস। নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে এসকল বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে নৈতিক শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে।[৩৮]

সাধারণ শিক্ষাধারায় প্রাথমিক স্তরের ৩য় থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ১০০ নম্বরের ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু প্রাক-প্রাথমিক ১ম ও ২য় শ্রেণিতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা রাখা হয়নি। এতে করে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা শিক্ষা জীবনের শুরুতে ধর্মীয় শিক্ষা না পাওয়ায় ক্রমান্বয়ে ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে গড়ে উঠার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাই ব্যক্তিকে তার চিন্তা- চেতনা, কর্মকাণ্ড ও আচার-আচরণে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে সুপথে পরিচালনা করে। ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের অভাবই ব্যক্তিকে অন্তঃসারশূন্য করে দেয়। তাই শিক্ষাস্তরের শুরু থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

সামগ্রিকভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ পর্যালোচনা করে বলা যায় এটি একটি স্তরগত পরিবর্তনশীল শিক্ষানীতি। শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত বৈশিষ্ট্য, মৌলিক নীতি সংক্রান্ত দর্শন ও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর চিন্তা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন হয়নি। এছাড়া মানবণ্টন ও পাঠ্যসূচি অধ্যায়টি না থাকায় এর কাঠামোগত দিকও অসম্পূর্ণ রয়েছে।

নৈতিক শিক্ষা অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, নৈতিকতার মৌলিক উৎস ধর্ম। তবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং দেশজ আবহও গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সকল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সমূহ এবং দেশজ আবহ কোনক্রমেই নৈতিকতার উৎস হ'তে পারে না। একমাত্র ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পরকালীন জবাবদিহিতার ভয়ই মানুষকে নৈতিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারে। আর এর মূলভিত্তি হবে কুরআন ও হাদীস।

শিক্ষা কমিশন ও জাতীয় শিক্ষানীতি একটি দেশের ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত নৈতিকতা সম্পন্ন সুনাগরিক তৈরির দিক-নির্দেশনা বিধায় এটা জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি শিক্ষানীতির সঙ্গে জাতির উন্নতি-অবনতি, কল্যাণ-অকল্যাণ, উত্থান-পতন তথা জাতির ভাগ্য ও ভবিষ্যত জড়িত। তাই দেশের মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আক্বীদা-বিশ্বাস, কৃষ্টি-সভ্যতা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন যুগোপযোগী আধুনিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা উচিত। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত সাত বার জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণিত হয়েছে। কিন্তু কোন শিক্ষানীতিতে দেশের মানুষের চাহিদার প্রতিফলন ঘটেনি বিধায় যতই শিক্ষিতের হার বাড়ছে ততই দেশ ও জাতি দুর্নীতি, অবক্ষয় ও অবনতির দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে।

---

৩৮ *জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০*, পৃ. ২০

# পঞ্চম অধ্যায়
## পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয়নীতি ও মূল্যবোধ প্রসঙ্গ

# পঞ্চম অধ্যায়
# পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয়নীতি ও মূল্যবোধ প্রসঙ্গ

একটি দেশের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সে দেশের জাতীয় দর্শন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সামাজিক প্রথা, ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়। শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের ও ভবিষ্যৎ সমাজ বিনির্মাণের হাতিয়ার। শিক্ষাব্যবস্থা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সৎ, দক্ষ, চরিত্রবান, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও চিকিৎসক, অর্থনীতিবিদ, প্রযুক্তিবিদ, সাহিত্যিক ও দার্শনিক তৈরি করে। রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সুনাগরিক ও দেশপ্রেমিক জনশক্তিতে পরিণত করে শিক্ষাব্যবস্থা। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, শান্তি, প্রগতি নির্ভর করে শিক্ষাব্যবস্থার উপর। শিক্ষা মানুষকে সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে শেখায়। এছাড়া মৌলিক মানবীয় গুণাবলী শিষ্টাচার, শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, কর্তব্যজ্ঞান, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ব, নৈতিক মূল্যবোধ, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সৃজনশীলতা ইত্যাদির বিকাশ ঘটায় শিক্ষাব্যবস্থা। আর এ শিক্ষাকে সঠিকভাবে রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি। বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম মুসলিম দেশ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম (৯১.৪%) হিসেবে ৩য় বৃহত্তম দেশ। কিন্তু বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষাক্রমে ইসলার্ম ও নৈতিক শিক্ষার জন্য যে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে শিক্ষানীতিতে বর্ণিত লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও আদর্শ সুনাগরিক তৈরিতে সক্ষম হচ্ছে না। আদর্শ মানুষ তৈরিতে, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি গঠনে যথাযথভাবে নৈতিক শিক্ষা প্রদান একান্ত প্রয়োজন। ফলে সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিকস্তরে ধর্মীয় শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পর্যালোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

**ধর্ম ও নৈতিকতা প্রসঙ্গ**

ধর্ম ও নৈতিকতা মানবসমাজের মূল্যবোধ, আচরণবিধি ও সামাজিক শৃঙ্খলা গঠনে গভীর প্রভাব বিস্তারকারী দুটি আন্তঃসম্পর্কিত ধারণা। ধর্ম মূলত বিশ্বাস, আচার-অনুশীলন, আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বরীয় নীতির মাধ্যমে মানুষের অন্তর্গত চেতনা ও মানসিক গঠনে কাজ করে; অপরদিকে নৈতিকতা সেই ধর্মীয় বা দার্শনিক বোধকে বাস্তব সামাজিক আচরণের নির্দেশিকায় রূপ দেয়। ইতিহাসে দেখা যায়, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম–প্রত্যেকটি ধর্মই সত্য, ন্যায়, অহিংসা, সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধের মতো নৈতিক গুণাবলিকে মানবজীবনের কেন্দ্রীয় আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। সমাজবিজ্ঞান ও নৈতিক দর্শনের আলোচনায় ধর্মকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং নৈতিকতাকে আচরণগত প্রয়োগ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, যা শিক্ষা, আইন, পরিবার ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল্যবোধ গঠনে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। আধুনিক বিশ্বেও নৈতিক সংকট, মূল্যবোধের পরিবর্তন ও

সামাজিক বৈচিত্র্যের মধ্যেও ধর্মীয় নীতি মানবিকতা, সামাজিক সম্প্রীতি ও ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গঠনে একটি কার্যকর মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে গবেষণার দৃষ্টিতে ধর্ম ও নৈতিকতা মানবসভ্যতার ধারাবাহিক মূল্যবোধ নির্মাণের অভিন্ন এবং অপরিহার্য উপাদান।

**ধর্ম**

বাংলা ধর্ম শব্দ যা ধারণ করা মূল ব্যঞ্জনা থেকে উৎসারিত। ধর্ম এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Religion। যার অর্থ হলো বন্ধন, যুক্ত, আবদ্ধ বা শৃংখলিত করা। অন্যদিকে ধর্ম এর আরবী প্রতিশব্দ হলো আদ্বীন। যার অর্থ এমন বন্ধন যার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত নির্দেশ মোতাবেক কর্ম সম্পাদনকেই বোঝায়। অর্থাৎ মহান সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত নির্দেশ অনুসরণ করে তার প্রেরিত মহাপুরুষদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ অনুকরণ করে পূণ্য কর্মে নিজেকে আবদ্ধ রেখে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও মূল্যবোধের চেতনায় নিজেকে উদ্ভাসিত করার নামই ধর্ম বা Religion।

দার্শনিক Emile Durkheim-এর মতে, ধর্ম হলো পবিত্র বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীর বিশ্বাস ও আচরণের একটি সমন্বিত ব্যবস্থা।[১]

**নৈতিকতা**

নৈতিকতা শব্দটি বাংলা 'নীতি' শব্দমূল থেকে উদ্ভূত। নীতি অর্থ-ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য-অকর্তব্য, বিচার, প্রথা, আচার, রীতি-নীতি ইত্যাদি।[২] নৈতিকতা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো morality। আর morality শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ moralitas থেকে, যার অর্থ- আচার-আচরণ, রীতিনীতি, আদব-কায়দা, চরিত্র, ভদ্রতা, সঠিক আচরণ, অভ্যাস ইত্যাদি।[৩] আবার নৈতিকতা শব্দটি ইংরেজিতে Ethics অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা গ্রিক শব্দ Ethica থেকে, যার অর্থ- চরিত্র (Character)।[৪] চরিত্রকে অভ্যাস বা রীতিনীতির সাথে সম্পর্কিত মনে করা হয়ে থাকে। ড. শেখ সালমা নার্গিস বলেন, Ethics শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Ethos থেকে এসেছে। এর অর্থ প্রথা (custom) বা প্রচলিত রীতিনীতি।[৫] Ethics শব্দটি বিশেষভাবে নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

---

১ Émile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life* (London: Georgn Allen & Unwin, 1915), p. 47

২ ড. মুহাম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০২খ্রি.), সং-২, পৃ. ৬৯৯

৩ Jaeqes P. Thiroux, *Ethics Theory and Practice* (California: Glencoe Publishing co. inc.), p. 2

৪ S. John Mackenze, *A Manual of Ethics* (Delhi: Oxford University Press, 1993), p. 1

৫ ড. শেখ সালমা নার্গিস, *বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষা: শিক্ষাক্রম ও বিদ্যালয়ে অনুশীল* (ঢাকা: অন্য প্রকাশ, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১৮

morality শব্দের অর্থ সম্পর্কে Oxford Advanced Learner's Dictionary-তে বলা হয়েছে- Principles concerning right and wrong or good and bad behavior" অর্থাৎ নৈতিকতা হলো- মানব আচরণের ন্যায্য-অন্যায্য অথবা ভালো-মন্দ সম্পর্কিত মূলতত্ত্ব। [৬]

The World Book Dictionary-তে বলা হয়েছে, "Moral, Ethical mean in agreement with a standard of what is right and wrong in character or conduct". অর্থাৎ নৈতিকতা হলো এমন একটি আদর্শের সাথে একমত পোষণ করা যা মানুষের চরিত্র বা আচরণের ভালো-মন্দ সম্পর্কে ধারণা দেয়।

J. P. Thiroux বলেন,

"Morality deals basically with humans and how they relate to other beings, both human and non-human. It deals with how humans treat other beings to promote mutual welfare, growth, creativity and meaning in a striving for what is good over what is bad and what is right over what is wrong" [৭].

মোটকথা, বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন প্রাণী হিসেবে মানুষের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ও কর্তব্য বিবেচনা করার একটি অন্তরশক্তি নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধ। এটি এমন একটি অন্তরশক্তি যা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ, কর্তব্য নির্ধারণ, ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত? কোনটি ভালো ও করণীয় আর কোনটি মন্দ ও বর্জনীয়? তা নির্দেশ করার সাথে সাথে মানুষকে ভালো ও ন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং মন্দ ও অন্যায় কাজ থেকে বারণ করে। সমাজে বসবাসকারী অপরাপর ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল, সংস্থা ইত্যাদির সাথে একজন মানুষের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত তা নির্দেশ ও নির্ণয় করে নৈতিকতা শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হলো- خلق 'খুলুকুন' এর বহু বচন হলো أخلاق 'আখলাক'।[৮] এর শাব্দিক অর্থ স্বভাব, চরিত্র, সচ্চরিত্র, নৈতিকতা, সদাচার, নীতিবোধ ও মানুষের সহজাত স্বভাব ও প্রকৃতি।[৯] পবিত্র কুরআনে خلق 'খুলুকুন' উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১০]

---

৬ *The World Book Dictionary*, v.2 (Chicagoi: World Book, inc.2000), p. 1350

৭ Jaeqes P. Thiroux, Ethics Theory and Practice, ibid, p.

৮ মুনির বা'লাবাক্কী, *আল-মাওরদি* (বৈরুত: দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ১৯৭৭খ্রি.). পৃ. ৫৯২

৯ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল মু'জামুল ওয়াফি, আধুনিক আরবি-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৭খ্রি.), পৃ. ৩৭৬।

১০ সূরা আল-ক্বালাম, আয়াত: ০৪

মানবজাতির বিমূর্ত চেতনার একটি কল্যাণকর প্রতিফলন হলো নৈতিকতা। ব্যক্তি,পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রে ন্যায়, সুবিচার, সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানবীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত সকল কর্মকান্ডকেই নৈতিকতা বা Morality বলা হয়।[১১] মোটকথা, বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন প্রাণী হিসেবে মানুষের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ও কর্তব্য বিবেচনা করার একটি অন্তরশক্তি নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধ। এটি এমন একটি অন্তরশক্তি যা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ, কর্তব্য নির্ধারণ, ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নৈতিকতা বা আখলাকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আবু হামিদ আল-গাযালী (মৃ. ৫০৫হি.) বলেন,

"আখলাক হচ্ছে অন্তরে বদ্ধমূল একটি প্রকৃতির নাম, যা দ্বারা ক্রিয়াকর্ম অনায়াসে ও চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে প্রকাশ পায়। এই প্রকৃতির দ্বারা প্রকাশিত ক্রিয়াকর্ম যদি বিবেক ও শরীয়াতের দৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট হয় তবে সেই প্রকৃতিকে বলা হয় সচ্চরিত্র। পক্ষান্তরে, যদি তা দ্বারা মন্দ ক্রিয়াকর্ম প্রকাশ পায় তবে সেই প্রকৃতিকে বলা হয় অসচ্চরিত্র।"[১২]

প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইবনু মিসকাওয়াহ (মৃ. ৪২১হি.) বলেন,

"আখলাক মানব প্রকৃতির এমন একটি অবস্থা যা কোন রকম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাকে কাজের প্রতি আহবান জানায়। আর এ অবস্থা দু'ধরনের। (ক) যা স্বভাবগতভাবেই পাওয়া যায়। যেমন সামান্য বিষয় মানুষকে আন্দোলিত করে, যথা-উষ্মা, এটা উত্তেজিত হয় সামান্য কারণে। (খ) যা অভ্যাস বা অনুশীলন ছাড়া অর্জিত হয় না।"[১৩]

অনেকের মতে, দৈনিক কাজ-কর্মের মাধ্যমে যে সব আচার-ব্যবহার, চাল-চলন ও স্বভাবের প্রকাশ পায়, সে সবের সমষ্টি হলো আখলাক।

মূলত: আখলাক একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সামাজিক জীব হিসেবে মানব চরিত্রের প্রতিটি দিকই আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিগত জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত আখলাকের ক্ষেত্র বিস্তৃত। মানব চরিত্রের সৎ ও অসৎ গুণাবলির প্রেক্ষাপটে আখলাক দুই ধরনের: (ক). আল-আখলাকে হামিদাহ বা সৎ চরিত্র (খ). আল-আখলাকে যামিমাহ বা অসৎ চরিত্র।

---

১১ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী, *নীতি বিদ্যা* (ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ২০০১), পৃ. ১০

১২ আবূ হামিদ গাযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন* (বৈরুত: দার আল-মা'রিফাহ, তা.বি.), খ.৩, পৃ. ৫৩

১৩ ইবনে মিসকাওয়াহ, *তাহযীব আল-আখলাক* (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ, সং-২), পৃ. ১০

**নৈতিক শিক্ষা**

নীতি বিষয়ক শিক্ষাই হলো নৈতিক শিক্ষা। শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হল সমাজে ব্যাপক নৈতিকতার প্রতিফলনের মাধ্যমে সুবিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। যাতে করে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে শিক্ষার মাধ্যমে আদর্শ জীবনের অধিকারী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য ও সমতাকে সামাজিকভাবে অনুশীলন ও উদ্বুদ্ধ করাই হলো নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য।[১৪]

**মূল্যবোধ**

মূল্যবোধ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Value, আরবী প্রতিশব্দ القيم। সাধারণতঃ মূল্যবোধ (Value) বলতে বোঝায় আমাদের আচরণের ভালো-মন্দের দিক মূল্যায়ন করা। নীতিবিজ্ঞানে মূল্য (Value) কথাটির আক্ষরিক অর্থ, যোগ্যতা বা উৎকর্ষতা। নীতিবিজ্ঞানের ভাষায়, "মূল্যবোধ (Value) হচ্ছে এমন একটি যোগ্যতা বা উৎকর্ষতা, যা আমাদের আচরণের লক্ষ্য ও কাম্য বস্তুকে গঠন করে।"[১৫] আর সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষায়, "মূল্যবোধ হচ্ছে এমন একটি আদর্শের মাপকাঠি যা মানুষের প্রয়োজন, দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও আকাঙ্ক্ষার নৈতিক, নান্দনিক এবং যৌক্তিক প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করে।"[১৬]

মূল্যবোধ হচ্ছে কতগুলো ভালো আচরণের সমষ্টি যা ব্যাক্তির আচরণের বহিঃপ্রকাশের মধ্যে প্রকাশ পায়। মূল্যবোধ জড়িত শিক্ষার সাথে, বিশ্বাসের সাথে, ধর্মের সাথে, সমাজ ব্যবস্থার সাথে, সংস্কৃতির সাথে, ঐতিহ্যের সাথে, রাজনীতির সাথে, পেশার সাথে। মূল্যবোধ বলতে মানবসমাজে ঐতিহ্যগতভাবে স্বীকৃত কাংখিত মানসিক সংগঠনগত আচরণিক অবস্থাকে বুঝায়। মূল্যবোধ এমন একটি গুণ যা ব্যক্তিকে তিলে তিলে অর্জন বা শিখতে হয়। তবে সমাজে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গুলো না থাকলে মূল্যবোধ সুসংহত করা সহজ হত।[১৭] অতএব, মূল্যবোধ হচ্ছে এমন একটি মাপকাঠি, যার আদর্শে সমাজস্থ মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং যার মাধ্যমে মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করা হয় এবং যা মানুষের কাঙ্ক্ষিত আচরণ গঠন করে।

**ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যাবোধের প্রয়োজনীয়তা**

মানব প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যেই মনুষ্যত্ব (Humanity) এবং পশুত্ব (Animality) সমান্তরালভাবে বিরাজমান। নৈতিক মূল্যবোধের ফলে সমাজ বহু অরাজকতা, অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে মুক্তি পায় এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। নৈতিক মূল্যবোধ উন্নয়নের একটি

---

১৪ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী, *নীতি বিদ্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১৫ ড. এম. আবদুল হামিদ, *সমকালীন নীতি বিদ্যার রূপরেখা* (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ ও প্রকাশনা বোর্ড, ২০০১), পৃ.১৫

১৬ সম্পা দাস, *সমাজ কর্ম: প্রত্যয়, ইতিহাস ও দর্শন* (ঢাকা: বুক চয়েস, ২০০৫), পৃ.১৩৭

১৭ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী, *নীতি বিদ্যা* (ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ২০০১), পৃ. ১০

প্রধান পূর্বশর্তও বটে। যে জাতির নৈতিক মূল্যবোধ যতো বেশি জাগ্রত হয়, সে জাতি ততো বেশি উন্নত। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও সুশাসনের জন্য নৈতিক মূল্যবোধ অনন্য ভূমিকা পালন করে এবং এর উপর একটি জাতির সভ্যতা, নৈতিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নয় বরং তারা কতখানি নৈতিক মূলবোধ দ্বারা সঞ্জীবিত তা দেখার বিষয়। নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে কর্মঠ ও পরিশ্রমী করে তোলে। শ্রম বিমুখতা, দায়িত্বহীনতা এবং উদাসীনতার মতো নৈতিক ব্যাধি নিরাময়ের ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধ মহৌষধের মতো কাজ করে। নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে অন্যায়ের পথ থেকে বেঁচে থাকার চেতনা যোগায়। ব্যক্তিস্বার্থ, অহংচেতনা, আত্মতুষ্টি, দুনিয়াসক্তি ইত্যাদি সংকীর্ণ চিন্তা ভাবনা থেকে বাঁচিয়ে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে। নৈতিক মূলবোধ মানুষকে দান করে প্রবল ও দৃঢ় মানসিক শক্তি, যার ফলে মানুষ যাবতীয় দুর্নীতিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে শেখে; অন্যায় ও অবৈধ পন্থা পরিত্যাগ করে নৈতিকতার ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ হয়। নৈতিক মূল্যবোধ মানুষের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করে থাকে। নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে আলোকিত মানুষের সংখ্যা সমাজে যতই বৃদ্ধি পায়, ততই সমাজ জীবন হয়ে ওঠে কলুষমুক্ত ও সৌন্দর্যমন্ডিত। তাই মানুষের আত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষের জন্য এবং জাতীয় জীবনের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষানীতি ও কারিকুল্যামে ধর্মীয় নৈতিক মূল্যবোধের সংযোগ ঘটানো একান্ত জরুরি।

**মূল্যবোধের অবক্ষয়**

কোন সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটলে তার পরিণতি কী ভয়াবহ হতে পারে এর প্রমাণ বর্তমান সমাজচিত্র। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করে এবং সভ্যতার চরম উৎকর্ষের এ সময়ে নৈতিক মূল্যবোধের সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের আঘাতে মানব সমাজদেহ আজ ক্ষত-বিক্ষত। সত্য-মিথ্যা আর ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব মানবজাতিকে অক্টোপাসের মত ঘিরে ধরেছে। প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, দয়া-মায়া, পরার্থপরতা, মানুষের সুন্দর ও মহৎ আকাঙ্ক্ষাগুলো জীবন থেকে আজ নির্বাসিত। ন্যায়বিচারের আশা, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণ কামনা আজ চরম প্রতারণার শিকার। মানুষে মানুষে, সমাজে সমাজে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে হিংসা-বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-কলহ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে জীবনকে কুরে কুরে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। ফলে সৎ অসৎ চিন্তা বিবর্জিত আত্মসর্বস্বতা, সংকীর্ণতা, অসহিষ্ণুতা ও মনুষ্যত্বহীনতা আর বল প্রয়োগই নৈতিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। "জোর যার মুল্লুক তার" এ মাৎস্যন্যায়-নীতির আয়ত্তে বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্ব আজ বন্দী। বিশ্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের এমন একটি স্থানও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে কম-বেশী এর উৎকট প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সর্বক্ষেত্রেই বিভাজন আর অনৈক্য মানবতার গৌরবময় অতীতের সকল অর্জনকে আজ ম্লান করে দিচ্ছে।

দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, অতি মুনাফাখোরীর আবরণে চলছে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থ চরিতার্থ করার মহোৎসব। ফলে প্রতিদিনই ঘটে চলছে এমনসব অমানবিক ও অস্বাভাবিক ঘটনা যা আইয়্যামে জাহিলিয়াতকেও হার মানায়। হিংসাত্মক কার্যকলাপ, নৃসংশতা, প্রতারণা, জালিয়াতি, ফটকাবাজি, কালোবাজারি, অপচয়, জাতীয় সম্পদ আত্মসাৎ, অশ্লীলতা ও মাদকের ছড়াছড়ি ইত্যাদি আজ আমাদের নিত্যসঙ্গী। মূল্যবোধ অবক্ষয়ের এসব বিভৎস চিত্র প্রতিদিনই প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বদৌলতে জাতি অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করে চলছে। জাতির জ্ঞানী-গুণী, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সুজন ব্যক্তিবর্গ আজ হতবাক, স্তম্ভিত, পরিণতির আশঙ্কায় আতঙ্কিত। মূলত আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি উদাসীনতা এবং বৈষয়িক ও বস্তুগত ভোগ-সম্ভোগের প্রতি অতিশয় আকর্ষণই মানুষের এ অবক্ষয় ও অধঃপতনের প্রকৃত কারণ। এ ছাড়াও যেসব কারণকে সাধারণত দায়ী করা যায় তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার অভাব, দারিদ্র ও বেকারত্ব, জাতির নীতি-নির্ধারক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা এবং অপরিণামদর্শী দায়বদ্ধতা, ক্ষমতা ও সম্পদের প্রতি সীমাহীন লোভ ও মোহ, সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা, ন্যায়বিচারের অভাব, দুর্নীতি, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, আত্মম্ভরিতা, রুচি- বিকৃতি, হতাশা ও অক্ষমতা ইত্যাদি। মানুষ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী এবং মানুষের চিন্তা ও জ্ঞান নির্ভুল বা নিরপেক্ষ নয়।' তাই তার পক্ষে নিজের চিন্তা-গবেষণা ও উদ্ভাবিত কর্ম-পরিকল্পনা দ্বারা প্রকৃত কল্যাণ লাভ সম্ভব হয় না; বরং কোন একটি বিশেষ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সে আরো বহু সমস্যায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। তাই আমাদের উচিত, ধর্মীয় ও আধুনিক জ্ঞানে নিজেদের সমৃদ্ধ করে সমৃদ্ধ করে সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হওয়া।

**শিক্ষার উদ্দেশ্য**

জাতির উৎকর্ষতা ও বিকাশ। মানবিক ও আত্মিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনার অবকাশ রাখে। আধুনিক মনীষীদের দৃষ্টিকে Economic employment-এর জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তাঁরা মনে করেন, Education is key to development. আধুনিক এসব অর্থনীতিবিদ নিরক্ষরতাকে প্রগতির পথে মহাপ্রতিবন্ধকরূপে চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে দেশের জনসংখ্যায় নিরক্ষরতার প্রাবল্য উন্নয়নকর্মে বিরাট বাঁধার সৃষ্টি করে।[১৮] কৃষিজ উন্নয়নের পিছনেও শিক্ষা ও সাক্ষরতার গুরুত্ব কম নয়। কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যই শিক্ষা অর্জন করতে হবে বা এটিই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এমন কথা ভাবা নিরেট বস্তুবাদিতার নামান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুগত বা বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনকে অস্বীকারের কোন উপায়

---

১৮ মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, *স্বাক্ষরতা ও স্বাক্ষরতা পদ্ধতি* (ঢাকা: ইউনিসেফ ১৯৭৯খ্রি.), পৃ. ৫; আবু হামিদ আবদুল লতিফ, *উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৩৯০বং/১৯৮৪খ্রি.), পৃ. ১০০

নেই। কিন্তু শুধু সেই শিক্ষা যা কেবল মানুষের বাইরের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয় আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন বা আত্মার বিকাশের প্রয়াসকে গৌণ করে তোলে সেই শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত ও চিরস্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায় না-এ সত্য বিশ্বে আজ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। কারণ যে আত্মা মানুষকে পরিচালিত করে তা যদি যথার্থ পথের দিশা দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে যত মেধা-মস্তিষ্ক সম্পন্ন নিখুঁত পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক না কেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য যত লজিস্টিক সাপোর্টই দেয়া হোক না কেন তার দ্বারা সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং মানুষের যে বিকাশ তা হতে হবে অবশ্যই সুষম, অর্থাৎ তার দেহ আর আত্মা যেন শিক্ষায় সমন্বিতভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে সেদিকটি বিবেচনায় আনতে হবে। আর মানুষের এই সুসমন্বিত বিকাশের জন্য এমন একটি যুগোপযোগী ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন যার মাধ্যমে জাতি একই সাথে মানবিক ও আত্মিক উৎকর্ষতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। এ দিকটি সামনে রেখে জাতিকে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন একটি সুসমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ও উন্নয়ন। এর মাধ্যমেই সম্ভব জাতিকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলে প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার আসল প্রয়োজন এখানেই নিহিত।

**ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা**

শিক্ষার সাথে ধর্মের সম্পর্ক আগাগোড়াই বেশ নিবিড়। ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'আল কুরআন' আরবী শব্দ; এর আভিধানিক বাংলা প্রতিশব্দ হল 'আবৃত্তি করা' বা 'পাঠ করা'। শুধু ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থই নয় বরং খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের সাথেও লেখা-পড়ার সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। হিব্রু শব্দ 'বাইবেল' অর্থ 'বই'- ব্যাপক অর্থে 'জ্ঞান' বা 'শিক্ষা'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ধর্মগ্রন্থগুলোর নামের সাথে শিক্ষার বা জ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রচলিত চরম নৈতিক অবক্ষয় থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হলে ইসলামী শিক্ষার যে কোনো বিকল্প নেই একথা আজ আর অস্বীকারের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। ইসলামী জিন্দেগীর পুরোটাই ধর্ম নির্ভর। সুতরাং মুসলমানদের জন্য ধর্মকে বাদ দিয়ে শিক্ষার চিন্তা অবান্তর। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম মনীষীগণ ধর্ম শিক্ষাকে প্রাধান্য দেবেন। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য অমুসলিম বরেণ্য শিক্ষাবিদ, মনীষী, শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা এ প্রসঙ্গে কি বলেন তা এ ক্ষেত্রে বিবেচনা করা দরকার। বলাবাহুল্য তাঁদের অনেকেই শিক্ষার সাথে ধর্মকে সম্পৃক্ত করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন-

স্ট্যানলি হল (Stanly Hall), জন মিল্টন (John Milton), এ্যলবার্ট স্কেজার (Albert Scezer), প্রফেসর হিম্যান এইচ হোম (Prof. Heman H. Home), শিক্ষা বিজ্ঞানী রাঙ্ক (Rusk), নান (Nune), এমনকি বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato) পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকাকে অস্বীকার করতে চাননি। বিশিষ্ট শিক্ষা বিজ্ঞানী স্ট্যানলী হল (Stanly Hall) দ্ব্যর্থহীনভাবে ধর্মীয় শিক্ষার পক্ষে মত ব্যক্ত বলেন:

If you teach their the three 'R's, Reading, Wrighting and Arithmatic and do'nt teach the fourth 'R' Religion, they are sure to become fifth `R' Rascal. অর্থাৎ- শিক্ষার্থীকে শুধু পড়তে লিখতে আর অংক কষতে শিখালে, আর ধর্ম না শিখালে তারা দুষ্টু হয়ে পড়বেই।

John Milton মনে করেন-Education is the harmonious development of bodz, mind and soul. অর্থাৎ-শরীর, মন ও আত্মার সুষম বিকাশের নাম শিক্ষা।

এই তিনের সুষম বিকাশ ঘটাতে হলে ধর্মকে বাদ দিয়ে যে সম্ভব নয় তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষা চিন্তাবিদ Albert Scezer তাঁর একটি গ্রন্থে শিক্ষার সাথে ধর্মের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন:

Three kinds of progress are significant progress of knowledge and technology, progress in socialigation of man progress in spirituality.

এখানেই শেষ না করে এর সাথে তিনি যোগ করেন-The last one is the most important.

এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে আর একটু এগিয়ে তিনি পরামর্শ রাখেন:

Our age must achieve spiritual renewal. A new renaissenc must come the renaissence in which mankind discovered that ethical action is the supreem truth and the supreem utiliterieanism by which mankind will be liberated.

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিজ্ঞানীদের এই সকল ধারণা ও মতামত শুধু তত্ত্ব হয়েই থাকেনি বরং বাস্তবে এর প্রতিফলন কিভাবে ঘটতে পারে সে ব্যাপারেও তাদের চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে কিভাবে ধর্মকে এর অন্তর্ভুক্ত করা যায় তার পথ বাতলে দিয়েছেন।

রাস্ক (Rusk) শিক্ষাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন। (ক) শারীরিক শিক্ষা (খ) আধ্যাত্মিক শিক্ষা। আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে আবার চারটি ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে ১. মানবিক ২. নৈতিক ৩. চারুকলা ও ৪. ধর্ম।

নান (Nune) নৈতিক চরিত্র ও ধর্মকে প্রথমেই স্থান দেয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছে। প্লেটো (Plato) যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তক তা হল আদর্শবাদ। তাঁর এই আদর্শবাদ শিক্ষা হলো বস্তু জগতকে আয়ত্ব করতে শেখায়। মানব জীবনের সারাংশ আধ্যাত্মিক অনুভূতি বিকাশের মাধ্যমে এর উৎকর্ষতা সাধনই আদর্শবাদী শিক্ষার মূল প্রতিপাদ্য। এটি সাধারণ ধর্মের কথা, যার সকল ক্ষেত্রে সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল পর্যায়ে ইসলামের রয়েছে সমৃদ্ধ দিক-দর্শন।

**ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়ন**

ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যবোধের জন্য সুশিক্ষা বা জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। কেননা জ্ঞান অর্জন ব্যতীত মূল্যবোধের বিকাশ সম্ভব নয়। জ্ঞানের কারণেই পৃথিবীর প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ.) শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ফেরেশতাগণের নিকট থেকে সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। মহান আল্লাহ্ জ্ঞানার্জনের নির্দেশনা দিয়েই পবিত্র কুরআনে তাঁর প্রথম বক্তব্য আরম্ভ করেছেন, "পড়ো, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[১৯] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "যাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।"

বিশ্বমানবতা যাতে এ কল্যাণ তথা নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন করতে পারে সেজন্য রাসূলুল্লাহ (স.) জ্ঞানার্জনকে অপরিহার্য (ফরয) ঘোষণা করেছেন। এভাবে পবিত্র কুরআনের প্রায় ৭৫৬ টি আয়াত এবং বহু হাদীসে জ্ঞানার্জন ও গবেষণা করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, আহ্বান জানানো হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো মানুষের মন ও মননে নৈতিক মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটানো এবং মানবজীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলা। ভোগবাদী উন্নত দেশগুলোর প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, তারা প্রথমেই শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করেছে। অতঃপর এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করে সভ্যজাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে তাদের নিজস্ব মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করে শিক্ষানীতি প্রণয়নের ফলে। প্রত্যেক জাতি নিজেদের বোধ-বিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করে এবং এর লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকে। আমেরিকা ও রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা বা শিক্ষাদর্শন এক রকম নয় এবং এর দ্বারা একই মূল্যবোধের মানুষ তৈরিও হয় না, যদিও উভয়টিই ভোগবাদী সভ্যতা। এর কারণ তাদের মূল্যবোধের পার্থক্য।

---

১৯ সূরা আলাক, আয়াত: ০১

সুতরাং শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে নিজস্ব মূল্যবোধের আলোকে। নিজস্ব মূল্যবোধের আলোকে সৎ ও দক্ষ জনশক্তি গঠনের লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষানীতি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাই পারে একটি উন্নত ও সভ্য জাতি গঠন করতে। কেননা শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সমাজের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব করে থাকে এবং দেশ ও জাতি গঠন এবং পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যদি সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, ত্যাগ, সংযম, উদারতা ও মানবসেবা ইত্যাদি মূল্যবোধের সম্মিলন ঘটাতে সক্ষম হই, তাহলে জাতি দ্রুত নৈতিক অবক্ষয়মুক্ত হবে। তবে এটি বাস্তবায়নের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন নিজস্ব মূল্যবোধের আলোকে প্রণিত একটি সর্বজনীন শিক্ষানীতি এবং একদল মেধাবী ও সুশিক্ষিত শিক্ষকের। সুতরাং দেশের সবচেয়ে মেধাবী ও সুশিক্ষিত সুজনদের শিক্ষকতার পেশায় আকৃষ্ট করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও সুষ্ঠু শিক্ষানীতি গ্রহণের মাধ্যমে মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রতিরোধের প্রারম্ভিক কাজ শুরু করতে হবে।

**মূল্যবোধ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভূমিকা**

বিদ্যালয় হচ্ছে সমাজের আলোকবর্তিকা। বিদ্যালয়ে সভ্যতারই ফুল ফোটানো হয়। মূল্যবোধ শিক্ষার একটি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বিদ্যালয় । কারণ এখানে সমাজের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীরা পড়তে আসে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার পরিবার থেকে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসে। তাই বিভিন্ন পর্যায়ের মূল্যবোধ শিখানোর উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে বিদ্যালয়। মূল্যবোধ চর্চায় বিদ্যালয় নানাভাবে ভূমিকা রাখতে পারে। সমাজ কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধের মধ্যে যত মূল্যবোধ আছে সেগুলোর চর্চার উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে বিদ্যালয়। যেমন প্রতিবেশীর প্রতি ভালো আচরণ করা। যেহেতু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পরস্পরের প্রতিবেশী তাই এই সৎ প্রতিবেশীসুলভ মূল্যবোধ আচরণ শিক্ষা দেওয়া খুবই সহজ। নৈতিকতার অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরে এবং এর ভয়াবহ ফলাফলের ব্যাখ্যা করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে নৈতিকতাধর্মী মূল্যবোধ যেমন সততা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ইত্যাদি শেখানো যায়। সামাজিক মূল্যবোধ সমূহের সম্প্রসারণের কৌশলগত জায়গাও হচ্ছে বিদ্যালয়। এখানে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করে। তাই সামাজিক মূল্যবোধ গুলো বিভিন্ন সমাজে এবং সমাজের প্রতিটি পরিবারে সম্প্রসারণ করা যায়। বিদ্যালয়ে সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালিত হয়। এ সমস্ত আনুষ্ঠানিকতার রীতিনীতিগত মূল্যবোধ শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় হতেই শিখে। সমাজে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতি গোষ্ঠী বসবাস করে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। ফলে বিদ্যালয় তাদের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ জাগ্রত হতে পারে।

ইসলাম শিক্ষা মূলতঃ সামগ্রিকভাবে ইসলামী শিক্ষায় বিদ্যামান। ইসলামী শিক্ষা বলতে বুঝায়- যে শিক্ষার প্রতিটি বিভাগই কুরআন ও হাদীসভিত্তিক, অর্থাৎ যার কোন একটি দিকও ইসলামী আক্বীদাবিরোধী নয় এমন শিক্ষার নামই হল ইসলামী শিক্ষা। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষার কোন স্তর ইসলামের দিক-নির্দেশনা বহির্ভূত নয়। ইসলামের সঙ্গে সংস্কৃতি (Culture), মনোবিদ্যা (Psychology), নৃতত্ত্ব (Anthropology), প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞান (Archeology), দর্শন (Philosophy), ইতিহাস (History), ভূগোল (Geography), সমাজবিজ্ঞান (Sociology) সহ পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান শাখার সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে।

মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তিনি সমস্ত জ্ঞানের স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বজ্ঞানের সকল বিষয়ই তিনি মানুষের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। যেহেতু তিনি সকল জ্ঞানের উৎস সেহেতু ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব সমস্ত জ্ঞানের মানদন্ড। সততা ও আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ বিশ্বাসসহ মানব কল্যাণের জন্য নবী করীম (স) নির্দেশিত পথে মানুষ সমগ্র জ্ঞানের সুস্থ ও নৈতিকচর্চা করে যাবে-এটিই মানুষের নিকট মহান আল্লাহ নির্দেশ। অতএব বাংলাদেশের পাঠ্যক্রম পাঠ্যসূচিতে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি আরবী ও ইসলাম শিক্ষাকে এমনভাবে  সন্নিবেশিত করতে হবে, যেন একজন ছাত্র জ্ঞানের ব্যাপক পরিপেক্ষিত লাভ করতে পারে এবং বিশেষায়িতের স্তরে প্রবেশ করার আগে জীবন ও সমস্যাবলীর প্রতি সুসংহত জ্ঞান অর্জন করতে পারে। একজন শিক্ষার্থী জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বদর্পে বিচরণ করতে সক্ষম হয়। দেশের আনুগত্যশীল সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠে; সত্য, ন্যায় আর ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে পরিশীলিত সমাজ গঠনে সক্ষম হয়। তাই জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব অপরীসিম।

**প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব**

মানুষের জ্ঞানগত পরিধি যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার সমস্যা ততই জটিল হতে জটিলতর হয়ে যাচ্ছে। মানুষ বস্তুগত অগ্রগতি যত বেশি লাভ করছে, নিত্য-নতুন কামনা-বাসনা, নতুন নতুন সমস্যা ও জটিলতা এবং নানারূপ নৈরাশ্য ও বঞ্চনার হাহাকার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। দুঃখজনক হলেও বাস্তব যে, বর্তমানে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সভ্য সমাজে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অপরাধের হার বেড়েই চলেছে। কেননা উন্নতির সোপান হিসেবে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার ব্যবস্থা নেই। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাবগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল:

**ক. মূল্যবোধের অবক্ষয়**

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মূল্যবোধ সৃষ্টি করা হলেও প্রচলিত শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে কেউ তা অর্জন করতে পারছে না। পৃথিবীর অগ্রযাত্রার সাথে সাথে মানুষের প্রতি মানুষের মূল্যবোধ হ্রাস পাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের মায়া-মমতা ও শ্রদ্ধা ইত্যাদি। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে ক্রমশই বাড়ছে সমাজ মূল্যবোধের অবক্ষয়। অথচ যে সমাজে মূল্যবোধ যত বেশি নিরাপদ হবে, সে সমাজে তত বেশি শান্তি ও সুখ নিশ্চিত হবে। এমন অবস্থা হবে যে, কেউ কারো প্রতি অন্যায় হস্তক্ষেপ করবে না। কেউ কারো জান-মাল ও ইজ্জতের কোন ক্ষতি করবে না। বরং প্রত্যেকে হবে প্রত্যেকের জন্য রক্ষাকবচ। কারো অসাক্ষাতেও কেউ কারো অমঙ্গল চিন্তা করবে না। বরং তার কল্যাণের জন্য দু'আ করবে যা ফিরিশতাগণ লিখে নিবেন ও ক্বিয়ামতের দিন তাকে উত্তম পুরস্কার দিবেন।

মানুষের মূল্যবোধকে অক্ষুন্ন ও উন্নত করার জন্য এযাবৎ মনুষ্যকল্পিত যত পথ-পন্থা এবং শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি বের হয়েছে এবং কথিত ধর্মসমূহে যেসব নীতি ও বিধান প্রণীত হয়েছে, সে সবের ঊর্ধ্বে আল্লাহ প্রেরিত বিধানই সর্বোত্তম ও চূড়ান্ত।

**খ. মনুষ্যত্বের বিনাশ**

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মানব সত্তার চরম উৎকর্ষ সাধিত হলেও প্রকৃত মনুষ্যত্বের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। মনুষ্যত্ব বিকাশের ব্যাপারে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আজ ব্যর্থ। অথচ আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ও মনুষ্যত্বের বিকাশে পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন গোত্রের নিকট মহামানবদের পাঠিয়েছেন, যাঁরা অহীর মাধ্যমে মানব জাতির শান্তি নিশ্চিত করতে আমৃত্যু কাজ করেছেন। বিভিন্ন নবী ও রাসূলকে বিভিন্ন গোত্রের জন্য বা নির্দিষ্ট এলাকার জন্য প্রেরণ করলেও রাসূল (সা.)-কে শেষ নবী হিসাবে সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী বানিয়ে পাঠিয়েছি।"[২০]

মূলতঃ মনুষ্যত্বের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষ নামের প্রকৃত স্বার্থকতা। আর মনুষ্যত্বের বিকল্প সাধনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হচ্ছে শিক্ষা। তাই একটি জাতির উত্থান-পতনের অনেকটাই নির্ভর করে সেই জাতির শিক্ষাব্যবস্থার উপর। শিক্ষা ব্যবস্থা যদি পূর্ণভাবে জাতির মধ্যে মানবতার উৎকর্ষ সাধন করতে পারে তাবেই সম্ভব একটি আদর্শ জাতি তথা আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা।

---

২০ সূরা সাবা, আয়াত: ২৮

**গ. নৈতিকতার অধঃপতন**

নৈতিকতার অধঃপতন বর্তমানে সমাজের সবক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। বিচ্যুতি নেই এমন স্থান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষকতা, ছাত্র ও অভিভাবক সকল স্তরেই নৈতিকতার অধঃপতন আজ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছে। এখন প্রায়ই দেখা যায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর যৌন হয়রানির ঘটনা। আবার অভিভাবক যখন তাঁদের ছেলেমেয়েকে অনৈতিক পন্থায় পরীক্ষায় পাস বা সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য সমর্থন করেন, তখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে নৈতিকতার কোন বিকাশ হবে না, এটাই স্বাভাবিক। যখন এরকম পরিস্থিতি ক্রমশ বাড়তে থাকে, তখন শিক্ষাঙ্গনে একটা অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরীক্ষায় ফেল করলে শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষর্থীদের মিছিল, শিক্ষকের পদত্যাগ দাবি করা, শ্রেণিকক্ষে তালা দেয়া, ব্যবহারিক পরীক্ষা/থিসিস নম্বরের সুযোগ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানি, প্রাইভেট টিউশন নিতে বাধ্য করা, যাবতীয় নৈতিক অধঃপতনের কলা-কৌশল এ দেশে প্রচলিত আছে। এভাবেই প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাই নৈতিকতাকে প্রতিনিয়ত দুমড়েমুচড়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে আর কলুষিত করছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। শিক্ষার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চিকিৎসাক্ষেত্রেও এ রকম অবনতি স্পষ্টত লক্ষ্য করা যায়। নৈতিকতার চরম ব্যত্যয় দেখা যায় খাবারে ভেজাল ও কেমিক্যাল ব্যবহারে। গুঁড়া মসলায় মেশানো হয় অস্বাস্থ্যকর ইটের গুঁড়াসহ নানা রঙের কেমিক্যাল। রান্না করা খাবারেও বিপত্তি। পচা-বাসি খাবার মিশিয়ে দেয়া, পোড়া তেলের ব্যবহার, নোংরা পরিবেশে রান্না ও সংরক্ষণ করা সহ সবকিছুতেই নীতিবর্জিত কাজ আজ অহরহ সর্বত্র দৃশ্যমান। নিয়োগ-বাণিজ্যের মাধ্যমে অদক্ষ লোকবল নিয়োগ, পদোন্নতি, পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার থেমে নেই। পুরোদমে চলে সরকার ও অন্যের অর্থ কীভাবে লোপাট করে নিজের করা যায় সেই ফন্দি। মানুষ এতটাই দিশেহারা হয়ে গেছে যে ঠিক-বেঠিকের মধ্যে কোনো তফাত খুঁজে পায় না। উক্ত পরিস্থিতিতে বর্তমান পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতার বদলে অনৈতিক শিক্ষা দেয়া, ইতিহাসকে বার বার বদলে দেয়া, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করার মাধ্যমে এ দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভুল পথেই বেশি নেয়া হচ্ছে যার ভয়াবহ চিত্র আজ সমাজে দৃশ্যমান।

**শিক্ষানীতি**

রাষ্ট্র বা জাতির রাষ্ট্রীয় মূলনীতির উপর ভিত্তি করে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য যে সব নীতির আলোকে শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয় তাকেই শিক্ষানীতি হিসেবে অবিহিত করা হয়।[২১]

**পাঠ্যপুস্তক**

শিক্ষার নির্ধারিত স্তরের নির্ধারিত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী রচিত নির্ধারিত শিক্ষণ-শিখনীয় বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে অবশ্য পঠিতব্য পুস্তককেই পাঠ্যপুস্তক বলা হয়। যেমন- পঞ্চম শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, বাংলা, গণিত ইত্যাদি। যে কোন বিষয়ে শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামগ্রী হলো পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তককে শিখন হাতিয়ার ও বলা হয়।

**শিক্ষাক্রম**

শিক্ষাক্রম (Curriculum) হলো শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক রূপরেখা। একজন শিক্ষার্থী কি পড়বে, কিভাবে পড়বে, শিখন সামগ্রী কীরূপ হবে ইত্যাদি নির্দেশনার সমষ্টিই হলো শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রমকে শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদণ্ড বলা হয়।

শিক্ষাক্রম বা Curriculum শব্দটি ল্যাটিন currese শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে।[২২] cursese শব্দটি প্রাচীন রোমে ব্যবহৃত হতো। যার অর্থ Course of study আবার কারো কারো মতে ল্যাটিন শব্দ currer শব্দ থেকে Curriculum শব্দটি এসেছে। যার অর্থ ঘোড়া দৌড়ের পথ। শিক্ষাক্রমের ধারণাকে সুস্পষ্ট করার জন্য শিক্ষাবিদগণ বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এর মধ্যে আধুনিক শিক্ষাক্রমের প্রবক্তা (Ralph Tylor) রাফ টেইলার ১৯৪৯ সালে চারটি প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের ধারণাটি স্বচ্ছ করার চেষ্টা করেছেন। প্রশ্নগুলো হলো:

১. শিক্ষা কি কি উদ্দেশ্য অর্জন করবে?
২. কি কি শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিদ্যালয় ঐ সব উদ্দেশ্য অর্জন করবে?
৩. কিভাবে ঐ সব শিখন অভিজ্ঞতাগুলো সংগঠন ও বিন্যাস করা যাবে?
৪. উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হয়েছে কিনা তা কিভাবে যাচাই করা যাবে? [২৩]

---

২১ প্রফেসর মো: আনসার আলী, *শিক্ষানীতি পরিক্রমা* (ঢাকা-চট্টগ্রাম : মিতা ট্রেডাস, ১৯৯৫খ্রি.), পৃ. ২
২২ এম.এ. ওহাব মিয়া, *শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও মূল্যায়ন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৪খ্রি.), পৃ. ৩
২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

উপরোক্ত প্রশ্নগুলো থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তা অর্জনের বিশদ পরিকল্পনার নাম। জাতীয় চাহিদা ও প্রয়োজনের নিরিখে শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য নিরূপিত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক স্তরের জন্য ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষাসহ অন্যান্য বিষয়গুলোর শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। এই শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বিস্তৃত প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, বিষয়বস্তু ও পরিকল্পিত কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে।

শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং মানবিক বিষয়ে সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে যে সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করতে হবে এর মধ্যে অন্যতম হলো- শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার সমগ্রচিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে এবং শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা। ইসলাম এই আকিদা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষের চরিত্র গঠন এবং নীতিবান মানুষ তৈরি করতে চায় যাতে তারা সমাজের সব ধর্মের মানুষের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে সক্ষম হয়। এদিকে দৃষ্টি রেখে প্রাথমিক স্তরে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মাধ্যমে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো নির্ধারণ ও এই যোগ্যতাগুলোর ভিত্তিতে বিস্তৃত শিখনক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। একজন আল্লাহ শিক্ষার্থীকে বিশ্বাসী, নীতিবান ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে ইমান ও আকিদা, ইবাদত, আখলাক বা নৈতিক গুণাবলি, কুরআন মজিদ সহীহ শুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করতে পারা ও নবি রাসুলগণের জীবন সম্পর্কে জানা-শীর্ষক পাঁচটি প্রান্তিক যোগ্যতা হলো একজন মানুষের সকল কর্মের উৎস বিশ্বাস।[২৪]

### প্রান্তিক যোগ্যতা

পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিশুরা যে যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে বলে আশা করা যায় সেগুলোকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা বলা হয়। প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রথম শ্রেণি থেকে এবং তা চলতে থাকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। তবে কোন কোন প্রান্তিক যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর শুরু ও শেষ হওয়ার পর্যায় ভিন্নতরও হতে পারে। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার শুরু থেকে শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অর্জিত যোগ্যতার সমষ্টিই হলো প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের জন্য ২৯ টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে ধর্মীয় নীতি নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত ১৯টি টি প্রান্তিক যোগ্যতা রয়েছে।

---

২৪ *প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম*, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, পৃ. ৩৩৪

**প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের জন্য নির্ধারিত ২৯টি প্রান্তিকযোগ্যতা থেকে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:**

১. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা/সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন, সকল সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসায় উদ্দীপ্ত হওয়া।

২. নিজ নিজ ধর্ম প্রবর্তকের আদর্শ এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করা।

৩. সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

৪. মানবাধিকার, আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

৫. স্বাধীন ও মুক্তচিন্তায় উৎসাহিত হওয়া এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করা।

৬. নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা।

৭. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হওয়া।

৮. বিশেষ-চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মানসিকতা অর্জন করা।

৯. অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে ত্যাগের মনোভাব অর্জন এবং পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা।

১০. সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

১১. প্রতিকূলতা ও দুর্যোগ সম্পর্কে জানা এবং তা মোকাবেলায় দক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া।

১২. নিজের কাজ নিজে করা এবং শ্রমের মর্যাদা দেওয়া।

১৩. প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানা ও ভালোবাসা এবং পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

১৪. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং ত্যাগের মনোভাব গঠন ও দেশ গড়ার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

১৫. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

১৬. বাংলাদেশকে জানা ও ভালোবাসা।[২৫]

---

২৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৫

**শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা**

প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণিতে প্রান্তিক যোগ্যতা কতটুকু অর্জিত হবে তাকে বলা হয় শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষাক্রমে প্রত্যেক শ্রেণির জন্য আলাদা আলাদা শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে তৃতীয় শ্রেণির জন্য ৪৬টি, চতুর্থ শ্রেণির জন্য ৬১টি এবং পঞ্চম শ্রেণির জন্য ৫৩টি শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

**প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয়নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধ প্রসঙ্গ**

শিক্ষা হলো একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ও ভবিষ্যত সমাজ বিনির্মাণের প্রধান হাতিয়ার। উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবনযাপন ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ, মানবতা, সৃজনশীলতা ও দেশপ্রেম ইত্যাদি ভালোগুণের বিকাশ ঘটায়। আর এই শিক্ষাকে সঠিকভাবে রূপদানের জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম হলো একটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন একটি উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন ও দক্ষ কর্মকুশলীর কাজ। শিক্ষাক্রম ছাড়া শিক্ষাদান কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

**পঞ্চম শ্রেণি**

**জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর আলোকে প্রাথমিক স্তরে পঞ্চম শ্রেণির জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয়নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধ প্রসঙ্গঃ মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা**

**পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে নৈতিক শিক্ষা**

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে স্ব-স্ব ধর্মের ধর্মীয় রীতি-নীতি আচার অনুষ্ঠান ও নৈতিকতা নিয়ে শ্রেণি ভিত্তিক বয়স উপযোগী আলোচনা রয়েছে। প্রাথমিক স্তরে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয় ছাড়াও প্রথম শ্রেণি থেকেই অন্যান্য বিষয়েও ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা এসেছে। প্রাথমিক শিক্ষার ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা নিরূপন করা হয়েছে। যার মধ্যে ১৯টি যোগ্যতাই ধর্ম ও নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত এবং অপর ৯টি জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও মৌলিক দক্ষতা অর্জনে সহায়ক।

২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে NCTB পঞ্চম শ্রেণির জন্য ৬টি বিষয় নির্ধারণ করেছে।

(১) আমার বাংলা বই

(২) প্রাথমিক গণিত

(৩) English For Today

(৪) প্রাথমিক বিজ্ঞান

(৫) বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়

(৬) ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা[২৬]

প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন বিষয়ে ধর্ম ও নৈতিকতার আলোচনা থাকলেও এই অধ্যায়ে আলোচনার বিষয় জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে পঞ্চম শ্রেণির আমার বাংলা বই এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে নৈতিক শিক্ষার অবস্থান। পঞ্চম শ্রেণির ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয় ছাড়াও আমার বাংলা বই এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে অধিকাংশ অধ্যায়েই নৈতিকতার প্রাসঙ্গিক আলোচনা এসেছে। তবে গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং English for Today বিষয়ে ধর্ম ও নৈতিকতার আলোচনা একেবারেই অপ্রতুল। নিম্নে পঞ্চম শ্রেণির আমার বাংলা বই এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে নৈতিক শিক্ষার অবস্থান তুলে ধরা হলো-

**আমার বাংলা বই**

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত পঞ্চম শ্রেণির আমার বাংলা বইটি সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা করেছেন হায়াৎ মামুদ, মহাম্মদ দানীউল হক এবং ড. মাসুদুজ্জামান। পাঠ্যপুস্তকটি শিল্প সম্পাদনা করেছেন হশেম খান। একশত চৌত্রিশ পৃষ্ঠা সম্বলিত আমার বাংলা বই এ রয়েছে নয়টি গল্প, নয়টি কবিতা ও একটি নাটিকা, দুইটি জীবনী, একটি লোক কাহিনী, একটি ভ্রমণ কাহিনী ও একটি স্মৃতি কথা। বইটিতে মলাটের পরেই রয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা, পতাকা তৈরির নিয়মাবলী ও ভবনে ব্যবহারের জন্য পতাকার মাপ। এরপর রয়েছে জাতীয় সংগীত, মূদ্রণ ও সংস্করণের সন, প্রসঙ্গ কথা, নির্দেশনা ও সূচীপত্র।[২৭]

পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলা বিষয়ে বর্ণিত নৈতিকতা সম্পর্কিত ২টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে। যেমন- "যথাযথভাবে আদেশ, অনুরোধ ও সম্বোধন করতে শিখবে এবং বিভিন্ন পরিবেশে আদব কায়দা রক্ষা করে কথা বলতে শিখবে।"[২৮]

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে পঞ্চম শ্রেণির **আমার বাংলা বই** পাঠ্য বিষয় বিশ্লেষণ করে নৈতিক শিক্ষার অবস্থান উপস্থাপন করা হলো :

**এই দেশ এই মানুষ**

এই দেশ এই মানুষ গদ্য রচনায় লেখকের নাম উল্লেখ নেই, বিষয়টি সংকলিত। এটি একটি শিশুতোষ বৈচিত্রময় রচনা। রচনাটিতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষের

২৬ শিক্ষাক্রম-২০১১, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, পৃ. ১০

২৭ আমার বাংলা বই, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, ২০২২

২৮ শিক্ষাক্রম-২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ.৯

বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রিয় মাতৃভূমির প্রতি ও দেশের সকল ধর্ম বর্ণের মানুষের প্রতি ভালোবাসার চিত্র ফুটে উঠেছে। সেই সাথে বিভিন্ন শ্রমজীবি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশিত হয়েছে।[২৯] গল্পটিতে দেশপ্রেম, কর্মতৎপরতা, সম্প্রীতি ও বিনয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে।

**সংকল্প**

সংকল্প কবিতাটি লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। কবিতাটিতে অসীম বিশ্বকে জানতে মানুষের কৌতুহলের অন্ত নেই এবং বীরেরা কেন জীবনকে অনায়াসে বিপন্ন করে, কেন বরণ করে মৃত্যুকে কিশোর মনও তেমনি সবকিছুই জানতে চায়।[৩০]

সংকল্প কবিতায় অজানাকে জানা, আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে।

**সুন্দরবনের প্রাণী**

সুন্দরবনের প্রাণী গল্পে লেখকের নাম উল্লেখ নেই, গল্পটি সংকলিত। দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রাণী বিশেষ করে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রাণী সম্পর্কিত তথ্য ও বিবরণ প্রদান করে এসব প্রাণীকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানোর কথা বলা হয়েছে।[৩১]

এ গল্পে পরিবেশ রক্ষা ও জীবের প্রতি মমতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

**হাতি আর শিয়ালের গল্প**

হাতি আর শিয়ালের গল্পে লেখকের নাম উল্লেখ নেই, গল্পটি সংকলিত। এ গল্পে বন জঙ্গলের পরিবেশের বর্ণনা, বনে বসবাসকারী বিভিন্ন পশু পাখির বিবরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে হাতির অহংকার এবং এর পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[৩২]

অহংকারের পরিণতি এবং শক্তির চেয়ে বুদ্ধি বড় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

**ফুটবল খেলোয়াড়**

কবি জসীম উদ্‌দীন রচিত ফুটবল খেলোয়াড় কবিতাটিতে জাত খেলোয়াড় ইমদাদ হকের খেলা এবং খেলায় জেতাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং শত আঘাত পেয়েও সে খেলে জিতে আসে, তার খেলায় দর্শকরা আনন্দ পায়। এই কবিতায় খেলাচ্ছলে একটি আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে। তা হলো নিজের যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে মানুষ যদি একান্তভাবে কিছু করে, তবে অন্য সকলের জন্যও সে বড় কিছু করতে পারে।[৩৩]

---

২৯ আমার বাংলা বই, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩
৩০ প্রাগুক্ত, পৃ.৬
৩১ প্রাগুক্ত, পৃ.১০-১২
৩২ আমার বাংলা বই, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬-১৮
৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ.২২

সাফল্যের পেছনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অনুশীলনের গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। শেখার প্রতি আগ্রহী অপরকে আনন্দ দান ও নান্দনিকতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে। খেলাধুলা ও সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীরা পাপকাজ হতে বিরত থাকতে পারে।

## বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ

বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ গল্পে লেখকের নাম উল্লেখ নেই, বিষয়টি সংকলিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য অনেক বীর বাঙ্গালী জীবন দিয়েছেন। দেশকে শত্রুমুক্ত করতে তাঁরা প্রানপণে লড়েছেন। বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ, বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁরা অপরিসীম সাহস এবং বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শহীদ হন। তাঁরা আমাদের গর্ব, আমাদের গৌরব। গল্পটিতে তাঁদের দেশপ্রেম তুলে ধরা হয়েছে।[৩৪]

দেশ প্রেম, আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, কৃতজ্ঞতাবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

## ফেব্রুয়ারির গান

ফেব্রুয়ারির গান কবিতাটি লিখেছেন লুৎফর রহমান রিটন। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ছাত্রদের মিছিলে গুলি চালায়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো অনেকে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। বাংলা ভাষার প্রতি মমতা আর ভাষা আন্দোলনে অমর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে ফব্রুয়ারির গান কবিতায়।[৩৫]

ভাষার প্রতি মমতাবোধ, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, সাহসিকতা ও কৃতজ্ঞতাবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

## শখের মৃৎশিল্প

শখের মৃৎশিল্প রচনায় লেখকের নাম উল্লেখ নেই, বিষয়টি সংকলিত। মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে মৃৎশিল্প বলে। দেশীয় শিল্পগুলোর মধ্যে এটিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এটি আমাদের নিজস্ব শিল্প। দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির, বাগেরহাটে ষাটগম্বুজ মসজিদ, ময়নামতির শালবন বিহারে এসব টেরা কোটার কাজ দেখতে পাওয়া যায়। গল্পে হাজার বছরের সভ্যতার নিদর্শন, ঐতিহ্য ও গর্বের বিষয় ফুটে উঠেছে।[৩৬]

সুস্থ শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চা, নান্দনিকতা, পরিশ্রম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

---

৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ.২৬-২৮
৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৭

## শব্দদূষণ

কবি সুকুমার বড়ুয়া রচিত শব্দদূষণ কবিতায় কবি শহর ও গ্রামে শব্দদূষণের পার্থক্যের চিত্র এঁকেছেন। কবিতটিতে পশুপাখির বিচিত্র রকমের ডাকের বর্ণনা, শহর জীবনের শব্দদূষনের বর্ণনা ও পল্লিজীবনের শান্তিময় পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন।[৩৭]

পরিবেশ রক্ষা, জীবের প্রতে মমতা, পরোপকার, উন্নত আচার-ব্যবহার, সহযোগিতা, সেবা, বিবেকবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

## স্মরনীয় যাঁরা চিরদিন

স্মরনীয় যারা চিরদিন রচনায় লেখকের নাম উল্লেখ নেই, বিষয়টি সংকলিত। স্মৃতি কথামূলক এ রচনায় এদেশের শহিদ বুদ্ধিজীবীদের কথা বলা হয়েছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও এ দেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদররা মিলে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে জাতির মেরুদণ্ড আমাদের বুদ্ধিজীবীদের। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, সুর সাধক, সরকারি কর্মকর্তা সহ আরও নানা শ্রেণি পেশার মানুষ। আমরা তাদেরকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।[৩৮]

দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, কৃতজ্ঞতাবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

## স্বদেশ

স্বদেশ কবিতাটি লিখেছেন কবি আহসান হাবীব। স্বদেশ কবিতায় নদীমাতৃক বাংলাদেশের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এদেশের সবখানেই ছোট বড় নদী দেখা যায়। নদীর জোয়ার, নদীর তীরে নৌকা বেঁধে রাখা, গাছে গাছে পাখির কলকাকলি এসবই কবিতায় বর্ণিত ছেলেটির মনে নিজের দেশের জন্য মায়া-মমতা ও ভালবাসার অনুভূতি জাগ্রত হয়।[৩৯]

দেশ প্রেম, কৃতজ্ঞতাবোধ, নান্দনিকতা, স্বদেশের প্রতি মায়ামমতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

## কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা

কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা লোককাহিনীতে লেখকের নাম উল্লেখ নেই, বিষয়টি সংকলিত। এক রাজপুত্রের সাথে এক রাখাল ছেলের বন্ধুত্ব হয়। রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা করে বড় হয়ে রাজা হলে রাখালকে সে মন্ত্রী বানাবে। কিন্তু রাজপুত্র রাজা হওয়ার পর তার প্রতিজ্ঞার কথা ভূলে যায়। এজন্য রাজার জীবনে ও রাজ পরিবারে নেমে আসে চরম দুর্দিন। অবশেষে রাখালের সাথে রানি কাঞ্চনমালার

---

৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৭

৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১

পরিচয় হয়। রাখাল রাজাকে সুস্থ করে তোলে এবং চক্রান্তকারীদের শাস্তি প্রদান করে। রাজা রাখাল বন্ধুকে মন্ত্রী বানায়। অতঃপর রাজপরিবারের সকলেই আনন্দে দিন কাটায়।[৪০]

এ লোককাহিনীর মাধ্যমে কৃতজ্ঞতাবোধ, ওয়াদা পালন, অহংকার বর্জন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে।

## অবাক জলপান

সুকুমার রায়ের অবাক জলপান নাটিকাটি এক তৃষ্ণার্ত পথিকের জলপান বিষয়ক হাসির গল্প। ভীষণ তৃষ্ণার্ত একজন পথিক তেষ্টায় নানানজনের কাছে গিয়ে জল চাইছে; কিন্তু কেউ তাকে জল দিচ্ছেনা। বরং তার কথা বলার মধ্যে নানা রকম খুঁত ধরছে। শেষ পর্যন্ত বেশ ধৈর্য্য ধারণ করে বুদ্ধি খাটিয়ে ফন্দি এঁটে এক বিজ্ঞানীর নিকট থেকে সে জল আদায় করে তার তৃষ্ণা নিবারণ করল।[৪১]

এ নাটিকার মাধ্যমে পরোপকার, ধৈর্য্যশীলতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে।

## ঘাসফুল

কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ঘাসফুল কবিতায় গ্রাম বাংলার অতি পরিচিতি ঘাসফুলের মিনতির কথা বলেছেন। ঘাসফুল যে কী আনন্দে বেঁচে আছে, তারা পৃথিবীতে আনন্দ ছাড়িয়ে দেয়। মানুষ যেন ঘাসফুলকে পায়ে দলে নষ্ট না করে কিংবা না ছিঁড়ে এজন্য তারা অনুরোধ করেছে। কারণ ফুল ছিঁড়লে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায় সে কথা বিধৃত হয়েছে।[৪২]

কবিতাটিতে পরিবেশ রক্ষা, কৃতজ্ঞতাবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

## মাটির নিচে যে শহর

মাটির নিচে যে শহর গল্পে লেখকের নাম উল্লেখ নেই, বিষয়টি সংকলিত। এ গল্পের মধ্য দিয়ে ময়নামতি, মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুরের অবস্থা বিশেষ করে নরসিংদী জেলার উয়ারী বটেশ্বরের প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের বিবরণে বাংলাদেশের সংস্কৃতি উঠে এসেছে।[৪৩]

অজানাকে জানা, সুস্থ্য সংস্কৃতি চর্চা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

## শিক্ষাগুরুর মর্যাদা

শিক্ষাগুরুর মর্যাদা কবিতাটি লিখেছেন কাজী কাদের নওয়াজ। দিল্লির অধিপতি বাদশা আলমগীরের পুত্র শিক্ষকের পায়ে কেন শুধু পানি ঢেলে দিল, নিজ হাতে সযতনে পা ধুয়ে দিল না সে জন্য বাদশা মনে ব্যথা পেয়েছেন। শিক্ষাগুরুর মর্যাদা কবিতার মধ্য দিয়ে শিক্ষকের প্রতি বাদশার মর্যাদা ও সম্মান

---

৪০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৬১
৪১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪- ৬৯
৪২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৭৮

এবং বাদশাহর মমত্ব ফুটে উঠেছে। কবিতাটিতে শিক্ষক ও বাদশাহর কথোপকথনে একে অপরের প্রতি আদব কায়দার সাথে সম্বোধন রয়েছে, আদেশ ও অনুরোধ বিবৃত নয়।[৪৪]

কবিতাটিতে বিনয়, অহংকার বর্জন, মহত্ব, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, উন্নত আদব কায়দা, সাহসিকতা ও আত্মসম্মানবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে।

## ভাবুক ছেলেটি

ভাবুক ছেলেটি গদ্য রচনায় লেখকের নাম উল্লেখ নেই, বিষয়টি সংকলিত। ভাবুক ছেলেটি রচনায় জগদীশচন্দ্র বসুর জীবন ও অবদানের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। বাল্যকাল থেকেই গাছপালার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। গাছেরও যে প্রাণ আছে তা তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন। এছাড়া তিনি খ্যাতিমান হয়েছেন অতিক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ বা মাইক্রোওয়েভ আবিষ্কার করে। তিনি একজন সফল বিজ্ঞানী। বাঙ্গালীর গৌরব। এ রচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান মনস্ক ও কৌতুহলী করার প্রেরণা দেওয়া হয়েছে।[৪৫]

পরিবেশ রক্ষা, কৃতজ্ঞতাবোধ, নান্দনিকতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

## দুই তীরে

দুই তীরে কবিতাটি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দুই তীরে কবিতায় একটি নদীর দুই তীরের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নদীর দুই তীরে দুজন মানুষ বাস করে। একজন ভালোবাসে নদীর বালুচর যেখানে শরৎকালে চকাচকিরা ঘর বাঁধে। আর অন্যজন ভালবাসে বন, যার আছে ঘন ছায়া। এভাবে নদীটির দুই তীরের মনোরম পরিবেশ মানুষকে সুন্দরভাবে মিলিয়ে দিয়েছে। কবিতাটিতে প্রকৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে দেশের জন্য গর্ব ও ভালবাসার চিত্র ফুটে উঠেছে।[৪৬] দেশ প্রেম ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

## বিদায় হজ

বিদায় হজ গদ্য রচনায় লেখকের নাম উল্লেখ নেই, বিষয়টি সংকলিত। এ রচনায় হযরত মুহাম্মদ (স) এর বিদায় হজ্ব এর ভাষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। বিদায় হজের ভাষণের মাধ্যমে মহানবি (স) সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের অমর বাণী বিশ্ববাসীকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি বিদায় হজের ভাষণে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করে বেশ কিছু উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করেন। যেমন, কৃতদাসের সাথে নিষ্ঠুর

৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২
৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৭
৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

ব্যবহার না করা; দাস-দাসীদের নিজেদের মত খাবার ও পোষাক প্রদান করা, কোন কৃতদাস নিজের যোগ্যতায় আমীর হলে তাঁকে মেনে চলা, সব মুসলমান একে অপরের ভাই।[৪৭]

সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ববোধ, দাস-দাসীদের প্রতি সদয় আচরণ ও মানবতাবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে।

## দেখে এলাম নায়াগ্রা

দেখে এলাম নায়াগ্রা ভ্রমণকাহিনীতে লেখকের নাম উল্লেখ নেই, বিষয়টি সংকলিত। এ ভ্রমণকাহিনীতে লেখক নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। বিশ্বের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত হলো কানাডার নায়াগ্রা জলপ্রপাত। এই জলপ্রপাত অন্যান্য জলপ্রপাতের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন।। এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি। এটি সমতলের ওপর দিয়ে একটি খরস্রোত নদীর সংগে বয়ে চলেছে। যে মাটির ওপর দিয়ে এই খরস্রোতা নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানে হঠাৎ করেই এক বিশাল ফাটল। নায়াগ্রার জল ঐ ফাঁকের ভেতরে যাচ্ছে।[৪৮]

অজানাকে জানা, নান্দনিকতা, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

## রৌদ্র লেখে জয়

কবি শামসুর রাহমান রচিত রৌদ্র লেখে জয় কবিতায় স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙ্গলীর বীরত্বের কথা প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশের মানুষের ওপর নির্মমভাবে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। বাঙ্গলীরা এ অন্যায়ের প্রতিবাদে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অনেক আত্মত্যাগ ও বিপুল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিজয় লাভ করে।[৪৯]

দেশ প্রেম, আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, কৃতজ্ঞতাবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

## মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী রচনায় লেখকের নাম উল্লেখ নেই, বিষয়টি সংকলিত। জীবনীমূলক এ রচনায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবন ও আদর্শ, গণতান্ত্রিক ও স্বাধীকার আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান তুলে ধরা হয়েছে। মওলানা ভাসানী ছিলেন একজন নিরহংকার আদর্শবান মানুষ। তাঁর জীবনাচরণ ছিল অত্যন্ত সাদামাটা ও সহজ সরল। তিনি সারাজীবন নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তাঁর কাছ হতে আমরা স্বদেশপ্রেম, প্রগতিশীল আদর্শ ও প্রতিবাদী চেতনায় উজ্জিবিত হওয়ার শিক্ষা পাই।[৫০]

---

৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৭
৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০৩
৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী রচনায় দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, মমতা, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ, অহংকার বর্জন ও নির্মলতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

## শহিদ তিতুমীর

শহিদ তিতুমীর রচনায় লেখকের নাম উল্লেখ নেই, বিষয়টি সংকলিত। জীবনীমূলক এ রচনায় পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তিতুমীরের অবদানের কথা বলা হয়েছে। ছোটবেলায় তিতুমীর ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও শক্তিশালী। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। ইংরেজ ও জমিদারদের অত্যাচারের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষ করার জন্য তিনি হিন্দু মুসলমান সবাইকে নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীর তিতুমীরই প্রথম শহীদ হন। তাই বাঙ্গালীর হৃদয়ে তিনি অমর ও চীরস্মরনীয় আছেন।[৫১৩৫]

এ রচনায় দেশ প্রেম, সাহসিকতা, আত্মত্যাগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

## অপেক্ষা

অপেক্ষা গল্পটির রচয়িতা সেলিনা হোসেন। অপেক্ষা গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময় বিপন্ন এক পরিবারের কথা জানা যায়। রুমা আর রুবা দুই বোন মুক্তিযুদ্ধে তাদের বাবা জসীম পাকিস্তানী মিলিটারীর গুলিতে শহিদ হন। এ গল্পে মুক্তিযুদ্ধ, দেশপ্রেম, মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদদের আত্মত্যাগের কথা বলা হয়েছে।[৫২]

এ গল্পে দেশ প্রেম, আত্মত্যাগ, সাহসিকতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

***বইয়ের শেষে পরনিন্দা ভালো নয় এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।***

পরনিন্দা ভালো নয় এ নীতি বাক্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উন্নত আদব-কায়দা, ঈর্ষামুক্ততা, সহিষ্ণুতা, মহত্ব, উন্নত আচার ব্যবহার, অপরের প্রতি সম্মানবোধ সম্পর্কে উজ্জিবিত করা হয়েছে।

## পঞ্চম শ্রেণিঃ বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় পুস্তকটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন ড. মাহবুবা নাসরিন, ড. আব্দুল মালেক, ড. ইশানী চক্রবর্তী, ড. সেলিনা আক্তার। পুস্তকটি শিল্প সম্পাদনা করেছেন হাশেম খান। পুস্তকটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০২ এবং অধ্যায় রয়েছে ১২ টি।

---

৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১৭

৫২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-২৬

## অধ্যায় : ১

### আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট ছয়টি বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যুদ্ধের সূচনা, মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনী, মুক্তিযোদ্ধা, পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ, পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পন ও আমাদের বিজয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় উপাধি। এসকল বিষয় বস্তুতে স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি করে যে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় তার পরিচিতি এবং নেতৃবৃন্দের অবদান, মুক্তিবাহিনী, মুক্তিফৌজ এবং যৌথবাহিনীতে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অপারেশন সার্চ লাইটের নামে নৃশংসতম হত্যাকান্ড, ভারতের সহযোগিতা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ বীরত্বমূলক রাষ্ট্রীয় উপাধি প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।[৫৩]

এ অধ্যায়ের আলোচনায় দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, সহযোগিতা, অন্যের মতামত প্রকাশে সহনশীলতা, কর্মতৎপরতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে।

### ব্রিটিশ শাসন

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য্য অস্তমিত হয়। এ কারনে বাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষে ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় দুইশত বছরের ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার পরবর্তি নবাবগণ ইংরেজদের হাতে পুতুল নবাবে পরিণত হন। ইংরেজরা তাদের ব্যবহার করে বাংলায় একচেটিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। এর ফলে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয়। তবে শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় কিছু উন্নতি হয়। সার্বিকভাবে এ যুদ্ধের ফলাফল বা পরিণতি ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য নেতিবাচক। কেননা এ যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে ইংরেজরা ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন তথা কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়। এর ফলে শুরু হয় শোষণ বঞ্চনার এক দীর্ঘ অধ্যায়। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত একশত বছর ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন চলে। ইতিহাসে যা কোম্পানি শাসন নামে পরিচিত। ১৮৫৭ সালে কোম্পানি নীতি ও শোষনের বিরুদ্ধে সিপাহিদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং বিদ্রোহ করে। ফলে কোম্পানির শাসন রদ হয় এবং ১৮৫৮ সালে বাংলাসহ সমগ্র ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ রানি নিজ হাতে তুলে নেন। যা চলে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। ভারতের ব্রিটিশ বিরোধি আন্দোলনের মধ্যে ছিল স্বরাজ আন্দোলন; অসহযোগ

৫৩ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, ২০২১, পৃ.২-১২

আন্দোলন এবং সশস্ত্র যুব বিদ্রোহ। এসকল আন্দোলনের কারণে এক পর্যায়ে ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হয়।[৫৪]

এ অধ্যায়ে দেশ প্রেম, আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, কর্মতৎপরতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

## বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন

বাংলাদেশের কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শন সমৃদ্ধ স্থান মহাস্থানগড় ও উয়ায়ী বটেশ্বর, পাহাড়পুর ও ময়নামতি, সোনারগাঁও ও লালবাগ কেল্লা এবং আহসান মঞ্জিল এর বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। এসব বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রাচীন স্থাপত্যের প্রতি গুরুত্ব ও শ্রদ্ধা পোষণের কথা বলা হয়েছে।[৫৫]

এ আলোচনায় অন্যের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, নান্দনিকতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে।

## অধ্যায় : ৪

## আমাদের অর্থনীতিঃ কৃষি ও শিল্প

বাংলাদেশ একটি অর্থনীতি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ কৃষিকাজের সাথে জড়িত। এ দেশের তিনটি প্রধান খাদ্য শস্য হলো ধান, গম, এবং ডাল। এছাড়া আলু, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় শস্যও দেশের বিভিন্ন স্থানে উৎপাদন করা হয়। যে সব কৃষি পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্র উপার্জন করা হয়, যেমন: পাট, চা, তামাক সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।[৫৬]

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শিল্প বস্ত্র শিল্প, পোশাক শিল্প, পাট শিল্প, চামড়াজাত দ্রব্য এবং বৃহৎ ও কুটির শিল্প নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে কৃষি ও শিল্পজাত বিভিন্ন শস্য ও উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু পাঠ সংশ্লিষ্ট আলোচনায় সরাসরি নৈতিকতার বিষয় বিবৃত হয়নি।

***কৃষি ও শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর সঠিক ব্যবহার এবং এ সকল কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আমাদেও কেমন আচরণ করা উচিত তা আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করলে শিক্ষার্থীদের নৈতিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনে সহায়ক হতো।***

এ অধ্যায়ে বিভিন্ন শস্য সম্পর্কে ধারণা, কর্মতৎপরতা, স্বাবলম্বিতা, সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে । নিজের কাজ নিজে করা এবং শ্রম ও শ্রমজীবি মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হতে শিখবে।

---

৫৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-২০

৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৮

৫৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩৮

**অধ্যায়ঃ ৫**

**জনসংখ্যা**

জনসংখ্যা অধ্যায়ে আমাদের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব, জীবনযাত্রার মানের ওপর অধিক জনগনের প্রভাব, জনসম্পদ সম্পর্কে ধারণা ও জনসম্পদের গুরুত্ব, জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করে জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা এবং জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানের কথা বলা হয়েছে।[৫৭]

এ অধ্যায়ের আলোচনায় সহযোগিতা, সহনশীলতা, একতা, কর্মতৎপরতা, সচেতনতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

**অধ্যায় : ৬**

**জলবায়ু ও দুর্যোগ**

জলবায়ু পরিবর্তন, নদীভাঙ্গন, খরা ও ভূমিকম্প বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উপরোক্ত পাঠগুলোর মধ্য দিয়ে আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কে ধারণা, আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ, আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও পরিবেশের ওপর আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, বাংলাদেশে দূর্যোগ প্রবণ অঞ্চল ও সেখানে সৃষ্ট সমস্যা, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। যেমনঃ গাছ কাটা, পাহাড় কাটা, পাখি শিকার, বন্যপ্রাণী নিধন, জলাভূমি ভরাট ইত্যাদি।[৫৮]

এ অধ্যায়ের আলোচনায় পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় সম্পদ রক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা, সহযোগিতা, দায়িত্ববোধ, দুর্যোগকালীন সময়ে করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

**অধ্যায় : ৭**

**মানবাধিকার**

এ অধ্যায়ে সকলের অধিকার, অটিষ্টিক শিশুর অধিকার, শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নারী অধিকার লঙ্ঘন শিরোনামে চারটি পাঠ রয়েছে। সকলের অধিকার পাঠে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত ১৪টি মৌলিক মানবাধিকারের উল্লেখ করে মানবাধিকার রক্ষায় সকলে কাজ করা, সচেতন থাকা এবং কেউ মানবাধিকার বিরোধী কোন কাজ করলে প্রয়োজনে প্রতিবাদ করার কথা বলা হয়েছে।[৫৯]

---

৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪৬

৫৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৫৪

৫৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৬০

**অটিস্টিক শিশুর অধিকার** পাঠে অটিস্টিক শিশু সম্পর্কে ধারণা দিয়ে তাদের বিভিন্ন অধিকার যেমন, স্বাধীনভাবে কথা বলা, বিশেষ যত্ন পাওয়া, শিক্ষা ও স্বাধীনতা এবং বিনোদনের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। অটিস্টিক শিশুরা কষ্ট পায় ও উত্তেজিত হয় এমন আচরণ হতে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে।

**সকলের অধিকার** পাঠ থেকে মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করা, সকলকে সচেতন করা এবং কেউ মানবাধিকার বিরোধী কোন কাজ করলে প্রয়োজনে প্রতিবাদ করার কথা বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে পঞ্চম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী মানবাধিকার রক্ষায় সচেতন হতে পারে কিন্তু প্রতিবাদ করাটা যৌক্তিক হবে কিনা? এত করে ভালো কাজ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য তৈরি হতে পারে এবং শিক্ষার্থী সমস্যায় পড়তে পারে। তাই শিক্ষার্থী নিজে প্রতিবাদ না করে শিক্ষক, বাবা-মা বা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করলে ভালো হতো।

**শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন** পাঠে শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ৫টি উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: ১৮ বছরের নিচে শিশুশ্রম বেআইনি, অনেক শিশু গৃহহীন, সামান্য কারণেই শিশুরা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় এ  শিশুদের বিদেশে পাচার করে দেয়া হয়। শিশুদের মানবাধিকার রক্ষায় শিক্ষার্থীদের সচেতন হওয়া এবং প্রয়োজনে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবগত করানোর কথা বলা হয়েছে।

**নারী অধিকার লঙ্ঘন** পাঠে আমাদের সমাজে কীভাবে মেয়েরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, মেয়েরা ছেলেদের মতো শিক্ষার সমান সুযোগ পায়না; চাকুরির ক্ষেত্রেও মেয়েরা পিছিয়ে থাকে, কাজের ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের মতো সমান পারিশ্রমিক পায়না, বাড়িতে কাজে সহায়তাকারীরা যথাযথ পারিশ্রমিক, খাবার ও স্বাস্থ্যসেবা পায়না, অনেক সময় বাড়ীতে কাজে সহায়তাকারীদের অন্য দেশে পাচার করে দেওয়া হয়। এ সকল অন্যায় আচরণ মানবাধিকার বিরোধী কাজ। যা মেনে নেওয়া উচিত নয়। মেয়েদের সমান অধিকার রক্ষায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।[৬০]

**উক্ত ৪টি পাঠে** সহানুভূতি, মানবতাবাদ, দায়িত্ববোধ, অন্য ধর্মে সহনশীলতা, অপরের প্রতি সম্মান, সম্প্রীতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

৬০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

## অধ্যায় : ৮

## নারী-পুরুষ সমতা

এ অধ্যায়ে নারী জাগরণের অগ্রদূত, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও নারী নির্যাতন নামে তিনটি পাঠ রয়েছে। **নারী জাগরণের অগ্রদূত** পাঠে সমাজের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য নারী পুরুষ উভয়ের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এবং নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া ভারতীয় উপমহাদেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমাজকে সচেতন করতে অসামান্য অবদানের কথা তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস পাঠে জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৭৭ সালের ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেওয়া এবং নারীর অধিকার আদায়ে নিউইয়র্কসহ কয়েকটি স্থানে নারী শ্রমিকদের আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

**নারী নির্যাতন** পাঠে প্রতিনিয়তই নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে এবং নারীর মানবাধিকার খর্ব হচ্ছে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। নির্যাতনের মধ্যে নারীদের এসিড ছুঁড়ে মারা, যৌতুকের দাবীতে নির্যাতন ও হত্যা, ধর্মীয় অপরাধের কথা বলে অবৈধভাবে শাস্তির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ পাঠের দ্বিতীয় প্যারায় বলা হয়েছে- "অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের বিনা অনুমতিতে মেয়েরা বাড়ির বাইরে যেতে বা কারও সাথে মিশতে পারে না। এতে পরিবারের সুনাম নষ্ট হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।"[৬১] এ দুটো লাইনের মধ্যেমে কোমলমতি ক্ষুধে শিক্ষার্থীদের বাড়ির বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে অভিভাবকদের অনুমতি নেওয়ার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যা ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের জন্যই নীতি নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ পরিপন্থি। কেননা একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত ছেলে মেয়েরা অভিভাবকদের অনুমতি নিয়েই বাড়ির বাহিরে যাবে এটিই আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক রীতি এবং নীতি নৈতিকতার সহায়ক। তাছাড়া শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়টিও এক্ষেত্রে জড়িত থাকে। এখানে অভিভাবকদের অনুমতির বিষয়ে শিক্ষার্থীদের নিরুৎসাহিত করা সমীচীন হয়নি এ ক্ষেত্রে শিক্ষানীতিতে বর্ণিত কর্তব্য বোধের প্রতিফলন ঘটেনি।

এই পাঠে নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা, সৌহার্দ্যবোধ, সমতা, মানবতাবাদ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, কুসংস্কারমুক্ততা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

---

৬১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

## অধ্যায় : ৯

## আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এ অধ্যায়ে সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, বাড়িতে নিরাপত্তা রক্ষা, রাস্তায় নিরাপত্তা রক্ষা এবং রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কর্তব্য এ চারটি বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

**সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য** পাঠে সমাজকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রাখতে এ স্তরের শিক্ষার্থীদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। ছোটদের ভালোবাসা, কারও ক্ষতি না করা, সবার উপকার করতে চেষ্টা করা, সমাজের নিয়ম কানুন মেনে চলা, সুবিধা বঞ্চিতদের সহযোগিতা করা, বড়দের শ্রদ্ধা করা, সমাজের সম্পদ সংরক্ষণ করা, অপরিচিতদের কাছ থেকে সাবধান থাকা।[৬২]

**বাড়িতে নিরাপত্তা রক্ষা** পাঠে বাড়িতে দূর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কিছু উপায় নিয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া হয়েছে। ধারালো জিনিস সাবধানে ব্যবহার করা, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের চুলা ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করা, অপরিচিতদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা, প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স রাখা, গাছে না ওঠা, জলাশয়ের আশে পাশে খেলার সময় সতর্ক থাকা।[৬৩]

**রাস্তায় নিরাপত্তা রক্ষা** পাঠে রাস্তায় চলাচলের সময় সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে এবং রাস্তা পারাপারের সময় অনুসরণ করতে হয় এ ধরনের তিনটি সাধারণ নিয়ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাস্তায় চলাচলের সময় ফুটপাত ব্যবহার করা, ওভারব্রিজ ব্যবহার করা, জেব্রাক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হওয়া।[৬৪]

**রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কর্তব্য** পাঠে শিক্ষার্থীদেরও যে রাষ্ট্রের প্রতি কিছু দায়িত্ব রয়েছে যে সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ, রাষ্ট্রের শাসন মেনে চলা, আইন মেনে চলা, কর প্রদান, ভোট দান, রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষার কথা বলা হয়েছে।[৬৫]

উক্ত চারটি পাঠে স্বাস্থ্য রক্ষা, কর্মতৎপরতা, পরিবেশ রক্ষা, অপরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাশীলতা, সহানুভূতি, দায়িত্ববোধ, মানবতাবাদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

---

৬২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
৬৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
৬৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

**অধ্যায় ঃ ১০**

**গণতান্ত্রিক মনোভাব**

গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার পাশাপাশি বিদ্যালয়, বাড়ি ও কর্মক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিকভাবে আমরা কীভাবে গণতান্ত্রিক চর্চা করতে পারি সে সম্পর্কে দুইটি পাঠে আলোচনা করা হয়েছে।[৬৬]

বিদ্যালয় পাঠে শ্রেণিতে দলনেতা নির্বাচন, শ্রেণিকক্ষ সাজানো, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনে শিক্ষার্থীরা কীভাবে সকলের মতামতের ভিত্তিতে কাজ করবে সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে।[৬৭]

বাড়ী ও কর্মক্ষেত্র পাঠে বাড়িতে খাবার প্রস্তুত, উৎসব অনুষ্ঠান ও ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে পরিবারের সকলে মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে সর্বস্তরের সহকর্মীদের সাথে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলে সেবার মান আরও ভালো করা যায় তা বলা হয়েছে।[৬৮৫২]

রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি গণতন্ত্র। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের জনগন দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছেন তা উল্লেখ করা হয়েছে।

***কিন্তু রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক চর্চা কীভাবে করা যেতে পারে তা বিবৃত হয়নি।***

অপরের মতামতের প্রতি সম্মান, গণতান্ত্রিক মনোভাব, মানবতাবাদ, সম্প্রীতি, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, দেশপ্রেম, সমতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

**অধ্যায় : ১১**

**বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী**

এ অধ্যায়ে গারো, খাসি, ম্রো, ত্রিপুরা, ও ওরাঁও জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, তাদের পরিচিতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, ঐতিহ্য, আচার আচরণ, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলায় তাদের আবাসস্থল চিহ্নিত করা হয়েছে। মানব বৈচিত্রের কারণে বাংলাদেশের সংস্কৃতি শক্তিশালী হয়ে ওঠছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে তাদের অবদান রয়েছে।[৬৯] কিন্তু তাদের উন্নতিতে সাহায্য ও জীবন ধারায় শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কথা পাঠ্যপুস্তকে বিবৃত হয়নি।

এ অধ্যায়ে সম্প্রীতি, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

---

৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
৬৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
৬৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৯০

## অধ্যায় : ১২

## বাংলাদেশ ও বিশ্ব

এ অধ্যায়ে জাতিসংঘ, জাতিসংঘের উন্নয়নমূলক সংস্থা ও সার্ক এ তিনটি পাঠ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জাতিসংঘ কী, জাতিসংঘের গঠন, উদ্দেশ্য, কার্যাবলী, জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা সমূহ, ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, ইউএনডিপি, ফাও, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক সম্পর্কে কার্যক্রম বিষয়ে বিবরণ দেওয়া হয়েছে।[৭০]

## সার্ক (SAARC)

সার্কের পূর্ণরূপ, সার্ক গঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, এর সদস্য সংখ্যা এবং এর কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[৭১] এ পাঠের আলোচনায় বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা, কর্মতৎপরতা, দায়িত্ববোধ, বিশ্বশান্তি, নান্দনিকতা, পরোপকারীতা, সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা, বিনয়, ন্যায়পরায়নতা, একতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে ।

***বইয়ের শেষে ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না এই উপদেশমূলক বাক্য বিবৃত হয়েছে।***

এ উপদেশমূলক বাক্যে চিন্তাশীলতা, সুকুমার বৃত্তি, সৌন্দর্যবোধ, বিবেকবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করা হয়েছে।

### পঞ্চম শ্রেণি: ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আচরণগত উৎসর্ষ সাধন ও নৈতিক মানবিক গুণাবলি সমৃদ্ধ চরিত্র গঠন।[৭২] কিন্তু কারিকুলামে এ উদ্দেশ্য অর্জনে যে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, বিষয়বস্তু ও পরিকল্পিত কাজ দেয়া হয়েছে তাতে বেশকিছু দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় তাই এ বিষয়ে এ অধ্যায়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হবে।

### প্রথম অধ্যায়

### আকাইদ বিশ্বাস

এ অধ্যায়ে শুরুতে মহান আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর পরিচয় প্রদানে বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। পৃথিবীতে স্রষ্টা ছাড়া আপনা-আপনি যে কিছুই সৃষ্টি হতে পারেনা তা উদাহরণের মাধ্যমে আল্লাহ যে এ জগতের সব কিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক তা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর পরিচয় যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য কি কি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন

---

৭০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৭১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৭২ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা- পৃ. ২৪

তাও আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আল্লাহর প্রতি ইমান আনার জন্য তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন, জান্নাত, জাহান্নাম, কিয়ামত, হাশর, মিজান ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইমানের পরিচয়, মুমিনের পরিচয়, আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য যে ইমানের প্রয়োজন সে কথাও বলা হয়েছে। এখানে আল্লাহ তায়ালার বেশ কয়েকটি গুণবাচক নামের বিস্তারিত পরিচয় ও সে গুণগুলো আমাদের অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## ইবাদত

এ অধ্যায়ের শুরুতে ইবাদত এর পরিচয় প্রদান করে বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর যাবতীয় আদেশ, নিষেধ মেনে চলাকে ইবাদত বলে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, সব কিছু মানুষের অধীন ও অনুগত করে দিয়েছেন । কিন্তু আল্লাহ মানুষ ও জ্বীনকে সৃষ্টি করেছেন কেবল আল্লাহর ইবাদতের জন্য। আলোচনায় কতগুলো নির্ধারিত মৌলিক ইবাদত উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-সালাত, সাওম, হজ, যাকাত, সাদকা, দান-খয়রাত, আল্লাহর পথে জিহাদ ইত্যাদি। এসব ইবাদত শিক্ষা দিয়েছেন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)। তাই তিনি যেভাবে যে ইবাদত করতে শিখিয়েছেন সেভাবেই আমাদের ইবাদত করা উচিত। এছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজকে কিভাবে ইবাদতে রূপান্তর করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইবাদত তথা আল্লাহর অনুগত থাকলে পরকালে জান্নাত লাভ করা যাবে, না হয় জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে বলে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়।

## তৃতীয় অধ্যায়

## আখলাক বা চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধ

এ অধ্যায়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের শুরুতে আখলাকের পরিচয় প্রদান করে কয়েকটি ভালো ও মন্দ আচরণ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। আলোচনায় বলা হয়েছে যার চরিত্র সুন্দর নয় কেউ তাকে ভালোবাসে না। ভালো চরিত্রের মধ্যে সত্য কথা বলা, পিতা-মাতার কথা শোনা, শিক্ষককে সম্মান করা, জাতীয় সম্পদ নষ্ট করা, শিক্ষকের সাথে ভালো ব্যবহার না করা ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) এর জীবনের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধের আদর্শ কাহিনী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিভাবে ভালো আচরণ করা যায় ও মন্দ আচরণ থেকে দূরে থাকা যায় তা আলোচনা করা হয়েছে।

## চতুর্থ অধ্যায়

## কুরআন মজিদ শিক্ষা

এ অধ্যায়ে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন মজিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তাজবীদ, মাখরাজ, ওয়াকফ, গুন্নাহসহ পাঁচটি সূরার অর্থসহ আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন মজিদের পরিচয়ে বলা হয়েছে এটি আল্লাহ তায়ালার বাণী, সর্বশেষ আসমানি কিতাব। যেটি সর্বশেষ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (স) এর উপর নাজিল হয়। কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের চারটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করে বলা হয় এ উদ্দেশ্যগুলো সামনে রেখে মহানবি (স) এর সাহাবীগণ কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করতেন। এখানে কুরআন মজিদ বুঝে তেলাওয়াত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কুরআন মজিদ বুঝে বুঝে তেলাওয়াত করলে কি কি সুবিধা ও কি কি জানা যাবে সে বিষয়েও উল্লেখ করা হয়। তাজবীদের আলোচনায় কেবল বলা হয়েছে শুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তেলাওয়াতের নিয়মকে তাজবিদ বলে।

## পঞ্চম অধ্যায়

## মহানবি (স) এর জীবনাদর্শ ও অন্যান্য নবিগণের পরিচয়

এ অধ্যায়ের শুরুতে নবি-রাসুলগণের কতিপয় গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-তারা ছিলেন মানুষের মহান আদর্শ ও শিক্ষক, উত্তম চরিত্রের অধিকারী, সত্যবাদী, নির্লোভ, নিষ্পাপ, দয়ালু, মানবদরদি ইত্যাদি। এরপর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়। মহানবি (স) এর জন্ম ও পরিচয়, আরবের অবস্থা, শৈশব কৈশোর, হাজরে আসওয়াদ স্থাপন, বিয়ে, নবুয়ত লাভ, ইমানের দাওয়াত, ইসলাম প্রচারে তায়েফগমন, মিরাজ, হিজরত, মদিনা সনদ, বদর ও অন্যান্য যুদ্ধ, হুদাইবিয়ার সন্ধি, মক্কা বিজয়, বিদায় হজ ইত্যাদি আলোচনায় স্থান পায়।

### অষ্টম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক সাহিত্য কণিকা-য় মানবীয় মূল্যবোধের অবস্থান

শিক্ষার্থীদের মধ্যে কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতার বিকাশ ও বৈচিত্রময় পাঠের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ অর্জনকে মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাক্রমে বর্ণিত ২৩টি উদ্দেশ্য সামনে রেখে অষ্টম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক *সাহিত্য কণিকা* প্রনয়ণ করা হয়েছে। এর মাঝে ১, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১ ও ২৩ নং উদ্দেশ্যগুলো নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। ৮টি উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মহিমা সম্পর্কে গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন, দেশ প্রেম, জাতীয়তাবোধ, ভাষা আন্দোলন ,

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জীব প্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, পরমত সহিষ্ণুতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সকলের প্রতি সংবেদনশীলতা ও সমমর্যাদার মনোভাব অর্জন, শিশু ও নারীর প্রতি সংবেদনশীল এবং নারীর কর্ম ও অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হওয়া, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের প্রতি মমতা ও সহমর্মিতাবোধ জাগরণ, বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়ার উপায় নিয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যা নীতি নৈতিকতা ও মানবীয় মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে।[৭৩]

পুনশ্চ : উল্লেখ যে, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ ও অষ্টম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক *সাহিত্য কণিকা* পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি বোধ, দেশপ্রেম, প্রকৃতি - চেতনা এবং ধর্ম, বর্ণ গোত্র ও নারী - পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০১০ এর আলোকে প্রণীত অষ্টম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক *সাহিত্য কণিকা*তে মানবীয় মূল্যবোধের প্রতিফলন কিভাবে ঘটেছে নিম্নে সে বিষয়ে আলোকপাত হলো। এতদবিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০১০ এর প্রাক-কথন,মুখবন্ধ ও পৃষ্ঠা নং ১, ২, ২০ এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ এর পৃষ্ঠা নং ৭ - ৮, ২৫।

**জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে প্রণীত অষ্টম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক *সাহিত্য কণিকা* পর্যালোচনা করে মানবীয় মূল্যবোধের স্বরূপ উপস্থাপন করা হলো**

**এক. সাহিত্য কণিকা**

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কতৃক ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্ঠম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত *সাহিত্য কণিকা* সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা করেছেন, অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক, অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক, অধ্যাপক শ্যামলী আকবর, অধ্যাপক ড. সরকার আবদুল

৭৩ অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক, অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক, অধ্যাপক শ্যামলী আকবর, অধ্যাপক ড. সরকার আবদুল মান্নান, অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর, ড. শোয়াইব জিবরান, শামীম জাহান আহসান , দ্বিতীয় পরিমার্জন, অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর, অধ্যাপক ড. শায়লা নাসরিন, পতিমোহন বিশ্বাস, শাহীনা কবির, *সহিত্য কণিকা*, অষ্টম শ্রেণি (ঢাকা, লক্ষী বাজার : মেসার্স সোমা প্রিন্টিং প্রেস, পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০২২) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড , বাংলাদেশ, পৃ. ৯৯-১০১

মান্নান, অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর, ড. শোয়াইব জিবরান, শামীম জাহান আহসান। *সাহিত্য কণিকা* পুস্তকটির দ্বিতীয় পরিমার্জনে যুক্ত ছিলেন অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর, অধ্যাপক ড. শায়লা নাসরিন, পতিমোহন বিশ্বাস, শাহীনা কবির। একশত ছত্রিশ পৃষ্ঠা সম্বলিত *সাহিত্য কণিকায়* রয়েছে ১১ টি গদ্য ও ১৩ টি কবিতা। *সাহিত্য কণিকা* পুস্তকটির মলাটের অপর পৃষ্ঠায় রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কতৃক সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সংক্ষিপ্ত ক্যাপশনসহ চারটি স্থির চিত্র। এরপর রয়েছে মুদ্রণ ও সংস্করণের সন, প্রসঙ্গ - কথা ও সূচিপত্র। কভারের শেষ পৃষ্ঠায় রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি উক্তি - 'দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহন করতে হবে।' এছাড়াও একটি নীতি বাক্য রয়েছে-'পরনিন্দা ভালো নয়'।[৭৪]

**০১ : ০১ : অতিথির স্মৃতি**

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *দেওঘরের* স্মৃতি গল্পটির নাম পরিবর্তন এবং ঈষৎ পরিমার্জনা করে এখানে *অতিথির স্মৃতি* হিসেবে সংকলন করা হয়েছে। *অতিথির স্মৃতি* গল্পে একটি কুকুরের সঙ্গে একজন মানুষের গভীর মমত্বের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। লেখক অসুস্থ হয়ে বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে গেলে সেখানে একটি পথের কুকুরের প্রতি তার সহানুভূতি জাগে। বেড়াতে বের হলেই কুকুরটি তাকে সঙ্গ দিত। এমনকি লেখকের চাকর-বাকররা কুকুরটির প্রতি অমানবিক আচরণ করলেও প্রাণিটি লেখকের সঙ্গ ছাড়েনি। এ গল্পে লেখক দেখিয়েছেন মানুষে মানুষে যেমন স্নেহপ্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠে, অন্য জীবের সঙ্গেও তেমনি মানুষের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। সেই সম্পর্ক নানা প্রতিকূলতার কারণে বাধাগ্রস্থ হয়। এ গল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল হবে এবং নতুন কোন জায়গা ভ্রমণ করলে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা লিখে রাখতে আগ্রহী হবে।[৭৫]

গল্পটিতে জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০১০ এর মানবীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক গুণাবলী অর্জন এবং জীব ও প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

**০১ : ০২ : ভাব ও কাজ**

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত *যুগবাণী* প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে *ভাব ও কাজ* প্রবন্ধ। শুধু ভাবের উচ্ছ্বাসে উদ্বেল না হয়ে কর্ম সম্পাদনে ভাবের সঙ্গে পরিকল্পিত কর্মশক্তি ও বাস্তব উদ্যেগের প্রয়োজন সম্পর্কে এ প্রবন্ধের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা হয়েছে। শুধু ভাব দিয়ে মহৎ কিছু অর্জন করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন কর্মশক্তি ও সঠিক উদ্যোগ। ভাব দ্বারা মানুষকে জাগিয়ে

---

৭৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৪

৭৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-১১

তোলা যায় কিন্তু যথাযাথ পরিকল্পনা ও কাজে স্পৃহা ছাড়া যেকোন ভালো উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। মূলত: এ রচনার মাধ্যমে দেশের উন্নতি ও মুক্তি এবং মানুষের কল্যাণের জন্য ভাবের সঙ্গে বাস্তবধর্মী কাজে তৎপর হওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।[৭৬]

প্রবন্ধটিতে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর মানবীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত দেশ প্রেম ও কর্মতৎপরতার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

**০১:০৩: পড়ে পাওয়া**

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত কিশোর গল্প *পড়ে পাওয়া*। এ গল্পটি *নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব* গ্রন্থ থেকে সংকলিত। এ গল্পে দুজন কিশোর একটি বাক্স কুড়িয়ে পায়। এ বাক্সে নগদ টাকা ও গহনা ছিল। তারা ও অন্য কিশোর বন্ধুরা মিলে সেটা তার প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। কুড়িয়ে পাওয়া অর্থ সম্পদ নিয়ে কিশোররা লোভের পরিচয় দেয়নি। বরং তারা অল্প বয়সেই সততা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে। এ গল্পে কিশোরদের ঐক্য চেতনার পাশাপাশি তাদের উন্নত নৈতিক ও মানবীয় মূল্যবোধের পরিচয় মেলে। তাছাড়া দরিদ্র অসহায় মানুষের প্রতি ভালোবাসার চিত্রও এ গল্পে ফুটে উঠেছে।[৭৭] এ গল্পে জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০১০ এর মানবীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত চারিত্রিক দৃঢ়তা, তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধ, সততা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

**০১:০৪: তৈলচিত্রের ভূত**

*তৈলচিত্রের* ভূত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি ছোট গল্প। সমাজে ভূত প্রেতে বিশ্বাস নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কার যে ভিত্তিহীন বিষয়টি এ গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। লেখক এ গল্পে বিজ্ঞানবুদ্ধির জয় দেখিয়েছেন। বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে এই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস সহজেই দূর করা সম্ভব। এ গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভূত প্রেতের বিষয়ে ভয়মুক্ত, কুসংস্কারমুক্ত ও সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ হবে।[৭৮]

গল্পটিতে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে বর্ণিত কুসংস্কারমুক্ত জীবন ও বিজ্ঞানমনস্কতার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

---

৭৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-১১

৭৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৯

৭৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৯

**০১:০৫: এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম**

*এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম* রচনাটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া একটি ভাষণের লিখিত রূপ। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙ্গালী নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। তবুও পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী বাঙ্গালীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ডাকে সারাদেশে সর্বাত্নক অসহযোগ আন্দোলন সূচিত হয় । এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) প্রায় দশ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে এ ঐতিহাসিক ভাষণটি দেন। ১৮ মিনিটের এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।[৭৯]

রচনাটিতে জাতীয় শিক্ষনীতি-২০১০ এ উল্লেখিত নৈতিক শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশাত্ববোধ, জাতীয়তাবোধ, গনতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

**০১:০৬: আমাদের লোকশিল্প**

*আমাদের লোকশিল্প* প্রবন্ধটি শিল্পী কামরুল হাসান রচিত *আমাদের লোককৃষ্টি* গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। লেখক এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের লোকশিল্প ও লোক ঐতিহ্যের বর্ণনার মাধ্যমে লোকশিল্পের প্রতি তার গভীর মমত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন। লেখক অধুনা বিলুপ্ত ঢাকাই মসলিন, জামদানি শাড়ি, নকশিকাঁথা, নানা রকম তৈজসপত্র, শৌখিন দ্রব্য সামগ্রী, শীতল পাটি, হাতপাখাসহ নানান ধরনের গ্রামীন লোকশিল্পের পরিচয় প্রদান করেছেন। বিশেষ করে নকশিকাঁথার প্রতিটি সূচের ফোঁড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক একটি পরিবারের কাহিনি এবং তাদের পরিবেশ ও জীবন প্রণালীর নিখুত চিত্র।[৮০]

এ প্রবন্ধটিতে জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০১০ এ উল্লেখিত জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকাশিত করে লোকশিল্পের মাধ্যমে আমাদের ঐতিহ্যকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণীত করা হয়েছে।

**০১:০৭: সুখী মানুষ**

*সুখী মানুষ* মমতাজউদদীন আহমদ রচিত একটি নাটিকা। এ নাটিকা পাঠে শিক্ষার্থীরা উপলব্দি করবে যে, অন্যায় দূর্নীতি ও অনৈতিক পন্থায় উপার্জিত অর্থ বিত্তই মানুষের অশান্তির মূল কারণ। পরিশ্রমের

---

৭৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩৫

৮০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৪৩

মাধ্যমে সৎ পথে জীবিকা নির্বাহ করলেই জীবনে শান্তি ও সুখ পাওয়া যায়। অবৈধ ও নীতিহীন পথে অর্থ উপর্জনের পথ পরিহার করাই উত্তম।[৮১]

এ নাটিকায় জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ২নং পয়েন্টে বর্ণিত নৈতিক, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

**০১:০৮: শিল্পকলার নানা দিক**

লেখক মুস্তাফা মনোয়ার *শিল্পকলার নানাদিক* প্রবন্ধে সুন্দরের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সংগীত, নৃত্য, কবিতা সববিছুর মধ্য দিয়েই সুন্দরকে প্রকাশ করা হয়। এ প্রবন্ধ পাঠে শিক্ষার্থীদের মনে সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি হবে। তারা নতুন কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হবে।[৮২]

প্রবন্ধটিতে জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০১০ এ উল্লেখিত শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে বর্ণিত জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত হওয়ার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

**০১ : ০৯ : মংডুর পথে**

বিপ্রদাশ বড়ুয়া রচিত *মংডুর পথে* ভ্রমণ কাহিনি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং তাদের অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। এক সময় আরাকানে ছিল মুসলমানদের শাসন, দৌলত কাজী ও আলাওলের মতো কবিরা বাংলায় কাব্যচর্চা করেছেন।[৮৩]

এ সকল নানাদিক উক্ত রচনায় স্থান পাওয়ায় শিক্ষাক্রমে বর্ণিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাভাষা চর্চা ও নান্দনিকতাবোধের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

**০১:১০: বাংলা নববর্ষ**

*বাংলা নববর্ষ* প্রবন্ধটি লিখেছেন শামসুজ্জামান খান। আমাদের স্বাধীনতার পেছনে নববর্ষের প্রেরণা, সম্রাট আকবরের সময় থেকে বাংলা সনের গণনা, নববর্ষে হালখাতা, বৈশাখী মেলা, ঘোড় দৌড়, বিভিন্ন লোকমেলার আয়োজন, পাহাড়ি অবাঙ্গালী জনগোষ্টীর নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নববর্ষ উদযাপনের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এ রচনার মাধ্যমে একটি সাংস্কৃতিক আয়োজন কীভাবে বাঙ্গালির রাজনৈতিক ঘটনাকে প্রভাবিত করেছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে।[৮৪]

রচনার বিষয়বস্তুতে জাতীয় শিক্ষাক্রম - ২০১২ তে বর্ণিত দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

---

৮১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৫১
৮২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৭
৮৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬৪
৮৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৭১

**০১:১১: বাংলা ভাষার জন্মকথা**

*বাংলা ভাষার জন্ম কথা* প্রবন্ধটি হুমায়ুন আজাদের *কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী গ্রন্থ* থেকে সংকলিত হয়েছে। ভাষার ধর্মই হচ্ছে বদলে যাওয়া। মানুষের মুখেমুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। সাধারণ মানুষ কথা বলত প্রাকৃত ভাষায়। এ প্রাকৃত থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম। এ রচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার জন্মকথা জানতে পারবে। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি শিক্ষার্থীদের মাঝে মমত্ববোধ জাগ্রত হবে।[৮৫]

*বাংলা ভাষার জন্মকথা* প্রবন্ধের বিষয়বস্তুতে জাতীয় শিক্ষাক্রম - ২০১২ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের 'ছ' নং পয়েন্টে বর্ণিত বাংলা সাহিত্যের অন্তর্নিহিত নান্দনিক সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

**০১:১২: মানবধর্ম**

লালন শাহ্ রচিত *মানবধর্ম* কবিতায় মানুষের জাত পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি জাতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। মনুষ্য ধর্মই মূলকথা। ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই বড়, এই বিষয়টিই কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি বা গর্ব অহংকার থেকে বিরত থাকতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা হয়েছে।[৮৬]

এ কবিতায় জাতীয় শিক্ষাক্রম - ২০১২ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের 'গ' নং পয়েন্টে বর্ণিত মানবীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ এবং সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের বেড়ে উঠার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

**০১:১৩: বঙ্গভূমির প্রতি**

মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত *বঙ্গভূমির প্রতি* কবিতায় স্বদেশের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও মাতৃভূমি বাংলার প্রতি কবি হৃদয়ের গভীর ভাবাবেগ প্রকাশিত হয়েছে। কবি দেশ, দেশের মানুষের মাঝে তথা এ সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আকুল আকুতি প্রকাশ করেছেন। এ কবিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিনয়ভাব জাগ্রত করার বিষয়টি ফুটে উঠেছে।[৮৭]

এ কবিতাটিতে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ মানবীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ এবং সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসাবে বেড়ে উঠার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

---

৮৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৬
৮৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১
৮৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪-৬

**০১ : ১৪ : দুই বিঘা জমি**

*দুই বিঘা* জমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *কথা ও কাহিনী* কাব্য গ্রন্থ থেকে সংকলিত । এই কবিতায় কবি সমাজের এক শ্রেণির বিত্তবান, প্রতাপশালী ব্যক্তিদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন, যারা সাধারণ মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করে সম্পদশালী হয় । তারা অর্থ, পেশী শক্তি ও দাপটের জোরে অন্যায়কে ন্যায় এবং ন্যায়কে অন্যায় বলে প্রতিষ্ঠা করে।[৮৮]

এ কবিতায় জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০১০ এ উল্লেখিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক গুণাবলী, যেমন নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, সহিষ্ণুতা, শৃংখলা, সদাচার অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ন্যায়বিচার বোধের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

**০১ : ১৫ : পাছে লোকে কিছু বলে**

কবি কামিনী রায় রচিত *পাছে লোকে কিছু বলে* কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা নিঃসংকোচচিত্তে জীবনপথে পরিচালিত হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। কে কী বলল তা ভেবে কাজ বা দায়িত্ব পালন হতে নিজেকে গুটিয়ে রাখার প্রবণতা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে।[৮৯]

জাতীয় শিক্ষাক্রমে বর্ণিত কাজের অভ্যাস ও কাজ করতে আগ্রহী হওয়ার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বিকশিত হওয়ার বিষয়টি এ কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে।

**০১ : ১৬ : প্রার্থনা**

*প্রার্থনা* কবিতাটি কবি কায়কোবাদের *অশ্রুমালা* কাব্যগ্রন্থ হতে সংকলিত। *প্রার্থনা* কবিতায় কবি স্রষ্টার প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। শিক্ষার্থীরা এই কবিতা পাঠে স্রষ্টার মহিমা সম্পর্কে জানবে। তারা স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং সৎ ও সুন্দর জীবন যাপনে তৎপর হবে।[৯০]

এ কবিতায় জাতীয় শিক্ষানীতিতে বর্ণিত শিক্ষার্থীদের মনে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

**০১:১৭: বাবুরের মহত্ত্ব**

কবি কালিদাস রায়ের *বাবুরের মহত্ত্ব* কবিতাটি *পর্নপুট* কাব্য গ্রন্থ হতে সংকলিত। কবিতায় মুঘল সম্রাট বাবুরের মহানুভবতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এতে বাবুরের মহৎ আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ তুলে ধরা হয়েছে।[৯১]

---

৮৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৯৩
৮৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৭
৯০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০১
৯১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৫

এ কবিতায় জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ বর্ণিত ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

**০১:১৮: নারী**

কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত *নারী* কবিতায় নারীর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং মানব সভ্যতায় নারীর অবদান যে পুরুষের চেয়ে কম নয়, এ বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে।[৯২]

এ কবিতায় জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০১০ এ বর্ণিত নারীপুরুষ বৈষম্য দূর করা এবং সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

**০১:১৯: আবার আসিব ফিরে**

কবি জীবনানন্দ দাশ রচিত *আবার আসিব ফিরে* কবিতা পাঠে শিক্ষার্থীরা বাংলার রূপবৈচিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তাদের মনে নিজের দেশের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত হবে।[৯৩]

জাতীয় শিক্ষাক্রম - ২০১২ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে 'ছ' নং পয়েন্টে বর্ণিত বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যের নান্দনিক সৌন্দর্যের বিষয়টি এ কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে।

**০১:২০: রুপাই**

পল্লী কবি জসীমউদ্‌দীন রচিত *নক্সী কাঁথার মাঠ* নামক কাহিনিকাব্যের এ অংশটুকু *রুপাই* কবিতা নামে সংকলিত হয়েছে। কৃষকের শ্রমেই সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব কিছুই কৃষকের কালো । আর এ কালো কৃষকই পৃথিবীর সবকিছু জয় করেছে। এ কবিতা পাঠে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রকৃতিকে যেমন ভালোবাসতে ও গ্রামীন সৌন্দর্য উপলব্দি করতে পারবে, তেমনি গ্রাম বাংলার কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও দ্বায়িত্বশীল আচরণ করতে শিখবে।[৯৪]

*রুপাই* কবিতায় জাতীয় শিক্ষাক্রম - ২০১২ তে উল্লেখিত বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও শ্রদ্ধাবোধের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

**০১:২১: নদীর স্বপ্ন**

*নদীর স্বপ্ন* কবিতায় কবি বুদ্ধদেব বসু নদী এবং নৌভ্রমণ নিয়ে এক কিশোরের কল্পনার চমৎকার বহিঃপ্রকাশ করেছেন। এ কবিতা পাঠে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কল্পনা শক্তির প্রসার, প্রকৃতি ও দেশের প্রতি আকর্ষণ এবং পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে।[৩৫]

---

৯২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১১০
৯৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৫
৯৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১১৯

কবিতাটিতে জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০১০ এ মানবীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত দেশ প্রেম, কর্তব্যবোধ ও সহমর্মিতাবোধের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

**০১:২২: জাগো তবে অরণ্য কন্যারা**

কবি সুফিয়া কামালের *উদাত্ত পৃথিবী* কাব্যগ্রন্থ হতে কবিতাটি সংকলিত। কবি প্রকৃতির চারপাশের অরণ্য নিধন লক্ষ্য করে ব্যথিত। মানুষের অযাচিত হস্তক্ষেপে উজাড় হচ্ছে বন। বাংলার রূপ - প্রকৃতি হুমকির মুখে পড়েছে। কবি দেখতে চান প্রকৃতিতে আবার সবুজ বৃক্ষের সমারোহ সৃষ্টি হোক, ফলে ও ফসলে ভরে উঠুক পৃথিবী।[৯৫]

*জাগো তবে অরণ্য কন্যারা* কবিতায় জাতীয় শিক্ষনীতি - ২০১০ এ উল্লেখিত দেশে এবং বহির্বিশ্বের প্রকৃতি ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষা, জীবের প্রতি মমতা সম্পর্কিত নৈতিক বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

**০১ : ২৩: প্রার্থী**

*প্রার্থী* কবিতাটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের *ছাড়পত্র* কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। *প্রার্থী* কবিতায় কবি পৃথিবীর শক্তির অন্যতম উৎস সূর্যের কাছে উত্তাপ প্রার্থী । প্রচন্ড শীতে সূর্যের এ উত্তাপের জন্য সারারাত অপেক্ষা করে বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন শীতার্ত মানুষ। এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীদের মনে বঞ্চিত, অবহেলিত ও দরিদ্র মানুষের প্রতি মমতা সৃষ্টি হবে। অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়হীন মানুষের কষ্ট দেখে তারা ব্যথিত হবে।[৯৬]

কবিতাটিতে জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০১০ এ উল্লেখিত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বর্ণিত মানবীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থ সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য দূর করা, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

**০১ : ২৪: একুশের গান**

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত *একুশের গান* কবিতা পাঠে শিক্ষার্থীরা ভাষা আন্দোলনে বাঙ্গালির আত্মত্যাগ নিয়ে যেমন গর্ব করতে শিখবে, তেমনি অন্যদিকে তারা শহিদের রক্তের ঋণ শোধ করার জন্য সব ধরণের অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্ছার হবে। কবিতাটিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে।[৯৭]

কবিতাটিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ এর বৈশিষ্ট্যে ৫ ও ৭ নং পয়েন্টে উল্লেখিত মানবীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত ভাষা আন্দোলনের চেতনা ও দেশাত্ববোধের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

---

৯৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫-১২৭
৯৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-১৩০
৯৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩-১৩৫

**পর্যালোচনা**

জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০১০ এর আলোকে অষ্টম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক *সাহিত্য কণিকাসহ* অধিকাংশ বিষয়েই নীতি - নৈতিকতা, মানবীয় মূল্যবোধ, চরিত্র গঠন, মহৎ গুণাবলী অর্জন, শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে নীতবোধ জাগ্রত করা এবং দেশ প্রেম উদ্ধুকরণের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের বিষয়ে দেশে প্রচলিত মূল চারটি ধর্ম যেমন, ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও খ্রিষ্ট ধর্ম ছাড়াও আদিবাসীসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদানকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে *ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা* নামে আলাদা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০১০ এ ধর্ম, নৈতিকতা ও মানবীয় মূল্যবোধের গুরুত্ব তুলে ধরে বলা হয়েছে-"ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি, আচরণগত উৎকর্ষসাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন।"[৯৮]

ধর্মশিক্ষা যাতে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চরিত্র গঠন ও মহৎ গুণাবলী অর্জনে, এবং শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা যায় এ বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা রয়েছে।

এ ছাড়াও আমরা লক্ষ্য করছি, জ্ঞান সঞ্চারণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মাঝে মানবিক গুণাবলী অর্জনের প্রতিও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যবসা শিক্ষা, কৃষি, আইন, কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রেও পেশাগত দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও চিন্তা বিকশিত করে চিত্তবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করা এবং তাদের মন ও কর্মে শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করা, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করার বিষয়ে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। মূলত: জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০১০ এর ২৮ টি অধ্যায়েই কোন না কোন ভাবে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার স্তর ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ ও অষ্টম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক *সাহিত্য কণিকা* পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে কোনভাবেই নৈতিকতাকে পরিহার করে কোন আলোচনা অন্তর্ভূক্ত হয়নি। পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা ও মানবীয় মূল্যবোধের বিষয়ে ব্যপকভাবে আলোচিত হলেও শিক্ষার্থীদের মাঝে এর প্রতিফলনের দায়িত্ব পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর

---

৯৮ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, *জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০* (ঢাকা : তা. নেই), পৃ. ২০

বর্তায়। কেননা বিদ্যালয় হল মূল্যবোধ শিক্ষার সুচিকাগার। তাই ব্যক্তি থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, দলীয়, রাষ্ট্রীয়, জাতিগত, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, মানবিক এমনকি বৈশ্বিক পর্য্যায়ে ধর্ষঁবং গুলো study করার গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হল বিদ্যালয়। কিন্তু এই সুবর্ণ সুযোগটি যারা তৈরি করে দিবেন, সেই শিক্ষকদের একটা বিরাট ভূমিকা থাকে মূল্যবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে মূল্যবোধ বিষয়ক বিষয়বস্তুর সংগঠনই যথেষ্ট নয়। শিক্ষকের দক্ষতা ও আন্তরিকতা থাকলে প্রতিটি পদক্ষেপে মূল্যবোধ শিখানো সম্ভব। তাই শিক্ষকের বিরাট ভূমিকা আছে। মূল্যবোধ শিক্ষার জন্য formal education বা পুঁথিগত বিদ্যা যথেষ্ট নয়। অতএব শিক্ষককে দার্শনিক হতে হবে। শিক্ষার্থীর বিশ্বাসে মূল্যবোধ প্রবেশ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা ব্যাপক। গতানুগতিক পাঠদান পদ্ধতি পরিবর্তন করে চিন্তন প্রক্রিয়ার উন্নতি করার সুযোগ করে দিতে হবে। চিন্তার স্বাধীনতা, মুক্তবুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়ে একজন বিশুদ্ধ মানুষ তৈরি করতে হলে শিক্ষককে পাঠে বৈচিত্র আনতে হবে। আর একজন শিক্ষক এভাবে মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারেন। মূল্যবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কাজ করানো এবং শিক্ষক closely observe করে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ শেখাতে পারেন। শিক্ষক সমাজে বিপ্লব আনতে পারেন। তাই নীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও জ্ঞান আহরণের স্পৃহা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করতে শিক্ষকের ভূমিকা ব্যাপক।

আমাদের মতে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর আলোকে মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও শিক্ষকদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষিত করে শ্রেণিকক্ষে নিয়মতান্ত্রিক পাঠদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নীতি-নৈতিকতা ও মানবীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ ও অষ্টম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক *সাহিত্য কণিকা* পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি বোধ, দেশপ্রেম, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম, বর্ণ গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

## অষ্টম শ্রেণিঃ ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

উক্ত গ্রন্থে পাঁচটি অধ্যায়ে অনেকগুলো বিষয় আলোচিত হয়েছে।

### প্রথম অধ্যায়

### আকাইদ

আকাইদ শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হয়-ইসলাম ধর্মের অনুসারী হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম মৌলিক কতিপয় বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। যেমন- আল্লাহ তায়ালা, নবি-রাসুল, ফেরেশতা, আখিরাত ইত্যাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলামের এরূপ মৌলিক বিষয়গুলোর উপর বিশ্বাসকে আকাইদ বলা হয়। আকাইদ শব্দটি বহুবচন। একবচনে "আকিদাহ যার অর্থ বিশ্বাস । আকাইদের বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস করতে হবে। এর কোনো একটিকে অবিশ্বাস করলে কেউ মুসলিম হতে পারে না। অতএব, আকাইদ হলো ইসলামের প্রধান ভিত্তি। উক্ত অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা ইসলামী আক্বিদা বা বিশ্বাসের মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে জানতে পারবে।

আলোচ্য অধ্যায়ে ইমান, নিফাক, আল-আসমাউল হুসনা, রিসালাত, খতমে নবুয়ত, আখিরাত, শাফাআত, জান্নাত, জাহান্নাম, ইমান ও নৈতিকা ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে।

### দ্বিতীয় অধ্যায়

### ইবাদত

ইবাদত শিরোনামের অধ্যায় সম্বন্ধে বলা হয়-আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করে তার আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জন করে জীবন পরিচালনাকে ইসলামি পরিভাষায় ইবাদত বলে । ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জীবন বিধান । ইসলামের মৌলিক পাঁচটি বিষয় যথা : কালিমা, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ যথাযথ পালনের নাম ইবাদত ।

আবার মানব- জীবনের প্রতিটি কাজ ইসলামি বিধি-বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর সকল সৃষ্টবস্তু মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মানুষ ও জিন জাতিকে শুধু আল্লাহর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। উক্ত অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থীরা ইবাদাতের মৌলিক বিষয়াবলী সম্বন্ধে অবহিত হবে।

আলোচ্য অধ্যায়ে ইবাদত, যাকাত, যাকাতের খাত, হজ ও হজ্জ পালনের নিয়ম, কুরবানি, আকিকা ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে।

## তৃতীয় অধ্যায়

## কুরআন ও হাদীস শিক্ষা

কুরআন ও হাদীস শিক্ষা শিরোনামের অধ্যায়ে বলা হয়-কুরআন ও হাদিস ইসলামি শরিয়তের প্রধান দুটি উৎস। ইসলামি শরিয়তের সকল বিধি-বিধান ও নিয়ম পদ্ধতি মূলত এ উৎসদ্বয় থেকেই গৃহীত। কুরআন মজিদ ও হাদিস শরিফে মানব জীবনের সকল সমস্যার মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। এসব মূলনীতির আলোকেই ইসলামের সকল বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে।

কুরআন ও হাদিসের নীতিমালার বাইরে কোনো কিছু ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে কুরআন মজিদ ও হাদিস শরিফ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে । এ অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা আল-কুরআন ও হাদিসের কতিপয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করবে।

আলোচ্য অধ্যায়ে কুরআন মজিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তাজবীদ, নুন সাকিন ও তানভিনের পরিচয় বর্ণনা, মীম সাকিন, নাযিরা তিলাওয়াতসহ ছয়টি সূরার অর্থসহ আলোচনা এবং সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত এবং আল-কুরআন ও হাদিসের আলোকে নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

## চতুর্থ অধ্যায়

## 'আখলাক'

আখলাক শিরোনামের উক্ত অধ্যায়ে বলা হয়- মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যে আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রের প্রকাশ পায় তাকে আখলাক বলে। আখলাক আরবি শব্দ 'খুলুকুন' এর বহুবচন। যার অর্থ চিত্র বা স্বভাব । মানব জীবনের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক সকল দিকই আখলাকের অন্তর্ভুক্ত । এ অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা- সদাচরণের ধারণা, ধৈর্য, ভ্রাতৃত্ব, নারীর মর্যাদা, সমাজসেবা, দেশপ্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণনা করতে পারব। অসদাচরণের ধারণা, অহংকার, অশ্লীলতা, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, চৌর্যবৃত্তি, ঘুষ, সন্ত্রাস এগুলো পরিহারের গুরুত্ব ও প্রতিকারের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব। পাশাপাশি এইচআইভি-এর ধারণা ও ইসলামের দৃষ্টিতে এইচআইভি এবং এইডস প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা করতে পারবে ।

আলোচ্য অধ্যায়ে আখলাকের প্রকার, আখলাকে হামিদাহ, ধৈর্য, ভ্রাতৃত্ব, নারীর মর্যাদা, সমাজসেবা, দেশপ্রেম, পরমতসহিষ্ণুতা, আখলাকে যামিমা, অহংকার, অশ্লীলতা, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, চৌর্যবৃত্তি, ঘুষ, সন্ত্রাস এইচআইভি এবং এইডস ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

## পঞ্চম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত শিরোনামের উক্ত অধ্যায়ে বলা হয়-মহান আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর ইবাদত করা, আল্লাহর বিধিনিষেধ

মান্য করা। আর এসব বিধিনিষেধ যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য অবশ্যই একটি অনুসরণীয় নীতিমালা প্রয়োজন। যাকে আমরা আদর্শ বলতে পারি।

মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আগত নবিগণের জীবনচরিত আমাদের আদর্শ। এর মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনচরিত হলো সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। এমনিভাবে যাঁরা নবি ও রাসুলগণের জীবনী অনুকরণ করে ধন্য হয়েছেন তাঁদের জীবনের ভালো দিকগুলোকেও আমরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবো। উক্ত অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা কয়েকজন নবী-রাসূল, সাহাবী ও তাবেয়ীর জীবনী জানতে পারবে।

এ অধ্যায়ের শুরুতে নবি-রাসুলগণের জীবনচরিত উল্লেখ করা হয়েছে। এতে হযরত সুলায়মান (আ.), হযরত মুসা (আ.), হযরত ঈসা (আ)-এর জীবনী স্থান পেয়েছে। এরপর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়। তারপর হযরত আয়েশা (রা.), হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) এবং হযরত রাবেয়া বসরি (র)-এর জীবন জীবনী স্থান পেয়েছে।

**পর্যালোচনা**

পঞ্চম শ্রেণির অধিকাংশ পাঠ্য বিষয়ে নৈতিকতা ও মানবীয় মূল্যবোধ সম্পর্কিত বিষয়বস্তু ব্যাপকভাবে অর্ন্তভুক্ত থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা শ্রেণি ও বিষয় ভিত্তিক সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়নি। অনেকাংশেই উপস্থাপনায় ধারাবাহিকতা ও সমন্বয় নেই। কিছু পাঠ্য পুস্তকে একই বিষয়ে যেমন-পূনরাবৃত্তি রয়েছে তেমনি বিষয় বস্তুতে কাঠিন্যের মাত্রা ও বিষয়বস্তুর আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে নৈতিক চেতনার প্রতিফলন অত্যান্ত সীমিত। কোন ক্ষেত্রে নৈতিকতার বিপরীত (বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়) শিক্ষা রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজে বিদ্যমান নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত বিষয় এর বিরুপ প্রভাব পরিবার শিক্ষা প্রশাসন ও শিক্ষকের উপর পরিলক্ষিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে প্রাথমিক পর্যায়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে শেখানো নীতি নৈতিকতা ও আদর্শগত জ্ঞান নিয়ে সংশয় সন্দেহে ভোগছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্টনিক শিক্ষা অনুশীলনে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। কেননা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিরাজমান অস্থিরতা শিশুর জীবন মননের উপরও বিরুপ প্রভাব বিস্তার করে।

এ পরিস্থিতি হতে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন ও পূণবিন্যাস করা। সামগ্রীকভাবে সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে নৈতিক উন্নয়ন সাধিত হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার সুফল অর্জিত হবে। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। পরিবার, সামাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নৈতিকতা অনুশীলন করা যাথে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনে নৈতিকতা নিয়ে কোন সংশয় ও সন্দেহ তৈরি না হয়।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার অবস্থানঃ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার অবস্থান: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে দেখা যায়। এর মধ্যে ইসলামী দেশগুলো ছাড়া আমেরিকা, বৃটেন, থাইল্যাণ্ড, শ্রীলংকা, ভারত প্রভৃতি দেশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আমেরিকা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ বেসরকারি স্কুল গির্জাসংশ্লিষ্ট এবং প্রধানত রোমান ক্যাথোলিক সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত। ধর্ম শিক্ষা দানের জন্যই এই স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই স্কুলগুলো উন্নতমানের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পেরেছে। পাবলিক স্কুলগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হলেও অঙ্গরাজ্য সরকার ও স্থানীয় স্কুল বেসরকারি ও গির্জা পরিচালিত স্কুলগুলোকে নানা উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে। তাদেরকে রাজ্যের শিক্ষার মান সংরক্ষণ করতে হয়, অনুমোদিত শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে হয় ও যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করতে হয়।[১]

বৃটেন বা যুক্তরাজ্যেও একই ভাবে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচলন ছিলো। কিন্তু উনিশ শতকের শেষদিকে ধর্মীয় দল বা গীর্জা পরিচালিত স্কুলগুলো অর্থাভাবে শিক্ষার মান রক্ষা করতে অসমর্থ হয়। স্কুলগুলোর অস্তিত্ব রক্ষা ও শিক্ষার উন্নত মান সংরক্ষণের জন্য তারা সরকারী অর্থ সাহায্যের দাবি জানাতে থাকে। ফলে ১৮৯০-১৯০০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে ১৪০০ ধর্মীয় সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্কুলে অর্থ সাহায্য দানের গুরুভার বহন করতে হয়। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে উদারপন্থী রাজনৈতিক দল ধর্মীয় ও জাতীয় এই দ্বৈত বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে একই প্রকার জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে আন্দোলন শুরু করে।[২]

একইভাবে থাইল্যাণ্ডে ও শ্রীলংকায় প্যাগোডা ভিত্তিক শিক্ষার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে থাইল্যাণ্ডে সরকারি সহায়তায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই প্যাগোডা ভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে বলে জানা যায়।

ভারতে ধর্মীয় শিক্ষার অবস্থা এদেশের সাথে তুলনীয়। মুসলমান ও হিন্দু ধর্মীয় দু'টি সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় দু'টি ধারাকে কখনও অস্বীকার করা যায়নি। এক আন্তার্জাতিক সমীক্ষায় ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার এই অনিবার্য অবস্থাকে স্বীকার করে মন্তব্য করা হয়

---

১ মো: সিদ্দিকুর রহমান ও মো. শাওকাত ফারুক, *শিক্ষা ব্যবস্থা* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাইজ, মে ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৩৬

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

> Indian culture has evolved out of impact of there two main streams of the society. One of the most salient feature and the religious education during this period was co-ordination between secular and religious education. Also the religious and social leaders directed their attention to the essential unity and equaly of all religious creeds to infuse national intigration.[৩]-

অবিভক্ত ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থাও ছিল ধর্মনির্ভর। সে সময় শিক্ষাকে ইহকাল ও পরকালের প্রস্তুতি হিসেবে ধরে নেওয়া হতো।

**ইউরোপে নৈতিক শিক্ষা**

খ্রিষ্টীয় ইউরোপে মধ্যযুগে অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল ক্যাথলিক চার্চের সাথে সংশ্লিষ্ট। এসব প্রতিষ্ঠানে খ্রিষ্টধর্মীয় শাস্ত্র ছাড়াও ব্যাপক পরিসরে ত্রয়ী বিষয় (trivium) তথা ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যা এবং ক্ষুদ্র পরিসরে চতুষ্টয়ী বিষয় (quadrivium) তথা গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও সঙ্গীত শেখানো হ'ত। শিক্ষার মাধ্যম ছিল ল্যাটিন ভাষা। এনলাইটেনমেন্ট যুগের পর থেকে পাশ্চাত্যে শিক্ষাব্যবস্থার ওপর খ্রিষ্টধর্মীয় প্রভাব দুর্বল হ'তে থাকে। বাইবেলের প্রামাণিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে। ফলে খ্রিষ্টধর্মীয়ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে মূলধারা থেকে প্রতিস্থাপিত হয় সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা। সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মের প্রভাবমুক্ত মানব যুক্তি ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানভিত্তিক বলে দাবী করা হ'ত। মূলতঃ ক্যাথলিক ও প্রটেস্টট্যান্ট খ্রিষ্টানদের মধ্যে চলা রক্তক্ষয়ী ৩০ বছরব্যাপী (১৬১০-১৬৪৮) যুদ্ধের পর ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব হ্রাস পায় এবং জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটতে থাকে। এ সময়কালে বিশেষ করে সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচলিত গণশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রমিত ভাষায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে জাতিরাষ্ট্রের সীমানাভুক্ত বিভিন্ন সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক জাতির মানুষকে আত্মীকরণ (assimilation) এবং একজাতকরণ (homogenization) করে জাতিরাষ্ট্রের অনুগত সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। এনলাইটেনমেন্ট চিন্তাবিদ জন লক এবং থমাস হবস এ সময়কালেই ক্যাথলিক চার্চের প্রতি আনুগত্যের বদলে জাতিরাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলেন। আধুনিক স্কুলশিক্ষা মূলতঃ জাতিরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব নেয়। শিল্প বিপ্লবের সময় পাশ্চাত্যে শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

---

৩ *UNESCO-NIER Regional programme for Educational Research*, Asian studz of curriculum, Tokyo 1970, p. 111.

ইংরেজ জাতির বৈশিষ্ট্য ও জীবন-দর্শন তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বিন্যাস ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রণে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায়, বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রথমে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদানের উদ্যেশ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। ক্রমে রাষ্ট্রও এ কাজে এগিয়ে আসে। চতুর্দশ হতে ষোড়শ শতকের মধ্যে ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী পাবলিক স্কুলগুলির জন্ম ও বিকাশ হয়। ঊনিশ শতক হতে রাষ্ট্র শিক্ষা উন্নয়নে ভূমিকা গ্রহণ করে।[৪]

**যুক্তরাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা**

ইংল্যান্ডের শিক্ষার্থীদের দৈনিক প্রার্থনার মধ্য দিয়ে স্কুল কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু এই প্রার্থনা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়ে দৈহিক শাস্তি নিষিদ্ধ। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, সবত্রই সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। দ্বি প্রাহরিক আহার ও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা বিধি আছে। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের জেনারেল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয় যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ৮ টি আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হয়। সাধারণ মান (Ordinary level) ও উন্নত মান (Advanced level) দুটি ভাগে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। কে কয়টি বিষয়ে কোন মাসে পরীক্ষা দেবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার ছাত্রছাত্রীদের নিজের। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে নূন্যতম যোগ্যতা হল দুটি বিষয়ে উন্নত মানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। মাধ্যমিক স্কুলের ছেলেমেয়েরা স্কুলের বাইরে র্সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। ক্লাব সোসাইটি ইত্যাদি গড়তে পারে।

ইংল্যান্ডের প্রাচীনতম ও ঐতিহ্যবাহী গ্রামার ও পাবলিক স্কুলে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। ইংল্যাণ্ডের জাতীয় জীবনে এ বিদ্যালয়গুলো একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এখানকার শিক্ষার্থীরা এমন ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে যে ইংল্যান্ডের সবক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে এদের দেখা যায়। নিচে যুক্তরাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় এসব বিদ্যালয়ের অবদান উল্লেখিত হল–

বেসরকারি স্কুলের মধ্যে বিশেষ জাতি সম্পন্ন হচ্ছে পাবলিক স্কুল। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত এরা প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে পরিচালিত হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সমগ্র দেশের বিদ্যালয়ের শিক্ষা জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসিলে এই পাবলিক স্কুলগুলি বিশেষ শর্তে সরকারী তহবিল হতে অর্থ সাহায্য গ্রহণের অধিকার লাভ করে। এই আইন বলে এগুলো নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার অধিকারও লাভ করে। এ স্কুলগুলির ইতিহাস অতি প্রাচীন ও বহুদিন ধরে চলার ফলে অধিকাংশ পাবলিক স্কুলের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এদের মধ্যে উইনচেষ্টার, ইটন,

৪ Henry Lester Smith, *Comparative education* (Bloomington, 1940), p. 12-13; F. Stuart Maclure, *Educational Documents : England and Wales 1816—1967,* (London: 1968), 2nd ed., p. 28

ডয়েস্ট মিনিষ্টার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পাবলিক স্কুলগুলো সাধারণত আবাসিক, অনাবাসিক দুইই আছে। এসব বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলো হচ্ছে,

১. সুপরিচালনা ও উন্নত শিক্ষা পদ্ধতি।

২. সুনির্বাচিত পাঠ্যক্রম।

৩. উন্নত শিক্ষার মান।

৪. সুযোগ্য শিক্ষক মন্ডলীর ব্যক্তিগত যত্ন।

৫. আবাসিক বিদ্যালয় হাউজ সিস্টেম।

৬. প্রিফেক্ট সিস্টেম।

ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষা প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকতা। প্রাথমিক মাধ্যমিক ও অনান্য স্তরের শিক্ষা পরিকল্পনার ভার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয়, স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোগের উপর ন্যস্ত। এরা পারস্পরিক আলোচনা সহযোগিতা ও পরামর্শের দ্বারা বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাগত সংযোগ ও সম্পর্ক রক্ষা করে থাকে। সাংগঠনিক দিক থেকে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনের উপর ভিত্তি করেই ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান কাঠামো তৈরি হয়েছে। তখন শিক্ষার উন্নতি বিধান ও অগ্রগতি ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা শিক্ষামন্ত্রীর প্রধান কাজ ছিল। শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব ১৯৬৪ সালের এপ্রিল হতে শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক স্টেট সেক্রেটারির উপর অর্পণ করা হয়। তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করেন এবং বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। কিন্তু তাতে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের শিক্ষা সংক্রান্ত স্বায়ত্বশাসনের অধিকার কখনও লংঘন করা হয়না। এসব স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ এলাকার শিক্ষাব্যবস্থা নির্ধারনের এবং নিয়ন্ত্রণের বিপুল ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন। ১৯৪০ এর আইন অনুসারে শিক্ষামন্ত্রীর প্রধান কাজ হল জাতীয় শিক্ষার নীতি অনুসারে ইংল্যান্ড শিক্ষার উন্নতি, অগ্রগতি ও LEA কে শিক্ষার সহায়তা দেয়া। আইনে শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়– To promote the education of the people of England and waled and the progressive development of Institutions devotes to that purpose and to secure, the effective execution by local authorities, under his control and divection, of the national policy for providing a varied and comprehensive educational service in every area[৫].

৫ Department of education and science, *The Educational system of England and Wales* (London: 1972), p. 12

শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক স্টেট সেক্রেটারি সরকারের কেবিনেট সাফল্য এবং পার্লামেন্টের দুজন আন্ডার সেক্রেটারি তার সহাকারি। স্টেট রাজনৈতিক দলের সদস্য। তবে একদল বেসামরিক সহকারি কর্মচারি মন্ত্রীকে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে।[৬]

ইংল্যান্ডের শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন কাজে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করে তাকে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে যখন শিক্ষায় সরকারের ভূমিকা ছিল না বললেই চলে সে সময় হতেই এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংস্থাগুলো (প্রধানত গীর্জা) ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা বিকাশে ও বিস্তারে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে আসছে। বৈচিত্র্য বিলাসী ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের প্রতি আস্থাশীলতা ইংরেজদের জাতীয় চরিত্ররুপে স্বীকৃত। এ কারণে বর্তমানে ইংল্যান্ডের সর্বত্র জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও তাদের পাশাপাশি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংস্থা দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব টিকে রয়েছে।

**নৈতিকতা ও মূল্যবোধ**

British Values হিসেবে Democracy, Rule of Law, Individual Liberty, Mutual Respect, Tolerance স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে শেখানো হয়। SMSC (Spiritual, Moral, Social and Cultural Development) এর মাধ্যমে মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া হয়।

**স্তরবিন্যাস**

- Primary Education: Reception–Year 6 (৪-১১ বছর)
- Secondary Education: Year 7–11 (১১-১৬ বছর)
- Post-16 Education: Sixth Form/College (১৬-১৮ বছর)

**কানাডার শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা**

কানাডার প্রতিটি প্রদেশে আলাদা শিক্ষানীতি থাকলেও Ethics, Citizenship, and Social Justice বিষয়গুলো পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত। Professional Ethics and Law in Education বইয়ে শিক্ষকদের জন্য নৈতিক নির্দেশনা রয়েছে।

**স্তরবিন্যাস**

- Elementary School: Kindergarten–Grade 6
- Junior High: Grade 7–9
- Senior High: Grade 10–12

---

৬ শরিফা খাতুন, *তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্ব* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩), পৃ. ১৫৫

**অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা**

Australian Curriculum G ÒEthical Understanding একটি সাধারণ সক্ষমতা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার্থীদের সততা, সহানুভূতি, সম্মান ও সামাজিক দায়িত্ববোধ শেখানো হয়।

**স্তরবিন্যাস**

- Primary School: Kindergarten–Year 6
- Secondary School: Year 7–12

**রাশিয়ার পাঠ্যক্রমে নৈতিক শিক্ষা**

রাশিয়ার পাঠ্যক্রমে নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি জোর দেওয়া হয়। মূলবিষয়গুলোর পাশাপাশি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাগরিক দায়িত্ববোধ এবং দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার জন্য বিভিন্ন বিষয় ও কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৭] সোভিয়েত যুগের পতনের পর নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাকে কম গুরুত্ব দেওয়া হতো। ওইসময় পরিবেশ পরিস্থিতি নেতিবাচক দিকে চলে যায়। কিন্তু বর্তমান সময়ে রাশিয়ায় শিশুদের নৈতিক শিক্ষা খুবই গুরুত্ব সহকারে দেওয়া হয় এবং এটি শৈশব থেকেই শুরু হয়। এই শিক্ষা তাদের সামাজিক আচরণ, দেশপ্রেম, সম্মানবোধ এবং নৈতিক দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করে।[৮]

রাশিয়ায় নৈতিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় (৬-৭ বছর) থেকে শুরু হয়। তবে, এর মৌলিক ধারণাগুলো পারিবারিক পরিবেশ এবং পূর্বশৈশব শিক্ষাকেন্দ্র থেকে শেখানো হয়। শিশুরা যখন কিন্ডারগার্টেনে যায়, তখন থেকেই সামাজিক ও নৈতিক আচরণের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়। এর ফলে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মূল্যবোধের অভাব এবং সমাজে দুর্নীতি ও অপরাধের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

**সুইডেনের শিক্ষা ব্যবস্থ্যা নৈতিক শিক্ষা**

সুইডেন একটি উন্নত দেশ যেখানে শিশুদের শিক্ষার মান এবং মানসিক বিকাশকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। নৈতিক শিক্ষা শিশুদের সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায়, তাদের নৈতিক মূল্যবোধ ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীলতা তৈরি করে। সেখানে স্কুলে ক্লাসের সমস্যার সমাধানে শিশুরা একত্রে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। যেমন কীভাবে সবাই মিলে খেলাধুলার সময় বেশি মজা করা যায়। শিশুদের মতামত প্রকাশের অধিকার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ শেখানো হয়। পরিবেশ

৭ William Benton, *This is the Challenge* (New York: Associate College Presses, 1958), p. 172-73.

৮ ড. সুলতান মাহমুদ রানা, *ঢাকা পোস্ট*, ১৯ জানুয়ারি-২০২৫ খ্রি.।

সচেতনতা এবং টেকসই উন্নয়নের গুরুত্ব পরিবেশ রক্ষা এবং পুনর্ব্যবহার (Environmental Responsibility) স্কুলের কার্যক্রমে শিশুরা প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো, পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ দিয়ে প্রজেক্ট তৈরি এবং বর্জ্য পৃথকীকরণ (waste segregation) শেখে।[৯]

স্কুলের প্রকল্পে শিশুদের দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে দেওয়া হয়, যেখানে প্রত্যেকের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। খেলার মাঠে ফ্রেন্ডশিপ বেঞ্চ (Friendship Bench) ব্যবহার করা হয়, যেখানে কোনো শিশু একাকী বোধ করলে বসে থাকে। অন্য শিশুরা সেখানে গিয়ে তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে।

স্কুলের খাবার পর শিশুদের নিজেদের ট্রে নিজে পরিষ্কার করা এবং শ্রেণিকক্ষ গোছানোর দায়িত্ব নিতে বলা হয়। ক্লাসে বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং বিভিন্ন উৎসব সম্পর্কে জানানো হয়। শিক্ষকরা শিশুদের সমস্যার মীমাংসা করার কৌশল শেখান, যেমন অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং নিজ অবস্থান শান্তভাবে ব্যাখ্যা করা।

**মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাদর্শনের মূল কথা হল গণতান্ত্রিক আদর্শের আলোচিত মূল্যায়ন ও রূপায়ন। এই গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিফলন সেখানকার শিক্ষা পরিদর্শন কার্যেও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাই পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রমের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রমের ব্যবধান যথেষ্ট।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা পরিদর্শনের চেয়ে শিক্ষার মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয় অনেক বেশী। এই ব্যবস্থাপনাকে পরিদর্শন না বলে মূল্যায়ন বলা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা পরিদর্শন যা মূল্যায়নের দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর দেয়া হয়না। দায়িত্ব দেয়া হয় একটা সংঘবদ্ধ দলের উপর যারা এই দায়িত্ব পালনের জন্যই বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকেই শিক্ষাপরিদর্শন বা মূল্যায়ন পদ্ধতি নিরূপনের জন্য স্বত:প্রণোদিত হয়ে কিছু সংখ্যক আঞ্চলিক Accrediting Association গড়ে উঠে। এই সংস্থাগুলো বিভিন্ন পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে তার উপর বিচার বিশ্লেষণ করে কতকগুলো নীতি নির্ধারণ করেন, তার উপর ভিত্তি করেই বিদ্যালয়ের শিক্ষাপরিদর্শন বা মূল্যায়ন করা হবে হবে স্থির করেন এবং যেসব বিদ্যালয় ঐ মূল্যায়নের শর্তাবলী পূর্ণ করতে পারবে তাদের accredited institution বলে ঘোষণা দেয়া হবে বলেও স্থির করা হয়।

---

৯ প্রাগুক্ত।

এসব প্রচেষ্টা বিচ্ছিন্ন ও আঞ্চলিক হওয়ার কারণে ১৯৩০ সালে জাতীয় নীতি নির্ধারণে Co-opertive study of secondary school standard এর উদ্যোগে প্রস্তুত হয় Evaluative criteria বলা হয় বই মূল্যায়ন হবে প্রতি পাঁচ বছর পর পর উদ্দেশ্য ছিল accredited institution হিসাবে পরিগণিত হওয়া বা প্রতিটি বিদ্যালয়ের আত্মসমীক্ষা করা।

মূল্যায়ন পদ্ধতির তিনটি স্তর ছিল। প্রথম স্তরে বিদ্যালয় নিজস্ব শিক্ষক মণ্ডলী বা প্রয়োজনবোধে অভিভাবক এবং বাইরের বিশেষজ্ঞের সাহায্যে Evaluative criteria র মাধ্যমে সমীক্ষা চালাবেন। এতে বিদ্যালয়গুলোকে আত্মসচেতন করে তুলবে। নিজেদের সামর্থ কতটুকু, দুর্বলতা কোথায় সে বিষয়ে তারা নিজেরাই অবহিত হবে তদানুসারে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারবে।

২য় স্তরে Accrediting Association বা state Department of Education কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি বিদ্যালয়ের সমীক্ষা বিবরণী নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেন। এই কমিটি সাধারণত স্থানীয় শিক্ষাবোর্ডের সুপারিনটেন্ট, প্রতিবেশী বিদ্যালয়ের প্রধান, অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং রাজ্য শিক্ষা বিভাগের বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত হয়। এই কমিটি কখনও ছিদ্রান্বেষী নয় বরং বিদ্যালয়ের নিজস্ব সমীক্ষায় যে দিকগুলো দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে সে বিষয়ে কমিটি সহযোগিতা করতেই এগিয়ে আসে। তারা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করে।

৩য় স্তরে বিদ্যালয়ের নিজস্ব সমীক্ষা রিপোর্ট ও কমিটির প্রদত্ত রিপোর্ট অনুসারে বিদ্যালয় নিজের দুর্বলতা বা ব্যর্থতাগুলো দূর করতে অগ্রসর হয় এবং সে ক্ষেত্রে বিদ্যালয় কতটুকু সক্ষম হল তার সমীক্ষা করা হয় আবার পাঁচ বছর পর । এ ধরনের পরিদর্শন বা মূল্যায়ন পদ্ধতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

**নৈতিকতা ও মূল্যবোধ**

যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম নেই, তবে অধিকাংশ রাজ্যে Character Education, Civic Responsibility এবং Social-Emotional Learning অন্তর্ভুক্ত। Ethical and Legal Issues in Education বইয়ে শিক্ষকদের জন্য নৈতিক নির্দেশিকা রয়েছে।

**স্তরবিন্যাস**

- Elementary School: Kindergarten–Grade 5
- Middle School: Grade 6–8
- High School: Grade 9–12

**জাপানের শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা**

প্রাচীনকাল থেকেই জাপানে উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ছিল।[১০] মেইজী যুগে জাপানে আধুনিক শিক্ষার সূচনা হয়। ১৮৯২-১৯০৬ সাল পর্যন্ত সময়ে জাপানের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়। বৃত্তিমূলক শিক্ষা, মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা, পেশাগত ও নৈতিক শিক্ষাকে সুবিন্যস্ত করা হয়।[১১] জাপানের শিক্ষাব্যবস্থাতেও শিশুদের প্রাথমিকভাবে শিষ্টাচার, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং সম্মানের বিষয়গুলো শেখানো হয়। ১৯৯০-এর দশকে জাপান নৈতিক শিক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং আত্মহত্যার হার বৃদ্ধি পায়। নৈতিক মূল্যবোধের অভাবে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হওয়া এবং শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়। পরে নৈতিক শিক্ষা পুনঃপ্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়, যা আজও কার্যকর হচ্ছে।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের অভিবাদন জানাতে ছাত্ররা ক্লাসের শুরু এবং শেষে মাথা নত করে নম্রভাবে 'ওহাইও গোজাইমাস' (সুপ্রভাত) বা 'আরিগাতো গোজাইমাস' (ধন্যবাদ) বলে। এখানে মূলত বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নম্রতা শেখানো হয়। জাপানের স্কুলগুলোয় ক্লাস শেষে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই শ্রেণিকক্ষ এবং স্কুল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করে। জাপানের স্কুলগুলোয় দলগত কাজ এবং সহযোগিতার চর্চা করা হয়। মাল্টিমিডিয়া বা পাঠ্যসূচির মাধ্যমে শিশুদের বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সুইডেন একটি উন্নত দেশ যেখানে শিশুদের শিক্ষার মান এবং মানসিক বিকাশকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। নৈতিক শিক্ষা শিশুদের সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায়, তাদের নৈতিক মূল্যবোধ ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীলতা তৈরি করে। সেখানে স্কুলে ক্লাসের সমস্যার সমাধানে শিশুরা একত্রে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়।

যেমন কীভাবে সবাই মিলে খেলাধুলার সময় বেশি মজা করা যায়। শিশুদের মতামত প্রকাশের অধিকার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ শেখানো হয়। পরিবেশ সচেতনতা এবং টেকসই উন্নয়নের গুরুত্ব পরিবেশ রক্ষা এবং পুনর্ব্যবহার (Environmental Responsibility) স্কুলের কার্যক্রমে শিশুরা প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো, পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ দিয়ে প্রজেক্ট তৈরি এবং বর্জ্য পৃথকীকরণ (waste segregation) শেখে।

---

১০ *Ministry of Foreign Affairs, Education and Japan's Modernization* (Tokio, 19972), p. 5

১১ *Educational Patterns in Contemporary Societies*, p. 311

স্কুলের প্রকল্পে শিশুদের দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে দেওয়া হয়, যেখানে প্রত্যেকের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। খেলার মাঠে ফ্রেন্ডশিপ বেঞ্চ (Friendship Bench) ব্যবহার করা হয়, যেখানে কোনো শিশু একাকী বোধ করলে বসে থাকে। অন্য শিশুরা সেখানে গিয়ে তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে।

স্কুলের খাবার পর শিশুদের নিজেদের ট্রে নিজে পরিষ্কার করা এবং শ্রেণিকক্ষ গোছানোর দায়িত্ব নিতে বলা হয়। ক্লাসে বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং বিভিন্ন উৎসব সম্পর্কে জানানো হয়। শিক্ষকরা শিশুদের সমস্যার মীমাংসা করার কৌশল শেখান, যেমন অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং নিজ অবস্থান শান্তভাবে ব্যাখ্যা করা।

১৯৪৬ সালে নতুন শিক্ষার জন্য জাপানের সংবিধানে দুইটি নীতি বিবেচিত হয়।

১. নতুন সংবিধান ঘোষণা করে জাপান পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক ও সামাজিক মঙ্গলকামী মানুষ/জাতি হিসাবে শান্তি পতিষ্ঠা ও মানবতার মঙ্গল সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়।

২. শিক্ষা যে এক সাধারণ ও সমৃদ্ধশালী কৃষ্টির হাতিয়ার স্বরুপ ব্যবহৃত হতে পারে এটিও সংবিধান উল্লেখ করা হয়।

উপরে দুটি নীতির আলোকে ১৯৪৭ সনে ফান্ডামেন্টাল অফ এডুকেশন বিস্তারিতভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর জাপানের শিক্ষার রুপরেখা প্রণয়ন করে। এ আইনে নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়।

১. শিক্ষার লক্ষ্য হবে এটি জনসাধারণকে সত্য ও ন্যায়কে ভালবাসতে শেখাবে।

২. শ্রমের মর্যাদা দিতে, স্বাধীনতার আদর্শের উদ্বুদ্ধ হতে শান্তি পূর্ণ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন এবং তাদের সুস্থ দেহ ও মন গঠন করতে সহায়তা করবে।

৩. এটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করবে।

৪. শিক্ষা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ সাধন করে নতুন কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক সৃষ্টি উন্নয়নে সহায়তা করবে।

৫. সুনাগরিক প্রস্তুতি দানের জন্য শিক্ষা রাজনৈতিক জ্ঞান বিকাশে সহায়ক হবে।

৬. জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে শিক্ষাদান ও প্রচারণা করা আইন বিরোধী। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরা রাজনৈতিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহন থেকে বিরত থাকবে।

৭. ধর্মের সহনশীল মনোভাব বিকাশে শিক্ষা সহায়ক হবে। সমাজ জীবনে ধর্মের মর্যাদা থাকলেও জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন বিশেষ ধর্মমত শিক্ষাদান আইন বিরোধী।

**জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলী**

শিক্ষা আইন অনুসারে জাপানে ৬-১৫ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ নবম শ্রেণি পর্যন্ত সকল ছেলেমেয়ের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরা বিশেষ স্কুলে বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণ করে।

১. দরিদ্র পরিবারের শিশুরা জাতীয় এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্কুল লাঞ্চ, শিক্ষা সফর, চিকিৎসা খরচ ইত্যাদি ব্যয় মেটানোর জন্য বিশেষ মঞ্জুরী পায়।

২. প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে অর্থাৎ নবম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়।

৩. উন্নত, সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য School lunch program চালুর ব্যবস্থা করা হয়।

**ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা**

ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020) শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিকতা, সহানুভূতি, সহনশীলতা, সাংবিধানিক মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধ গঠনের উপর জোর দেয়। পাঠ্যক্রমে "Value-Based EducationÓ Ges ÒConstitutional Morality" অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

**স্তরবিন্যাস**

- Foundational Stage: Nursery–Grade 2
- Preparatory Stage: Grade 3–5
- Middle Stage: Grade 6–8
- Secondary Stage: Grade 9–12

**পাকিস্তানের জাতীয় শিক্ষানীতিতে নৈতিক শিক্ষা**

**ইসলামিক শিক্ষা**

ইসলামিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে।

লক্ষ্য: To develop students into good Muslims and responsible citizens.

কুরআন, হাদীস, ইসলামী ইতিহাস ও মূল্যবোধ পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত।

**দীনী মাদ্রাসা শিক্ষা**

- মাদ্রাসা শিক্ষাকে মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয় করার পরিকল্পনা রয়েছে।
- ধর্মীয় শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় করে integrated curriculum চালুর প্রস্তাব।

**শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও মূল্যবোধ**

ইসলামিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শেখাতে শিক্ষকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের সুপারিশ করা হয়েছে।

**মানবীয় মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্তি**

Guidance, Counselling and Character Building:

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, সহানুভূতি, দায়িত্ববোধ, সহনশীলতা গঠনের জন্য আলাদা অধ্যায় রাখা হয়েছে।
- Character building is a cross-cutting theme across all levels of education.

**পাঠ্যক্রমে মূল্যবোধ শিক্ষা**

- ধর্মীয় মূল্যবোধের পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, নাগরিক দায়িত্ব পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত।
- Students shall be taught to respect diversity and uphold ethical standards. [১২]

**শ্রীলংকার শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা**

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির মধ্যে শ্রীলংকা শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভের পর শ্রীলংকায় একটি নতুন গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সমাজ গঠনের জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষাকে সর্বজনীন করণ ও জনগণের জন্য শিক্ষার সমসুযোগ সৃষ্টিকরণকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পাঁচ থেকে চৌদ্দ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় এবং কিন্ডারগার্টেন স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে পশ্চিমা শক্তির আগমনের পূর্বপর্যন্ত শ্রীলংকার শিক্ষা ছিল বৌদ্ধ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল বৌদ্ধ মন্দির কেন্দ্রিক। ১৫০৫ সালে পর্তুগিজরা সর্বপ্রথম শ্রীলংকায় আগমন করে এবং পর্তুগিজরা জনসাধারণকে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে ধর্মান্তরিত করার লক্ষ্যে স্কুল স্থাপন শুরু করে। ১৬৫৮ সালে পর্তুগীজ শাসনের শেষে ওলন্দাজদের আগমন ঘটে। তারা শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনরুপ পরিবর্তন না এনে পর্তুগীজদের অনুসরণ করতে থাকে। ১৭৯৬ সালে শ্রীলংকার

১২ *Ministry of Federal Education and Professional Training, Pakistan, National Education Policy 2017–2025 (Draft); CSJ Pakistan (2022), Policy Recommendations on Inclusive Education in Pakistan.*

নিয়ন্ত্রণ ইংরেজদের হাতে আসে। তার নিম্নস্তরের দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল পরিচালনা হাতে আসে। তার নিম্নস্তরের দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল পরিচালনা শুরু করে। ফলশ্রুতিতে ১৮৬৯ সালে শ্রীলংকায় ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন গঠিত হয় এবং ধীরে ধীরে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠতে থাকে। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভের পর নতুন এবং পরিবর্তিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন শুরু করা হয়। শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয় এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করা হয়। শিক্ষার লক্ষ্য এবং শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূণ পরিবর্তনের সূচনা হয়। শ্রীলংকার জাতীয় পার্লামেন্টে উপস্থাপিত একটি শ্বেতপত্রে শ্রীলংকার শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপে বিধৃত করা হল,

The provision of a broad general education fpr the entire population so that attitudes, qualities of character and sense of responsibility of the citizens will be developed the enable them to perform their nationat duties and ensure emergence of a broad outlook. (দেশের সমগ্র জনগণের জন্য একটি ব্যাপক সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা করা যা সকল নাগরিকের মনোভাব, চারিত্রিক গুণাবলি ও দায়িত্ববোধ এমনভাবে গড়ে তুলবে যাতে তারা জাতীয় কর্তব্য সম্পন্ন করতে পারে এবং তাদের মধ্যে উদার দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোষ ঘটে।)

১. The stimulation of a national renaissancc through the development of the ability to appreciate the social and cultural achievements of one's country and a readiness to serve the nation to the best of ones ability with a sense of patriotism and understanding of true human values. (জাতীয় পুনরুজ্জীবনের জন্য উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যাতে যে কেউ দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কৃতিত্বকে সমাদর করার মত দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধের সঠিক উপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির সেবায় প্রস্তুত থাকতে পারে।)

২. An increase in the productive, vocational and technical skill and efficiency of the students so that may exploit the resources of the country and work for national prosperity through agriculture, industry and commerce. (শিক্ষার্থীদের উৎপাদনশীল, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি নৈপুণ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে

তারা দেশের সম্পদ কাজে লাগাতে পারে এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতির লক্ষ্যে কাজ করতে পারে।)

**নৈতিকতা ও মূল্যবোধ**

National Education Policy Framework 2020–2030 অনুযায়ী, `Moral and Ethical Education' একটি মূল স্তম্ভ। পাঠ্যবইয়ে ধর্মীয় সহনশীলতা, সামাজিক দায়িত্ব, এবং মানবিক মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

**স্তরবিন্যাস**

- Primary Education: Grade 1–5
- Junior Secondary: Grade 6–9
- Senior Secondary: Grade 10–11
- Advanced Level: Grade 12–13

**সিঙ্গাপুরের শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা**

সিঙ্গাপুরে Character and Citizenship Education (CCE) বাধ্যতামূলক। পাঠ্যক্রমে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ, সহানুভূতি ও জাতীয় পরিচয় গঠনের উপর জোর দেওয়া হয়।

**স্তরবিন্যাস**

- Primary Education: Primary 1–6
- Secondary Education: Secondary 1–4/5
- Post-Secondary: Junior College/Polytechnic

**গণচীনের শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা**

প্রাচীনকাল থেকেই চীনে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলন ছিল। সরকারি কাজের জন্য দক্ষ ও শিক্ষিত কর্মচারির তৈরি ছিল শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। উনিশ শতক হতে চীনে আধুনিক শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়।[১৩] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে মাও সেতুং-এর নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় এসে শিক্ষাকে বাস্তবমুখী করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৫৪ সালের সংবিধান নতুন চীনের শিক্ষার নিম্নোক্ত দুই প্রধান উদ্দেশ্য ঘোষণা করে,

১৩ *Educational Patterns in Conteporary Societies*, pp. 237-274

১. চীনের শিক্ষার মূল লক্ষ্য প্রতি ব্যক্তিকে নৈতিকবোধ; বুদ্ধিমত্তা ও শারীরিক গুণ বিকাশ সাধন করে তাকে সংস্কৃতিবান ও গণতান্ত্রিক মনোভাবপন্ন কর্মীরূপে প্রস্তুতি দান করবে।

২. মার্কস, লেলিন ও মাও-এর মতে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য পুঁথিগত বিদ্যা বা বিদ্যালয়ের শিক্ষাই পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং নতুন সমাজে তাত্ত্বিক শিক্ষার সঙ্গে হাতে-কলমে কাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে হবে।[১৪]

চীনের প্রতিটি ব্যক্তির সার্বিক বিকাশের জন্য বুদ্ধিমত্তা, নৈতিকবোধ, শারীরিক গুণ বিকাশের সুযোগ রয়েছে। তাদের সংস্কৃতিমনা গণতান্ত্রিক কর্মী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এবং জীবন ও বাস্তবতার সাথে শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে হাতে কলমে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে নানান সংস্কারের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন, ব্যবহারিক শিক্ষার প্রাধান্য দান, খন্ডকালীন ও অবসরকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্যে ১৯৪৯ সালে গণচীন স্বাধীন দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের ফলে তদানীন্তনকালে গণচীনের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর রাশিয়ার যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এমনকি দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে রাশিয়ান ভাষা প্রবর্তন করা হয়। ১৯৫০ সালের পর থেকে সোভিয়েত শিক্ষা ব্যবস্থার ধারা পরিহার করা শুরু হয়। ১৯৫৯ সালে গ্রেটলিপ ফরোয়ার্ড আন্দোলনের সময় থেকে শিক্ষাব্যবস্থায় কায়িক শ্রম প্রবর্তন করা হয়। ১৯৬০ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা অব্যবস্থা দেখা যায়। এই অব্যবস্থা দূর করে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সীমা পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সকল স্কুল ও বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৬৭ সালে কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় খোলা হয়। এর পর ১৯৭০ দশকে শিক্ষা বিপ্লবের ফলে অবসরকালীন ও স্বল্পমেয়াদী বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য বেশ কতকগুলি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

**উন্নত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন**

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থার দক্ষতা মূল্যায়নে দেখা যায় এসব দেশ অভ্যন্তরীণ দক্ষতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যেমন সচেতনভাবে এগিয়ে চলছে তেমনি বহিঃস্থ মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও তারা ১০০% সফল। যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান এসব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দক্ষতা মূল্যায়ন করলে দেখা যায় আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এদের অপচয় নেই। অর্থাৎ যতজন শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় ঠিক ততজনই নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সব অপচয় রোধ করে। কোন শিক্ষার্থী বিদ্যালয় ত্যাগ না করেই সেই ধরনের ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান এবং কর্মদক্ষতার দ্বারা বিদ্যালয়ের সময়সীমা অতিক্রম করানো হয়। এসব দেশে আভ্যন্তরীণ

১৪ *Educationa in Communist China*, p. 28

দক্ষতা মূল্যায়ন পুরোপুরি অর্জিত হয়। বহিঃস্থ মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এসব দেশ সমান সফলতায় স্বাক্ষর রাখছে। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা শেষ করে শিক্ষার্থীরা আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে বা কাজে নিয়োজিত হয়। পেশাগত শিক্ষা শেষ করে পেশায় নিয়োগ পায়। কেউ বেকার বসে থাকে না। সে যা শিখেছে তা বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোন কাজ না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সরকার তার ব্যবস্থা করবে। এসব দেশের ছেলে-মেয়েরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষাকে কাজে লাগাতে পারে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দক্ষতা মূল্যায়ন করতে গিয়ে দেখা যায় গোটা শিক্ষাব্যবস্থারই কোন দক্ষতা নেই। সেটা আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই হোক বহিঃস্থ ক্ষেত্রেই হোক। সবদিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় অপচয়ই বেশী। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অপচয় হচ্ছে। কারণ –

১) অধিকাংশ অভিভাবকই জানে না কেন তার সন্তানকে লেখাপড়া শেখাতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করলে তার এবং দেশের জন্য সেটা কতটা মঙ্গলজনক হবে।

২) আবার অনেকের সদিচ্ছা থাকলেও অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারণে সন্তানকে লেখাপড়া শেখাতে পারে না।

৩) প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে শুরু করে উচ্চ শিক্ষাস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষকের অযোগ্যতা, অদক্ষতার কারণে অনেক শিক্ষার্থী তার শিক্ষাজীবন শেষ করতে পারে না।

৪) শিক্ষায় প্রতিটি পর্যায়ে রয়েছে আবার পাশ ফেলের হিসাব। যারা ফেল করে তারা আর উৎসাহ পায় না। ফলে ঝরে পড়ার হার দিন দিন বাড়ছে।

বহিঃস্থ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যারা পাশ করে বের হয় তারা বেশির ভাগই সম্মানযোগ্য কাজ পায় না। পেশাগত জীবনে তারা শিক্ষাকে কাজে লাগাতে পারে না। ব্যাপকহারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সরকার করতে পারছে না। প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে শিক্ষিত বেকার তৈরি হচ্ছে। সরকারও এসব বেকারদের জন্য কোন ভাতা বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে না।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে, যা তাদের শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শিশুদের প্রস্তুত করে তুলছে। ফিনল্যান্ড, জাপান ও সুইডেনের মতো দেশগুলো শিক্ষার ক্ষেত্রে চমকপ্রদ উদাহরণ হিসেবে সামনে চলে এসেছে। ফিনল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশ্বের অন্যতম সেরা শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। কারণ এখানে শিশুদের নৈতিক শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে শিশুদের স্বাধীন চিন্তা করতে এবং সৃজনশীল হতে উৎসাহিত করা হয়। সেখানে শিক্ষাব্যবস্থা শিশুর ওপর পরীক্ষার চাপ কমিয়ে প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। ফিনল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শিশুরা শ্রেণিকক্ষের বাইরে প্রকৃতির সান্নিধ্যে শিখতে পারে।

মোটকথা পৃথিবীর সর্বত্রই পাঠ্যপুস্তককে শিক্ষার্থীদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভ্যাস-একথায় নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রয়াস থাকে। শিক্ষাদর্শন ও পাঠ্যপুস্তকে দেশের ঐতিহ্য, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা দেশের ভবিষ্যত নাগরিকদের চরিত্র গঠন সম্বন্ধীয় বিষয়াবলী থাকে। কোনো একটি সমাজ বা জাতিকে জানার অন্যতম প্রকৃষ্ট পন্থা হলো সে অঞ্চলের পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা। কারণ পাঠ্যপুস্তকে থাকে জাতির আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন সংক্রান্ত রচনাবলী। নৈতিক ও মানবিক সমাজ বির্নিমাণে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষা ও চর্চার বিকল্প নেই। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের দায় রয়েছে তাঁর নাগরিককে নৈতিক ও মানবিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে। রাষ্ট্রগুলো তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী নাগরিকদের জন্য শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং করছে দেশে দেশে। বাংলাদেশেও নাগরিকদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তাই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটি নৈতিক ও মানবিক সমাজ বির্নিমাণের ও শিক্ষা কারিকুলামে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা সময়ের দাবী।

# সপ্তম অধ্যায়

## ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়ন : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমস্যা ও করণীয়

# সপ্তম অধ্যায়

## ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়ন : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমস্যা ও করণীয়

ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা একটি জাতির মূল্যবোধ, আচরণ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় নীতির অন্তর্ভুক্তি এবং মানবীয় মূল্যবোধের প্রসার একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রয়েছে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ। এই অধ্যায়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা এবং সম্ভাব্য সমাধানপন্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় পরিচয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ বাহক। স্বাধীনতার পর থেকেই শিক্ষানীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল এমন এক মানবসম্পদ তৈরি করা, যারা শুধুমাত্র জ্ঞান ও দক্ষতায় নয়, বরং নৈতিকতা, মানবিকতা, সহনশীলতা, সামাজিক সংহতি এবং ধর্মীয় মূল্যবোধে সুসংহত হবে। বাস্তবে দেখা যায়–জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৭২ ব্যতীত ১৯৭৯, ১৯৮৮, ২০০৩, ২০১০ প্রণীত বিভিন্ন শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা, সীমাবদ্ধতা এবং কাঠামোগত দুর্বলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি বহু-ধর্ম ও বহু-সংস্কৃতির দেশ–এখানে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা একই জাতীয় শিক্ষা কাঠামোর আওতায় শিক্ষা গ্রহণ করে। ফলে ধর্মীয় শিক্ষার পাঠ্যক্রম, শিক্ষক প্রস্তুতি, শিক্ষার পদ্ধতি ও নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা–সবকিছুতেই থাকতে হয় সামগ্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু বাস্তবতার সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হলেও, তা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। সমসাময়িক সামাজিক বাস্তবতা যেমন–সহিংসতা, সাইবার অপরাধ, জেন্ডার বৈষম্য, দুর্নীতি, অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি আমাদের ইঙ্গিত দেয় যে নৈতিক শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত প্রভাব এখনও প্রত্যাশিত নয়।

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের সামগ্রিক চিত্র আলোচনা করে প্রথমে সমস্যার ক্ষেত্রসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এরপর নীতিগত, প্রাতিষ্ঠানিক, পাঠ্যক্রমগত, শিক্ষণ-পদ্ধতিগত ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট করণীয় তুলে ধরা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো–এমন সমন্বিত দিকনির্দেশনা তৈরি করা যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার বাস্তবায়নকে আরও কার্যকর এবং টেকসই করতে পারে।

ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধের বিস্তার বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। অধিকাংশ শিক্ষার্থীই পরিবার, সমাজ ও বিদ্যালয়–এই তিন স্তরে ধর্মীয় ও নৈতিক চর্চার মধ্যে বেড়ে ওঠে। তবে জাতীয় শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রমে নির্ধারিত মূল্যবোধ কাঠামো শিক্ষার্থীর জীবনে কতটা কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, তা একটি মৌলিক প্রশ্ন।

বাংলাদেশে বর্তমানে তিন ধরনের শিক্ষা কাঠামো প্রচলিত–

১. সাধারণ শিক্ষা (General Education)

২. মাদরাসা শিক্ষা (Madrasa Education)

৩. প্রাথমিক ধর্মশিক্ষা ভিত্তিক শিক্ষা (Religious Instruction in Schools)

এর প্রত্যেকটি কাঠামোতেই ধর্মীয় শিক্ষা একটি স্বীকৃত উপাদান। তবে নৈতিক শিক্ষাকে কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তা কাঠামো ভেদে ভিন্ন। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমেই দেওয়া হয়; মাদরাসা শিক্ষায় ধর্মীয় জ্ঞানকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই জটিল কাঠামো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি করে। একদিকে ধর্মীয় শিক্ষা যথেষ্ট হলেও নৈতিক শিক্ষার অনুশীলন দুর্বল; অন্যদিকে আধুনিক নৈতিকতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার শিক্ষা পাঠ্যক্রমে থাকলেও তার অনুশীলনে কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে।

**ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার তাত্ত্বিক ভিত্তি**

নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু ব্যক্তিকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা নয়; বরং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র–এই তিন স্তরে স্থিতিশীল মূল্যবোধ কাঠামো তৈরি করা। তাত্ত্বিকভাবে নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি কয়েকটি আন্তর্জাতিক ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ–

**সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব** (Social Contract Theory)

এই তত্ত্ব অনুসারে নাগরিক সমাজ টিকে থাকে যখন প্রত্যেক ব্যক্তি কিছু মৌলিক দায়িত্ব পালন করে। নৈতিক শিক্ষা এই দায়িত্ববোধকে বিকশিত করে। বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতেও নাগরিকত্বচেতনা, ন্যায়বোধ ও দায়িত্ববোধ তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

**মানবিকতাবাদ** (Humanism)

মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। ধর্মীয় শিক্ষা ব্যক্তির আধ্যাত্মিক দিককে উন্নত করে, কিন্তু মানবিক শিক্ষা সার্বজনীন নৈতিক চেতনা সৃষ্টি করে–সকলের প্রতি সম্মান, সহনশীলতা, শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলে।

**মূল্যবোধ শিক্ষা** (Values Education)

এটি আধুনিক বিশ্বের নৈতিক শিক্ষার প্রধান কাঠামো। এর লক্ষ্য–

- ব্যক্তিগত মূল্যবোধ
- সামাজিক মূল্যবোধ
- নাগরিক মূল্যবোধ
- মানবাধিকার-ভিত্তিক নৈতিকতা

নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে সাধারণত এই তিনটি বিষয়কে অনুসরণ করা হয়। সকল ধর্মের নৈতিক শিক্ষায় কিছু সাধারণ বিষয় রয়েছে–সত্য, সততা, ন্যায়, করুণা, দানশীলতা ও অপরের প্রতি সহমর্মিতা। পাঠ্যক্রমে যখন ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ নৈতিকতা যুক্ত হয়, তখন তা একটি ভারসাম্যপূর্ণ নীতিকাঠামো গঠন করে–যা বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতির মূল দর্শন।

**বাংলাদেশে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য**

বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০), প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলাম (২০১৩ ও ২০২১), মাধ্যমিক শিক্ষা কারিকুলাম (২০১৭) বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি অভিন্ন লক্ষ্য পাওয়া যায়–

**চরিত্রগঠন** (Character Formation)**:** শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চরিত্রকে এমনভাবে গঠন করা যাতে সে সততা, ন্যায়, দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলার চর্চা করে।

**আধ্যাত্মিক উন্নতি** (Spiritual Development)**:** ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক চেতনা বিকশিত করে। এর উদ্দেশ্য নৈতিকতার মূলে থাকা আধ্যাত্মিক বোধ তৈরি করা।

**সামাজিক সম্প্রীতি ও শান্তি** (Peace & Social Harmony)**:** বহুধর্মীয় ও বহুজাতিক সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে নৈতিক শিক্ষা অপরিহার্য।

**জাতীয় পরিচয়বোধ ও নাগরিকত্বচেতনা** (National Identity & Citizenship)**:** দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সংবিধানের মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা।

**বৈশ্বিক নাগরিকত্ব ও মানবিকতা** (Global Citizenship)**:** বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে এমন শিক্ষার্থী তৈরি করা প্রয়োজন, যারা বৈশ্বিক নৈতিক কাঠামো–মানবাধিকার, সহনশীলতা, বহু সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিশ্বশান্তির প্রতি অঙ্গীকার গড়ে তোলে, যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দায়িত্বশীল বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে পরিচিত হতে সহায়তা করে।

**বাংলাদেশের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার বর্তমান কাঠামো**

বাংলাদেশে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার কাঠামো মূলত তিনস্তরে কার্যকর করা হয়। নীতিগত স্তর, পাঠ্যক্রম স্তর, এবং বাস্তবায়ন স্তর। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার

পাঠ্যক্রম (২০১৩, ২০১৭, ২০২১), মাদরাসা শিক্ষা নীতিমালা, এবং কারিগরি শিক্ষার মূল্যবোধ কাঠামো ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ভিত্তি নির্ধারণ করেছে। কিন্তু মাঠপর্যায়ে পরীক্ষামূলক বাস্তবায়নের সময় অনেক বৈপরীত্য, অসঙ্গতি ও সীমাবদ্ধতা দেখা যায়, যা শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র, আধ্যাত্মিকবোধ এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ গঠনে বাধা সৃষ্টি করে।

**প্রাথমিক স্তরে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অবস্থান**

বাংলাদেশের শিশু প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, তাই ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি এ স্তরেই গঠিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে ধর্ম এবং নৈতিকতা দুটি পৃথক অথচ পরিপূরক অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। ধর্মীয় শিক্ষার কাঠামো

- মুসলিম শিক্ষার্থীদের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা
- হিন্দু শিক্ষার্থীদের হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা
- বৌদ্ধ শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা
- খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

এগুলোর পাঠ্যবই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রস্তুত করে। ধর্মীয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য–শিশুকে ধর্মের আধ্যাত্মিকতা, ন্যায়নীতি, মানবিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচয় করানো।

**নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি**

পাঠ্যসূচিতে নৈতিক শিক্ষা নামে আলাদা কোনো বই নেই। নৈতিক বিষয়গুলো সংযুক্ত হয়েছে–বাংলা, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, পৌরনীতি ও নাগরিকতা, সাধারণ জ্ঞান, চারুপাঠ সহ অন্যান্য পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে সততা, শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ, সহযোগিতা, সামাজিক সম্প্রীতি, মানবিকতা–এসব গুণাবলি নানাভাবে পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত হয়েছে।

**প্রাথমিক স্তরে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সমস্যাবলী**

- শিক্ষকরা অনেক সময় নৈতিক বার্তার ব্যাখ্যা দেন না; শিশুরা মুখস্থ করে।
- ধর্মীয় শিক্ষা সপ্তাহে ১/২ পিরিয়ড থাকায় শিক্ষার্থীর শিক্ষণ কম হয়।
- অনেক স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষক নেই; ফলে প্রাথমিক শিক্ষকরা বাধ্য হয়ে ধর্মীয় ক্লাস নেন।
- পাঠ্যবইয়ের নৈতিক গল্প থাকলেও অনুশীলন নেই–স্কুলের আচরণ, শৃঙ্খলা, পরিবেশ নৈতিকতার অনুকূল নয়।
- শিশুদের পারিবারিক পরিবেশ অনেকাংশেই শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই আচরণগত সামঞ্জস্যহীনতা তৈরি হয়।

**মাধ্যমিক স্তরে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অবস্থান**

মাধ্যমিক স্তর (৬-১০ শ্রেণি) শিক্ষার্থীর পূর্ণাঙ্গ নৈতিক আচরণ গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলেও নৈতিক শিক্ষা আলাদা বিষয় হিসেবে নেই; বরং তা সমন্বিতভাবে বিভিন্ন বিষয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

**ধর্মীয় শিক্ষার কাঠামো**

৬-১০ শ্রেণির প্রতিটি শ্রেণিতে ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক। পাঠ্যবইয়ে ধর্মীয় মতবাদের পাশাপাশি নৈতিক উপদেশ, সামাজিক সম্প্রীতি, মানবিকতা, দেশপ্রেমের পাঠ রয়েছে।

**সাধারণ নৈতিক শিক্ষা**

বিষয়গুলোর মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়–বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, পৌরনীতি ও নাগরিকতা, ইতিহাস, বাংলা সাহিত্য ও পরিবেশবিজ্ঞান

**মাঠপর্যায়ের সমস্যা**

- অনেক ক্ষেত্রেই পাঠ্যবই বোঝার কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে লেখা হয়নি। এতে মূল্যবোধ ব্যাখ্যার অভাব পরিলক্ষিত হয়।
- শিক্ষকের নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার সক্ষমতা কম; বেশিরভাগের কোনো প্রশিক্ষণ নেই।
- মূল্যবোধমূলক আলোচনার পরিবর্তে শিক্ষকরা শুধু বই পড়ান।
- পরীক্ষাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা মূল্যবোধ শিক্ষাকে উপেক্ষা করে।

**মাদরাসা শিক্ষায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অবস্থান**

বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষা হলো ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রধান উৎস। এটি দুটি ধারায় বিভক্ত–

১. কওমি মাদ্‌রাসা

২. আলিয়া মাদ্‌রাসা

**আলিয়া মাদ্‌রাসা:** সরকার অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত। এসব মাদ্‌রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ইতিহাস, আখলাক, শরিয়াহ ও দর্শনের মাধ্যমে নৈতিকতা গঠনের চেষ্টা করা হয়।

**বাস্তবায়নগত সমস্যা**

- পাঠ্যপুস্তকে নৈতিক মূল্যবোধ (citizenship, human rights) অন্তর্ভুক্তির ঘাটতি রয়েছে।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব

**কওমি শিক্ষা**

কওমি মাদরাসা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র; তবে

- সাধারণত ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।
- পাঠ্যক্রম আধুনিক সমাজ-রাষ্ট্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।
- জ্ঞান-মানসিকতায় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় না।

**ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের করণীয় (সুপারিশসহ)**

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কার্যকর করতে হলে শিক্ষানীতি, পাঠ্যক্রম, শিক্ষক, প্রতিষ্ঠানিক পরিবেশ, সমাজ ও প্রশাসনিক–সব স্তরে সুসমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন। নিচে সুপারিশসহ করণীয় উপস্থাপন করা হলো।

**(ক) ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার জন্য পৃথক জাতীয় কাঠামো তৈরি**

একটি সমন্বিত National Framework for Religious and Moral Education প্রণয়ন করা জরুরি।

**সুপারিশঃ** জাতীয় শিক্ষাক্রম বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ও ধর্মীয় গবেষকরা যৌথভাবে এই কাঠামো তৈরি করবেন।

**(খ) সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় শক্তিশালীকরণ**

- দুই ধারার মধ্যে পাঠ্যক্রমগত ফাঁরাক কমাতে হবে।
- সাধারণ শিক্ষায় ও ধর্মীয় শিক্ষায় নৈতিক মূল্যবোধ বাড়ানো
- মাদ্রাসা শিক্ষায় জীবনমুখী নৈতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও বিশ্বের ধর্মবিষয়ক ধারণা যুক্ত করা
- উভয় স্তরের জন্য কিছু যৌথ নৈতিক মডিউল তৈরি করা।

**সুপারিশঃ**

দুটি ধারাকে একটি ন্যূনতম নৈতিক মানে আনতে হবে।

**(গ) নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা**

বর্তমান পাঠ্যক্রমে নৈতিকতা ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু নিজস্ব বিষয় নয়। তাই–

- নৈতিক ও চরিত্র শিক্ষা (Moral and Character Education) নামে একটি পৃথক বাধ্যতামূলক বিষয় প্রবর্তন করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকে ১ম থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত নৈতিকতার ধারণা ধারাবাহিকভাবে রাখতে হবে।

**সুপারিশঃ**

ইউনেস্কোর Life Skill and Value Education কাঠামো অনুসরণ করে বিষয়টি প্রণয়ন করা।

**পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন**

(ক) শিশু-কিশোর মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী পাঠ্যবই পুনর্লিখন

- ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়গুলোকে শিক্ষার্থীদের বয়সভিত্তিক মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী সাজাতে হবে।
- গল্প, উপকথা, বাস্তব জীবনের উদাহরণ দিতে হবে।
- নৈতিক দ্বন্দ্ব (moral dilemma) শিক্ষক-শিক্ষার্থী আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে।
- চিত্র ও কার্যক্রমভিত্তিক পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শান্তি, সহযোগিতা, সততা–এগুলোর উদাহরণসমূহ পাঠ সংশ্লিষ্ট আলোচনায় আনতে হবে।

**সুপারিশঃ**

পাঠ্যবই লেখায় ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানী ও নীতিশিক্ষার গবেষকদের পরামর্শ নিতে হবে।

**(খ) আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়া অন্তর্ভুক্ত করা**

- বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে মিল রেখে পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা যেতে পারে- অন্যান্য ধর্মের প্রতি সাম্য, শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার পাঠ।
- বিশ্বের ধর্মসমূহের ঐতিহাসিক অবদান।
- সামাজিক ঐক্য, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।
- আন্তঃধর্মীয় সংঘর্ষ প্রতিরোধমূলক শিক্ষা।

**সুপারিশঃ**

ধর্মীয় মূল্যবোধকে সংকীর্ণ নয় বরং অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপে উপস্থাপন করতে হবে।

বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল নৈতিকতা যুক্ত করা অপরিহার্য–

- অনলাইন নিরাপত্তা।
- সাইবার নীতি (cyber etiquette)।
- ভুয়া তথ্য শনাক্তকরণ।
- অনলাইন আচরণের নৈতিকতা।
- গেমিং, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার নির্দেশনা।

**সুপারিশঃ**

ক্লাস ৬-১২ শ্রেণি পর্যন্ত Digital Moral Literacy বাধ্যতামূলক করা।

**বিদ্যালয় পরিবেশ ও প্রশাসনিক সংস্কার**

**(ক) নৈতিক স্কুল পরিবেশ তৈরি**

বিদ্যালয়কে নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের কেন্দ্র হিসেবে কার্যকর করতে–

- পরস্পর শ্রদ্ধাবোধ,
- সহপাঠী সহিংসতা ও বুলিং প্রতিরোধ,
- নৈতিক আচরণভিত্তিক পুরস্কার,
- গণশিক্ষা, সামাজিক সেবা কার্যক্রম,
- পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ সংরক্ষণ, সহমর্মিতা চর্চার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

**সুপারিশঃ**

প্রতিটি স্কুলে School Ethics Committee গঠন করা যেতে পারে, যেখানে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী থাকবে।

**(খ) কাউন্সেলিং সেবা চালু করা**

মানসিক স্বাস্থ্য, নৈতিক সংকট, মূল্যবোধভিত্তিক সমস্যা সমাধানের জন্য-

- প্রতিটি স্কুলে প্রশিক্ষিত কাউন্সেলর।
- নৈতিক সংকট সমাধানের সেশন।
- কিশোর-যুবাদের জন্য বিশেষ পরামর্শ সেবা চালু করা।

**সুপারিশঃ**

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে Student Counselling Cell বাধ্যতামূলক করতে হবে।

**(গ) ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক সহশিক্ষা কার্যক্রম**

- নৈতিক বিতর্ক।
- মানবিকতা-সহমর্মিতা ক্লাব।
- আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কর্মশালা।
- পরিচ্ছন্নতা অভিযান।
- সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ।

**সুপারিশঃ**

এসব কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণকে বার্ষিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

**পরিবার ও সমাজের সঙ্গে সমন্বয়**

**(ক) পরিবারভিত্তিক নৈতিক শিক্ষার দিকনির্দেশনা**

পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের জন্য–

- নৈতিক শিক্ষা নির্দেশিকা বই।
- অভিভাবক ওয়ার্কশপ।
- দায়িত্বশীল ডিজিটাল ব্যবহার প্রশিক্ষণ।
- পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষা।
- অভিভাবকদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
- মিডিয়া, সামাজিক সংগঠন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার সহায়ক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

**সুপারিশঃ**

স্কুলে Parent Orientation on Moral Education চালু করা।

**(খ) সমাজে নৈতিক পরিবেশ নির্মাণ**

- স্থানীয় ধর্মীয় নেতা, শিক্ষক ও সমাজকর্মীদের সমন্বয়।
- সামাজিক অনুষ্ঠানে নৈতিক মূল্যবোধ প্রচার।
- শিশুবান্ধব ও সহিংসতামুক্ত সমাজ গঠন।
- ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও বিভাজন নিরসন।

**সুপারিশঃ**

উপজেলা পর্যায়ে Moral and Social Harmony Committee গঠন করতে হবে।

**মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন**

**(ক) আচরণভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু**

লিখিত পরীক্ষা নৈতিকতার আসল পরিমাপক নয়। তাই–

- প্রশিক্ষকের মূল্যায়ন।
- সহপাঠী মূল্যায়ন।
- প্রকল্পভিত্তিক মূল্যায়ন।
- সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে মূল্যায়ন
- নৈতিক আচরণের ডায়েরি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা নেয়া।

**সুপারিশঃ**

প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য একটি Ethical Progress Portfolio রাখা।

**(খ) গুণগত গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা**

- বিদ্যালয়গুলোর নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ফলোআপ।
- স্বাধীন গবেষণা সংস্থার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ।
- শিক্ষা অধিদপ্তরের মনিটরিং।
- নিয়মিত আপডেট করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন।

**সুপারিশঃ**

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে Moral Education Research Cell প্রতিষ্ঠা করা।

**ডিজিটাল যুগোপযোগী নৈতিক শিক্ষা**

**(ক) সাইবার নৈতিকতার পাঠ্যক্রম বাধ্যতামূলক করা**

- অনলাইন নিরাপত্তা।
- ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা।
- নৈতিক যোগাযোগ।
- অনলাইন প্রতারণা প্রতিরোধ।
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক ব্যবহার।

**(খ) শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ নিশ্চিত করা**

- নিরাপদ ইন্টারনেট সফটওয়্যার।
- শিক্ষকদের ডিজিটাল নৈতিকতা প্রশিক্ষণ।

**সুপারিশঃ**

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC), ICT Division ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় যৌথভাবে Digital Moral Awareness Programme চালু করতে পারে।

**প্রশাসনিক সংস্কার**

**(ক) দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অনিয়ম কমানো**

প্রশাসনিক স্তরে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা হলে তা শিক্ষা ব্যবস্থায়ও প্রভাব ফেলবে। এর জন্য প্রয়োজন-

- স্বচ্ছ নিয়োগ।
- শুদ্ধাচার নীতির কঠোর বাস্তবায়ন।
- শৃঙ্খলা তদারকি।
- সুশাসনের নীতিমালা।

**সুপারিশঃ**

শিক্ষা ব্যবস্থায় Integrity and Ethics Policy প্রণয়ন।

**(খ) শান্তিপূর্ণ ও সহনশীল রাজনৈতিক পরিবেশ**

- শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার না করা।
- শিক্ষাঙ্গনে সহিংসতা রোধ।

**বাস্তবায়নের সমস্যা**

**১. পাঠ্যবইয়ের সীমাবদ্ধতা**

- ধর্মীয় শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যবইগুলোতে অনেক সময় একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়, যা ধর্মীয় সহনশীলতা বাধাগ্রস্ত করে।
- নৈতিক মূল্যবোধের উপস্থাপন অনেক ক্ষেত্রে সাধারণীকৃত ও বিমূর্ত, যা শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগে দুর্বলতা সৃষ্টি করে।

**২. শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব**

- ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা সীমিত।
- অনেক শিক্ষক ধর্মীয় বিষয় পড়াতে গিয়ে নিজস্ব মতবাদ বা পক্ষপাত প্রকাশ করেন, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

**৩. ধর্মীয় বিভাজন ও সাম্প্রদায়িক প্রভাব**

- পাঠ্যবই ও শ্রেণিকক্ষে ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োগে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি কখনো কখনো প্রবেশ করে, যা সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা নষ্ট করে।
- সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা অনেক সময় বঞ্চিত বা উপেক্ষিত বোধ করে।

**৪. প্রশাসনিক ও নীতিগত দুর্বলতা**

- শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব থাকলেও বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট, পরিকল্পনা ও মনিটরিং ব্যবস্থা নেই।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনতা ও মানদণ্ড একরকম নয়, ফলে বাস্তবায়নে বৈষম্য দেখা যায়।

**৫. সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাব**

- অনেক অভিভাবক ধর্মীয় শিক্ষাকে শুধু ধর্মীয় আচরণ শেখার মাধ্যম হিসেবে দেখেন, নৈতিক বিকাশের দিকটি উপেক্ষিত হয়।
- মিডিয়া ও প্রযুক্তির প্রভাব শিক্ষার্থীদের নৈতিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

**৬. শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য, পদোন্নোতি ও সামাজিক মর্যাদা না থাকায় বিরুপ প্রভাব**

- শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য, নিয়মিত পদোন্নোতি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা না থাকায় অধিকাংশ শিক্ষকগণই হীনমন্যতায় ভোগেন। অনেক শিক্ষকগণই কাঙ্খিত পেশায় যেতে না পেরে শিক্ষকতার পেশায় আসেন। শিক্ষকতার পেশায় এসে মানসিকভাবে খাপ খাওয়াতে না পেরে অনেকক্ষেত্রেই একনিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালন করছেন না। এতে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

**পাঠ্যবই পুনর্মূল্যায়ন ও উন্নয়ন**

- ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার পাঠ্যবইগুলো সাম্প্রদায়িকতামুক্ত, সহনশীলতা ভিত্তিক ও বাস্তব জীবনের উপযোগী করে তৈরি করতে হবে।
- সকল ধর্মের মৌলিক নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে।

**শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা**

- ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করতে হবে, যাতে শিক্ষকরা নিরপেক্ষ ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেন।
- মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি (value-based pedagogy) প্রয়োগ করতে হবে, যেখানে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে শেখে।
- ধর্মীয় শিক্ষকদের জন্য পৃথক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা এবং সকল শিক্ষককে বছরে অন্তত একবার নৈতিক শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা।
- NCTB ও NAPE-এর মাধ্যমে নৈতিক ও মূল্যবোধ শিক্ষা বাধ্যতামূলক মডিউল তৈরি করা।

**ধর্মীয় সংলাপ ও সহনশীলতা চর্চা**

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় আয়োজন করতে হবে।
- ধর্মীয় উৎসব ও ঐতিহ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানানো এবং সম্মান প্রদর্শনের চর্চা গড়ে তুলতে হবে।

**প্রশাসনিক উদ্যোগ ও নীতিগত সমন্বয়**

- জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়নে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার জন্য আলাদা বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে।

## সুপারিশমালা

- প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করতে হবে। বিশেষত প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তরের সরকারী, বে-সরকারী সকল পর্যায়ে কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তকে ইসলামী মূল্যবোধ পরিপন্থী উপাদান চিহ্নিত করে তা অপসারণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ইসলামের মৌলিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাবিদ সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী শিক্ষা কমিশন গঠন করে দেশে একটি সুসমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে।
- সকল মুসলমানের জন্য আরবী ভাষা বিশেষত পবিত্র কুরআন ও প্রয়োজনীয় হাদীস শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- শিক্ষানীতি যেন ইসলামী তাহজিব-তমদ্দুন ধারণ করে রচিত ও বাস্তবায়িত হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।
- সাধারণ শিক্ষায় ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে এসব আলোচনায় বিষয়ভিত্তিক কুরআনের আয়াত ও হাদিস সংযুক্ত করা উচিত। এতে শিক্ষার্থীরা একই সাথে কুরআন ও হাদিসের দলিলভিত্তিক আলোচনার সাথে পরিচিত হবে। ফলে যেকোন ইসলামি বিষয়ের আলোচনায় কুরআন ও হাদিসের প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করতে পারবে।
- মানুষের অধিকারসমূহ শ্রেণি উপযোগী একটি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা প্রয়োজন ছিল। যেখানে বান্দার হক, যেমন-পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অসহায়, মালিক-শ্রমিক সম্পর্কসহ সাধারণ মানুষের অধিকারসমূহ নিয়ে কুরআন ও হাদিসের তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা প্রয়োজন।

- বিদ্যমান নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় একদিনে সৃষ্টি হয়নি। তাই এ থেকে অল্প সময়ের ব্যবধানে মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। নৈতিক প্রগতি ও সচ্ছতায় উত্তরণের জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী, শক্তিশালী ও সুপরিকল্পিত সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। আর এই উদ্যোগের প্রথম হাতিয়ার হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন। কারিকুলামে নৈতিক শিক্ষা এমনভাবে ঢেলে সাজানো উচিত যেন একজন শিক্ষার্থী সচেতনভাবে সঠিক নৈতিকতা অর্জনে সচেষ্ট হয়।
- আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে শিক্ষাথীদের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক পূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সংযোজন করতে হবে।
- শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মচেতনা, আত্মোপলব্ধি, বিবেকবোধ, আত্মসম্মানবোধ ও বলিষ্ঠ নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সংযোজন করতে হবে।
- পরকালীন জীবনের প্রতি শিক্ষার্থীদের বিশ্বাসী করে গড়ে তোলা এবং পরকালের সফলতা ও ব্যর্থতাকে প্রকৃত সফলতা ও ব্যর্থতা হিসেবে গ্রহণ করার উপযোগী বিষয়বস্তু পাঠ্যবিষয়ে গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা।
- শুধু শিক্ষা দ্বারা মানুষের চরিত্র সংশোধিত হয় না। শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব জীবনে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ে ''সততা স্টোর'' এর পাশাপাশি সালাতের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ, যথাসময়ে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করা, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক আচরণ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- বিদ্যালয়ে দৈনন্দিন ক্লাস রুটিনে সাপ্তাহিক কেবল ২টি পিরিয়ডে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠদান করা হয়। এই পিরিয়ডগুলোতে ইসলামি শিক্ষা পেলেও বাকী পিরিয়ডগুলোতে যা শিক্ষা দেওয়া হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা পরস্পর বিরোধী শিক্ষা। তাই শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামাইজেশন জরুরি হয়ে পেড়েছে। শতভাগ ইসলামাইজেশন করা সম্ভব না হলেও অন্যান্য পাঠ্যবিষয়গুলোতে ইসলামি উপাদান বাড়ানো ও ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়বস্তুগুলো বাদ দেওয়া উচিত।
- বিদ্যালয়ে মুসলিম শিক্ষার্থীদের ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ অনুশীলন করে শিখানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার্থীরাও যেন তাদের ধর্মীয় আচার অনুশীলন করতে পারে সে সুযোগ রাখতে হবে।
- বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সন্তানদের প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে।

- বিদ্যালয়ে এমন কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা উচিত যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞান ও বিশ্বাসের যথার্থ প্রয়োগ করার সুযোগ পায়।
- বিদ্যালয়ে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে ধর্মীয় মৌলিক নীতিগুলো প্রয়োগ করতে পারে সে বিষয়টি শিক্ষকদের তদারকি করতে হবে।
- শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের দৈনন্দিন আচরণ সম্পাদনের ক্ষেত্রে অর্জিত ইসলামি জ্ঞান ও বিশ্বাসের পূর্ণ অনুশীলন করার সুযোগ পায় অভিভাবকগণ সে বিষয়ে শিক্ষকের পরামর্শে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।
- সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে এতটা পরিমাণ আরবি ভাষা শিক্ষা রাখা আবশ্যক যেন শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে কুরআন পড়তে পারে ও অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়।
- প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে ইসলামি সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। যেন শিশুরা মুসলিমদের নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে পারে ও তা অনুশীলনে সচেষ্ট হয়।
- পাঠ্যক্রমে মানুষের মন্দ আচরণের (মিথ্যা, ধোঁকাবাজী, ঘুষ, দুর্নীতি, হারাম উপার্জন, প্রতারণা, খাদ্যে ভেজাল, চুরি, নকল, ওয়াদা খেলাফ, অপচয়, মানুষের হক নষ্ট করা ইত্যাদি) বিষয়ভিত্তিক কঠোর সমালোচনা করে এর পরিণতি উল্লেখ করতে হবে যাতে শিশু শিক্ষার্থীদের মনে এসব বিষয় সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি হয়।
- পাঠ্যক্রমে মানুষের ভালো আচরণের (সত্য বলা, ধোঁকাবাজী না করা, হালাল উপার্জন, অপচয় না করা, প্রতারণা না করা, ঘুষ ও দুর্নীতি মুক্ত থাকা, ওয়াদা পালন করা, মানুষের হক নষ্ট না করা ইত্যাদি) বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করে এসবের সুফল উল্লেখ করতে হবে যাতে শিশু শিক্ষার্থীদের মনে এসব গুণ অর্জনের বিষয়ে তীব্র আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়।
- ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার প্রধান বাহন হলো আরবি ভাষা। আমাদের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিতে প্রাথমিক আরবি শিক্ষা সংযুক্ত করা উচিত। কেননা আরবি ভাষা ন্যূনতম না বুঝলে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হবে বলে মনে হয় না।
- ''ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা'' পাঠ্যবইয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে অমুসলিম নাগরিকগণ যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে সে সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা জরুরি। এ বিষয়টি আলোচনা করা হলে ইসলামে অমুসলিমদের যেসকল অধিকার স্বীকৃত সে সম্পর্কে শিশু শিক্ষার্থীরা ধারণা লাভ করবে।

- বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংস্কৃতির ইভেন্ট বাড়াতে হবে। যেমন- হামদ, নাত, গজল, ইসলামি সংগীত, ক্বিরাত ও আযান ইত্যাদি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।
- বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মন-মানস, চিন্তা-চেতনা, মুসলিম ঐতিহ্য ও ধর্ম বিশ্বাসের পরিপন্থী যেসব বিষয় রয়েছে সকল পাঠ্যবিষয়ের পাঠ্যপুস্তক থেকে এসব নেতিবাচক আলোচনা বাদ দিতে হবে। অন্যথায় ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।
- শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকে শিশু মনে ইসলামি চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা জন্মানোর সকল আয়োজন থাকতে হবে।
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ বিশেষ স্থাপনার গায়ে পুষ্পমাল্য প্রদান, নিরবতা পালন, শ্রদ্ধা প্রদর্শন ইত্যাদি করা হয় যা সুস্পষ্ট শিরক। ''ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা'' বইয়ে এসব শিরক এর ভয়বহতা তুলে ধরে বাস্তব জীবনে তা থেকে বেঁচে থাকার অনুশীলন করাতে হবে।
- শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় সুদৃঢ় নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রাধান্য দিতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামি ভাবধারা ও নৈতিক চরিত্র সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইবাদতের স্থান বরাদ্দ করা জরুরি।
- প্রাথমিক স্তরের শুরু থেকে (১ম শ্রেণি) থেকে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রাথমিক স্তর থেকেই বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআন মুখস্তকরণ বাধ্যতামূলক পাঠ্যক্রমে যুক্ত করতে হবে।
- প্রাথমিক স্তর থেকেই বিষয়ভিত্তিক কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদিস মুখস্তকরণ বিষয়টি পাঠ্যক্রমে যুক্ত করতে হবে। যাতে শিশুকাল থেকেই শিক্ষার্থীরা কুরআন ও হাদিসের অকাট্য দলিল উপস্থাপন করতে পারে।
- বিদ্যালয়ে প্রতি ২/৩ মাসে "অভিভাবক সমাবেশ" বা "মা সমাবেশ" অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালাতে হবে।
- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকা অনুযায়ী যথোপযুক্ত শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে যেন শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করেন সে ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে।
- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার অনুশীলন সম্পর্কে সচেতন অভিভাবকদের মতামত নিয়ে তা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ৩য় শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত একই বিষয় বারবার আলোচনা করা হয়েছে। একই বিষয় পুনরুল্লেখ না করে নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। তাহলে শিক্ষার্থীরা ইসলাম সম্পর্কে আরো জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা যখন নিজে কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন করে জানতে পারবে যে, কোন ধরনের অপরাধের শাস্তি কি এবং কি কাজের জন্য কি পুরস্কার তখন শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে তা থেকে উপকৃত হতে পারবে এবং ব্যক্তি জীবনে কুরআন ও হাদিস দ্বারা বেশি প্রভাবিত হবে। তাই মাধ্যমিক স্তরে অর্থসহ কুরআন বুঝে পড়ার জন্য শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের যথাযথ ধর্মীয় জ্ঞান প্রদান করা সম্ভব হলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামাজিক অনাচার থেকে বাঁচতে পারবে ও এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারবে।
- শিশুকাল থেকে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতি অনুরাগী করা সম্ভব হলে কুরআন ও হাদিসের আলোকে আদর্শ জীবন গঠন করার জন্য শিক্ষার্থীরা সচেষ্ট হবে।
- একজন শিক্ষার্থী যখন জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি, ইভটিজিং, যৌতুক, অপহরণ, সুদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাস, সামাজিক অনাচার, জুয়া, ছিনতাই, রাহাজানী, হত্যা ও আত্মহত্যা, মাদকাসক্তি, ধূমপান, নারী নির্যাতন ইত্যাদি সম্পর্কে সরাসরি কুরআন ও হাদিস থেকে এর ক্ষতিকর দিক, ভয়াবহ শাস্তি ও বিধান সম্পর্কে জানতে পারবে তখন কুরআন ও হাদিসের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।
- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে যদি বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদিস মুখস্তকরণ বাধ্যতামূলক করা হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের জীবনে কুরআন ও হাদিসের আমল খুব সহজে বাস্তবায়ন করা যাবে।
- আমাদের পাঠ্যক্রমে বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজিকে যেভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয় ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে আরবি ভাষা সেভাবে গুরুত্ব পেলে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে বলে মনে করি।
- বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত। কিন্তু এই দ্বিমুখী শিক্ষা জাতীয় জীবনে এক সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তাই একমুখী ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।
- ঈমান ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে চরিত্র গঠনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে প্রাথমিক শিক্ষাসহ সকল স্তরে ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে পাঠ্যক্রমে সংযুক্ত করতে হবে।

- সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতি রেখে জাতীয় শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও সে অনুযায়ী সকল স্তরের পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে পরিমার্জন করে ইসলামি ভাবধারায় রূপান্তর করতে হবে।
- বিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রের সামষ্টিক প্রত্যাশা পূরণের জন্য শিক্ষার সকল স্তরে নৈতিক শিক্ষার একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরি বলে মনে করি।
- প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ এ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- প্রাথমিক স্তরে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার শিক্ষণ ও অনুশীলন বাস্তবায়নের তদারকির জন্য আলাদা মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে।
- শিক্ষকদের সততা, দক্ষতা ও সদাচরণের সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিক্ষকের শেখানো উপদেশাবলী আচরণে প্রতিফলিত হতে হবে। শিক্ষক নিজেই যেন শিশু শিক্ষার্থীদের অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারেন।
- প্রাথমিক স্তরের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা ফলপ্রসূ করতে হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকেও ধর্মীয় শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার বাস্তবায়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি, জটিল এবং বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা কেবল পাঠ্যবই-নির্ভর কোনো জ্ঞানচর্চা নয়; বরং এটি একজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক দৃঢ়তা, মানবিকতা, মূল্যবোধ, সহনশীলতা ও জাতীয় চেতনা গঠনের ভিত্তি। কিন্তু অনুকূল নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবায়নে রয়েছে বহুমুখী প্রতিবন্ধকতা। ্যক্রমের সীমাবদ্ধতা, যোগ্য শিক্ষকের অভাব, রাজনৈতিক পরিবর্তন, ধর্মীয় বৈচিত্র্যের অসংলগ্ন সমন্বয়, পরিবার, সমাজ ও মিডিয়ার প্রভাবের অসঙ্গতি, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের দুর্বলতা এবং বাজেট সংকট এর মধ্যে অন্যতম কারণ। ধর্মীয় নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধ শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা উচিত।

নৈতিক শিক্ষা শুধু ধর্মীয় শিক্ষার সমার্থক নয়; এটি মানবজীবনের মূল চরিত্র নির্মাতা। শিক্ষার্থীর আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, সহনশীলতা, মানবিকতা, সত্যনিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতা গঠনে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সম্মিলিত ভূমিকা অপরিসীম। বাস্তবায়নগত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পিত, বিজ্ঞানসম্মত, সমন্বিত এবং যুগোপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সার্বিকভাবে বলা যায়, ধর্মীয় নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা যদি একটি জাতির শিক্ষাব্যবস্থায় গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সেটি কেবল শিক্ষার্থী নয়–পুরো সমাজকে মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক, শান্তিপূর্ণ ও অগ্রসর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

# উপসংহার

# উপসংহার

**বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয়নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধের স্বরূপ** শীর্ষক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে প্রচলিত জাতীয় শিক্ষানীতির আদর্শিক ভিত্তি, নীতিমূলক দিকনির্দেশনা, পাঠ্যক্রমের গঠন, শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, সামাজিক বাস্তবতা এবং বৈশ্বিক শিক্ষাচিন্তার আলোকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অবস্থানকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা। গবেষণার সাতটি অধ্যায় সুবিন্যস্তভাবে পর্যালোচনা করলে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয়নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধের একটি অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ, সীমাবদ্ধতা ও কাঠামোগত সমস্যাগুলোও সুস্পষ্টভাবে উঠে আসে।

গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে এই অঞ্চলের শিক্ষা প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধভিত্তিক ছিল। প্রাচীন গুরুকুল পদ্ধতি, বৌদ্ধ বিহার এবং মধ্যযুগীয় মক্তব-মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম, নৈতিকতা, কর্মশিক্ষা, শৃঙ্খলা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ ছিল শিক্ষার অন্যতম মূল উপজীব্য। ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশ শিক্ষা আধুনিকীকরণ ও জাগতিক জ্ঞানের বিস্তার ঘটালেও বাঙালির নৈতিক ও মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা দর্শনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। তাই বলা যায়–বাংলাদেশের শিক্ষাদর্শের ঐতিহাসিক রূপ ও আধুনিক রূপ পরস্পর বিরোধী নয়; বরং একটি অপরটির পরিপূরক।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলায় শিক্ষাচিন্তার ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণে দেখা যায়–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বেগম রোকেয়া, বিদ্যাসাগর, কাজী নজরুল ইসলামসহ বিশিষ্ট চিন্তকদের শিক্ষাদর্শে মানুষ গঠন, চরিত্রগঠন, মানবিকতা, সহানুভূতি ও সামাজিক ন্যায়বিচার ছিল শিক্ষা-ধারণার কেন্দ্রবিন্দু। ঐতিহাসিকভাবে বাঙালি সংস্কৃতি ধর্মীয় বৈচিত্র্য ও মানবিক মূল্যবোধের সমন্বয়ে নির্মিত। এই প্রেক্ষাপটে গবেষণাটি দেখিয়েছে যে–বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধ যোগসূত্রহীন দুটি পৃথক উপাদান নয়; বরং একই সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধারার ধারাবাহিক রূপ।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাক-স্বাধীনতা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে ধর্মীয় নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধের বিশ্লেষণে দেখা যায়–কমিশনসমূহ সাধারণত তিনটি মৌলিক লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার কাঠামো নির্মাণের পরামর্শ দেন- (১) চরিত্রগঠন, (২) নৈতিক নেতৃত্ব তৈরি ও (৩) সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা।

কমিশনগুলো ধর্মীয় শিক্ষার পরিচিত কাঠামো বজায় রাখলেও নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করেন। যেমন–ধর্মীয় শিক্ষা আলাদা বিষয় হিসেবে থাকলেও নৈতিকতাকে একীভূতভাবে শেখানোর জন্য কার্যকর পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতির অভাব ছিল স্পষ্ট। ফলে ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষা পরস্পর সংযুক্ত হওয়ার পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন রূপে থেকে গেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে স্বাধীনতা-পরবর্তী শিক্ষা কমিশন ও সরকারি শিক্ষানীতির বিশ্লেষণে দেখা যায়–১৯৭৪ সালের কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন ব্যাতীত সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় অবস্থানে রাখা হয়েছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার, শান্তি, সমতা, সততা, দায়িত্ববোধ, সামাজিক সম্প্রীতি ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন জাতীয় শিক্ষার মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। তবে শিক্ষানীতিতে যেসব মূল্যবোধ যুক্ত হয়েছে, তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বারবার ঘাটতি দেখা গেছে। শিক্ষা কমিশনগুলোর ধারাবাহিক সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় কাঠামোগত সংস্কার, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ, মূল্যায়নব্যবস্থা পর্যাপ্তভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

পঞ্চম অধ্যায়ে পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণে দেখা যায়–বাংলাদেশের জাতীয় পাঠ্যক্রমে নৈতিকতা, মানবিকতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ, দেশপ্রেম, নাগরিকত্ব শিক্ষা, সহনশীলতা ও ধর্মীয় সম্প্রীতির বহু উপাদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিশেষত প্রাথমিক পাঠ্যক্রমে নৈতিক গল্প, কবিতা, জাতীয় মূল্যবোধ, ধর্মীয় আচরণবিধি ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কিত পাঠ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো–পাঠ্যপুস্তক মুখস্থনির্ভর, শিক্ষকেরা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পান না, কার্যকর শিক্ষণপদ্ধতি প্রয়োগ হয় না, শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন মূল্যায়নের কোনও কাঠামো নেই। ফলে পাঠ্যবস্তুর উদ্দেশ্য ও বাস্তব শেখার ফলাফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান থাকে। গবেষণাটি দেখিয়েছে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক আচরণ গঠনে পাঠ্যক্রম কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নৈতিক শিক্ষা পর্যালোচনায় দেখা যায়–উন্নত দেশগুলোতে মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা আধুনিক চরিত্রগঠনের অন্যতম প্রধান কাঠামো। যেমন– যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, সিঙ্গাপুর, জাপান, দ. কোরিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে নৈতিক শিক্ষা কেবল পাঠ্যবইয়ের বিষয় নয়; বরং বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শ্রেণিকক্ষ সংস্কৃতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, স্কুল কমিউনিটি এবং পরিবার-স্কুল সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান শিক্ষা হলো–নৈতিকতা একটি বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়; বরং পুরো শিক্ষাব্যবস্থার আচরণ কাঠামোর সঙ্গে নৈতিকতা একত্রে কাজ করলে তার প্রভাব টেকসই হয়। তাই বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতেও নৈতিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণ পদ্ধতিগত কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

সপ্তম অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বিদ্যমান সমস্যা, চ্যালেঞ্জ, ও সীমাবদ্ধতাগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় করণীয় ও সুপারিশ উপস্থাপিত হয়েছে। সমস্যাগুলোর মধ্যে–

(১) শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব

(২) পাঠ্যক্রমের অসামঞ্জস্য

(৩) পরীক্ষা নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা

(৪) মূল্যায়ন কাঠামোর দুর্বলতা

(৫) পরিবারের ভূমিকার দুর্বলতা

(৬) ধর্মীয় শিক্ষা ও আধুনিক নৈতিকতার প্রয়োগে বৈজ্ঞানিক সমন্বয়ের অভাব

(৭) ডিজিটাল যুগে সামাজিক-নৈতিক বিচ্যুতি প্রভৃতি অন্যতম।

গবেষণায় প্রস্তাবিত করণীয়গুলো বিশেষত–

- শিক্ষক প্রশিক্ষণ উন্নয়ন
- পাঠ্যক্রমে নৈতিক চিন্তা ও জীবনদক্ষতা যুক্ত করা
- আচরণভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা
- পরিবার-স্কুল সমন্বিত নৈতিকতা চর্চা
- স্কুল পরিবেশে সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির চর্চা
- ধর্মীয় শিক্ষা ও বৈশ্বিক নৈতিকতার সমন্বিত সংযোগ
- ডিজিটাল নৈতিকতা ও সাইবার আচরণ শিক্ষা

এই করণীয়গুলো বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় ও মানবীয় মূল্যবোধের কার্যকর ও টেকসই ভিত্তি নির্মিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

১. ধর্মীয় শিক্ষা ও মানবীয় মূল্যবোধ–বাংলাদেশের শিক্ষাদর্শের দুটি মূল স্তম্ভ, যেগুলো ঐতিহাসিকভাবে পরস্পর সম্পূরক।

২. জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধকে শক্ত অবস্থানে রাখা হলেও বাস্তবায়ন কাঠামো দুর্বল হওয়ায়–

- পাঠ্যবই উদ্দেশ্য পূরণ করছে না
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ অপর্যাপ্ত
- শ্রেণিকক্ষে আচরণগত পরিবর্তন ঘটছে না

৩. নীতি-প্রণয়ন ও নীতি-বাস্তবায়নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়েছে, যা শিক্ষানীতির কার্যকারিতা হ্রাস করছে।

৪. বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মকে মানবিক, সহনশীল, দায়িত্বশীল ও মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান কাঠামোকে আরও কার্যকর, আধুনিক ও পদ্ধতিগতভাবে উন্নত করা প্রয়োজন।

৫. পরিবার, বিদ্যালয় সমাজ-রাষ্ট্র সমন্বিতভাবে নৈতিক শিক্ষা কাঠামোয় কাজ না করলে নৈতিকতার বিকাশ অসম্পূর্ণ থাকে।

৬. বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ–ডিজিটাল বিভ্রান্তি, সামাজিক সহিংসতা, নৈতিক বিচ্যুতি–মোকাবিলার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা নতুন আকারে যুক্ত করা অপরিহার্য।

ধর্মীয় নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধ কেবল পাঠ্যবইয়ের উপাদান নয়; বরং জাতীয় চরিত্র, সাংস্কৃতিক পরিচয় ও রাষ্ট্রগঠনের ভিত্তি। শিক্ষানীতিতে মূল্যবোধ ও ধর্মীয় শিক্ষার উপস্থিতি রয়েছে, কিন্তু বাস্তবায়ন পদ্ধতি দুর্বল। তাই ভবিষ্যতের শিক্ষাব্যবস্থায়–মানবিকতা, সহমর্মিতা, চরিত্রগঠন, নৈতিকতা ও সৎ নাগরিকত্বের মতো নৈতিক কাঠামোকে কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে শিক্ষা কাঠামোকে পুনর্গঠন করতে হবে।

বাংলাদেশে ধর্মীয় শিক্ষা ও মানবীয় মূল্যবোধকে শুধু আদর্শিকভাবে আলোচনা করলে হবে না; এগুলোকে শিক্ষাপদ্ধতির ভিত, আচরণ সংস্কৃতি এবং নাগরিকত্ব চর্চার মূল ভিত্তিতে রূপান্তর করতে হবে।

যদি জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এবং পরবর্তী কারিকুলাম সংশোধনসমূহের আলোকে ধর্মীয়নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধ বাস্তবায়নে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নৈতিক, মানবিক শান্তিকামী এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গঠন করা সম্ভব হবে। এতে শুধু শিক্ষাব্যবস্থা নয়; বরং রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন, সামাজিক সম্প্রীতি, গণতান্ত্রিক চর্চা এবং টেকসই মানবসম্পদ বিকাশের ভিত্তি আরও শক্তিশালী হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয়নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধ কেবল একটি আনুষ্ঠানিক উপাদান নয়; বরং জাতীয় পরিচয়, রাষ্ট্রচিন্তা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মৌলিক ভিত্তি। কিন্তু বাস্তবে তা ফলপ্রসূ করতে এখনও বিস্তর কাজ বাকি। বিশেষত–সময়োপযোগী নীতিমালা, দক্ষ শিক্ষক, আধুনিক পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নব্যবস্থা এবং পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের সমন্বিত প্রয়াস অপরিহার্য। এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশ বাংলাদেশে মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক ভূমিকাপালনে সক্ষম হবে–এ প্রত্যাশা।

# গ্রন্থপঞ্জি

# গ্রন্থপঞ্জি

**বাংলা গ্রন্থ**


১. আল-কুরআনুল কারীম।

২. দিজেন্দ্র নারায়ণ ঝা রচিত ও গৌরীশংকর দে অনূদিত, *আদি ভারত* (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৮ খ্রি.)।

৩. ভূতনাথ সপ্ততীর্থ অনূদিত, *মনুস্মৃতির মেধাতিথি ভাষ্য* (কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৩৬১), খ.১।

৪. বেবী দত্ত, মধুমালা সেনগুপ্ত, দেবিকা গুহ, *ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস* (কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১১ খ্রি.)।

৫. আমানুল্লাহ আহমদ, *বরেন্দ্র অঞ্চলে শিক্ষার পটভূমি*, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস রাজশাহী, ১৯৯৮খ্রি.।

৬. ভিক্ষু সনীথানন্দ, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষুজীবন* (ঢাকা: ১৯৯৫খ্রি.)।

৭. ধর্মরক্ষিত মহাথেরো, *বুদ্ধ ও মৌর্যযুগে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম* (কুমিল্লা: ১৯৮৪খ্রি.)।

৮. নীহারঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস* (আদিপর্ব) (কলকাতা: ১৯৫২খ্রি.)।

৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: ১৯৪৩খ্রি.), খ.১।

১০. সম্পাদনা পরিষদ, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯২খ্রি.), সং-২।

১১. ইউসুফ হোসেন, *মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতি*, ফারুক আহমদ অনূদিত, (ঢাকা: ১৯৬৭ খ্রি.)।

১২. আলাওল, *তোহফা*।

১৩. বিপ্রদাস পিপিলাই, মনসামঙ্গল।

১৪. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব, *ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৯খ্রি.)।

১৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬খ্রি.)।

১৬. শিবলী নু'মানী, *মাকালাত-এ-শিবলী*, খণ্ড-৩, (আযমগড়, ১৯৩২)।

১৭. আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী* (অনুবাদ, ব্লকম্যান), খ.১।

১৮. সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি, অনুবাদ, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *সিয়ারুল মুখাখ্খেরীন*, খ.২।

১৯. শামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আবদুল রহমান, *আল-সাখাবী-'আল-দাও আল-লামী'* (কায়রো, ১৩০৩ হিজরি)।

২০. গুলাম আলী আজাদ বিলগ্রামী, *'খাজিনাত-ই-আমিরাহ'* (নওল কিশোর প্রেস)।

২১. আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ওমর আল-মক্কী ওরফে হাজী দবীর, *'জাফর আল-অলি-বিন-মুজাফ্ফর অ-অলিহ' (Arabic History of Guzrati;* স্যার ডেনিসন্ রোস কর্তৃক সম্পাদিত)।

২২. জ্যোৎস্না বিকাশ চৌধুরী, *শিক্ষার ইতিহাস* (ঢাকা: ১৯৯৪খ্রি.)।

২৩. আব্দুল মোমেন চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭খ্রি.)।

২৪. ওয়াকিল আহমেদ, *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী (১৭৫৭-১৮০০)*, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রি.।

২৫. আখী সিরাজ, *'সিয়ারুল আরেফীন'।*

২৬. বাহরাম, *'লাইলী মজনু'*, ড. শরীফ সম্পাদিত (বাংলা একাডেমি, ঢাকা)।

২৭. আব্দুল কারিম, 'বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষার গোড়ার কথা, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ঢাকা, ১৯৯৪।

২৮. আব্দুল কারিম, *'বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষার গোড়ার কথা*, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ঢাকা, ১৯৯৪।

২৯. বিজয়গুপ্ত, *পদ্মপুরাণ*।

৩০. বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, খ.১, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

৩১. আব্দুল হালিম, *সয়ফুলমুল্‌ক*, পাণ্ডুলিপি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

৩২. মিনহাজ-ই-সিরাজ, *ৱাকাৎ-ই-নাসিরী*, অনুবাদ: র‍্যাভারটি।

৩৩. ড.এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২।

৩৪. হরিসাধন গোস্বামী, *ভারতের শিক্ষা ইতিহাস* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পরিষদ, ১৯৮৯ খ্রি.)।

৩৫. যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, *বর্ধমান ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, খ.৩, পৃ. ২১১

৩৬. ড. আবদুল করিম, *মক্কা শরীফে বাঙালী মাদ্‌রাসা* (চট্টগ্রাম: বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৮৭ খ্রি.)।

৩৭. এ.এন. বসু, *আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা* (কলকাতা: ১৩৫১বঙ্গাব্দ)।

৩৮. সম্পাদক, মমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশের ইতিহাস: সুলতানি ও মোগল আমল* (আনু. ১২০০-১৮০০ সাল অব্দ) (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি.), খ.২।

৩৯.'মানিকচন্দ্র রাজার গান', *বঙ্গসাহিত্য পরিচয়*, খ.১।

৪০.দীনেশচন্দ্র সেন, *ভঙ্গভাষা ও সাহিত্য*।

৪১. দ্বিজ হরিরাম, *চণ্ডীকাব্য*, টি.সি. দাসগুপ্ত (সম্পাদিত)।

৪২. ভারতচন্দ্র, *বিদ্যাসুন্দর কাব্য*।

৪৩. পরমেশ আচার্য, *বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা* (কলকাতা: অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০০৯ খ্রি.)।

৪৪. কাজী শহীদুল্লাহ, *পাঠশালা থেকে স্কুল*, আবদুল মমিন চৌধুরী অনূদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খ্রি.)।

৪৫. দৌলত উজীর বাহরাম খান, *'লায়লী মজনু'*।

৪৬. মুকুন্দরাম, *চণ্ডীমঙ্গল কাব্য*, জে.এন. দাসগুপ্ত (সম্পাদিত)।

৪৭. কৃত্তিবাস, রামায়ণ, ভূমিকা।

৪৮. মোহাম্মদ ইলিয়াছ আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ (বাংলাদেশ প্রেক্ষিত)* (ঢাকা: জাগরণী প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রি.)।

৪৯. অধ্যাপক মুহাম্মদ মোমিন উল্লাহ, *শিক্ষার ইতিহাস* (ঢাকা: এডুকেয়ার পাবলিকেশন, ১৯৮০ খ্রি.)।

৫০. রনজিৎ ঘোষ, *আধুনিক ভারতের শিক্ষার বিকাশ*।

৫১. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ* (ঢাকা: জাগরণী প্রকাশনী, ১৯৯৯খ্রি.)।

৫২. সুশীল কুমার গুপ্ত, *ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ* (কলিকাতা, ১৯৭৭খ্রি.)।

৫৩. কাজী আব্দুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* (রাজশাহী, ১৯৬১ খ্রি.), খ.১।

৫৪. যোগেশ চন্দ্র বাগল, *ডিরোজিও* (কলিকাতা, ১৯৭৬ খ্রি.)।

৫৫. মৌলভী নূর মোহাম্মদ আযমী, 'ইংরাজী শিক্ষার গোড়ার কথা', *মোহাম্মদী*, ২২শ বর্ষ, জৈষ্ঠ, ১৩৫৮।

৫৬. মোহাম্মদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা*, অনুবাদ-মুস্তফা নুরউল ইসলাম, ঢাকা, ১৯৬৯।

৫৭. স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস* (১৮২৬-১৮৫৬), কলিকাতা, ১৯৭৫ খ্রি.।

৫৮. সুশীল কুমার চ্যাটাজী, *বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তার পরিজন* (কলিকাতা, ১৯৭৪ খ্রি.)।

৫৯. রাজ নারায়ণ বসু, *হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত* (কলিকাতা, ১৩৭৬ খ্রি.)।

৬০. রাজনারায়ণ বসু, *একাল আর সেকাল*, কলিকাতা, ১৯৫১ খ্রি.।

৬১. আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস (*ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৫খ্রি.)।

৬২. ড. মো: আবদুল্লাহ আল- মাসুম, *বৃটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮ খ্রি.)।

৬৩. মোহাম্মদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা*, অনুবাদ-মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ঢাকা, ১৯৬৯।

৬৪. অমলেন্দু দে, *বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, কলিকাতা, ১৯৭৪।

৬৫. মোশফেকা মাহমুদ, *'পত্রে রোকেয়া পরিচিতি'* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৬৫খ্রি.)।

৬৬. মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, ঢাকা, ১৯৮৫।

৬৭. শামসুন নাহার, 'বেগম রোকেয়া জীবনী', ঢাকা, ১৯৫৮।

৬৮. আবুল খায়ের খান চৌধুরী, 'মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে ক্রমবিকাশদ্ধ, হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা* (ঢাকা: সূচিপত্র প্রকাশনী, ২০০২ খ্রি.)।

৬৯. মাওলানা মুশতাক আহমদ, *তাহরীকে দেওবন্দ* (ঢাকা: ১৯৯২ খ্রি.)।

৭০. আবদুস সাত্তার, *তারীখ-এ-মাদ্রাসা-এ-আলীয়া* (ঢাকা: ১৯৫৯ খ্রি.)।

৭১. ড. আবদুল মালেক, মরিয়ম বেগম, ফখরুল ইসলাম ও শেখ শাহবাজ রিয়াদ, *শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা* (ঢাকা: অনুপম প্রিন্টার্স ইউজিসি প্রকাশনা, ২০১২ খ্রি.)।

৭২. আব্দুল হাই, *প্রাসঙ্গিক ভাবনা শিক্ষা* (ঢাকা : ঐতিহ্য, ২০১৬)।

৭৩. রঞ্জিত কুমার রায়, *টিচিং মেথোডস অ্যা অ্যান্ড লার্নিং রিসোর্সেস* (ঢাকা: কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ২০০০খ্রি.), স. ১।

৭৪. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদভী, *আহাম্মিয়া নিযাম আত-তারবিয়্যাহ ওয়াত-তা'লীম ফিল আক্বতার* (ইন্ডিয়া: আল-মাজমা' আল-ইসলামী আল-ইলমী, ২০১৪খ্রি.)।

৭৫. সম্পাদনায় এমাজউদ্দীন আহমদ ও হারুন-অর-রশিদ, *রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৩, ২০০৭)।

৭৬. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪খ্রি.)।

৭৭. ড. মো. আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪খ্রি.), ১ম সং।

৭৮. ড. এমাজ উদ্দীন, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*, ঢাকা, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ ১৯৬৪ খ্রি.।

৭৯. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮খ্রি.)।

৮০. কাজী আব্দুল ওদুদ, *বাংলার মুসলমানদের কথা* (কলকাতা: ১৩৮৪ খ্রি.)।

৮১. মোহাম্মদ আজিজুল হক, অনু. মোস্তফা নূরুল ইসলাম, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯খ্রি.)।

৮২. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী* (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশনী, ২০০০খ্রি.)।

৮৩. আবদুস সাত্তার, *আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০খ্রি.)।

৮৪. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা* (ঢাকা: ১৯৮৩খ্রি.), খ.২।

৮৫. আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর* (ঢাকা: ১৯৮৭খ্রি.)।

৮৬. আহমদ নূরুল ইসলাম, কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত ০৩ মাঘ ১৩৩২, ইংরেজি ১৭ জানুয়ারি ১৯২৬ খ্রি.।

৮৭. মাওলানা আবদুস সাত্তার, তারীখ-ই-মাদ্রাসা-ই-আলিয়াহ (ঢাকা: ১৯৫৯খ্রি.), খ.১।

৮৮. ড. বদরুল হাসান, ঊনিশ শতক: নবজাগরণ ও বাংলা উপন্যাস (কলকাতা: জগৎমাতা পাবলিশার্স, ১ম সং, ১৯৮৯খ্রি.)।

৮৯. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৫ খ্রি.)।

৯০. পরিতোষ কুমার কুন্ডু, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: অর্ণব পকাশনী, ২০০৩ খ্রি.)।

৯১. ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন, ইসলামী শিক্ষা প্রসার উন্নয়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫খ্রি.)।

৯২. প্রফেসর আনসার আলী, শিক্ষানীতি পরিক্রমা (ঢাকা: ১৯৯৫খ্রি.)।

৯৩. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর, *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি* (ঢাকা: বুক পয়েন্ট, ২০০৬ খ্রি.)।

৯৪. স্বপন কুমার ঢালী ও রেজা ইমাম, শিক্ষার ভিত্তি (ঢাকা: প্রভাতী লাইব্রেরী, নীলক্ষেত, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯খ্রি.)।

৯৫. অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক, অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক, অধ্যাপক শ্যামলী আকবর, অধ্যাপক ড. সরকার আবদুল মান্নান, অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর, ড. শোয়াইব জিবরান, শামীম জাহান আহসান , দ্বিতীয় পরিমার্জন, অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর, অধ্যাপক ড. শায়লা নাসরিন, পতিমোহন বিশ্বাস, শাহীনা কবির, *সহিত্য কণিকা*, অষ্টম শ্রেণি (ঢাকা, লক্ষী বাজার : মেসার্স সোমা প্রিন্টিং প্রেস, পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০২২) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড , বাংলাদেশ।

৯৬. *বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, ২০২১ খ্রি.।

৯৭. *আমার বাংলা বই*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, ২০২২ খ্রি.।

৯৮. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী, *নীতি বিদ্যা* (ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ২০০১)।

৯৯. আবূ হামিদ গাযালী, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন (বৈরুত: দার আল-মা'রিফাহ, তা.বি.), খ.৩।

১০০. ইবনে মিসকাওয়াহ, তাহযীব আল-আখলাক (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ, সং-২)।

১০১. মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, স্বাক্ষরতা ও স্বাক্ষরতা পদ্ধতি, ঢাকা ইউনিসেফ ১৯৭৯খ্রি.।

১০২. আবু হামিদ আবদুল লতিফ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৩৯০বং/১৯৮৪খ্রি.)।

১০৩. প্রফেসর মো: আনসার আলী, *শিক্ষানীতি পরিক্রমা* (ঢাকা-চট্টগ্রাম : মিতা ট্রেডাস, ১৯৯৫)।

১০৪. এম.এ. ওহাব মিয়া, *শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও মূল্যায়ন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৪খ্রি.)।

১০৫. মুনির বা'লাবাক্কী, আল-মাওরদি (বৈরুত: দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ১৯৭৭খ্রি.)।

১০৬. ড. শেখ সালমা নার্গিস, *বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষা: শিক্ষাক্রম ও বিদ্যালয়ে অনুশীল* (ঢাকা: অন্য প্রকাশ, ২০১৫ খ্রি.)

১০৭. ড. এম. আবদুল হামিদ, *সমকালীন নীতি বিদ্যার রূপরেখা* (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ ও প্রকাশনা বোর্ড, ২০০১)।

১০৮. সম্পা দাস, সমাজ কর্ম: প্রত্যয়, ইতিহাস ও দর্শন (ঢাকা: বুক চয়েস, ২০০৫ খ্রি.)।

১০৯. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী, *নীতি বিদ্যা* (ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ২০০১ খ্রি.)।

১১০. মো: সিদ্দিকুর রহমান ও মো. শাওকাত ফারুক, *শিক্ষা ব্যবস্থা* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাইজ, মে ১৯৯৮ খ্রি.)।

১১১. শরিফা খাতুন, *তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্ব* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩ খ্রি.)।

**ইংরেজি গ্রন্থ**


১১২. J.N. Sarkar, *India Through the Ages*, Calcutta, 1957.

১১৩. Narendra Krishna Sinha (ed.), *The History of Bengal* (1757-1905) (University of Calcutta, 2nd Ed. 1996).

১১৪. Martin, History, Antiquities, *Topography and Statistics of Eastern India*, volume II, London, 1838.

১১৫. Poromesh Acharya, *'Indigenous Vernacular Education in Pre-British Era: Traditions and Problems*, 1978.

১১৬. R.C. Mazumdar, *History of Mediaeval Bengal* (K Mukherjee & G Bhardwaj and Co Calcutta, 1973).

১১৭. Radha Krishna Sharma, *Nationalism Social Reform and Indian Women*, Patna, 1981.

১১৮. H.G. Rawlinson, *India, A Short Cultural History* (London, 1937).

১১৯. D.C. Sen, *Typical Selections from old Bengali Literature*.

১২০. M. Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal*, Vol. B, Riyadh, 1985.

১২১. Abdul Quader Badayuni, *Muntakhab al-Twarikh*, vol. III.

১২২. M.A Rahim, *Social and Cultural*, Vol. 1.

১২৩. A.R. Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal*.

১২৪. Francois Bernier, *Travels in the Mogul Empire*, New Delhi.

১২৫. S.M. Jafar, *Education in Muslim India, Being An Inquirey into the State of Education During the Muslim Period of Indian History* (1000-1800, A.D), Reprint, Delhi, 1973).

১২৬. Abdul Karim, *Social History of the Muslims in Bengal* (Down to A.D. 1538), Dacca, 1959.

১২৭. N.N. Law, *Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule (By Muhammadan)*, (London: 1916).

১২৮. A.K.M. Ayub Ali, History of the Traditional Islamic Education in Bengal, (Dhaka: 1983).

১২৯. Narendra Nath Law, *Promotion of Learning in India during Muhamedan rule.*

১৩০. Goron, Stan and G.P. Goenka, *The Coins of the Indian Sultans*, Covering the Area of Present-day India, Pakistan and Bangladesh, (New Delhi, 2001).

১৩১. Abdul Karim, *Bengal Under the Mughals: Politics, Society and Culture*.

১৩২. A. F. Salahuddin and Bazlul Mobin Chowdhury (ed.), *Bangladesh: National Culture and Heritage, An Introductory*, Reader, Dhaka, 2004.

১৩৩. Khonder Fuzli Rubee, *The Origin of the Musalmans of Bengal: Being a Translation of Haqiqote Musalman-I-Bengalah*, Calcutta, 1895.

১৩৪. M.H. Sayed, *History of the Glorious Mughal Empire*, Vol-3, 1st Published-2004, New Delhi.

১৩৫. W.W. Hunter, *The Indian Mussalmans*, Reprinted for the First Edition, Lahore, 1964.

১৩৬. J. Long Rev, Adam's Report on Vernacular Education in Bengal and Behar, 1833, 1836 and 1838, (Culcutta : 1868).

১৩৭. Hunter, W.W., *The Indian Mussalmans, Reprinted from the First Edition*, Lahore.

১৩৮. N.K. Bhattasali, *Coins and Chronology of the Early Independent Studies of Bengal*, Cambridge, 1922.

১৩৯. Abdul Hamid Lahori, *Badshanama*, Vol. 2, Culcutta, 1867.

১৪০. Sayed Golam Hossain Tabtabai, *Sieir Mutaqherin,* Vol. II, translated by Haji Mustafa, Culcutta, 1789.

১৪১. Abdul Karim, *Social and Cultural*, Vol. I.

১৪২. Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times*, Dacca, 1963.

১৪৩. Abul Fadl Allami, *Ain-i-Akbari*, Eng. tr. By H. Blochmann (Calcutta: Asiatic Society of Benal, 1904).

১৪৪. *Bengal Past and Present*, (Calcutta, 1948).

১৪৫. Shah Shu'yab, *Manaqib-al-Asfiya*, Extract Printed at the end of *Maktubat-i-Sadi*.

১৪৬. *The district of Rajshahi, its past and Present.*

১৪৭. Dr. A.K.M. Yaqub Ali, *Select Arabic and Persian Epigraphs* (Dhaka: Islamic Foundation, Bangladesh, 1988).

১৪৮. W. Adam, *Report on State of Education in Bengal* (1835-38), Kolkata, 1911, ppp. 161.

১৪৯. Rachana Chakraborty, *'Women's Education and Empowerment in Colonial Bengal', in Hans Hagerdal (ed.) Responding to the West: Essays on Colonial Domination and Asian Agency*, Amsterdam, 2009.

১৫০. M.A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal,* Vol. 1, Karachi, 1967.

১৫১. W. Adam, *Reports on the State of Education in Bengal,* Anath Nath Basu (ed.), Calcutta University, 1941.

১৫২. J.C. Marshman, *Life and Times of Carey,* Marshman and Ward, Vol-II, London, 1859.

১৫৩. Syed Mahmood, *A History of Education in India,* (1781-1893), Aligarh, 1895.

১৫৪. Mohammad Mohar Ali, *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities* (1833-1857), Chittagong, 1965.

১৫৫. Mohammad Mohar Ali, *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities* (1833-1857), Chittagong, 1965, p. 5

১৫৬. A.R. Mallick, British Policy and the Muslims In Bengal, 1775-1856, Dacca, 1977.

১৫৭. H. Sharp (ed.), *Selections from Educational Records* (1771-1839), Part-I, Calcutta, 1920.

১৫৮. J.A. Richey (ed.), *Selection from Educational Records* (1840-1859), Part-II, Calcutta, 1922.

১৫৯. Abdul Karim, *Mohammadan Eduction in Bengal,* Calcutta, 1900.

১৬০. Thomas Babington Macaulay, *Minules on Education in India, written in the year 1835*, 1836 and 1837.

১৬১. Syed Mahmood, *A History of Education in India* (1781-1893), Aligarh, 1895.

১৬২. Raqib Uddin Ahmed, *The Progress of the Industry and Trade* (1855-1966). Dacca, 1966.

১৬৩. Abdul Karim, *Muhammadan Education in Benga*l, Calcutta, 1990, Appendix.

১৬৪. Ahmad Zaheda, State and Education in Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh 1704-1971*: Volume Three; Social and Cultural History. Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1997, (2nd edition).

১৬৫. Ahmad Zaheda, State and Education in Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh 1704-1971*.

১৬৬. Plato, *The law (Book-1),* Trans: R.G. Bury (New York: G.P Patamas sons, 1926).

১৬৭. Aristotle, *The Politics (book vii)* (Trans: Errets Barker), (Oxford: Clarendon press, 1946).

১৬৮. A. K. M. Ayyub Ali, History of traditional Islamic education in Bangladesh (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1983).

১৬৯. Elizabeth Cooper. *The Harim and The Purdah* (Delhi. Bimla publishing House. Delhi First Published in 1915. Reprinted in 1983).

১৭০. WilliamAdam, *Second Report on the State of Education in Bengal: District of Rajshahi*, Cal-cutta: Bengal Military Orphan Press, 1836.

১৭১. Mallick, A. R., British Policy, p. 192. Hampton, H. V., Biographical Studies.

১৭২. *Marshman, Advantages of Christianity in Promoting the Establishment and Prosperity of the British Government in India; Containing Remarks Occasioned by reading a Memoir on the Vellore Mutiny*, London, 1813.

১৭৩. T.B. McCully, *English Education*.

১৭৪. M. Wylie, *Bengal as a Field of Missions*, London, 1854.

১৭৫. Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal* (1884-1992), First Published, Dacca, 1974.

১৭৬. John Milton, *Milton's Tractate On Education*.

১৭৭. *Jan Jacques Roussesu*, Trans. Barbara Foxtey (London: J.M. Dent and Sons ltd, Jan Jacques, 1966).

১৭৮. Bertrand Russel, *On Education* (London: Unwin paparbooks, 1985).

১৭৯. B. B. Misra, The Indian middle classes: their growth in modern times (London: 1961).

১৮০. Vernon Mallinson, *An introduction to the study of comparative education* (London: Heinemann Educational, 1975).

১৮১. James Bryant Conant, *Education and liberty: the role of the schools in a modern democracy (*Harvard University Press, 1953).

১৮২. R.C. Majumar (ed.), *The History and Culture of the Indian People: The Classical Age.* (Bharatiya Vidza Bhavan, Bombay, 1954). (Third edition 1970).

১৮৩. F. W. Garford, *Education and Social Purpose* (London: 1962).

১৮৪. Dr. Sekander Ali, *Report on Islamic Education and Madrasah Eduction in Bangladesh*.

১৮৫. Jaeqes P. Thiroux, *Ethics Theory and Practice* (California: Glencoe Publishing co. inc.).

১৮৬. S. John Mackenze, *A Manual of Ethics* (Delhi: Oxford University Press, 1993).

১৮৭. Henry Lester Smith, *Comparative education* (Bloomington, 1940).

১৮৮. F. Stuart Maclure, *Educational Documents: England and Wales 1816—1967,* (London: 1968), 2nd ed..

১৮৯. William Benton, *This is the Challenge* (New York: Associate College Presses, 1958).

**রিপোর্ট**

১৯০. *Report on Public Instruction in East Bengal* for the year 1948-1949.

১৯১. Proceedings of the Pakistan Education Conference held at Karachi from 27 November to 1st December 1947, Education Division, Government of Pakistan.

১৯২. East Bengal Education Ordinance, Ordinance no. 1, 1947.

১৯৩. Report on Public Instruction in East Bengal for the Period from August 15, 1947 to March 31, 1948.

১৯৪. Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam, 1907-08 to 1911-12, Vol. 1.

১৯৫. Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam, 1907-08 to 1911-12, Vol. II.

১৯৬. Supplement to the progress of Education in Bengal, 1912-13 to 1916-17 Fifth Quinquennial Review.

১৯৭. Progress of Education in India, 1907 to 1912, Vol. II, Parliamentary Papers (House of Commons), 1914, cd. 7486, Vol. 6.

১৯৮. Proceedings of Muhammadan Educational Conference, 19 December, 1905, para-5, Eastern Bengal and Assam Education Proceedings, June, 1906.

১৯৯. Government of India, E.D. to Chief Secretary, Government of Eastern Bengal and Assam, Telegram No. 7, 13, January, 1911. Eastern Bengal and Assam Education Proceedings, 1911.

২০০. Supplement to the progress of Education in Bengal, 1912-13 to 1916-17 Fifth Quinquennial Review.

২০১. Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam, 1906-07 to 1911-12, Vol. II.

২০২. Progress of Education in India, 1907 to 1912, Parliamentary Papers, 1904, Vol. 65.

২০৩. Here to Victory, 20 February, 1911 (Private and Confidential) Hardinge Papers, Vol.

২০৪. Sufi ahmed Muslim Community in Bengal (1884-1912), Dacca, 1974.

২০৫. Chef Secretary, Government of Eastern Bengal and Assam, to Secretry, Government of India, Home Department, No, 4836, Shillong, 12 May, 1910. Eastern Bengal and Assam Education Proceedings, 1910.

২০৬. D.P.I, Eastern Bengal and Assam to Chief Secretary, Government of Eastern Bengal and Assam, No, 203, Shillong, 4 April, 1907, Eastern Bengal and Assam Education Proceedings, 1907.

২০৭. Report on the Fourth Session of the Provincial Mohamedan Education Conference, Held at Rangpur, April, 1911.

২০৮. Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam, 1907-08 to 1911-12.Vol. II, p. 89. Supplement to the progress of Education in Bengal, 1912-13 to 1916-17 Fifth Quinquennial Review.

২০৯. Progress of Education in Bengal, 1902-03 to 1906-07, Third Quinquennial Review.

২১০. P.C. Lyon, Chief Secretary, Government of Eastern Bengal and Assam, to Government of India, Home Department, No. 1137E, Shillong, 18 May, 1908 : Eastern Bengal and Assam Education Proceding, 1908.

২১১. *British Policy and the Muslims in Bengal*.

২১২. Education Commission: Report by the Bengal Provincial Committee, with Evidence taken the Committee and Merorial Addressed to the Education Commission, Calcutta, 1884.

২১৩. Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam, 1901-02-1906-07, Shillong, 1908.

২১৪. Calcutta University, Commission, 1917-19, Vol. II, Calcutta, 1919.

২১৫. *Epigraphia Indo-Moslemica,* 1917, Plate II.

২১৬. *Epigraphia Indo-Moslemica*, 1917-18.

২১৭. *Report of William Adam, Education Commission (Frist, Second and Third Report), (1835-1837).*

২১৮. Dispatch from the Court of Direction of the East India Company to the Government General of India in Council on the subject of the Education of the people of India, Simla, 19th July, 1854.

২১৯. Progress of Education in Bengal, 1902-03 to 1906-07, Third Quinquennial Review.

২২০. Report on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal (1861- 1977), Vol. 3.

২২১. Report on Public Instruction in Bengal, 1909-10, p. 46.

২২২. Report on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal.

২২৩. Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam, 1906-07 to 1911-12, Vol. 1.

২২৪. M.K.U. Molla, The New province of Eastern Bengal and Asam, Rajshahi University, IBS, 1981.
২২৫. Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam.
২২৬. General Report on Public Instruction in Bengal, 1890-91.
২২৭. Report on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal (Op.cit. p. 75.
২২৮. Progress of Education in Bengal, 1907-08 to 1911-12, Fourth Quinquennial Review.
২২৯. Resulotion of the Govt. of India, 7 August, 1871, para-2, India Education Proceedings, August, 1871.
২৩০. Report of the Indian Education Commission, 1890-91.
২৩১. Proceedings of the Provincial Muhammadan Educational Conference, 1910.
২৩২. Proceedings of the Sub-Committee for Female Education among Muhammadans, 1908.
২৩৩. The Eastern Bengal and Assam Government's Resolution No. 260E, Dated the 17th February, 1908.
২৩৪. The Eastern Bengal and Assam Gazette, February, 1908; Ali, p. 32.
২৩৫. Report of the Third Provincial Muhammadan Educational Conference. Eastern Bengal and Assam, held at Bogra on 26th & 27th of March, 1910.
২৩৬. Enamul Hoque, Nowab Bahadur Abdul Latif, Ritings and Related documents.
২৩৭. Report of the Indian Education Commission, 1883.
২৩৮. *Calcutta University commission*, 1917-19. Vol. II, Calcutta, 1919.
২৩৯. Nawab Bahadur Abdul Latif, His Writing and Related Document.
২৪০. A Short Note by Nawab Ali Chowdhury on Muhammadan Female Education to be considered by the Muhammadan Education Committee, 1914-12.

২৪১. নওয়াব আলী চৌধুরী, পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির কার্যবিবরণী ও সমালোচনা (১৯০৬-১২), কোলকাতা, এপ্রিল, ১৯১৪।

২৪২. বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (মফিজ উদ্দিন), ফেব্রুয়ারি-১৯৮৮ খ্রি.।

২৪৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের প্রতিবেদন ১৯৯৪।

২৪৪. Declaration of the 3rd Summit Conference of the Muslim Heads of States held in Holy City of Makkah, KSA organized by the organization of Islamic Conference (25-28 January 1961).

২৪৫. প্রতিবেদন, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৭।

২৪৬. বাংলাদেশ স্কুল ও মাদ্‌রাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম মক্কা ঘোষণার আলোকে পর্যালোচনা, ২০০১।

২৪৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, *জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০* (ঢাকা : তা. নেই)।

২৪৮. UNESCO-NIER Regional programme for Educational Research. Asian studz of curriculum, Tokyo 1970, p. 111.

২৪৯. Ministry of Foreign Affairs, Education and Japan's Modernization (Tokio, 19972).

**২৫০.** Educational Patterns in Contemporary Societies.

২৫১. Educational Patterns in Conteporary Societies.

**২৫২.** Education in Communist China.

২৫৩. Department of education and science, *The Educational system of England and Wales* (London: 1972).

২৫৪. National Curriculum and Textbook Board, Bangladesh.

২৫৫. Dr. Sekender Ali Ibrahimi, Report on Islamic education and Madrasha education in Bengal, I. F. B. Dhaka 1987, Vol. IV.

২৫৬. Proposal for a New Education Policy, Ministry of Education and Scientific Research, Islamabad, July 1969.

**পত্র-পত্রিকা**

২৫৭. 'বার্ষিক বিবরণী', *শিখা*, ১ম বর্ষ চৈত্র, ১৩৩৩, পৃ. ২২

২৫৮. হাবিব রহমান, মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর বার্ষিক অধিবেশনসমূহে সভাপতির ভাষণ, *ঢাকা বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, মাঘ-চৈত্র ১৪০৬।

২৫৯. *সংবাদ প্রভাকর*, ১৯.১২.১২৫৪, বিনয় ঘোষের সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র।

২৬০. ইসলাম প্রচারক, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০০।

২৬১. ইসলাম প্রচারক, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ।

২৬২. *আল্-এসলাম*, ২য় ভাগ, ১০ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৩।

২৬৩. ড. সুলতান মাহমুদ রানা, *ঢাকা পোস্ট*, 19 জানুয়ারি-2025 খ্রি.।

২৬৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮ই মাঘ, ১৩১৫.

২৬৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ই এপ্রিল, ১৯০৬ খ্রি.।

২৬৬. এস.উল্লিউ হোসেন, 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি, *ইসলাম প্রচারক*, পঞ্চম বর্ষ, ৯-১০ম সংখ্যা ও ১১শ সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ও অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩১০।

২৬৭. মোহাম্মদ ইসমাঈল ইসলামাবাদী, 'নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ', *মাসিক মোহাম্মদী*, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৩৭।

২৬৮. শামসুল আলম, নওয়াব সৈয়দ শামসুল হুদা, *ইসলামি ফাউণ্ডেশন পত্রিকা*, জুলাই-সেপ্টেম্বর-১৯৮৫ খ্রি।

২৬৯. Dr. a. Halim in the *Journal of the Pakistan Historical Society*, 1953, pt. IV.

২৭০. *The Musslaman*, Vol, XI, March 23, 1917, No-17.

২৭১. Obaidullah Al Obaidi, 'Muhammadan Education in Bengal', *The Bengal Magazine*, January, 1873.

২৭২. Rachana Chakraborty, 'Some Thoughts on Women's Education in Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries Bengal: Its form and Content', *The Quarterly Review of Historical Studies* Vol. LII Nos. 1&2.

**অভিধান**

২৭৩. মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল-আযহারী, *আরবি-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭২খ্রি.), প্রথম প্রকাশ, খ.২।

২৭৪. রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত* (বৈরূত: দারুল-মা'আরিফ, তা.বি.)।

২৭৫. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব* (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৩খ্রি.)।

২৭৬. ইব্ন মানযূর, *লিসানুল আরব* (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪২৩ হি.), খ. ৫।

২৭৭. আহমাদ শরীফ, *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬খ্রি.)।

২৭৮. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী ও স্বরোচিষ সরকার (সম্পাদিত), *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী,২০০৫)।

২৭৯. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-ক্বামুসুল ওয়াযিয লি দিরাসিল আরাবিয়াতিল আযীয* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০২ খ্রি.)।

২৮০. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ৫ম সং, ২০০৮খ্রি.)।

২৮১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, আল-মু'জামুল ওয়াফী (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০০৫খ্রি.)।

২৮২. ড. এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২খ্রি.)।

২৮৩. এম.এ. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলিত), *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৪ খ্রি., সং-৪)।

২৮৪. *বাংলা বিশ্বকোষ*, ৩য় খন্ড, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, পৃ. ২৬০-২৬১।

২৮৫. *The World Book Dictionary*, v.2 (Chicagoi: World Book, inc.2000)

**বিশ্বকোষ**

২৮৬. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪১৭হি./১৯৯৬খ্রি.), ২৫শ খণ্ড।

২৮৭. *Encyclopedia Britannica*, Vol.22 (Chicago, London, Encyclopedia of Britannica inc. 1994).

২৮৮. *Banglapedia*, National Encyclopedia of Bangladesh Asiatic Society of Bangladesh, CD Edition, February 2008.

২৮৯. *The New Illusted Medical and Health Encyclopedia*.

২৯০. *Encyclopaedia of Britannica*, Vol-22, (Chicago, London: Eencyclopaedia Britannica inc, 1946).

২৯১. W. Geetz Philip (ed.), *The New Encyclopedia Britannica* (Vol. 18 Macropaedia, 15th Edition, Chicago).

**ওয়েব**

২৯২. https://nctb.gov.bd/

২৯৩. https://www.teachers.gov.bd/blog/details/790669?page=114&new-curriculum-2021-of-bangladesh-and-my-thoughts

# পরিশিষ্ট




# জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

**শিক্ষা মন্ত্রণালয়**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# প্রাক-কথন

একটা জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হল শিক্ষা। দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্য পূরণে শিক্ষাই হচ্ছে প্রধান অবলম্বন। মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তা-চেতনায় প্রাগ্রসর একটি সুশিক্ষিত জাতিই একটি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। তাই শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড।

আওয়ামী লীগ আগামী প্রজন্মকে নৈতিক মূল্যবোধ, জাতীয় ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রস্তুতি পূর্বেই গ্রহণ করেছিল।

আমাদের দেশের জনগণের ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য আমার ভীষণ দুঃখ ও কষ্ট হয়। স্বাধীনতার পর ঊনচল্লিশ বছর পার হয়ে গেলেও কোন শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হয়নি। স্বাধীনতার পরপরই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. কুদরাত এ খুদার নেতৃত্বে দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিশন ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গণমুখী আধুনিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারকে নৃশংসভাবে হত্যা করার মধ্য দিয়ে অবৈধ ক্ষমতা দখলের পালা শুরু হয়। ফলে ড. কুদরাত এ খুদা প্রণীত শিক্ষানীতি আর বাস্তবায়িত হয়নি। বরং জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়, মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরনে কোন পদক্ষেপই নেয়া হয়নি।

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একুশ বছর পর ক্ষমতায় এসে পুনরায় শিক্ষানীতি প্রণয়নে পদক্ষেপ নেয়। ১৯৯৭ সালে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে 'শিক্ষানীতি-২০০০' প্রণীত হয়। কিন্তু ক্ষমতার পট পরিবর্তন হওয়ায় আবারও শিক্ষানীতি ফেলে দেয়া হয় আস্তাকুঁড়ে। ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে আমরা সরকারের দায়িত্ব নেবার পর নির্ধারিত লক্ষ্যকে সামনে রেখে পূর্বে প্রণীত শিক্ষানীতিকে যুগোপযোগী করে প্রণয়ন করার জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের মতামত গ্রহণ করা হয়। সকলের মতামতকে গুরুত্ব দেয়ার কারণে এই শিক্ষানীতি সর্বমহলে গ্রহণযোগ্যতা পায়।

এভাবে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আমরা একটা শিক্ষানীতি পেলাম। এই শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানচ্ছি। আমরা জানি, যে কোন বিষয়ে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে সঠিক নীতিমালা প্রয়োজন। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার-২০০৮ এ আমরা সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশকে একটি দারিদ্রমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, উদার ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র করার নীতি নির্ধারণ করি, কারণ উপযুক্ত দিক নির্দেশনা ও দিকদর্শন ছাড়া সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করা যায় না। তবে এখানে একটা কথা না বললে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কতকগুলি উপকমিটি গঠন করে, তার মধ্যে শিক্ষা উপকমিটিও রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল মানুষের মৌলিক চাহিদা ও করণীয় সম্পর্কে দলের নীতি নির্ধারণ করা। যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, কৃষি ইত্যাদি।

এই উপকমিটিগুলো বিভিন্ন সময়ে সেমিনার করে আলোচনা করে এবং আমাদের দলের ঘোষণাপত্র অনুযায়ী নীতিমালা কী হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাপত্র তৈরী করে। সংগঠন যখন ক্ষমতায় যাবে কীভাবে দেশ পরিচালনা করবে তার একটা প্রস্তুতি নেয়। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন এবং উপকমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী। অনেকগুলো সেমিনার-সিম্পোজিয়াম তাঁরা করেছেন। কাজেই রাজনৈতিক দল হিসেবে জনসেবার যে প্রস্তুতি আওয়ামী লীগ নিয়েছে তারই ফসল এই শিক্ষানীতি। ১৯৯৬ ও ২০০৯ সালে যাঁরা কমিটির সদস্য ছিলেন তাঁদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ১৯৭২ সালে ড. কুদরাত এ খুদা কমিটির অনেকেই আর ইহজগতে নেই। যাঁরা বেঁচে আছেন এবং যাঁরা নেই সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য দিক হল এখানে ধর্ম, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এতে মানুষের স্বভাবজাত অনুভুতিকে যেমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তেমনি পার্থিব জগতে জীবন জীবিকার সুযোগ সৃষ্টিকারী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে- যা কর্মসংস্থানের দ্বার উন্মোচিত করবে। দেশ অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসম্পন্ন জ্ঞানলাভ করে বাংলাদেশকে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সক্ষম হব। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তি বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করেই উদযাপন করে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের মর্যাদা দিতে পারব।

এই নীতিমালা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

**শেখ হাসিনা**
**প্রধানমন্ত্রী**
**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

# মুখবন্ধ

স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর প্রায় চার দশকেও কোনো শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে স্বাধীন বাংলাদেশের চাহিদা অনুসারে শিক্ষানীতি প্রণীত হলেও ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, লক্ষ্য ও চেতনাকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর আমাদের সকল অর্জনই ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর পর ছয়টি শিক্ষানীতি/ প্রতিবেদন প্রণীত হলেও তা বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

১৯৯৬ সনে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনুসারী সরকার একটি শিক্ষানীতি (শিক্ষানীতি-২০০০) প্রণয়ন করলেও, ২০০১ সনে সরকার পরিবর্তনের ফলে বাস্তবায়নের পরিবর্তে তা বাতিল করে দেওয়া হয়।

২০০৯ সনের জানুয়ারি মাসে জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থন লাভ করে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও মহাজোটের সরকার প্রতিষ্ঠার পর জাতির সামনে এক নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। দিন বদলের ইশতেহার, ভিশন-২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য, জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থন এবং প্রত্যাশা এই সম্ভাবনা বাস্তবায়নের বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করে দেয়। দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরেই বর্তমান সরকার স্বল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করার লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয়। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে চেয়ারম্যান ও ড. কাজী খলিকুজ্জমান আহমদকে কো-চেয়ারম্যান করে আঠারো সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি মাত্র চার মাসের মধ্যে একটি খসড়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার পর তা চূড়ান্ত না করে ব্যাপক জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা হলে সকল মহলের বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়। বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনা সভা করে মতামত নেওয়া হয়। শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, রাজনীতিক, আলেম-ওলামা, ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, পেশাজীবীসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামত, সুপারিশ ও পরামর্শ বিবেচনা করে খসড়া শিক্ষানীতিকে আরও সংশোধন সংযোজন করে চূড়ান্ত আকারে প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশেষ করে যাঁরা তাঁদের মতামত ও পরামর্শ দিয়ে নানাভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করার জন্য অবদান রেখেছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই ।

এই শিক্ষানীতি সম্পর্কে দুটি বিষয় স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন। (১) এটা কোনো দলীয় শিক্ষানীতি নয়- জনগণ তথা জাতির আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে তৈরি করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি। (২) শিক্ষানীতি কোনো অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়, এর পরিবর্তন ও উন্নয়নের পথ সব সময়ে উন্মুক্ত থাকবে। কোনো ভুল-ত্রুটি হলে তা সংশোধন করা যাবে। শিক্ষা একটি গতিশীল বিষয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের সঙ্গে সংগতি রেখে সবসময়েই এর পরিবর্তন বা আধুনিকীকরণ অব্যাহত থাকবে। বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়ার মধ্যেই বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অব্যাহত উন্নয়ন ও প্রয়োগের অভিজ্ঞতা শিক্ষানীতিকে অব্যাহতভাবে সমৃদ্ধ করবে।

শিক্ষানীতির মূলে প্রতিফলিত হয়েছে জনগণের রায় ও প্রত্যাশা এবং আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতিফলন এবং আমাদের সংবিধানের মূল দিকনির্দেশনা। সবরকম বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্য শিক্ষানীতির মৌলিক ভিত্তি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

আমাদের সকল শিশুর জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা একটি মৌলিক বিষয়। মানসম্মত আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা লাভ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আয়ত্ত করে আমাদের নতুন প্রজন্ম যাতে নিজেদের দক্ষ মানবসম্পদে উন্নীত করে এবং তা প্রয়োগ করে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও পশ্চাৎপদতার অবসান ঘটিয়ে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। সেই লক্ষ্যেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে আমাদের বিরাটসংখ্যক তরুণদের দক্ষ ও পেশাদার মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে।

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। মানসম্মত শিক্ষা ও দক্ষ জনসম্পদ গড়ার প্রধান শক্তি মানসম্মত দক্ষ নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। আধুনিক যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্থান করে নিয়েছে প্রযুক্তি। শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিশেষ করে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি আধুনিক যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সারা বিশ্বে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় তা অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

একদিকে নিরক্ষরতার অবসান ঘটিয়ে যেমন সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি আমাদের উচ্চশিক্ষার মান বিশ্বমানে উন্নীত করতে হবে। সাধারণ তরুণদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

মোট কথা সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষা, আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা, কম্পিউটারসহ আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা লাভ এবং তা আয়ত্ত ও প্রয়োগ করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য কারিগরি পেশাগত জ্ঞান ও শিক্ষা এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ অগ্রাধিকারের বিষয়। আমরা কোনও বিষয়কেই ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখতে পারি না। চ্যালেঞ্জ যত বড়ই হোক না কেন, আমাদের তা মোকাবেলা করতে হবে এবং সফল হতে হবে। আমাদের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষাই সর্বাধিক ফলপ্রসূ উপায়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ থেকে শুরু করে সর্বাধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাদান সবই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্ব পেতে হবে।

শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন তথা শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য দলমতনির্বিশেষে সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অপরিহার্য। সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ জাগরণের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াসই আমাদের জাতির জন্য এই সাফল্য এনে দিতে পারে।

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন বর্তমান যুগের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারের বিষয়। আমাদের সমাজের সকল স্তরের মানুষ ভবিষ্যৎ গঠনের এই মহৎ কাজে আন্তরিকভাবে শামিল হবেন- এই প্রত্যাশা নিয়ে এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। শিক্ষা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতা ও বিনিয়োগ গুণগতভাবে বৃদ্ধি করতে হবে।তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের জন্য বিনিয়োগের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষায় বিনিয়োগ আসলে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ।

শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে আধুনিক মানসম্মত যুগোপযোগী শিক্ষা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নতুন প্রজন্মের নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, চরিত্র গঠন এবং জনগণ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করতে হবে। আমাদের জাতির ঐতিহ্য, মূল্যবোধ এবং গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা নতুন প্রজন্মকে সাহসী ও গৌরবান্বিত করে প্রকৃত শিক্ষায় দক্ষ, জ্ঞানী এবং দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। তাদেরকে  উদ্যোগী, সৃজনশীল এবং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্বদানে সফল হতে হবে।

আমাদের কোনো শিক্ষার্থীর জীবনকে একটি উদ্দেশ্যহীন পথে ঠেলে দিতে পারি না। কোনো ধরনের দক্ষতা, অন্তত: নূন্যতম একটি পর্যায় পর্যন্ত মানসম্মত শিক্ষা লাভ না করে মাঝ পথে কোনো শিক্ষার্থীকে আমরা ঝরে পড়তে বা হারিয়ে যেতে দিতে পারি না। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে কেনো না কেনো পর্যায়ে একটি স্বীকৃত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মনে রাখতে হবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনের মূল্যবান সময়ের ব্যবহার যথাযথভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। আমরা চাই না কোনো শিক্ষার্থীই অকৃতকার্য হয়ে শিক্ষা জীবন থেকে হারিয়ে যাক।

পরীক্ষা পদ্ধতি বা শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান যাচাই বা শিক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন করতে হবে। এ জন্য ক্লাশরুমের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ সফল করতে হবে। শিক্ষার্থীদের তথাকথিত নোট বই, প্রাইভেট টিউশনী প্রভৃতি অনাকাঙ্খিত আপদ থেকে মুক্তি দিতে হবে। পরীক্ষা হবে শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও স্বাভাবিক পরিবেশে, পরীক্ষাকে শিক্ষার্থীরা ভীতিকর মনে করবে না, বরং আনন্দময় উৎসব হিসেবে গ্রহণ করবে। পরীক্ষাকে পরীক্ষার্থীরা তার শিক্ষা জীবনের সার্থকতার মূল্যায়ণ ও স্বীকৃতি হিসাবে আনন্দের সাথে গ্রহণ করবে। সার্বিক শিক্ষা জীবনকেই আকর্ষণীয় নিরাপদ ও আনন্দময় করে তুলতে হবে। এ রকম পরিবেশই আমাদের লক্ষ্য ও কাম্য।

জোরজবরদস্তি করে শিক্ষাদান নয়, শিশুদের শিক্ষার পরিবেশ, পাঠদান পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তুলতে হবে। আমাদের জাতির স্বপ্ন বাস্তবায়িত করে তুলতে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে প্রকৃত শিক্ষা, জ্ঞান, প্রযুক্তিতে দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ, একই সংগে নৈতিক মূল্যবোধ, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দায়বদ্ধ এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলাই হবে আমাদের মূল লক্ষ্য।

শিক্ষানীতির মহৎ লক্ষ্য অর্জনে আমরা সকলের সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

**নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি**
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

# সূচিপত্র


| | | | |
|---|---|---|---|
| অধ্যায় - ১ | : | শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য | ১ |
| অধ্যায় - ২ | : | প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা | ৩ |
| অধ্যায় - ৩ | : | বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা | ১০ |
| অধ্যায় - ৪ | : | মাধ্যমিক শিক্ষা | ১২ |
| অধ্যায় - ৫ | : | বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা | ১৫ |
| অধ্যায় - ৬ | : | মাদ্‌রাসাশিক্ষা | ১৮ |
| অধ্যায় - ৭ | : | ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা | ২০ |
| অধ্যায় - ৮ | : | উচ্চশিক্ষা | ২২ |
| অধ্যায় - ৯ | : | প্রকৌশলশিক্ষা | ২৫ |
| অধ্যায় - ১০ | : | চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা | ২৭ |
| অধ্যায় - ১১ | : | বিজ্ঞানশিক্ষা | ২৯ |
| অধ্যায় - ১২ | : | তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা | ৩১ |
| অধ্যায় -১৩ | : | ব্যবসায়শিক্ষা | ৩৩ |
| অধ্যায় - ১৪ | : | কৃষিশিক্ষা | ৩৫ |
| অধ্যায় - ১৫ | : | আইনশিক্ষা | ৩৭ |
| অধ্যায় - ১৬ | : | নারীশিক্ষা | ৩৯ |
| অধ্যায় - ১৭ | : | কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষা | ৪১ |
| অধ্যায় - ১৮ | : | বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্ল গাইড এবং ব্রতচারী | ৪২ |
| অধ্যায় - ১৯ | : | ক্রীড়াশিক্ষা | ৪৬ |
| অধ্যায় - ২০ | : | গ্রন্থাগার | ৪৮ |
| অধ্যায় - ২১ | : | পরীক্ষা ও মূল্যায়ন | ৫০ |
| অধ্যায় - ২২ | : | শিক্ষার্থীকল্যাণ ও নির্দেশনা | ৫৩ |
| অধ্যায় - ২৩ | : | শিক্ষার্থী ভর্তি | ৫৫ |
| অধ্যায় - ২৪ | : | শিক্ষক প্রশিক্ষণ | ৫৬ |
| অধ্যায় - ২৫ | : | শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার, দায়িত্ব | ৫৮ |
| অধ্যায় - ২৬ | : | শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক | ৬০ |
| অধ্যায় - ২৭ | : | শিক্ষা প্রশাসন | ৬২ |
| অধ্যায় - ২৮ | : | শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপ | ৬৮ |
| সংযোজনী -১ | : | বাংলাদেশের সংবিধানের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিধান | ৭০ |
| সংযোজনী -২ | : | জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি | ৭১ |

# ১ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ (সংযোজনী-১) বিবেচনায় রাখা হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন, যেখানে প্রত্যেক সদস্য দেশে সকল শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার তাগিদ রয়েছে, সেটিও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত,বিজ্ঞান মনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে। এই আলোকে শিক্ষার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতিগত তাগিদ নিম্নরূপ :

১. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।

২. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর (যেমন: ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক-চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎজীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।

৪. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।

৫. দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন-ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।

৬. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।

৭. জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থসামাজিক শ্রেণী-বৈষম্য ও নারীপুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৮. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।

৯. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।

১০. মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতিস্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

১১. বিশ্বপরিমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।

১২. জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি (ICT) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

১৩. শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

১৪. সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তাচেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান।

১৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।

১৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিকশিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা ।

১৭. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত (শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা। এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।

১৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।

১৯. সর্বক্ষেত্রে মান-সম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের জন্যে প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

২০. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা চর্চা এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সেলক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা।

২১. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

২২. পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।

২৩. দেশের আদিবাসী সহ সকল ক্ষুদ্রজাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।

২৪. সব ধরনের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

২৫. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

২৬. শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকা গুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৭. বাংলাভাষা শুদ্ধ ও ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া নিশ্চিত করা।

২৮. শিক্ষার্থীদের শারীরিক মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীর চর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

২৯. শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩০. মাদক জাতীয় নেশা দ্রব্যের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করা।

# ২ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

## ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

### উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার আগে শিশুর অন্তর্নিহিত অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতুহল, আনন্দবোধ ও অফুরন্ত উদ্যমের মতো সর্বজনীন মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতিগ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। তাই তাদের জন্য বিদ্যালয়-প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি। অন্যান্য শিশুর সঙ্গে একত্রে এই প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা শিশুর মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। কাজেই ৫+ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে। পরবর্তীকালে তা ৪+ বছর বয়স্ক শিশু পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। এই পর্যায়ে শিক্ষাক্রম হবে:

- শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিমূলক এবং সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন।
- অন্যদের প্রতি সহনশীলতা এবং পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ।

### কৌশল

১. অন্যান্য গ্রহণযোগ্য উপায়ের সঙ্গে ছবি, রং, নানা ধরনের সহজ আকর্ষণীয় শিক্ষাউপকরণ, মডেল, হাতের কাজের সঙ্গে ছড়া, গল্প, গান ও খেলার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে।

২. শিশুদের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তাদের স্বাভাবিক প্রাণশক্তি ও উচ্ছ্বাসকে ব্যবহার করে আনন্দময় পরিবেশে মমতা ও ভালোবাসার সঙ্গে শিক্ষা প্রদান করা হবে। শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে যেন তারা কোনোভাবেই কোনোরকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার না হয়।

৩. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে বাড়তি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি করা হবে। তবে সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হওয়ায় ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হবে।

৪. মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডায় ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সকল ধর্মের শিশুদেরকে ধর্মীয়জ্ঞান, অক্ষরজ্ঞান সহ আধুনিক শিক্ষা ও নৈতিকতা শিক্ষাপ্রদানের কর্মসূচি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে।

## খ. প্রাথমিক শিক্ষা

### উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যাধিক। দেশের সব মানুষের শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার ভিত্তিমূল প্রাথমিক শিক্ষা। তাই মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। একাজ করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। শিক্ষার এই স্তর পরবর্তী সকল স্তরের ভিত্তি সৃষ্টি করে বলে যথাযথ মানসম্পন্ন উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষার পর অনেকে কর্মজীবন আরম্ভ করে বলে মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা তাদের যথেষ্ট সহায়ক হতে

পারে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান ও বিদ্যালয় ভেদে সুযোগ-সুবিধার প্রকট বৈষম্য, অবকাঠামোগত সমস্যা, শিক্ষক-স্বল্পতা ও প্রশিক্ষণের দুর্বলতাসহ বিরাজমান সমস্যাসমূহ দূর করে জাতির সার্বিক শিক্ষার ভিত শক্ত করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সকলের জন্য একই মানের। অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক এবং ভৌগোলিক কারণে বর্তমানে শতভাগ শিশুদের প্রাথমিক স্কুলের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না, ২০১০-১১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। যে সমস্ত গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসকল গ্রামে ন্যূনপক্ষে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্রুত প্রতিষ্ঠা করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা।
- কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা।
- শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিক্ষার্থীর নিজ স্তরের যথাযথ মানসম্পন্ন প্রান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী এবং উপযোগী করে তোলা। এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক আকর্ষণীয় করে তোলা এবং মেয়েদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা।
- শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবন-দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া।
- সবধরণের প্রতিবন্ধীসহ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

### কৌশল

### রাষ্ট্রের দায়িত্ব

সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার তাগিদ সংবিধানে বিধৃত আছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং রাষ্ট্রকেই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব বেসরকারি বা এনজিও খাতে হস্তান্তর করা যাবে না। কোনো ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা কোনো এনজিও প্রাথমিক

শিক্ষাদানকল্পে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে চাইলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান পালন করে করতে হবে।

**প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ও বাস্তবায়ন**

১. প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারন করা হবে। এটি বাস্তবায়নে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অবকাঠামোগত আবশ্যকতা মেটানো এবং প্রয়োজনীয়সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা।

২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করার জন্য অনতিবিলম্বে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

- প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা;
- প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষাক্রম বিস্তারসহ শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ওপর ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করা।

প্রাথমিক শিক্ষার এই পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হবে। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে আট বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ২০১৮-এর মধ্যে ছেলে-মেয়ে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতিসত্তা নির্বিশেষে পর্যায়ক্রমে সারা দেশের সকল শিশুর জন্য নিশ্চিত করা হবে।

**বিভিন্ন ধারার সমন্বয়**

২. একই পদ্ধতির মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাংলাদেশের সংবিধানে ব্যক্ত করা হয়েছে। সাংবিধানিক তাগিদে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত বিষয়সমূহে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা হবে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারা যথা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম), ইবতেদায়িসহ সবধরণের মাদরাসার মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা হবে। নির্ধারিত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য নিজস্ব কিংবা অতিরিক্ত বিষয় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের অনুমতিসাপেক্ষে বিভিন্ন ধারায় সন্নিবেশ করা যাবে।

৩. শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ইবতেদায়িসহ সবধরণের মাদরাসাসমূহ আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবে এবং প্রাথমিক স্তরের নতুন সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

৪. বিভিন্ন ধরনের (কমিউনিটি বিদ্যালয়, রেজিস্ট্রিকৃত নয় এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রেজিস্ট্রিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ ও শহুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার যে প্রকট বৈষম্য বিরাজমান তা দূরীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সাধারণ, কিন্ডারগার্টেন,ইংরেজী মাধ্যম ও সবধরণের মাদরাসা সহ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নিয়মনীতি মেনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করতে হবে।

**শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি**

৫. প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ধারা নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট শ্রেণীর পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে। সকল বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ

কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি যথাযথ পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করবে। সর্বত্র অবকাঠামো তৈরি এবং কম্পিউটার সরবরাহ ও কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ না দেওয়াপর্যন্ত তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ও মূল্যায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি-সহজপাঠ ও অনুশীলন পুস্তকভিত্তিক হবে। মানসম্পন্ন ইংরেজি লিখন-কথনের লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম শুরু থেকেই গ্রহণ করা হবে এবং ক্রমান্বয়ে ওপরের শ্রেণীসমূহে প্রয়োজনানুসারে জোরদার করা হবে। প্রথম শ্রেণী থেকে সহশিক্ষাক্রম বিষয় থাকতে পারে। প্রাথমিক স্তর থেকে নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামুলক করা হবে। প্রাথমিক স্তরের শেষ তিন শ্রেণীতে অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবেশের উপযোগী প্রাক-বৃত্তিমূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হবে, যাতে যারা কোনো কারণে আর উচ্চতর পর্যায়ে পড়বে না এ শিক্ষার ফলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে।

**ভর্তির বয়স**

৬. বর্তমানে চালু ৬+ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হবে।

৭. প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ : ৩০। এ লক্ষ্য পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে অর্জন করা হবে।

**বিদ্যালয়ের পরিবেশ**

৮. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক/শিক্ষিকার আচরণ যেন শিক্ষার্থীদের কাছে বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করে তোলে সেদিকে নজর দেওয়া হবে এবং শিক্ষা পদ্ধতি হবে শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দদায়ক, চিত্তাকর্ষক, পঠনে আগ্রহ সৃষ্টির সহায়ক।

৯. সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীর সুরক্ষার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

**শিক্ষা-সামগ্রী**

১০. প্রাথমিক শিক্ষার নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম-কাঠামো অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য পৃথক বিষয়-ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা এবং শ্রেণীগত যোগ্যতা নির্ধারণ করে বিষয়-ভিত্তিক শিক্ষা সামগ্রী যথা পাঠ্যপুস্তক এবং প্রয়োজনবোধে সম্পূরক পঠন সামগ্রী এবং অনুশীলন পুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা (বিশ্লেষণ, উদাহরণ ও অনুশীলন সংবলিত পুস্তক) প্রণয়ন করবে। সকল পাঠ্যপুস্তক সহজ ও সাবলীল ভাষায় রচিত, আকর্ষণীয় এবং নির্ভুল করা হবে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে।

**ঝরে পড়া সমস্যার সমাধান**

১১. দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য উপবৃত্তি সম্প্রসারণ করা হবে।

১২. স্কুলের পরিবেশ আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তোলা হবে। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য খেলাধুলার সুব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের আগ্রহ, মমত্ববোধ ও সহানুভূতিশীল আচরণ এবং পরিচ্ছন্ন ভৌত পরিবেশসহ উল্লেখযোগ্য উপকরণের উন্নয়ন ঘটানো হবে। ছেলে-মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা হবে। শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হবে।

১৩. দুপুরের খাবার ব্যবস্থা করা জরুরি। পিছিয়ে পড়া এলাকাসহ গ্রামীণ সকল বিদ্যালয়ে দুপুরে খাবার ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে।

১৪. পাহাড়ি এলাকায় এবং দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ে হোস্টেলের ব্যবস্থা করার দিকে নজর দেওয়া হবে।

১৫. হাওর, চর এবং একসঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয় এমন এলাকার বিদ্যালয়ে সময়সূচি এবং ছুটির দিনসমূহের পরিবর্তন করার সুযোগ থাকবে। এ সকল বিষয়ে স্থানীয় সমাজভিত্তিক তদারকি ব্যবস্থার সুপারিশে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

১৬. মেয়ে শিশুদের মধ্যে ঝরে পড়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অধিক হওয়ায় তারা যাতে ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। মেয়ে শিক্ষার্থীরা যেন বিদ্যালয়ে কোনোভাবে উত্যক্ত না হয় তা নিশ্চিত করা হবে।

১৭. বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণী শেষ করার আগে প্রায় অর্ধেক এবং যারা পরবর্তী পর্যায়ে যায় তাদের প্রায় ৪০ শতাংশ দশম শ্রেণী শেষ করার আগে ঝরে পড়ে। ঝরে পড়া দ্রুত কমিয়ে আনা জরুরি। ২০১৮ সালের মধ্যে সকল শিক্ষার্থী যেন অষ্টম শ্রেণী শেষ করে সেই লক্ষ্যে উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলোসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণ করা হবে।

### আদিবাসী শিশু

১৮. আদিবাসী শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা শিখতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে। এই কাজে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে, আদিবাসী সমাজকে সম্পৃক্ত করা হবে।

১৯. আদিবাসী প্রান্তিক শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে।

২০. আদিবাসী অধ্যুষিত (পাহাড় কিংবা সমতল) যেসকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। যেহেতু কোনো কোনো এলাকায় আদিবাসীদের বসতি হালকা তাই একটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আবাসিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হলে সেদিকেও নজর দেওয়া হবে।

### প্রতিবন্ধী শিশু

২১. সবধরণের প্রতিবন্ধীর জন্য প্রয়োজনানুসারে বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবন্ধীবান্ধব সুযোগ-সুবিধা, যেমন- শৌচাগার ব্যবহারসহ চলাফেরা করা ও অন্যান্য সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

২২. প্রতিবন্ধীদের বিশেষ প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশেষ বিবেচনা করা হবে।

২৩. প্রত্যেক পিটিআইতে বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর কমপক্ষে একজন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

### পথশিশু ও অন্যান্য অতিবঞ্চিত শিশু

২৪. এদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনার এবং ধরে রাখার লক্ষ্যে বিনা খরচে ভর্তির সুযোগ, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, দুপুরের খাবার ব্যবস্থা এবং বৃত্তিদানসহ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিদ্যালয়ে তাদের সুরক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

### বিভিন্ন ধরনের এবং এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বিদ্যমান প্রকট বৈষম্য

২৫. এই বৈষম্য ধাপে ধাপে কমিয়ে আনা হবে। সেই লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া এলাকাসমূহে অবস্থিত স্কুলসহ গ্রামীণ বিদ্যালয়সমূহকে পরিকল্পিত কর্মসূচির ভিত্তিতে বিশেষ সহায়তা দেওয়া হবে, যাতে কয়েক বছরের মধ্যে বৈষম্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে।

### শিক্ষণ পদ্ধতি

২৬. শিশুর সৃজনশীল চিন্তা ও দক্ষতার প্রসারের জন্য সক্রিয় শিক্ষণ-পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীকে এককভাবে বা দলগতভাবে কার্য সম্পাদনের সুযোগ দেওয়া হবে। ফলপ্রসূ শিক্ষাদান পদ্ধতি উদ্ভাবন, পরীক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা উৎসাহিত করা হবে এবং সেজন্য সহায়তা দেওয়া হবে।

### শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

২৭. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণীতে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু থাকবে। পঞ্চম শ্রেণী শেষে উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে সকলের জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অষ্টম শ্রেণী শেষে আপাতত: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা নামে একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এই পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে।

### বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নে তদারকি এবং তাতে জনসম্পৃক্ততা

২৮. বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে নির্বাচিত ও পদাধিকারবলে অন্তর্ভুক্ত সদস্য সম্বলিত ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আরো সক্রিয় করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কমিটিকে প্রয়োজনে আরো ক্ষমতা দেওয়া হবে। তবে পাশাপাশি কমিটির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

২৯. সক্রিয় অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি প্রতিষ্ঠা করে অভিভাবকদেরকে বিদ্যালয় এবং তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার বিষয়ে আরো উৎসাহী করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

### শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকদের পদোন্নতি

৩০. প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা পাশ এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর জন্য দ্বিতীয় বিভাগসহ স্নাতক ডিগ্রিধারী মহিলা বা পুরুষ। তবে নিচের শ্রেণীতে মহিলা শিক্ষকদের প্রাধান্য দেওয়া হবে। যোগদানের পর সর্বোচ্চ তিন বছরের মধ্যে এ সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে এবং সি-ইন-এড/বি.এড অর্জন করতে হবে। প্রধান শিক্ষকের সরাসরি নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং যোগদানের পর সর্বোচ্চ তিন বছরের মধ্যে সি-ইন-এড বা বি.এড (প্রাইমারি) ডিগ্রি অর্জন করতে হবে। শিক্ষকদের স্তর এবং বেতন স্কেল যথোপোযুক্ত বিন্যাস করে (যথা- সহকারী শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক) তাদের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষকদের উৎসাহিত করা হবে। অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে শিক্ষকদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বিবেচনায় নিয়ে তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা হবে; পাশাপাশি তাদের জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করা হবে।

৩১. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং কর্মকালীন প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। প্রয়োজনবোধে ও সম্ভাব্যক্ষেত্রে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। দেশে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ ক্ষমতা বাড়ান হবে।

৩২. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সঙ্গে পদোন্নতির যোগসূত্র স্থাপন করা আবশ্যক বলে উচ্চতর ডিগ্রিধারী এবং প্রশিক্ষিত যোগ্যতাসম্পন্নব্যক্তিদের সরাসরি নিয়োগ এবং ত্বরান্বিত পদোন্নতির মাধ্যমে উচ্চতর পদ পূরণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রয়োজনে পদ উন্নীত (আপগ্রেইডিং) করা হবে। তবে এর জন্য যথাযথ বিধি-বিধান তৈরি করা হবে।

### শিক্ষক নির্বাচন

৩৩. সরকারি অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ি মাদরাসা সমূহের জন্য মেধাভিত্তিক ও উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ একটি বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। এই কমিশন শিক্ষা ও প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হবে। যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে কমিশন শিক্ষক নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পাদন করবে। এই নির্বাচন উপজেলা বা জেলা ভিত্তিক হবে। কমিশন দ্বারা নির্বাচিতদের মধ্য থেকে যথাযথ নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেবে। বিদ্যালয়গুলোতে প্রত্যেক বছর কতজন শিক্ষক প্রয়োজন তা উপজেলা/থানা ভিত্তিক সমন্বয় করে কমিশনকে জানাবে- আর এই ভিত্তিতে এক বছরের জন্য বিষয়ওয়ারী শিক্ষক নির্বাচনের উপজেলা/থানা ভিত্তিক লক্ষ্য স্থির করা হবে। এই কমিশনকে মাধ্যমিক ও বেসরকারি (সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত) ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হবে।

### বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ

৩৪. বিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মূলত প্রধান শিক্ষকের ওপর; তাই এই দায়িত্ব দক্ষতার সাথে যাতে প্রধান শিক্ষকগণ পালন করতে পারেন সেজন্য তাঁদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের বহিঃতত্ত্বাবধানের ও পরিবীক্ষণের কাজ যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করা আবশ্যক। একাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে (যেমন- এটিপিও) বাস্তবসম্মতভাবে বিদ্যালয়ের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে যাতে তাঁরা তত্ত্বাবধায়ন ও পরিবীক্ষনের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন।

### অন্যান্য

৩৫. প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বাড়ান হবে। কোন্ গ্রামে বিদ্যালয় নেই বা কোন্ গ্রামে আরো বিদ্যালয় প্রয়োজন তা জরিপের মাধ্যমে স্থির করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হবে।

৩৬. ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ)-কে অভীষ্ট মানের শীর্ষ পর্যায়ের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে যেন তা কার্যকরভাবে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে: পিটিআইগুলোর অ্যাকাডেমিক স্টাফদের এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও প্রকল্পভুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, মৌলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম তৈরি ও অনুমোদন, প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান, প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা পরিচালনা ও ডিপ্লোমা প্রদান করা, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা, কর্মশালা, সম্মেলন পরিচালনা ইত্যাদি।

৩৭. সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমগ্র জাতিকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

৩৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আচরণিক সচেতনতা (যেমন নখ কাটা, হাত ধোয়া, দাঁত পরিস্কার করা ইত্যাদি) সৃষ্টি করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

# ৩ বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিককে সাক্ষর করে তোলা। বিশাল নিরক্ষর জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বর্তমানে পনের বছরের বেশি বয়সীদের সাক্ষরতার হার শতকরা ৪৯, অর্থাৎ পনের বছরের বেশি বয়সীদের শতকরা ৫১ ভাগ এখনও নিরক্ষর। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অপ্রতুলতা ও অনমনীয়তা এবং অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও দারিদ্র্যের কারণে দেশে বিরাজমান নিরক্ষরতা ব্যাপক। নানা কারণে অনেক ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না বা ভর্তি হয়েও পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে না। নিরক্ষরতা সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ও শিক্ষা-বিষয়কে ভিত্তি করে বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে কার্যকর গণশিক্ষার বিস্তার তাই জরুরি।

**বয়স্ক শিক্ষা**

বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সাক্ষর, লেখা-পড়া ও হিসাব-নিকাশে ন্যূনতমভাবে দক্ষ, মানবিক গুণাবলির চেতনায় উদ্দীপ্ত, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতন এবং পেশাগত দক্ষতায় উন্নত করে তোলা। প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত এবং প্রাপ্ত বয়স্ক সকলকে সাক্ষর করে না তোলা পর্যন্ত বয়স্ক শিক্ষার এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে।

**উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা**

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক ব্যবস্থা। প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত যে সকল শিশু-কিশোর বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না এবং যারা ঝরে পড়ে যায় এই ব্যবস্থায় তারা মৌলিক শিক্ষা লাভ করবে এবং কিছু ব্যবহারিক শিক্ষাও পাবে যা তারা প্রয়োজনে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনকারী যোগ্যতাসম্পন্ন শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে।

**কৌশল**

**বয়স্কশিক্ষা**

১. বয়স্ক শিক্ষার আওতায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে সাক্ষরতা শিক্ষা, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ, সচেতনতা অর্জন ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন।

২. দেশের সকল নিরক্ষর নারী-পুরুষের জন্য এই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। তবে নিরক্ষরদের মধ্যে যাদের বয়স পনের থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর এক্ষেত্রে তারা অগ্রাধিকার পাবে।

৩. বয়স্ক শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। বয়স্ক সাক্ষরতা কোর্স ব্যতিত অন্যান্য কোর্সের সময়সীমা, বিষয়বস্তু, পঠন-পাঠনের পদ্ধতি, শিক্ষকের যোগ্যতা ও শিক্ষণ-প্রক্রিয়া, স্থানীয় ও প্রবাসী জনমানুষের চাহিদা, সম্পদের প্রাপ্যতা ও পেশাগোষ্ঠীর প্রকৃতি অনুসারে নির্ধারিত হবে। জাতীয় গণশিক্ষার শিক্ষাক্রম-বিষয়ক কমিটি প্রয়োজনে শিক্ষার অন্যান্য ধারার যেমন- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ, কৃষি, বন ও পরিবেশ, মৎস্য ও পশুপালন ইত্যাদির সঙ্গে সমন্বয় রেখে এবং বিদেশে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণের বিষয়টি বিবেচনা করে উপযুক্ত বিষয়াদির শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হবে।

৪. অর্জিত শিক্ষা ও দক্ষতাকে অটুট রাখার জন্য অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। গ্রামে পাঠ-অনুশীলন-চক্র ও গ্রামশিক্ষা-মিলনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৫. সমন্বিত সাক্ষরতা অভিযানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজ বিভিন্ন পদ্ধতি, উপকরণ, প্রক্রিয়া ও অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সমন্বয় ঘটিয়ে যথাসম্ভব কম সময়ে দেশ থেকে নিরক্ষতা দূর করার চেষ্টা করা হবে। বিভিন্ন ধরনের বাস্তব উদ্যোগ উৎসাহিত করা হবে এবং মূল্যায়ন সাপেক্ষে যে উদ্যোগ বিশেষভাবে কার্যকর প্রতীয়মান হবে সেটিকে জোরদার করার লক্ষ্যে সহায়তা দেওয়া হবে। এই লক্ষ্যে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি **মূল্যায়ন কমিটি** গঠন করা হবে।

৬. স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ করে ছুটির সময় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে সংক্ষিপ্ত ও কার্যকর শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে দেশে বিভিন্ন মহল কর্তৃক পরিচালিত/উদ্ভাবিত বয়স্ক শিক্ষাদান পদ্ধতি বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৭. সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনায় বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিও ব্যবহার করা হবে।

### উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

৮. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার বয়স আট বছর থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

৯. প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার উপকরণ প্রণীত হবে। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার উপকরণে জাতীয় চাহিদার প্রতিফলন থাকবে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা যায় এমন উপকরণ দ্বারাই উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হবে। গণশিক্ষার শিক্ষাক্রম বিষয়ক একটি টেক্‌নিক্যাল কমিটি বিভিন্ন উপকরণ পর্যালোচনা করে মানসম্মত উপকরণাদির অনুমোদন দেবে।

১০. বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য উৎসাহিত করা হবে। দেশের অনগ্রসর এলাকা এবং অতিবঞ্চিত শিশুদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই শিক্ষাক্রমের আওতায় আনার চেষ্টা করা হবে।

১১. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদানে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষ করা হবে।

### গণশিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মোদ্যোগের সমন্বয়

১২. গণশিক্ষার ক্ষেত্রে সকল কর্মোদ্যোগের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৩. গণশিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং জাতীয় গণমাধ্যমের ভূমিকা সমন্বিত করা হবে।

### গণশিক্ষা সংক্রান্ত আইন

১৪. গণশিক্ষা প্রসারের জন্য যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা পূরণ করার জন্য প্রয়োজনে যথাযথ আইনগত কাঠামো প্রবর্তন করা হবে।

### জাতীয় জাগরন ও স্বেচ্ছা সেবক

১৫. সাক্ষরতার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সামগ্রীকভাবে জাতীয় জাগরন সৃষ্টি করা হবে। সকল শিক্ষিত মানুষকে এ কাজে কিছু না কিছু অবদান রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১৬. সাক্ষরতা আন্দোলন সফল করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা হবে।

১৭. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাক্ষরতা আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা হবে।

# ৪ মাধ্যমিক শিক্ষা

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

নতুন শিক্ষা কাঠামোয় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। এই স্তরের শিক্ষাশেষে শিক্ষার্থীরা সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ধারায় যাবে, নয়তো অর্জিত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত্তিতে বা আরো বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকার্জনের পথে যাবে। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা।
- কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য, বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, একটি পর্যায়ের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা।
- মানসম্পন্ন শিক্ষাদান করে প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার ভিত শক্ত হবে।
- বিভিন্নরকমের মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর জন্যও যতদিন প্রয়োজন বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতি সমর্থন করা।
- নির্ধারিত বিষয়ে সকল ধারায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।

**কৌশল**

**শিক্ষার মাধ্যম**

১. এই পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে মূলত বাংলা তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য-অনুযায়ী নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি ইংরেজি মাধ্যমেও শিক্ষা দেওয়া যাবে। বিদেশীদের জন্য সহজ বাংলা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

**শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক**

২. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে তিনটি ধারা থাকবে সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষাধারা এবং প্রত্যেক ধারা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত থাকবে। সব ধারাতেই জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে যথা- বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক থাকবে। প্রত্যেক ধারায় এসকল বিষয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। অবশ্য প্রত্যেক ধারায় সেই ধারা-সংশ্লিষ্ট আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিভিন্ন বিষয় থাকবে।

৩. ধারাসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ধারার শিক্ষায় উৎকর্ষ অর্জনের প্রয়োজন-ভিত্তিক বিন্যাস এবং সেই অনুসারে স্ব স্ব শিক্ষাক্রম তৈরি করা হবে।

৪. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি সকল ধারার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে।

৫. মাধ্যমিক স্তরে মাদরাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ বিষয়সমূহ ব্যতীত সকল ধারার জন্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং সাধারণ ধারার বিশেষ বিষয়সমূহের প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। মাদরাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ বিষয়সমূহের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে যথাক্রমে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ।

**অবকাঠামো এবং শিক্ষক ও স্টাফ**

৬. বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন করা হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম ও দশম শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করা হবে। এই লক্ষ্যে বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণী কক্ষ ও বিভিন্ন আসবাবপত্র ও শিক্ষা-সরঞ্জাম বৃদ্ধি করা হবে। উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে উচ্চতর শ্রেণীসমূহে পাঠদানের জন্য ইংরেজিসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। পদক্ষেপগুলির বাস্তবায়নে অর্থের জোগানের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

৭. সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে। খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হবে। গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিক পদ সৃষ্টি করে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হবে।

৮. বিজ্ঞান-শিক্ষাদানকারী প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি-সংবলিত বিজ্ঞানাগার থাকতে হবে এবং এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

**সুযোগবঞ্চিত শিক্ষার্থী ও অনগ্রসর অঞ্চল**

৯. বিভিন্ন কারণে সংকুচিত সুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অগ্রসর শিক্ষার্থীদের অনুরূপ সম-সুযোগ সৃষ্টি এবং বিভিন রকমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহের অনুরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও প্রযুক্তির উন্নয়ন**

১০. অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে অধিক সম্পর্কিত সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায়-শিক্ষা শাখার বিষয়সমূহ (যেমন অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবসায়-শিক্ষা), কারিগরি শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি কম্পিউটার এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়গুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত সরকারি সহায়তা (যেমন শিক্ষকের বেতন-ভাতা, বিজ্ঞানশিক্ষার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ইত্যাদি) প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

**শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত**

**১১.** শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে **১ : ৩০**-এ উন্নীত করা হবে।

**শিক্ষক-নিয়োগ**

**১২.** সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ প্রস্তাবিত বেসরকারি **শিক্ষক নির্বাচন কমিশন** প্রতি বছর যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ধারার জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচন করবে

এবং তাঁদের মধ্য থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ করবে (বিস্তারিত অধ্যায়-২৭)।

**শিক্ষক-প্রশিক্ষণ**

১৩. সকল বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণকে অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য কাজে যোগদানের আগে মৌলিক শিক্ষকতা-প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। শূন্যপদ পূরণের সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

**শিক্ষার্থী-মূল্যায়ন**

১৪. দশম শ্রেণী শেষে জাতীয় ভিত্তিতে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষার নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে। দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে অরো একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, এর নাম হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। উভয় পরীক্ষা হবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে এবং পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে। (বিস্তারিত অধ্যায় -২১)।

**পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ**

১৫. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রশাসনিকভাবে নিয়মিত ও কার্যকর পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

**অন্যান্য**

১৬. সকল ক্যাডেট কলেজ মৌলিক বিষয়সমূহে অভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ এবং সাধারণ ধারায় পাবলিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবে।

১৭. 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন যেহেতু একটি বিদেশি ধারায় হয় সেহেতু 'ও' এবং 'এ' লেভেলকে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হবে। সরকারি অনুমোদনসাপেক্ষে এই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। তবে উভয়ক্ষেত্রে সাধারণ ধারার সমপর্যায়ের বাংলা এবং বাংলাদেশ স্টাডিজ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ দু'টি বিষয় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে 'ও'লেভেল উত্তীর্ণকে এস.এস.সি এবং 'এ' লেভেল উত্তীর্ণকে এইচ.এস.সি-র সমমান হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

১৮. সংস্কৃত ও পালি বিষয়ে প্রচলিত আদ্য, মধ্য ও উপাধি কোর্সটি প্রয়োজনীয় সংস্কারসহ অব্যাহত থাকবে। এক্ষেত্রে সব ধারার জন্য অভিন্ন বিষয় বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তির সাথে ধারা সংশ্লিষ্ট আবশ্যিক বিষয় সংস্কৃত ও পালি শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি আধুনিক শিক্ষা কোর্স প্রচলন করা হবে।

১৯. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশের আলোকে সনাতন পদ্ধতির সংস্কৃত ও পালি শিক্ষার সার্টিফিকেট / উপাধির সমতাবিধান করা হবে।

# ৫ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

দক্ষ জনশক্তি জাতীয় উন্নয়নের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নকৌশল ও পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অসম ও প্রতিকূল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এ অসম-প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগসৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদাবৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তিসহ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। লক্ষণীয় যে, বর্তমানে গ্রামে কৃষি থেকে শুরু করে যান্ত্রিক নৌকা, যন্ত্রচালিত আখ মাড়াইয়ের মেশিন, রাইস মিল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুতায়ন, পাওয়ার লুম, যন্ত্রচালিত তাঁত ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে।এগুলোর উন্নতি ছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তি (ICT)-র সংযোজন ঘটাতে হবে। দেশের প্রয়োজন ছাড়াও বিদেশে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই চাহিদা আরো বাড়বে। কাজেই দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় অনেক বৃদ্ধি সম্ভব। অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনায় রেখে দক্ষ জনশক্তি তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :-

- দেশ ও বিদেশের চাহিদা বিবেচনায় রেখে সকল ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগসৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদাবৃদ্ধির লক্ষ্যে এ শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা ।
- দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় বৃদ্ধি করা।

**কৌশল**

১. দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের সকল ধারায় প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাক্রম চালু করা হবে। প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাসহ আট বছর মেয়াদি শিক্ষা অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে।

২. অষ্টম শ্রেণী সমাপ্ত করার পর অর্থাৎ প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ একজন শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষা ধারায় ভর্তি হতে পারবে। এই ধারায় যারা যাবে তারা যেন ধাপে ধাপে তাদের নির্বাচিত কারিগরি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে ।

৩. অষ্টম শ্রেণী সমাপ্ত করার পর যারা কোনো মূল ধারায় পড়বে না তারা ছয়মাসের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জাতীয় দক্ষতামান-১ জনশক্তি হিসেবে পরিচিত হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় নবম, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণী সমাপ্ত করে একজন যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতামান ২, ৩ ও ৪ অর্জন করতে পারবে।

৪. অষ্টম শ্রেণী সমাপ্ত করার পর শিল্প-কারখানা এবং উপজেলা ও জেলাপর্যায়ে স্থাপিত সরকারি টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট বা বেসরকারি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে দেওয়া ১, ২ ও ৪ বছরের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়েও যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতামান ২, ৩ ও ৪ অর্জন করতে পারবে।

৫. এস.এস.সি.পরীক্ষায় উত্তীর্ন শিক্ষার্থীরা এবং জাতীয় দক্ষতামান-৪ এর সনদধারীরা ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য ডিপ্লোমা / বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (একাদশ-দ্বাদশ) / ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স (একাদশ-দ্বাদশ) / সমমানের কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। তবে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৬. কারিগরি ডিপ্লোমা পর্যায়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে যোগ্যতা যাচাই করে ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্নাতক পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা কোর্সে (ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, কৃষি ইত্যাদি) ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে।

৭. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ : ১২।

৮. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সকল শিক্ষাক্রমে যথাযথ দক্ষতা অর্জনের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সকল স্তরের শিক্ষাক্রমে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৯. ১৯৬২ সালের শিক্ষানবিশি আইনকে যুগোপযোগী করে দেশে ব্যাপক ভিত্তিতে শিক্ষানবিশ (অ্যাপ্রেনটিসশিপ) কার্যক্রমের প্রবর্তন করা হবে।

১০. প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

১১. সর্বস্তরের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিল্প কারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সকল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ভিটিটিআই ও টিটিটিসি-র আসন এবং প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হবে।

১২. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত মানসম্মত পুস্তক প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হবে।

১৩. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। এছাড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, লেদার ইনস্টিটিউটসহ এ ধরণের অন্যান্য ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

১৪. মাধ্যমিক স্কুল/বৃত্তিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদিতে কারিগরি শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

১৫. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সুসংহত করার জন্য দেশের সমস্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হবে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে অধিকতর শক্তিশালী করা হবে এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান ও জনবলের ব্যবস্থা করা হবে।

১৬. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হবে।

১৭. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ঘাটতি পূরণের জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হবে।

১৮. নতুন নতুন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এবং সেগুলোর ব্যবস্থাপনা পর্যায়ক্রমে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে। তবে এগুলোতে অস্বচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েদের স্বল্প ব্যয়ে পড়ার সুযোগ থাকবে।

১৯. প্রকৌশল ডিপ্লোমা ও অন্যান্য ডিপ্লোমা পর্যায়ের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোর্সগুলো দুই শিফটে চালু করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তবে নির্ধারিত পাঠদান সময় মানসম্মত পর্যায়ে বজায় রেখে এ ব্যবস্থা করা হবে।

২০. বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুবিধাদি ব্যবহার করে সান্ধ্যকালীন ও খণ্ডকালীন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে স্কুল পরিত্যাগকারী ও বয়স্কদের স্থানোপযোগী বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান করে তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার চেষ্টা করা হবে।

২১. যারা অষ্টম শ্রেণী বা মাধ্যমিক পর্যায়ের যে কোনো শ্রেণীর পরবর্তী পর্যায়ে যে কোনো (আর্থিক, পারিপার্শ্বিক) কারণে পড়বে না তাদেরকে বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং তারা যাতে তাদের নির্বাচিত কারিগরি শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তাস্বরূপ উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। যুক্তিসঙ্গত স্বল্প সময়ের মধ্যে এরকম শিক্ষার্থীদের অধিকাংশকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমে নিয়ে আসা হবে।

২২. বেসরকারি খাতে মানসম্পন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে এবং এমপিওভুক্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান এবং যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জামসহ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

২৩. যে সকল দেশে আমাদের দেশের মানুষ কাজ করতে যায় সে সকল দেশের শ্রম বাজার বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা হবে এবং ঐ সকল দেশের ভাষার নূন্যতম জ্ঞান লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে ।

২৪. দেশ-বিদেশের কর্মবাজারের চাহিদার আলোকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পর্যায়ের সকল কারিকুলাম নিয়মিতভাবে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হবে।

২৫. ভবিষ্যতে কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।

# ৬ মাদ্‌রাসা শিক্ষা

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

মাদ্‌রাসা শিক্ষায় ইসলাম ধর্ম শিক্ষার সকল প্রকার সুযোগ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার্থীরা যেন ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী অনুধাবনের পাশাপাশি জীবনধারণ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী হয় ও তার উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা রাখতে পারে তার জন্য যথার্থ জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা করা হবে। সাধারণ বা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতায় তারা যেন সমানভাবে অংশ নিতে পারে সেজন্য মাদ্‌রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ ঃ

- শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রাসূল (সা:)-এর প্রতি অটল বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবনে সমর্থ করে তোলা।
- দ্বীন ও ইসলামের ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য অনুকরণীয় চরিত্র গঠণ এবং ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার সম্পর্কে জনগোষ্ঠিকে সচেতন করা ও ধর্ম অনুমোদিত পথে জীবন-যাপনের জন্য তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করার উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা।
- শিক্ষার্থীরা এমনভাবে তৈরি হবে যেন তারা ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী ভাল করে জানে ও বোঝে, সে অনুসারে নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই আদর্শ ও মূলনীতির প্রতিফলন ঘটায়।
- শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অন্যান্য ধারার সঙ্গে মাদরাসা শিক্ষায় সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করা।

**কৌশল**

১. বর্তমানে মাদ্‌রাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে একে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে এ শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়।

২. বর্তমানে বাংলাদেশে ইবতেদায়ি পাঁচ বছর, দাখিল পাঁচ বছর, আলিম দুই বছর, ফাযিল দুই বছর ও কামিল দুই বছর মেয়াদি ব্যবস্থা রূপে প্রচলিত আছে। সবধরনের মাদরাসার পুনর্বিন্যাস করে অন্যান্য ধারার সঙ্গে সমতা রক্ষার লক্ষ্যে ইবতেদায়ি আট বছর , দাখিল দুই এবংআলিম দুই বছর করা হবে। সাধারণ ধারায় উচ্চশিক্ষার সাথে সমন্বয় রেখে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক ও অন্যান্য উপকরণ নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে ৪ (চার) বছর মেয়াদি ফাজিল অনার্স এবং এক বছর মেয়াদি কামিল কোর্স চালু করা হবে।তবে যতদিন পর্যন্ত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক ও অন্যান্য উপকরণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না ততদিন পর্যন্ত ফাযিল ও কামিল কোর্সের বর্তমান মেয়াদ অব্যাহত থাকবে।

৩. শিক্ষার অন্যান্য ধারার সঙ্গে সমন্বয় রেখে ইবতেদায়ি পর্যায়ে নির্দিষ্ট শ্রেণীর শিক্ষাক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ, অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, গণিত ,নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরন করা হবে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হবে। দাখিল পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয় বাধ্যতামূলক থাকবে।

৪. সাধারণ শিক্ষার মতো মাদ্‌রাসা শিক্ষার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা কাঠামো নির্ধারণ করা হবে এবং তাদের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সমভাবে উন্মুক্ত রাখা হবে। এই উদ্দেশ্যে গাজীপুরে স্থাপিত মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্য প্রযোজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৫. কওমি মাদরাসার ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি কওমি মাদ্‌রাসা শিক্ষা কমিশন'করে, উক্ত কমিশন কওমি প্রক্রিয়ায় ইসলাম শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাদান বিষয়ে সুপারিশ তৈরি করে সরকারের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে।

৬. অন্যান্য ধারার মতো একই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মাধ্যমে ইবতেদায়ি ও দাখিল পর্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হবে যেন শিক্ষার্থীগণ দেশে ও বিদেশে নিয়োগক্ষেত্রে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ পায়। এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মাদরাসাগুলোতে পর্যায়ক্রমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার মতো শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ সাপেক্ষে বিজ্ঞানাগার স্থাপন এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদির সৃষ্টি করা হবে।

৭. সাধারণ শিক্ষার মতো মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ, বৃত্তিদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হবে।

৮. মাদ্‌রাসা শিক্ষার ইবতেদায়ি, দাখিল ও আলিম স্তরে স্বীকৃতি প্রদান, নবায়ন, ধর্মীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পরীক্ষাগ্রহণ, সনদ প্রদান ইত্যাদি কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডকে প্রয়োজনের নিরিখে পুনর্গঠন করে আরও সুসংগঠিত ও কার্যকর করা হবে।

৯. সাধারণ শিক্ষা ধারায় অনুসৃত শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষা ধারায় অনুসরণ করা হবে ।

১০. মাদ্‌রাসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই শিক্ষার সকল স্তরে সুচারুরূপে পরিচালনা ও তদারকির জন্য সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিতরূপে পরিবীক্ষণ ও অ্যাকাডেমিক পরিদর্শনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১. মাদ্‌রাসা শিক্ষার উচ্চ অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পাঠদান করা হবে।

১২. মাদ্‌রাসা শিক্ষার উচ্চ অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে শিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, শিক্ষাঙ্গনগুলোর তদারকি ও পরিবীক্ষণ এবং পরীক্ষা-পরিচালনাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বর্তমানে কুষ্টিয়াস্থ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত। একটি নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই বিশাল দায়িত্ব পালন দুরূহ। উল্লিখিত কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য একটি অনুমোদনকারী (অ্যাফিলিয়েটিং) ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

# ৭ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি, আচরণগত উৎকর্ষসাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন।

এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- প্রচলিত ব্যবস্থাকে গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান।
- প্রত্যেক ধর্মে ধর্মীয় মৌল বিষয়সমূহের সঙ্গে নৈতিকতার উপর জোর দেওয়া এবং ধর্মশিক্ষা যাতে শুধু আনুষ্ঠানিক আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেয়া।

**কৌশল**

ক. ধর্ম শিক্ষা

- ইসলামধর্ম শিক্ষা

১. শিক্ষার্থীদের মনে আল্লাহ, রাসুল(সা:) ও আখিরাতের প্রতি অটল ঈমান ও বিশ্বাস যাতে গড়ে ওঠে এবং তাদের শিক্ষা যেন আচার সর্বস্ব না হয়ে তাদের মধ্যে ইসলামের মর্মবাণীর যথাযথ উপলব্ধি ঘটায় সেভাবে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হবে।

২. ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে।

৩. কলেমা, নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাতের তাৎপর্য বর্ণনাসহ ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক যথার্থভাবে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হবে।

৪. শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জন, সৎ সাহস ও দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা হবে।

- হিন্দুধর্ম শিক্ষা

১. প্রকৃতি ও পরিবেশকে জানার মধ্য দিয়ে সবকিছুর মূলে যে ঈশ্বর আছেন, ধর্মের মূল যে ঈশ্বর, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা দেওয়া হবে।

২. হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে।

৩. নীতিবোধ জাগ্রত করার সহায়ক হিসেবে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের গল্প-উপাখ্যান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হবে।

৪. শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জন, সৎ সাহস ও দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা হবে।

- বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

    ১. সিদ্ধার্থের বিভিন্ন বিদ্যা শিক্ষায় পারদর্শিতা, চার নিমিত্ত দর্শন, মার বিজয় ও অন্তিম উপদেশের বিষয়ে পাঠদান করা হবে।

    ২. বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে। ।

    ৩. গৌতম বুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত কাহিনী ও গল্পের মাধ্যমে নীতিবোধ জাগ্রত করা এবং পার্থিব জীবনের সুখ-বিলাস, অর্থ-সম্পদ যে কিছুই সঙ্গে যাবে না, কর্মই জীবনের একমাত্র পাথেয় গুরুত্বসহকারে সেই শিক্ষা দেওয়া হবে।

    ৪. শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জন, সৎ সাহস ও দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা হবে।

- খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা

    ১. যিশুর জীবন, কাজ ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে জীবনের পূর্ণতা লাভের পথ ও পরামর্শ এবং নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

    ২. খ্রিষ্ট ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে।

    ৩. শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ জীবন-যাপন করা এবং অন্যদের সুস্থ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন-যাপনে সাহায্য করতে শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে তৈরি করে গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হবে।

    ৪. শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জন, সৎ সাহস ও দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা হবে।

- **অন্যান্য ধর্ম**

    আদিবাসীসহ অন্যান্য সম্প্রদায় যারা দেশে প্রচলিত মূল চারটি ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী তাঁদের জন্য নিজেদের ধর্মসহ নৈতিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

## খ. নৈতিক শিক্ষা

নৈতিকতার মৌলিক উৎস ধর্ম। তবে সামাজিক ও সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং দেশজ আবহও গুরুত্বপূর্ণ উৎস। নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে এসকল বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে নৈতিক শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে।

# ৮ উচ্চশিক্ষা

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জ্ঞান সঞ্চারণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সেই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলোর জন্য স্বশাসন ব্যবস্থা অপরিহার্য। তবে তা যথানিয়মে নির্ধারিত নীতিমালার আওতায় বাস্তবায়িত হবে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ প্রস্তাবিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সরকারি তদারকির ব্যবস্থা থাকবে। বর্তমানে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানসাধনায় নিযুক্ত বিশেষজ্ঞগণ আপন বিষয়ে গভীরতা অর্জনের প্রয়োজনে তাঁদের সাধনার ক্ষেত্রকে ক্রমাগত সঙ্কুচিত করছেন, ফলে জ্ঞানের জগতে বিভাজন ঘটছে। অন্যদিকে একটি বিপরীত প্রক্রিয়াও চলছে অর্থাৎ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয় পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও বিশ্বজগত সম্পর্কে অভিনব উপলব্ধি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই জ্ঞানের জগতে সকল বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি অতিক্রম করে একটি সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বর্তমানে প্রচলিত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের মতো একটি স্বাধীন দেশের প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মেটাতে সমর্থ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থায় পুনর্বিন্যাস আবশ্যক। মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং ক্ষেত্রবিশেষে (যথা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসায়) বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে পারে সেই আলোকে বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নিয়মানুসারে চালিত হতে হবে।

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ ঃ

- কার্যকরভাবে বিশ্বমানের শিক্ষাদান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগানো এবং মানবিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা দান।
- অবাধ বুদ্ধিচর্চা, মননশীলতা ও চিন্তার স্বাধীনতা বিকাশে সহায়তাদান করা।
- পাঠদান পদ্ধতিতে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে দেশের বাস্তবতাকে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, রাষ্ট্র ও সমাজের সমস্যা সনাক্ত করা ও সমাধান বের করা।
- নিরলস জ্ঞানচর্চা ও নিত্যনতুন বহুমুখী মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার ভেতর দিয়ে জ্ঞানের দিগন্তের ক্রমসম্প্রসারণ।
- আধুনিক ও দ্রুত অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে কার্যকর পরিচিতি ঘটানো।
- জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমুখী, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী নাগরিক সৃষ্টি।
- জ্ঞান চর্চা, গবেষনা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী হতে জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি।
- মেধার বিকাশ এবং সৃজনশীল নতুন নতুন পথ ও পদ্ধতির উদ্ভাবন।
- জ্ঞান সৃজনশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নাগরিক সৃষ্টি।

**কৌশল**

১. বিভিন্ন ধারার মাধ্যমিক শিক্ষা সফলভাবে সমাপ্ত করার পর মেধা, আগ্রহ ও প্রবণতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করবে।

২. মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং আদিবাসীসহ ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, বিভিন্ন কারণে অনগ্রসর এবং অন্যান্য গোষ্ঠির সন্তানদেরকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আবাসিক সুবিধাসৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ ও বৃত্তি প্রদানসহ বিশেষ সহায়তা দেওয়া হবে।

৩. শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে পারে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে (যেমন- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে) উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হবে। কোটা পদ্ধতি বা অন্য কারণে ন্যূনতম যোগ্যতার শর্ত শিথিল করা হবে না।

৪. উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বপ্রকার যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। তারজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫. চার বছরের সম্মান স্নাতক ডিগ্রিকে সমাপনী ডিগ্রি হিসেবে এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষকতা ব্যতীত অন্য সকল কর্মক্ষেত্রে যোগদানের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

৬. যে সকল কলেজে তিন বছর মেয়দি স্নাতক ডিগ্রি কোর্স চালু আছে পর্যায়ক্রমে সেখানে চার বছরের স্নাতক সম্মান ডিগ্রি কোর্স চালু করা হবে।

৭. মাস্টার্স, এম.ফিল বা পি.এইচ.ডি-কে বিশেষায়িত শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং শুধুমাত্র গবেষণা ও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষকতা করতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদেরকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করতে হবে। গবেষণা নিশ্চিত করার জন্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগে পর্যায়ক্রমে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম চালু করে সেখানে নিয়মিতভাবে মাস্টার্স, এম.ফিল ও পি.এইচ.ডি ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। সাধারণত মাস্টার্স এক বছরের, এম.ফিল দু বছরের এবং পিএইচডি রেজিস্ট্রেশনের সময় হতে ছয় বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৮. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন যে সকল কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণী চালু আছে, সেসকল কলেজে এ শ্রেণী অব্যাহত থাকবে। তবে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য তাদের গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানাগার ও অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে এবং শিক্ষকদের মান উন্নয়নে ব্যাপক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সকল কলেজে চার বছরের ডিগ্রি অনার্স কোর্স চালু করা হবে, প্রয়োজনে সেগুলোতেও এই বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে।

৯. বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সকল ডিগ্রি কোর্স পর্যায়ে ১০০ নম্বরের/৩ ক্রেডিট ইংরেজি বিষয় সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

১০. গবেষণার কাজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে একযোগে অংশগ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌলিক গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের গবেষণার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সংখ্যক আকর্ষণীয় মূল্যের গবেষণা অনুদান এবং সম্প্রতি প্রবর্তিত বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ ছাড়াও আরো ফেলোশিপের ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ডিগ্রি কলেজগুলোতে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১১. উচ্চশিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি হবে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের। উচ্চশিক্ষায় বাংলায় সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষায় রচিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যবহারযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ রচনা বাংলা ভাষায় অনুদিত হওয়া প্রয়োজন। এই কাজকে জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উচ্চশিক্ষায় বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ব্যবহার অব্যাহত থাকবে।

১২. উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, শান্তি ও সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থাও থাকবে।

১৩. উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্য শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করা হবে। সরকারি অনুদান ছাড়াও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যয়নির্বাহের জন্য শিক্ষার্থীর বেতন ব্যবহার করতে হবে এবং ব্যক্তিগত অনুদান সংগ্রহের চেষ্টা চালাতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ভর্তি ফি ও বেতন খুবই সামান্য। অভিভাবকের আর্থিক সচ্ছলতার প্রত্যয়ন পত্রের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর বেতন নির্ধারণের চেষ্টা করা হবে। এতে অসচ্ছল অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। অসচ্ছলতা প্রমাণের মূল দায়িত্ব অভিভাবকের উপর ন্যস্ত থাকবে তবে তার জন্য যথাযথ নিয়মনীতি প্রণয়ন করা হবে।

১৪. শিক্ষার্থীর মেধা ও অভিভাবকের আর্থিক সচ্ছলতার নিরিখে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃত্তি প্রদান করা হবে। তাছাড়া মেধাবী শিক্ষার্থীরা মেধার ভিত্তিতে সহজ শর্তে যেন ব্যাংক ঋণ পেতে পারে সে ব্যবস্থা করা হবে।

১৫. বাংলাদেশের বিকাশমান অর্থনীতিতে পাট, বস্ত্র ও চামড়া খাতের বিপুল গুরুত্ব ও সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রেখে পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট, টেক্সটাইল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ অব লেদার টেক্‌নোলজিকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১৬. শিক্ষকদের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি। এলক্ষ্যে ছুটির সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকদের সমন্বয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ-সেমিনারের ব্যবস্থা করা হবে।

১৭. প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ নির্ধারিত অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার (academic calendar) অনুসরণ করবে। নতুন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রদান কোন তারিখে শুরু হবে, কোন পরীক্ষা কখন হবে সহ সারা বছরের কর্মসূচি সংবলিত এই অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার শিক্ষা বছর শুরু হওয়ার আগে মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা হবে।

১৮. দেশের উচ্চশিক্ষার স্বার্থে প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ও শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত উপযুক্ত মানের হতে হবে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নির্বিশেষে বৈষম্যহীন হতে হবে এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তা প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা করা যাবে না। এসব বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙালি সংস্কৃতির পরিপন্থি হতে পারবে না এবং এরূপ কোন কার্যক্রম চালাতে পারবে না।

১৯. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণায় উৎসাহিত করা এবং প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কনসালটেন্সির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যে সকল শিক্ষক এ ধরনের প্রকল্পে কাজ করবেন তাদের যথোপযুক্ত সম্মানী প্রদান করা হবে। এরকম গবেষণা কার্যক্রম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু আছে। এই কার্যক্রম মূল্যায়ন করে প্রয়োজনে পরিমার্জন করে একটি দিকনির্দেশনা-কাঠামো তৈরি করা হবে।

২০. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টেলিভিশনে সুবিধাজনক কোনো চ্যানেলে –যেমন বিটিভিতে দ্বিতীয় চ্যানেলে–অধিকতর সময় বরাদ্দ, রেডিও ট্রান্সমিশন এবং মাল্টি ইনফরমেশন সিস্টেম চালু করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

# ৯ প্রকৌশল শিক্ষা

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বর্তমানে উন্নত দেশগুলোতে তো বটেই, আমাদের সমাজেও সাধারণ মানুষের জীবনে সকলক্ষেত্রেই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তিজ্ঞান এবং এগুলোর প্রয়োগ হয়ে পড়েছে একান্ত অপরিহার্য। এর ফলে সামাজিক জীবনযাত্রার পটপরিবর্তন হচ্ছে এবং সমাজ জীবনের কার্যধারাতেও আসছে গতিশীল পরিবর্তন। একবিংশ শতাব্দীতে প্রকৌশল বিষয়ে শিক্ষাক্রম অনেক বদলে যাবে।

প্রকৌশল শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ: –

- সমাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন, বাস্তবধর্মী, দক্ষ প্রকৌশলী ও কারিগরি জনশক্তি গড়ে তোলা যাতে তারা দেশের উন্নয়নে, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে, দারিদ্র দূরীকরণে এবং সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে পারেন।
- সর্বক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির উপর জোর দেওয়া যাতে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ায় প্রকৌশলীরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন।

**কৌশল**

১. বর্তমান প্রযুক্তি ও পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, উন্নয়ন, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয়সংখ্যক দক্ষ প্রকৌশলী সরবরাহ করার জন্য প্রকৌশল বিদ্যায়তনগুলোতে প্রয়োজনে একাধিক শিফ্‌টে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হবে। প্রয়োজনে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২. দেশের সম্পদ উন্নয়ন ও বিভিন্ন কারিগরি সমস্যার সমাধান ও উচ্চমানসম্পন্ন প্রকৌশলী তৈরির জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও স্নাতকোত্তর কোর্সের প্রতি অধিকতর নজর দেওয়া হবে। গবেষণার মূল এলাকাগুলো হবে দেশীয় শিল্পের প্রকৌশলগত সমস্যা বিষয়ক।

৩. আধুনিক প্রযুক্তির অভুতপূর্ব ও দ্রুত উন্নয়নের সাথে সংগতি রেখে পাঠ্যক্রম উন্নয়ন এবং শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত করার জন্য সর্বদা দৃষ্টি রাখা হবে।

৪. দেশের বৃহৎ শিল্পগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তি, প্রকৌশল, রসায়ন, বস্ত্র, পাট, চামড়া, সিরামিক ও গ্যাস শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পের জন্য উপযুক্ত প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ তৈরির জন্য অবিলম্বে বিকাশমান বিষয়ে কোর্স চালুকরা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন নতুন অনুষদ চালু করা বাঞ্ছনীয়। এসকল বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অতিরিক্ত ব্যয় সংবলিত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অর্থ-প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৫. প্রকৌশল তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যার কোর্সগুলোকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার আলোকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির নিয়মিত হালনাগাদসহ শিল্প কারখানা ও কারিগরি সংস্থাসমূহে শিক্ষার্থীদের সহায়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

৬. প্রকৌশল শিক্ষায়তনের সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা হবে। এক্ষেত্রে নবিশি শিক্ষাসংক্রান্ত বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা এবং প্রকৌশল শিক্ষায়তনের সঙ্গে দেশের সকল পর্যায়ের চেম্বার অব কমার্স ও চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিগুলোর সহযোগিতা করার জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হবে ।

৭. প্রকৌশল শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের সময় অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের ওপরে গুরুত্ব আরোপ হবে।

৮. বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জীবনচক্র ছোট হয়ে যাওয়ায় এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হওয়ায়, চাকরিতে নিয়োজিত পেশাজীবী প্রকৌশলীদের অব্যাহত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং অব্যাহত পেশাগত উন্নয়নের ব্যবস্থা ব্যাপকহারে চালু করা হবে।

৯. ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী দেশের প্রকৌশল বিদ্যায়তনে, যথা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, উচ্চতর শিক্ষার জন্য যথাযোগ্য ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করতে পারবে।

১০. দেশের প্রচলিত বিভিন্ন স্তরে কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার মূল্যায়ন ও মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো পেশাগত ও বিশেষজ্ঞ সংস্থার মূল্যায়ন ও স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা করা হবে।

১১. টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, লেদার টেকনোলজি কলেজ ও টেকনিক্যাল টিচার্স কলেজগুলোকে আরো শক্তিশালী করা হবে। প্রয়োজনে এ সকল ক্ষেত্রে বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১২. প্রকৌশল ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা উৎসাহিত করতে সরকারি দিকনির্দেশনা প্রদানকরা হবে এবং তার সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও অর্থায়নে সহায়তা দেওয়ার দায়িত্ব থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের।

১৩. শিক্ষা বর্ষের শুরুতে প্রতি বছরের জন্য অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ণ ও অনুসরণ করা হবে।

# ১০ চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

একটি সুস্থ সবল জনগোষ্ঠীই শুধু দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এজন্যে প্রয়োজন স্বাস্থ্য সচেতনতা, রোগপ্রতিরোধমূলক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং যথাযথ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা। সেলক্ষ্যে যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে এদেশে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্যকর্মী এবং বিশেষজ্ঞ গড়ে তুলতে হবে। একদিকে শিক্ষার্থীরা যেন তাদের পেশাগত দক্ষতা অর্জন করে অন্যদিকে তারা যেন সংবেদনশীল বিবেকবান মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- আপামর জনগণের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুস্থ্য ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্তমানের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, সাধারণ চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ, স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বাস্থ্য জনশক্তি গড়ে তোলা।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সরকারিভাবে সকলের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল তৈরি করা।
- চিকিৎসা পেশা অন্যান্য পেশার তুলনায় স্পর্শকাতর এবং শারীরিক ও মানসিক কষ্ট/অসুস্থতা তথা জীবন-মৃত্যুর সমস্যার সঙ্গে জড়িত হওয়ায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, সাধারণ চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ, স্বাস্থ্যকর্মী যেন সংবেদনশীল, সামাজিক দায়বদ্ধতা বোধসম্পন্ন বিবেকবান মানুষ হিসেবে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হন সেলক্ষ্যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।
- চিকিৎসাবিজ্ঞানের সকল উন্নতির সুফল দেশের জনগণের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, সাধারণ চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী, সেবক-সেবিকা, স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ, স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা এবং এঁদের সবাইকে সমাজের ও মানব সেবায় অনুপ্রাণীত করা ।
- দেশবাসীর ব্যাধি ও চিকিৎসা সমস্যাবলীর মোকাবিলায় উপযুক্ত চিকিৎসা শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ তৈরির লক্ষ্যে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা করে এ দেশের স্থানীয় রোগ ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।

**কৌশল**

১. মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য উচ্চ মাধ্যমিক শেষে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া অব্যাহত থাকবে। ভর্তি পরীক্ষায় কোন প্রার্থী দুই বছরের বেশি অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না।

২. মেডিকেল কলেজে পাঁচ বছরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অব্যাহত থাকবে এবং এক বছরের ইন্টার্নশিপ থাকবে।

৩. স্নাতকোত্তর চিকিৎসার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য অধিক সংখ্যক চিকিৎসা-শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ তৈরি করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বর্তমান মেডিকেল কলেজে চালূকৃত পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্সের বিস্তৃতি অব্যাহত রাখা হবে।

৪. সকল মেডিকেল কলেজের শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে। বাস্তব শিখনের বিজ্ঞানাগারগুলোতে যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যবস্থা যথাযথভাবে গ্রহণ করা হবে।

৫. নার্সিং পেশার চাহিদা দেশে এবং বিদেশে রয়েছে এবং বাড়ছে। মানসম্পন্ন নার্সিং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে।

৬. নার্সিং কলেজে বি.এস.সি ও এম.এস.সি নার্সিং কোর্স খোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৭. নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে কোনো হাসপাতালের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত রাখা হবে।

৮. স্বাস্থ্য সহকারীদের শিক্ষা বিস্তার ও লাগসই প্রশিক্ষণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৯. মানসম্পন্ন প্যারামেডিকেল শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো হবে। এক্ষেত্রে ভর্তির যোগ্যতা ন্যূনতম এস.এস.সি বা সমমানের হবে। অধিক জনশক্তি প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাথে নার্সিং ও প্যারামেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে।

১০. আধুনিক এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি ঐতিহ্যিক দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত হোমিওপ্যাথি এবং ইউনানি ও আয়ুর্বেদী চিকিৎসা ব্যবস্থারও উন্নয়ন সাধনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১১. প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদান যেন উপযুক্ত মানসম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। নতুন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অনুমোদন দেওয়ার সময় প্রকল্পের মূল্যায়ন যেন যথাযথ হয় সেদিকে কঠোর নজর রাখা হবে। এই মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন করার জন্য যথাযথ ক্ষমতাসম্পন্ন ও দক্ষ জনবল সংবলিত মেডিকেল অ্যাক্রেডিটেশান কাউন্সিল গঠন করা হবে।

১২. মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি ফিজিওথেরাপি ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিসহ অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসাসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে।

১৩. স্বাস্থ্য সেবার ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণের ফলে প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রোমেডিকেল ও বায়োঃমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়ো ফিজিক্স, মেডিকেল ইনফরমেশন সায়েন্স এবং ফিজিও থেরাপি বিষয়গুলো শিক্ষণের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১৪. প্যারামেডিকেল / ডিপ্লোমা মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

# ১১ বিজ্ঞান শিক্ষা

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

বিজ্ঞানের মূল কাজ হচ্ছে প্রকৃতিকে অনুধাবন করা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির রহস্যকে বিজ্ঞান উন্মোচন করে যাচ্ছে। এটি একদিকে মানবজাতির অজানাকে জানার কৌতূহলকে পূরণ করে, অন্যদিকে বিজ্ঞানের লব্ধ জ্ঞান প্রতিনিয়তই নানা ধরণের প্রযুক্তির ব্যবহারের ভেতর দিয়ে মানবসভ্যতাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শুধুমাত্র যথাযথ বিজ্ঞান শিক্ষাই একটা জাতিকে দ্রুত তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :—

- শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করা যেন প্রতিভা বিকাশ, জ্ঞান সাধনা এবং সৃজনশীলতায় তারা আন্তজার্তিক মান অর্জন করতে পারে।
- বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তি শিক্ষা এবং মানবিক শিক্ষার যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের একটি যে অন্যটির পরিপূরক এই বিষয়টি মাথায় রেখে একটা সমন্বিত শিক্ষার অংশ হিসেবে বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা।

**কৌশল**

**প্রাথমিক শিক্ষা**

১. বিজ্ঞান শিক্ষা একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু হবে। তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত না করে প্রকৃতি, পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলির সঙ্গে পরিচিত করে শিক্ষার্থীদেরকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে। শুরু থেকেই তাদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলা হবে।

২. শ্রেণী কক্ষে শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাদের জন্যে নানারকম চিত্র, ভিডিও প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে নিজেদের পক্ষেই সহজেই করা সম্ভব এমন সব পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও প্রশ্ন করার প্রবণতাকে শিক্ষক সবসময়েই উৎসাহিত করবেন। নানারকম তথ্য মুখস্থ না করে জীবনের নানা ক্ষেত্রে সেসব তথ্যব্যবহারের ক্ষমতাকে বিকশিত করতে সাহায্য করবেন।

৪. প্রাথমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার একটি সমন্বিত কোর্স থাকবে। পাঠ্যপুস্তক সহজবোধ্য, সচিত্র এবং আকর্ষণীয় হবে। স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় পাঠদান করা হবে।

**মাধ্যমিক শিক্ষা**

৫. বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে গণিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে শিক্ষার্থীদের গণিত শিক্ষায় জোর দেওয়া হবে। গণিত বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের গণিতের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে।

৬. শিক্ষার্থীরা যেন পঠিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা মৌলিক বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে জানতে পারে, তার সমস্যা সমাধান করতে পারে এবং বাস্তব জীবনে তা ব্যবহার করতে পারে সেভাবে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং পাঠদান করা হবে।

৭. ব্যবহারিক ক্লাশ ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষা অর্থহীন বলে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান ও গণিতের প্রতিটি শাখায় নিয়মিত ব্যবহারিক ক্লাশের ব্যবস্থা করা হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার যথাযথ মূল্যায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে, যেন শিক্ষার্থীদের ঢালাওভাবে নম্বর দেয়ার সুযোগ না থাকে।

৮. শিক্ষার্থীদের কাছে বিজ্ঞান এবং গণিতকে আকর্ষনীয় করার জন্যে প্রতিটি স্কুলে বাৎসরিক ক্রীড়া বা সাংস্কৃতিক সপ্তাহের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান মেলা বা গণিত অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হবে। জাতীয় পর্যায়েও বিজ্ঞান মেলা ও গণিত অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হবে।

**উচ্চশিক্ষা**

৯. চার বছরের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রিকে প্রান্তিক ডিগ্রি হিসেবে গণ্য করা হবে। কাজেই উচ্চতর স্তরে শিক্ষাদান বা গবেষণার কাজে নিযুক্ত হওয়া ভিন্ন অন্য সকল ক্ষেত্রে এই ডিগ্রি পর্যাপ্ত বলে বিবেচনা করা হবে এবং পাঠ্যসূচিকে সেভাবে গড়ে তোলা হবে।

১০. শুধুমাত্র গ্র্যাজুয়েট স্কুলেই (স্নাতকোত্তর পর্যায়) নিয়মিত মাষ্টার্স ও পি.এইচ.ডি প্রোগ্রামের মাধ্যমে সত্যিকার গবেষণা করা সম্ভব। কাজেই প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্র্যাজুয়েট স্কুল খুলে সেখানে মাস্টার্স এবং পি.এইচ.ডি প্রোগ্রাম চালু করা হবে। দেশের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তার সমাধানের লক্ষ্যে গবেষণার আয়োজন করতে হবে। এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করা হবে।

১১. বিজ্ঞান গবেষণার জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাঝে যোগাযোগ ও সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলা হবে।

১২. গবেষণার ফল সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য গবেষণা জার্নাল প্রকাশ করা হবে। একই সাথে পৃথিবীর সকল গবেষণা জার্নাল দেশের গবেষকদের হাতে পৌঁছানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে। তথ্যপ্রযুক্তি এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের সকল গ্রন্থাগারের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তোলা হবে।

১৩. গবেষণার পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য নিয়মিতভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হবে।

১৪. মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী করার জন্যে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। উন্নতমানের কেন্দ্রীয় গবেষণাগার এবং গবেষণা ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হবে।

**অন্যান্য**

১৫. আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শিক্ষাদানের কৌশল ও দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষকদের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

১৬. বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি থানা/উপজেলায় সরকারি অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করে পালাক্রমে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আবশ্যিক ব্যবহারিক পাঠদানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

# ১২ তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

প্রায় দুই শতাব্দী আগে শিল্প বিপবের কারণে সভ্যতার গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছিল, একুশ শতকে তথ্য প্রযুক্তির বিপবের ভেতর দিয়ে আবার সেই গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। এই তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের অংশীদার হয়ে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি অভাবিত সুযোগ পেয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার করে সর্বক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। রাষ্ট্র পরিচালনায় স্বচ্ছতা এনে দূর্নীতির মূলোৎপাটন করার ক্ষেত্রেও তথ্যপ্রযুক্তি অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি সরবরাহসহ সম্ভাবনাময় রপ্তানিখাত হিসেবে সফট্ওয়্যার, ডাটা প্রসেসিং বা কলসেন্টার জাতীয় service industry বিকাশে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- উপর্যুক্ত কর্মযজ্ঞের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় আন্তর্জাতিক মান ও গুণ সম্পন্ন শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির প্রচেষ্টা চালানো ।
- তথ্যপ্রযুক্তিকে শুধুমাত্র কম্পিউটার বিজ্ঞানের মাঝে সীমিত না রেখে মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, নেটওয়ার্কিং কিংবা সকল তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ।

**কৌশল**

**প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা**

১. শিক্ষার একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে কম্পিউটারকে শিক্ষা দানের উপকরণ (Tool) হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

২. মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রবেশের পূর্বেই সকল শিক্ষার্থীকে কম্পিউটার বিষয়ে শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

৩. মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ের সঙ্গে কম্পিউটার বিষয় নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়া হবে।

৪. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় গ্রাফিক ডিজাইন, মাল্টিমিডিয়া, অ্যানিমেশন, ক্যাড(সিএডি)/ সিএসএম ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে।

৫. তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে আগ্রহসৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হবে।

**উচ্চশিক্ষা**

৬. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মানের কারিকুলামসহ কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ খোলা হবে।

৭. বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষার মান যুগোপযোগী করে শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্রভাবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা করা হবে।

৮. বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে জাতীয় পরীক্ষাপদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করে তথ্যপ্রযুক্তি জনবলে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেয়া হবে। প্রয়োজনে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৯. বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগসূত্র গড়ে তোলা হবে।

১০. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত অর্থে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

১১. ২০১৩ সালের মধ্যে সকল স্নাতক ডিগ্রিধারী যেন কম্পিউটার ব্যবহারের মৌলিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে।

১২. তথ্যপ্রযুক্তিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণদানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে একটি তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

**অন্যান্য**

১৩. তৃণমূল পর্যায়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে জেলা উপজেলা/থানা পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং টেলিসেন্টার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১৪. সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা এবং নীতিনির্ধারকদের কম্পিউটার বিষয়ক দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

১৫. সরকারি-বেসকারি প্রতিষ্ঠানে তৃতীয় ও তদুর্ধ শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে কম্পিউটার বিষয়ক দক্ষতা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

# ১৩ ব্যবসায় শিক্ষা

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অবদান অপরিসীম। শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের শাখাসমূহের সমন্বিত ব্যবস্থাকে ব্যবসায় শিক্ষা বলে এই নীতিমালায় অভিহিত করা হচ্ছে। এ শাখায় শিক্ষা যথার্থভাবে আয়ত্ত করতে পারলে চাকরি এবং চাকরির বিকল্প হিসেবে ব্যবসায়কে আত্মকর্মসংস্থান-ভিত্তিক জীবিকার উপায় হিসেবে গ্রহণ করা যায়। বর্তমান বিশ্বে বাজার অর্থনীতির প্রচলন, বিশ্ববিস্তৃত পণ্যের বাজার এবং তীব্র প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও তার সহায়ক কার্যাবলি প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে পরিগণিত। তাই বর্তমানে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল দেশেই ব্যবসায় শিক্ষার গুরুত্ব ও চাহিদা অতি উঁচু পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিভিন্ন স্তরে ব্যবসায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করা।
- ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।
- একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের পথ সুগম করা।
- আর্থিক, ব্যবসায়িক ও কর্মী-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভে সহায়তা করা এবং কর্মী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মীর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ ব্যবস্থাপক সৃষ্টি করা।
- শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে ঝরে পড়লে অর্জিত শিক্ষা দ্বারা আত্মকর্মসংস্থানের পথ সুগম করা।
- প্রতিষ্ঠানের আকারভেদে সাংগঠনিক স্তরের নিম্ন, মাঝারি ও উচ্চ পর্যায়ে কর্মকর্তা/নির্বাহী/ ব্যবস্থাপক/ হিসাব কর্মকর্তা, এক কথায় ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজনানুসারে দক্ষ জনশক্তি সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়তা করা।
- কর্মী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীর সামর্থ বৃদ্ধি করে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা।
- ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ব্যাংক ব্যবস্থাপনা, বীমা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত ডিগ্রি অর্জনের পথ সুগম করা।

**কৌশল**

১. দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের জনবলের চাহিদার ভিত্তিতে ব্যবসায় শিক্ষার সম্প্রসারণ, পরিমার্জন ও সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া হবে। এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্যক্তি-খাতের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করে তা অব্যাহত রাখা হবে।

২. মাধ্যমিক স্তর অর্থাৎ নবম শ্রেণী থেকে ব্যবসায় শিক্ষা শুরু করা হবে।

৩. ব্যবসায় বিষয়ের সকল শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার ব্যবহারসহ সহজলভ্য সকল তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে প্রত্যেক ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে কম্পিউটার ল্যাবরেটরি স্থাপন করা প্রয়োজন।

৪. ব্যবসায় শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হবে এবং এলক্ষ্যে ব্যবসায় শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন উৎসাহিত করা হবে।

৫. ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের শিক্ষকদের শিল্প, ব্যাংক, বীমা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সমস্যা নিয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬. ব্যবসায় শিক্ষার সকল স্তরে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত রীতি পদ্ধতি ও সম্ভাব্য উন্নয়ন চাহিদার আলোকে পাঠ্যসূচি নির্ধারণ ও পাঠাপুস্তক প্রণয়ন করা হবে। বিভিন্ন স্তরের জন্য স্তর-ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করার ব্যবস্থা করা হবে।

৭. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি  জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের তত্ত্বাবধানে বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে প্রণীত হবে।

৮. বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং শিল্প-ব্যবসায়ের মধ্যে মত বিনিময়ের সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং ব্যবস্থাপক প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক মতবিনিময় সভার ব্যবস্থা  করা হবে।

৯. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শিল্প, বাণিজ্য ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থীদের স্বল্পমেয়াদী 'ইন্টার্নশিপ' এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা হবে।

১০. দেশের ১৬টি কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের ভৌত অবকাঠামো আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য যুগোপযোগী ট্রেড কোর্স চালু এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা হবে।

১১. পর্যটন শিল্প, হোটেল ব্যবস্থাপনা শিল্প ও অন্যান্য সম্ভাবনাময় খাত চিহ্নিত করে সেগুলোর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা জরুরি। তাই চিহ্নিত বিভিন্ন খাতে প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

# ১৪ কৃষি শিক্ষা

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। তাই উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন কৃষি উন্নয়ন ও বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। কৃষি প্রধান বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন কৃষিশিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কৃষি একটি ফলিত বিজ্ঞান। কৃষি উন্নয়ন বলতে বোঝায় দেশের শস্য, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও বনসম্পদের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা। উচ্চতর কৃষিশিক্ষা বলতে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, কৃষি, ভেটেরিনারি, পশুপালন, কৃষি প্রকৌশল, কৃষি অর্থনীতি ও মৎস্য বিজ্ঞানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডক্টরাল পর্যায়ে অধ্যয়ন ও উচ্চতর গবেষণা বোঝায়। কৃষি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- দেশের মাটি, পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং দেশের পরিবেশগত শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ সাধন।
- জাতীয় উন্নয়নে কৃষি নির্ভর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
- বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা কৃষি অর্থনীতির যথাযথ বিকাশ।
- পেশা ও বিজ্ঞান হিসেবে জাতীয় জীবনে কৃষির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রসার।
- প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে দেশের স্থলজ ও জলজ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
- কৃষি শিক্ষার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ।
- জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য ব্যাপক অভিঘাত মোকাবেলা করে কৃষি উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য জোরদার গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ।
- কৃষিকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে উপলব্ধি করার জন্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও সচেতনতা সৃষ্টি।
- কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতাসৃষ্টি।
- খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, অপুষ্টি দূরীকরণ ও দারিদ্র্যবিমোচন।
- গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ।

**কৌশল**

১. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষিবিজ্ঞানে পাঠদান বাস্তবধর্মী ও বস্তুনিষ্ঠ এবং শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে জোরদার ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ভেটেরিনারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, পশুসম্পদ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে অধিকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২. স্নাতক পর্যায়ের সকল শিক্ষাক্রমে যুক্তিযুক্ত উপায়ে সংশ্লিষ্ট বাধ্যতামূলক বিষয়, ঐচ্ছিক বিষয়, মাঠ ও গ্রামীণ কর্ম-অভিজ্ঞতা, সমাজবিজ্ঞান, ভাষা ও মৌল বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখা হবে। ব্যবহারিক শিক্ষার উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

৩. কোর্স পদ্ধতি নির্দিষ্ট সময়সীমায় আবদ্ধ বলে এর সার্বিক সাফল্য শিক্ষকের বিষয় জ্ঞান, দক্ষতা, আন্তরিকতা ও নিবেদিতপ্রাণতার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এ কারণে দক্ষ ও মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিসহ তাদের অনুকূলে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হবে এবং তাদের জন্য উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ জ্ঞানের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া জোরদার করা হবে।

৪. শিক্ষকদের জন্য শিক্ষাদান ও গবেষণাসহ অন্যান্য দায়-দায়িত্ব পালনের মূল্যায়ন প্রথা চালু করা হবে।

৫. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে তিন সিমেস্টারব্যাপী কোর্স পদ্ধতির এম.এস. কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ডক্টরাল কার্যক্রম মূলত গবেষণাভিত্তিক থাকবে। তবে প্রয়োজনে কোর্স ওয়ার্কের বিধান থাকবে।

৬. উন্নত বীজ, জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি এবং বায়োটেকনোলজি সংক্রান্ত গবেষণা জোরদার করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭. বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও জাতীয় উন্নয়ন চাহিদার সঙ্গে উচ্চতর কৃষিশিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলার জন্য প্রচলিত সংশ্লিষ্ট কোর্সসমূহের পাশাপাশি নতুন নতুন কোর্স সংযোজনের ব্যবস্থা করা হবে (যেমন পরিবেশ বিজ্ঞান, জৈব প্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, সম্পদ অর্থনীতি, জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা, ভূমিস্বত্ব ও ব্যবস্থাপনা, পুষ্টিবিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রভৃতি)।

৮. ডিপ্লোমা পর্যায়ের কৃষি শিক্ষা, মৎস্য উন্নয়ন, পশু চিকিৎসা ও পশু পালন, বনবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষাক্রমকে অধিকতর বিস্তৃত করা হবে। এ লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্প্রসারণ করা হবে।

৯. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযোগী নতুন নতুন এ্যাকশন গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১০. স্নাতক পর্যায়ে সবার জন্য কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিশেষায়িত কম্পিউটার সংক্রান্ত কোর্স ঐচ্ছিক করা হবে।

১১. উচ্চতর কৃষিশিক্ষার মান ও সমরূপতা বজায় রাখার জন্য কৃষি শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধি নিয়ে টেকনিক্যাল পর্যায়ে একটি সমন্বয়, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এই লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিবে।

১২. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সকল ডিগ্রি কোর্স পর্যায়ে ১০০ নম্বরের/৩ ক্রেডিট ইংরেজি বিষয় সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

# ১৫ আইনশিক্ষা

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভের অধিকার বাংলাদেশের সকল নাগরিকের এবং বাংলাদেশে অবস্থানকারী সকল ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার। সংবিধান অনুযায়ী আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা ও দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টির জন্য আইনশিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। দেশে ন্যায়বিচার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের জন্যও সঠিক ও যুগোপযোগী আইনশিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। আইনশিক্ষার দুটি দিক রয়েছে: পেশাগত ও ব্যবহারিক। দেশের প্রচলিত আইনশিক্ষায় এ দুটি দিকের কোনোটারই সুষ্ঠু বিকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। আইনশিক্ষার মান যেমন নানা কারণে নিম্নমুখী হচ্ছে তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও এর কল্যাণকর ফলাফল সব সময় লক্ষিত হচ্ছে না। তাই আইন শিক্ষার সার্বিক পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আইন শিক্ষার্থীরা যাতে আইনের শাসন, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে এবং দেশের অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখতে পারে সেলক্ষ্যে আইন শিক্ষাকে অধিকতর বিশ্লেষণধর্মী ও প্রয়োগমুখী করা হবে। আইনশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ ঃ

- জনগণের আইনগত অধিকার সংরক্ষণে সহায়তা করা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুদক্ষ শিক্ষক, আইনজীবী, আইনবিদ ও বিচারক তৈরিতে সাহায্য করা।
- এমন উচ্চ যোগ্যতা, উন্নত চরিত্র, ধীশক্তি ও জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি সৃষ্টি করা যাঁরা –
  - আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের আদর্শ সমুন্নত রাখতে সক্ষম হবেন।
  - দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবেন।
  - পেশাগত দক্ষতা ও নৈতিকতার আদর্শ স্থাপন করবেন।
  - আইন ও বিচার পদ্ধতির সংস্কার ও উন্নতি সাধন করতে পারবেন।
  - পরিবর্তনশীল সমাজের নতুন নতুন প্রয়োজনের সঙ্গে আইনশিক্ষা ও তার ব্যবহারিক অনুশীলনের সামঞ্জস্যবিধান করতে পারবেন।

**কৌশল**

১. বর্তমানে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়সমুহে চার বছরমেয়াদি আইনে অনার্স ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয়। কিন্তু কলেজগুলোতে সাধারণ এল.এল.বি কোর্সের মেয়াদ দু'বছর। কলেজ গুলোতে সাধারণ এল.এল.বি কোর্সের মেয়াদ দু'বছরের পরিবর্তে তিন বছর করা হবে এবং শেষ শিক্ষাবর্ষে প্রায়োগিক কোর্সের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। ক্রমান্বয়ে তিন বছরের এল.এল.বি কোর্স উঠিয়ে দিয়ে তার স্থলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চার বছরের আইনে অনার্স ডিগ্রি কোর্স চালু করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি হবে এক ও অভিন্ন।

২. আইন শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রির জন্য অধ্যয়ন এবং আইন বিষয়ে গবেষণা উৎসাহিত করা হবে। এর জন্য আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আইন বিষয়ে অন্তত একটি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স স্থাপন করা হবে।

৩. আইন শিক্ষায় মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ হবে দু'বছরের। মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্স দু'ভাবে বিভক্ত হবে। যারা প্রথম অংশে কোর্স কার্যক্রম ও দ্বিতীয় অংশে থিসিস কার্যক্রমে যোগদান করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদের এম.ফিল ডিগ্রি প্রদান করা হবে। পি.এইচ.ডি ডিগ্রির ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিসমূহ এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৪. আইন শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য আইন কলেজগুলোর ভৌত সুবিধা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করা হবে।

৫. আইন কলেজ অনুমোদনের ব্যাপারে কলেজ ভবন, পাঠাগার, শিক্ষক নিয়োগ, কলেজের প্রশাসন, পরিচালন ও গভর্নিং বডি গঠন ইত্যাদি ব্যাপারে সাধারণ কলেজসমূহের ক্ষেত্রে আরোপিত শর্তাদি কঠোরভাবে প্রয়োগ ও বলবৎ করা হবে।

৬. বর্তমানে আইন কলেজসমূহে খন্ডকালীন শিক্ষক ও খন্ডকালীন শিক্ষার্থী এবং সান্ধ্যকালীন কোর্স ও ক্লাস সব মিলিয়ে যে খন্ডকালীন শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার মানোন্নয়ন করা প্রয়োজন। এগুলোতে পূর্ণ শিক্ষাক্রম অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা হবে।

৭. আইন কলেজগুলোতে মোট শিক্ষকের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ নিয়মিত ও পূর্ণকালীন হতে হবে। অনধিক এক-তৃতীয়াংশ খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা থাকতে পারে।

৮. আইন শিক্ষায় পাঠ্যক্রম প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আন্তঃবিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটাতে হবে যাতে শিক্ষার্থীগণ সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে। আইন পাঠ্যক্রমে জাতীয় ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৯. আইন শিক্ষায় শিক্ষায়তনিক ও কারিগরী/ব্যবহারিক প্রকৃতির যৌক্তিক সমন্বয় ঘটাতে হবে যাতে আইনের স্নাতকবৃন্দ আইন ব্যবসায় এবং আইন বিষয়ক সাধারণ চাকুরীর জন্য জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। আইন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অধিকতর ব্যবহারিক পদ্ধতি চালু করা আবশ্যক, যেমন-সক্রেটিস পদ্ধতি, সমস্যা পদ্ধতি, কেস স্টাডি, মুট কোর্ট এবং মকট্রায়াল, ক্লিনিক্যাল লিগ্যাল এডুকেশন ইত্যাদি।

১০. কলেজগুলোতে আইন শিক্ষার মনোন্নয়নের জন্য ভর্তি পরীক্ষা চালু করা হবে।

১১. কলেজগুলোকে কার্যকর তদারকি ব্যবস্থার আওতায় আনা জরুরী। আইন কলেজগুলোর মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বার কাউন্সিল ও শিক্ষাবিদদের প্রতিনিধিত্বের দ্বারা বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন করা হবে।

# ১৬ নারীশিক্ষা

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

দেশ ও সমাজ উন্নয়নের মূল ভিত্তি শিক্ষা। সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক নানা কারণে এ দেশের সর্বস্তরে ব্যাপক সংখ্যক নারী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারী শিক্ষাকে শুধু পরিবারের মঙ্গল, শিশুযত্ন ও ঘরকন্নার কাজে সীমাবদ্ধ রেখে জাতীয় উন্নয়নে নারীকে নিষ্ক্রিয় রাখার বিরাজমান প্রবণতা দূর করা হবে। সার্বিক উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও সুষম সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীশিক্ষার উপর জোর দেওয়া হবে। নারীশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ –

- নারীকে সচেতন ও প্রত্যয়ী করা এবং সম-অধিকারের অনুকূলে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রখর করা।
- সকল পর্যায়ে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণে নারীকে উদ্বুদ্ধ ও দক্ষ করা।
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও দারিদ্র্য বিমোচনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে কাজে নিয়োজিত হয়ে এবং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধনে ভূমিকা পালন করা ।
- যৌতুক ও নারী নির্যাতন নিরসন এবং নারীর অধস্তন অবস্থার পরিবর্তন ও তাঁর সমঅধিকার নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় নারী যাতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারেন তার উপযোগী করে নারীকে গড়ে তোলা।

**কৌশল**

১. বাজেটে নারীশিক্ষা খাতে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হবে। শিক্ষার সকল স্তরে নারীশিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করা হবে এবং বেসরকারি উদ্যোগ ও অর্থায়নকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা করা হবে।

২. ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ঝরেপড়া ছাত্রীদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যাদেরকে এভাবে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না তাদেরকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্মসূচির আওতায় আনা হবে।

৩. ছাত্রীদের জন্য খণ্ডকালীন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি নজর দেওয়া হবে।

৪. অধিক সংখ্যক মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনা হবে এবং তাদের প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা/পেশাদারি শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে এবং এ বিষয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৫. প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে পাঠ্যসূচিতে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের কথা তুলে ধরা হবে যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণের পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে আরও অধিক সংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও নারীদের রচনা অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

৭. মাধ্যমিক স্তরের শেষের দু'বছরের পাঠ্যক্রমে "জেন্ডার স্টাডিজ" এবং প্রজনন-স্বাস্থ্য (reproductive health) অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৮. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিষয় নির্বাচনে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সকলের পুরো স্বাধীনতা থাকবে এবং সকল বিষয়ের ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে। কোনো বিশেষ বিষয়ের দিকে (যেমন গার্হস্থ্য অর্থনীতি) মেয়েদের উৎসাহিত করা বা ঠেলে দেওয়া যাবে না।

৯. ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সময় যাতে অসুবিধার সম্মুখিন না হয় সেজন্য তাদের শিক্ষার সুবিধার্থে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুবিধা ও প্রয়োজনে নিরাপদ ছাত্রী নিবাসের ব্যবস্থা করা হবে।

১০. মেয়েদেরকে বিজ্ঞানশিক্ষায় এবং পেশাদারিশিক্ষায় (যেমন - প্রকৌশল, মেডিকেল, আইন, ব্যবসায় ইত্যাদি) উৎসাহিত করা হবে।

১১. দেশে মেয়েদের জন্য চারটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে। মেয়েরা যাতে অধিক হারে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনে মেয়েদের জন্য পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আরও বাড়ানো হবে। প্রস্তাবিত উপজেলা কারিগরি বিদ্যালয়সমূহ মেয়েদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে এবং তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে।

১২. উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণা করার জন্য দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা এবং সুদমুক্ত/ স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

১৩. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সকল নীতিনির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

১৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে প্রণীত যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন রোধ সংক্রান্ত বিধিবিধান কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে।

# ১৭ কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষা

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

একটি সংস্কৃতিবান, সুরুচিসম্পন্ন, ঐতিহ্য সচেতন সুশৃঙ্খল জাতি ও নাগরিকগোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষাদান অত্যন্ত জরুরি। এ শিক্ষার অন্তর্গত সংগীত, চিত্রকলা, কারুশিল্প ও হস্তশিল্প, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য বা অঙ্গবিক্ষেপ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীর মন ও মননকে বিকশিত করে এবং তার চিত্তবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করে। দেশের চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সংগীত, নাটক, যাত্রা ও থিয়েটার ইত্যাদি সম্পর্কে যেমন এর মাধ্যমে ধারণা লাভ করা যায়, তেমনি বিভিন্ন দেশের শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ করা যায়। এ শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের একদিকে চিত্তোৎকর্ষ সাধন করা যায়, অন্যদিকে এই বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। কারুকলা ও সুকুমার বৃত্তি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- শিক্ষার্থীদের মন ও মননকে বিকশিত করে চিত্তবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করা এবং তাদের মন ও কর্মে শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করা।
- শিক্ষার্থীদের জীবনকে শিল্পিত করে তোলার প্রেরনাদান, শখের শিল্পচর্চায় উদ্বুদ্ধ করা এবং যারা যথার্থ দক্ষতা অর্জন করবে তাদের পেশাদারী হতে সাহায্য করা ।
- বর্তমান বিশ্বে মাদক-এর ভয়াবহ বিস্তারের কারণে দেশে যুব সমাজের অবক্ষয় মারাত্মক আকার ধারন করেছে। এ অবক্ষয় রোধে সুষ্ঠু মনন চর্চার মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রাখা।

**কৌশল**

১. কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষাদান বিষয়টিকে একটা পেশাভিত্তিক শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২. সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসহ পিছিয়েপড়া গোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদেরকে বিশেষ সহায়তা দেওয়া হবে।

৩. কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি বিষয়টি সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে প্রবর্তন এবং এই দুই স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে এর বিভিন্ন শাখায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে।

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক, কক্ষ, পরিবেশ, পাঠ্যপুস্তক/সহায়ক পুস্তক ও বিভিন্ন সরঞ্জামের সংস্থান করা হবে।

৫. কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তির বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হবে।

৬. সরকারি উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে জাতীয় চিত্রশালা, সংগীত ও নৃত্য অ্যাকাডেমি এবং নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৭. সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং শহর ও গ্রাম পর্যায়ে চিত্রকলা ও কারুশিল্পের ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী, সংগীত, নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে।

# ১৮ বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্ল গাইড এবং ব্রতচারী

**ক. প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা: বিশেষ শিক্ষা**

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

বিভিন্নভাবে সীমাবদ্ধতায় আক্রান্ত শিশুদের আওতায় পড়ে দৃষ্টি, শ্রবণ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধিত্বের মাত্রানুসারে এদের মৃদু প্রতিবন্ধী, মাঝারি প্রতিবন্ধী ও গুরুতর প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিবন্ধিত্বের ধরণ ও মাত্রার ওপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা হবে, তবে প্রতিবন্ধিত্বের গুরুতর মাত্রার কারণে যাদেরকে এভাবে সম্পৃক্ত করা সম্ভবপর হবে না তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। বিশেষ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- শিক্ষার মূলধারায় প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- যে সব শিশু শারীরিক ও মানসিক সমস্যার জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণ করতে অপারগ এবং মূলধারায় যাদের সম্পৃক্ত করা সম্ভবপর নয় তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা, দক্ষ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা, বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করা।

**কৌশল**

১. বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের সঠিক সংখ্যা এবং তাদের প্রতিবন্ধিত্বের ধরন ও মাত্রাভিত্তিক বিভাজন করার জন্য সনাক্তকরণ ও জরিপ চালানো হবে।

২. প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত বিদ্যালয়সমূহে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যাতে স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থায় দ্রুত উন্নতি হয়।

৩. সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় স্কুলগুলোতে অন্তত একজন শিক্ষককে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাদান উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৪. প্রতিবন্ধীদের শরীরচর্চা ও খেলাধূলা তদারকির উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হবে।

৫. সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের অধীনে যে ৬৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে সেগুলোর উন্নতিসাধন করা হবে। এ ব্যবস্থা শ্রবণ, বচন, মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য চালু করা হবে।

৬. দৃষ্টি, শ্রবণ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য জেলা ও থানা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম চালুর ব্যবস্থা করা হবে।

৭. প্রতিবন্ধীদের বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

৮. এক বা একাধিক বিষয় অধ্যয়নে অসমর্থ প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষাক্রমে নমনীয়তা অনুসরণ করা হবে।

৯. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১০. প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমন্বিত শিক্ষাক্রম সংবলিত সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষকদের জন্য পিটিআইগুলোতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়/ ইনস্টিটিউট স্থাপন করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১১. সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে প্রস্তাবিত সমন্বিত শিক্ষা চালু করার লক্ষ্যে শিক্ষকপ্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে বিশেষ শিক্ষা এবং প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত করা হবে। এতে সাধারণ শ্রেণীতে শিক্ষকের পক্ষে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করা সহজতর হবে।

১২. প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষাক্রমে প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত বিষয়বস্ত অন্তর্ভুক্ত করা হবে ।

১৩. চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্য প্রতিবন্ধীদের সমান সুযোগ প্রদান করা হবে।

**খ. স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা**

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রের একটি অবহেলিত অংশ স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা। শিক্ষিত জাতিগঠনে সাধারণ শিক্ষার মতো স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এ দুটোকে বাদ দিলে সাধারণ শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ বলা যাবে না।

শিশুকাল থেকে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্যোগ নেওয়া হলে তারা শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ থাকার দিকে মনোযোগী হবে, তারা নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা শিখতে সমর্থ করবে। সময়ানুবর্তিতা শারীরিক শিক্ষার অন্যতম পাঠ। শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। এ উপায়ে তাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে পারে বরেণ্য ক্রীড়াবিদ/ খেলোয়াড়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যদি শরীরচর্চা ও খেলাধুলার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকে তাহলে বয়ঃসন্ধিক্ষণে ছেলেমেয়েদের বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কাও কম থাকে। খেলাধুলার উপযুক্ত পরিবেশ পেলে মাদক দ্রব্যের মতো ভয়াল অভিশাপ শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারবে না।

এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ:

- শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ থাকার দিকে মনোযোগী করা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টিতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা ।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শরীরচর্চা ও খেলাধুলাকে একটি আবশ্যিক বিষয় করা।
- খেলাধুলার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে মাদক দ্রব্যের মতো ভয়াল অভিশাপ থেকে শিক্ষার্থীদের দুরে রাখা।
- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষা উৎসাহিত করা।

**কৌশল**

১. শিক্ষার কোনো পর্যায়ে বিষয়টি পাবলিক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। তবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে একটি নির্ধারিত মান অর্জন করতে হবে যা ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্ণয় করা হবে। প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বয়স ও সামর্থ্য বিবেচনা করে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যসূচিকে যুগোপযোগী, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করা হবে।

২. শরীরচর্চা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শিক্ষা দেওয়া হবে।

৩. নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের সময় খেলার মাঠ থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৪. স্বল্পমূল্যে স্কুল কলেজে শারীরিক শিক্ষার সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে।

৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে দেশীয় খেলাধুলার প্রচলন করা হবে।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলার জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে।

### গ. স্কাউট, গার্ল গাইড ও বিএনসিসি

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

- দেশের শিশু, কিশোরকিশোরী ও তরুণতরুণীদের যথাক্রমে স্কাউট ও গার্লগাইড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, আত্মনির্ভরশীল, সৎ, চরিত্রবান, কর্মোদ্যোগী, সেবাপরায়ণ, স্বাস্থ্য সচেতন, সর্বোপরি আদর্শ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অবদান রাখা।
- স্কাউট ও গার্ল গাইড কর্মসূচি অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্ত্বার উন্মেষ ঘটিয়ে তরুণ-তরুণীদের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল, আত্মসচেতন ও পরোপকারী হিসেবে গড়ে ওঠার গুণাবলী অর্জনে সহায়তা দান করা।
- বিএনসিসির আওতায় অনুশীলনের মাধ্যমে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জীবনে কর্মদক্ষতা, নৈতিকতা ও শৃঙ্খলাবোধের উন্মেষ ঘটানো।

**কৌশল**

১. দেশের সর্বত্র (স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায়) স্কাউট আন্দোলন মোটামুটি বিস্তৃত। একে আরো বিস্তৃত ও সুসংহত করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে –

   ➢ দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাব স্কাউটিং এবং স্কাউটিং (যদি থাকে) জোরদার করা হবে এবং না থাকলে চালু করা হবে।

২. দেশের সর্বত্র বালিকা বিদ্যালয়ে গার্ল গাইড আন্দোলন মোটামুটি বিস্তৃত। একে আরো বিস্তৃত ও সুসংহত করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে -

   ➢ দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গার্ল গাইডিং (যদি থাকে) আরো জোরদার করা এবং না থাকলে চালু করা হবে।

৩. শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সমূহে কাব স্কাউট,স্কাউট, গার্লগাইড বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৪. দেশের সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনসিসি শাখা খোলা যেতে পারে।

৫. এ বিষয়ের উপর প্রতি সপ্তাহে একটি ক্লাশ বরাদ্দ রাখা হবে।

### ঘ. ব্রতচারী

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

অর্ন্তনিহিত উদ্দেশ্যের বিবেচনায় ব্রতচারী কার্যক্রম অনেকটা স্কাউটিং ও গার্লস গাইডিংয়ের অনুরূপ, তবে এটি এই দেশের সংস্কৃতির ভেতর থেকে উঠে এসেছে। এটি গীত ও নৃত্য-ভিত্তিক সুশৃঙ্খল একটি কার্যক্রম যা বিদ্যালয়ে বিনোদন চর্চার বিষয় হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। ব্রতচারীর উদ্দেশ্যসমূহকে উপজীব্য করে ছড়া ও গীত-এর সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। যাঁরা তা পরিবেশন করেন এবং যাঁরা শোনেন-দেখেন সবাইকে এই কার্যক্রম ব্রতচারীর উদ্দেশ্যসমূহের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে সহজেই। ব্রতচারী কার্যক্রম সিলেট, ঢাকা, খুলনা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং জয়পুরহাটের অনেক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে। এর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ:

- ব্রতচারীর শিক্ষা যোগ্য নাগরিক হওয়া, শ্রমজীবী মানুষকে সম্মান করা, অসম্প্রদায়িকতা অনুশীলন করা, পরিশ্রমী হওয়া, দেশ গড়ার কাজে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানো এবং মানুষের সেবা করা।
- এই কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান, পরিশ্রমী, পরোপকারী সুস্থ মনের মানুষ সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

**কৌশল**

১. নীতিগতভাবে ব্রতচারী কার্যক্রমের স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

২. যে সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এটি চালু আছে তার পদ্ধতি ও কার্যকরিতার মূল্যায়ন করা এবং এর একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা হবে।

৩. দেশের অন্যান্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এটি চালু করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হবে।

৪. সপ্তাহে দুই দিন একটি সুবিধাজনক সময়ে দিনে আধ ঘন্টা এর জন্য নির্ধারণ করা হবে।

৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্রতচারী সংগঠনের অনুরূপ শিশু-কিশোরদের অন্যান্য সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় উৎসাহ প্রদান করা হবে।

# ১৯ ক্রীড়াশিক্ষা

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

ছাত্র-ছাত্রীসহ তরুণতরুণীদের পূর্ণ বিকাশে শরীরচর্চা ও ক্রীড়ার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উৎপাদনশীলতা, সৃজনধর্মিতা এবং আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সুস্থ দেহ ও মনের সমন্বয় মানব উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শরীর, মন ও মেধার সমন্বয়ে মানুষের জীবন পূর্ণতা লাভ করে। বাংলাদেশে খেলাধুলা ও শরীর চর্চা দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকলেও দেশে প্রচলিত ক্রীড়া ও শরীর চর্চার মধ্য দিয়ে তা' কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা' প্রশ্ন সাপেক্ষ। উল্লেখ্য, বর্তমানে ক্রীড়া শিক্ষা ও এক্ষেত্রে দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনের বিষয়টি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশ্বব্যাপী ক্রীড়াবিদ্যায় শিক্ষিত তরুণ তরুণীরা আজ আকর্ষণীয় পেশাগত সম্মানের অধিকারী। কিন্তু আমাদের দেশে ক্রীড়াবিদগণ বিশ্বপরিসরে বিভিন্ন ক্রীড়ায় এখনো কাঙ্ক্ষিত স্বীকৃতি পায়নি। ফলে বিভিন্ন সময়ে গৌরবজনক অর্জনের ধারাবাহিকতাও রক্ষা হয় না। ঢাকার সাভারে বাংলাদেশের একমাত্র ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি বর্তমানে শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রচলিত এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি স্তরে সনদ প্রদান করে আসছে। ক্রীড়া শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ রূপদান ও আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে এ কার্যক্রম যথেষ্ট নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ক্রীড়া শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। ক্রীড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- শিক্ষার্থীদের খেলা-ধুলার প্রতি আগ্রহী করে তোলা।
- দেশের সকল অঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা যেন ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদান রাখার সমান সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা।
- পেশা হিসেবে ক্রীড়াকে গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।
- প্রশিক্ষিত ক্রীড়াবিদ তৈরী করতে সহায়তা করা। ক্রীড়া শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াবিদ তৈরি করা।
- প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের ক্রীড়াবিদদের জন্য দেশ ও বিদেশে উল্লেখযোগ্য পেশাদার ক্রীড়াবিদের তালিকায় স্থান পাওয়ার পথ সুগম করা।
- ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জল করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করা।

**কৌশল**

দেশে মানসম্পন্ন ক্রীড়া শিক্ষা সম্প্রসারণে নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ গ্রহণ করা হবে :

১. ক্রীড়া শিক্ষাকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিস্তৃতির জন্য প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগে একটি করে ক্রীড়া শিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

২. ক্রীড়া শিক্ষা বিদ্যালয়ে অধ্যায়নের ফলে যাতে সাধারন ধারার উচ্চশিক্ষায় অধ্যায়নের পথ রুদ্ধ না হয় সে জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অভিন্ন বিষয়গুলো ক্রীড়া শিক্ষার জন্যও বাধ্যতামূলক হবে।

৩. দেশের সকল ক্রীড়া শিক্ষা বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষা যে কোন একটি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রনে অনুষ্ঠিত হবে।

৪. সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে স্বতন্ত্র ক্রীড়াশিক্ষা স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেওয়া হবে।

৫. বাংলাদেশে ক্রীড়াশিক্ষাকে যুগোপযোগী করে আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াবিদ তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশের একমাত্র ক্রীড়াশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি'কে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে জেলা পর্যায়ে ক্রীড়াশিক্ষা স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করে বিকেএসপির অধীনে ক্রীড়াশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত করা হবে।

৬. যতদিন বিকেএসপি'কে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা না হয় ততদিন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি স্তরে ক্রীড়াবিষয়ে সনদ প্রদান করা হবে।

৭. ক্রীড়া শিক্ষার বিস্তার এবং একে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান, আন্ত স্কুল-কলেজ এবং জাতীয় পর্যায়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

৮. ক্রীড়াশিক্ষা হবে সম্পূর্ণ আবাসিক। এ লক্ষ্যে প্রত্যেক ক্রীড়াশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবাসিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

# ২০ গ্রন্থাগার

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

গ্রন্থাগার সভ্যতার দর্পণ বলে বিবেচিত। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগার যেমন একটি দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক বিকাশগত মান নির্ধারণের অন্যতম সূচক, তেমনি গ্রন্থাগার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ ও এর গুণগত মান ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রাণ স্পন্দনের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। দেশের নাগরিকদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, গবেষণা, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিক্ষা গ্রহণে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্য সহজলভ্য করার দায়িত্ব হল গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের। এই প্রত্যয়কে ভিত্তি করে দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত জাতীয় গ্রন্থাগার ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে কলেজসমূহের গ্রন্থাগার পর্যায়ক্রমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে এবং শুরু থেকেই এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে। গ্রন্থাগার শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- বইপড়ার সুযোগ করে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা এবং সকলের জন্য শিক্ষার সুষম সুযোগ সৃষ্টি করা।
- সর্বস্তরে সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- পর্যায়ক্রমে গ্রন্থাগারগুলোকে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর করে আন্তর্জাতিক জ্ঞান সংগ্রহের পথ সৃষ্টি করা।
- গ্রন্থাগার গুলোকে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনভিত্তিক বই, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী দ্বারা সমৃদ্ধ করা।
- জাতীয় ইতিহাসের মৌলিক দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ ও গবেষণার প্রয়োজনে ব্যবহার উপযোগী করা।

**কৌশল**

১. প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করে শিক্ষার্থীদের উপযোগী বই দিয়ে তা সমৃদ্ধ করা হবে।

২. দেশের প্রত্যেকটি উপজেলা সদরে গণগ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে, যার একটি দায়িত্ব হবে প্রাথমিক /মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বই সরবরাহ করা। উপজেলা-ভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলোকে পর্যায়ক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর করা হবে।

৩. প্রত্যেক ইউনিয়নে এক বা একাধিক নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ভ্রাম্যমান বইয়ের কেন্দ্ররূপে দাঁড় করা হবে এবং এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। পরবর্তীকালে ইউনিয়ন পর্যায়ে উপজেলা গ্রন্থাগারের অনুরূপ গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে যথাযথ বেসরকারি উদ্যোগ উৎসাহিত করা হবে।

৪. শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য যথাযথ কর্মসূচি নেওয়া হবে।

৫. পিটিআই, নেপ এবং অধিদপ্তরসমূহের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলোর আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৬. মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজে উন্নত ও আধুনিক মানের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা, গ্রন্থাগারিক-এর পদ সৃষ্টি এবং গ্রন্থগার কর্মীদের বেতন কাঠামো বিভিন্ন স্তরে যৌক্তিকীকরণ করা হবে। সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক মঞ্জুরি দেওয়া হবে।

৭. প্রত্যেক কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হবে। ইলেকট্রনিক গ্রাহক হিসেবে সকল গবেষণা জার্নাল সংগ্রহ করা হবে। গ্রন্থাগারগুলো নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে যেন যে কোন শিক্ষার্থী অন্য যে কোন গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। পর্যায়ক্রমে বই ও জার্নালসমূহের ডিজিটাল সংস্করণ করা হবে।

৮. জাতীয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় আর্কাইভসের গুরুত্ব বিবেচনা করে এগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হবে এবং ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনা হবে। জাতীয় গ্রন্থাগারে একটি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ শাখা থাকবে এবং এই শাখাকে তথ্যপ্রযুক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করা হবে।

৯. বিভাগীয় শহর ও জেলা সদরসমূহে পর্যায়ক্রমে জাতীয় গণগ্রন্থাগার স্থাপন করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ শহরগুলোতে নগর গ্রন্থাগার ও পৌর গ্রন্থাগার স্থাপন করবে।

১০. নীতি, পরিকল্পনা ও সমন্বয়গত সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি সংবিধিবদ্ধ এবং সার্বিক মর্যাদাসম্পন্ন কার্যকর গ্রন্থাগার কাউন্সিল স্থাপন করা হবে।

১১. মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরকে নিজ নিজ প্রশাসনাধীন গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোর উন্নয়ন ও নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনায় কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

১১. প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারিক, সহ গ্রন্থাগারিক সহ অন্যান্য পদ সৃষ্টি করা ও তাদের যথার্থ মর্যাদা নির্ধারণ করা হবে।

১২. গ্রন্থাগারে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।

# ২১ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যার সাহায্যে শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষার্থী কতটা সফল হয়েছে তা নিরূপিত হয়। শিক্ষার্থীর আচরণের যে দিকগুলো তার সার্বিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে শিক্ষাবিদগণ চিহ্নিত করেছেন সেগুলো হলো – জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত, অনুভূতি সম্পর্কিত ও মনন সম্পর্কিত। এই তিন প্রকার আচরণের মধ্যে আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথমটি মূল্যায়ন করা হয়। এটি আরো কার্যকরভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর অন্য দুটি দিকও যাচাই করার জন্য যথাযথ নিয়মনীতি তৈরী করা আবশ্যক। পরীক্ষা ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :-

- মুখস্ত বিদ্যা নয় বরং শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুকে কতটুকু আত্মস্থ করতে পেরেছে তা মূল্যায়নের লক্ষ্যে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা।
- পরীক্ষা ও মূল্যায়নের স্তর, পদ্ধতি এবং সকল ধারার জন্য অভিন্ন কৌশল অনুসরণের নিয়মনীতি নির্ধারণ করা।
- যথাযথ মূল্যায়নের জন্য পাঠ্যপুস্তক, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার নিয়মকানুন নির্ধারণ এবং প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের তা বুঝতে পারার উপায় নির্ধারণ এবং তাদের সচেতন করা।

**কৌশল**

১. শিক্ষার সকল স্তরে জ্ঞানার্জন মূল্যায়ন যাতে যথার্থ হয় সেদিকে যথাযথ নজর দেয়া হবে। পরীক্ষা পদ্ধতিকে আরো কার্যকর করা হবে।

২. ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের অনুভূতি ও মনন সম্পর্কিত বিকাশ মূল্যায়ন করার পদ্ধতি নিরূপনের ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্য্যক্রম হাতে নেওয়া হবে।

৩. প্রচলিত পদ্ধতিতে মূলতঃ মুখস্থবিদ্যা মূল্যায়িত হয়। এটি প্রকৃত মূল্যায়ন হতে পারে না। আসলে মুখস্থ বিদ্যা নয় বরং বিষয়বস্তুকে কতটুকু আত্মস্থ করা হয়েছে তার মূল্যায়ন করা গেলেই শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়ণ করা হবে। বর্তমানে যে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে সেটি আত্মস্থ করা বিদ্যা মূল্যায়নের একটি প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগ নির্ভর করবে উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল রেখে যথাযথ পাঠ্যপুস্তক, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার করার নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করা এবং প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের তা যথাযথভাবে বুঝতে পারার ওপর। কাজেই এ বিষয়ে যথাযথ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, নিয়ম-কানুন নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা ও জ্ঞান সৃষ্টি করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা**

৪. স্কুল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে। সকল শ্রেণীতে কার্যকরভাবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হবে। খেলাধুলা ও শরীরচর্চার দক্ষতা ধারাবাহিক মূল্যায়নে স্থান পাবে।

৫. পঞ্চম শ্রেণী শেষে উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে সকলের জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ।

৬. অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আপাতত: এই পরীক্ষার নাম হবে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (J.S.C) পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। সকল পরীক্ষায় মুখস্থকে নিরুৎসাহিত করা এবং সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হবে। অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিভাগ ভিত্তিক বৃত্তি প্রদান করা হবে।

৭. যে সকল শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণীর শেষে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে না, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের একটি কোর্স সমাপ্তি সনদপত্র প্রদান করবে এবং শিক্ষার্থীর আন্তঃপরীক্ষা ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল জন্ম তারিখসহ উক্ত সনদপত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে।

৮. দশম শ্রেণী শেষে জাতীয় ভিত্তিতে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষার নাম হবে মাধ্যমিকস্কুল সার্টিফিকেট (S.S.C) পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে। দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে আরো একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, এর নাম হবে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (H.S.C) পরীক্ষা। উভয় পরীক্ষা হবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে এবং পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে।

৯. মাদরাসার ক্ষেত্রে জুনিয়র দাখিল ,দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় সকল ধারার জন্য আবশ্যিক বিষয়সমুহে অন্যান্য ধারার সঙ্গে অভিন্ন প্রশ্নপত্র অনুসরন করা হবে।

১০. মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবহারিক পরীক্ষার যথাযথ মূল্যায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১. মাধ্যমিক পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষায় কোন শিক্ষার্থী এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হলে তাকে সে বিষয়ে/বিষয় দু'টিতে দু'বার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিবর্তিত হলে পুরাতন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী উক্ত প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে, তবে কোনো অন্তর্বর্তীকালীন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাবে না।

১২. শিক্ষা বোর্ড সমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য তাদেরকে আন্তঃবোর্ড বদলির ব্যবস্থা করা হবে।

**কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা**

১৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে, তাই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত রাখা হবে।

**স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা**

১৪. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রয়োজনে অন্তঃ ও বহিঃমূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকবে। মুখস্থ বিদ্যাকে নিরুৎসাহিত করে আত্মস্থ করার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূল্যায়ন পদ্ধতি আধুনিকীকরণ করে যথাযথ মূল্যায়ন করবে।

১৫. পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস করাা হবে।

১৬. ধারাবাহিক মূল্যায়ন, হোমওয়ার্ক, মিড টার্ম পরীক্ষায় আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে।

১৭. বিভাগীয় কমিটি এবং ফ্যাকাল্টি ডিন পরীক্ষার মূল্যায়ন বিষয়টিকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখবেন।

১৮. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের গ্রেডিং এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে এক ও অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হবে।

**সকল স্তরে প্রযোজ্য**

১৯. প্রান্তিক ও পাবলিক পরীক্ষা সমূহের তারিখ অ্যাকাডেমিক বছর শুরু হওয়ার আগেই নির্ধারণ করা হবে এবং তা অনুসরণ করা হবে।

২০. প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক ও প্রশ্ন পরিমার্জনাকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

২১. পরীক্ষকদের নিকট থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তরপত্র পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান থাকবে এবং যথাসময়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যর্থতার জন্য শাস্তির বিধান করা হবে। উত্তরপত্র মূল্যায়নের সম্মানী যুগোপযোগী করা হবে।

২২. গাইড বই, নোট বই, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং প্রভৃতির ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া ও শিক্ষার মান অর্জন বিশেষ বিঘ্নিত হচ্ছে। এগুলো বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। যারা গাইড বই ও নোট বই তৈরি ও সরবরাহ করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যে সকল শিক্ষক দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করবেন তাঁদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাছাড়া গাইড বই, নোট বই ও কোচিং-এর অপকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদেরকে সচেতন করা হবে।

২৩. পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধকল্পে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপকদের আরো উদ্যোগী হতে হবে। এই বিষয়ে সময় সময় সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করা হবে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদেরকে নকলের পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আলোচনা সভা ও প্রকাশনার আয়োজন করবে। যারা নকল করবে এবং যারা সাহায্য করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২৪. গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করার পর মেধা তালিকা নেই। তবে স্নাতক (সাধারণ এবং অনার্স) পর্যায়ে যারা গড়ে সর্বোচ্চ গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরেও বিশেষ স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা হবে। গ্রেডিং পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

# ২২ শিক্ষার্থীকল্যাণ ও নির্দেশনা

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

অনেক সময় বহু সমস্যার আবর্তে অনেক শিক্ষার্থী অত্যাচারিত, বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, ফলে অনেকের জীবন নষ্ট হয়। তাই শিক্ষার্থী নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি কার্যকরভাবে প্রবর্তন করা হবে। তা করা হলে বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার এবং শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার পরিবেশ উন্নত করা যাবে এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীকল্যাণ ব্যবস্থা ও নির্দেশনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ :

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবেশ উন্নয়নে এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির/অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা।
- নারীপুরুষ, জাতিসত্বা, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা নির্বিশেষে সবাই পূর্ণ মানবাধিকার সম্পন্ন মানুষ, এই বোধ শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে উজ্জীবিত করা।
- শিক্ষার সকল পর্যায়ের পাঠক্রমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করা। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আরো ব্যাপক উন্নতমানের স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করা/জোরদার করা।
- প্রয়োজন-নির্ধারণ করে শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা প্রদান করা।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যয়ভার লাঘব করে শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নে উৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনীয় ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ও পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি করা।

**কৌশল**

১. শিক্ষার্থী কল্যাণ এবং উপদেশ-সেবা সকল শিক্ষা স্তরে চালু/শক্তিশালী করা হবে।

২. সর্বস্তরের শিক্ষক উপদেষ্টাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. পাঠ্যাতিরিক্ত কার্য্যক্রম (যথা খেলাধুলা, বিতর্ক, বই পড়া, রচনা প্রতিযোগিতা, ম্যাগাজিন প্রকাশনা ইত্যাদি)-এ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত ও সহায়তা করা হবে।

৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল ধারার শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হবে।

৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে এবং উচ্চশিক্ষার জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করার জন্য ঋণ প্রদানকারী সংস্থা / ব্যাংকসমূহকে উৎসাহিত করা হবে।

৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য পুষ্টিকর দুপুরের খাবার এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগসহ সমৃদ্ধ চিকিৎসা কেন্দ্র থাকবে।

৭. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করার জন্য শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও স্থানীয় সমাজের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কর্মদল গঠন করা হবে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৮. কর্তৃপক্ষের সাহায্য, নাগরিকদের দান, প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অনুদান নিয়ে প্রতি শিক্ষায়তনে ছাত্রকল্যাণ তহবিল গঠন করে অভাবগ্রস্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৯. প্রতিটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক ব্যায়ামগার তৈরির পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তা কোন স্তরে কী আকারের ও পর্যায়ের হবে তা একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।

১০. যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি বিদ্যমান আছে সেগুলোকে আরও জোরদার করা হবে। শিক্ষার্থীদের পরামর্শক-শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যকর নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি চালু করা হবে।

১১. প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু করা এবং থাকলে তা অব্যাহত রাখা ও জোরদার করা হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতমানের স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং থাকলে তা অব্যাহত রাখা এবং মানোন্নয়নের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষার্থীকল্যাণ কাজে পরামর্শক প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা দেওয়ার জন্য একটি জাতীয় শিক্ষার্থী কল্যাণ নির্দেশনা ও পরামর্শকেন্দ্র স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

# ২৩ শিক্ষার্থী ভর্তি

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

একজন শিক্ষার্থীকে যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্যে তাকে তার মেধা ও মননের উপযোগী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ করে দেওয়াপ্রয়োজন। শিক্ষার্থীর আঞ্চলিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তে তার মেধা ও প্রবণতা যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির মাপকাঠি হয় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। কোনো কোনো স্কুলে ভর্তি করার জন্যে কোমলমতি শিশুদের নানারকম তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত করে প্রথম শ্রেণীতেই বিষয়ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করা হবে। প্রাথমিকউত্তর সকল পর্যায়ে ভর্তির জন্য নীতিমালা তৈরি করা হবে এবং সেগুলো অনুসরণ করা হবে।

প্রসঙ্গতঃ যে কোন পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিচিতিতে মাতা-পিতা উভয়ের নাম অথবা আইনগত অভিভাবকের নাম উল্লেখ করা হবে এবং প্রাথমিক পরীক্ষা পাসের সনদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এদের নাম থাকবে।

**কৌশল**

১. প্রত্যেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যথাযথ নীতিমালা নির্ধারণ করে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ করবে। এতে ভাষা (বাংলা ও ইংরেজি) এবং বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন থাকবে। পূর্ববর্তী পাবলিক পরীক্ষায় অর্জিত ফলাফলকে ভর্তির ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং সেটি মূল্যায়নের বিধিমালা থাকবে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের এক মাসের মধ্যে ভর্তি পরীক্ষার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

২. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য পূর্ববর্তী পাবলিক পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের মূল্যায়ন বিধিমোতাবেক করা হবে। পাশাপাশি নির্বাচনী পরীক্ষা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা ও তদারকির ভিত্তিতে নেওয়া যাবে। নির্বাচনী পরীক্ষা ভাষা (বাংলা এবং ইংরেজি) এবং শিক্ষার্থীর নির্বাচিত বিষয় ভিত্তিক হবে।

৩. নীতিগতভাবে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য নির্বাচনী পরীক্ষা থাকবে না তবে যেসকল বিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা অপেক্ষা ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হবে সেসকল বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পরবর্তী যে সকল শ্রেণীতে ভর্তির জন্য নির্বাচনী পরীক্ষার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থে কোড পদ্ধতি অবলম্বন করে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে।

৪. শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাসের শিক্ষক -শিক্ষার্থী অনুপাত বিবেচনায় আনা হবে। এই বিবেচনায় নির্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না।

# ২৪ শিক্ষক প্রশিক্ষণ

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

সুশিক্ষা ও মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক। শিক্ষকের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য একদিকে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা, অন্যদিকে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক-শিক্ষা এবং চাহিদাভিত্তিক যুগপোযোগী পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন করা।

দেশে প্রচলিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই গতানুগতিক, অসম্পূর্ণ, সনদপত্র সর্বস্ব, তত্ত্বীয় বিদ্যাপ্রধান, ব্যবহারিক শিক্ষা অপূর্ণ, মুখস্থ বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল এবং পুরনো পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসারী। তাই আশানুরূপ ফললাভ হচ্ছে না। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ১৪টি সরকারি প্রশিক্ষণ কলেজ, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য ৫টি এইচ.এস.টি.টি.আই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য একটি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে। ১৪টি সরকারি প্রশিক্ষণ কলেজেই বিএড ডিগ্রি দেওয়াহয়। কয়েকটি প্রশিক্ষণ কলেজে এমএড ডিগ্রিও প্রদান করা হয়। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ও দূর শিক্ষণের মাধ্যমে প্রতি বছর বিএড ডিগ্রি প্রদান করছে। এছাড়া ১০৬ টি বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এগুলোতে ভৌতব্যবস্থা, প্রশিক্ষকের মান এবং প্রদত্ত প্রশিক্ষণ অনেক ক্ষেত্রে খুবই নিম্নমানের।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ৫৩টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। এগুলোতে এক বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে তা অপ্রতুল, চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত এবং যুগোপযোগী নয়। তাই প্রশিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন করা হবে। পাশাপাশি শিক্ষকদের শিক্ষাদানে দক্ষতা মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ –

- শিক্ষক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের শিখন-শিখানো কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।
- শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং সময়ের সঙ্গে যুগোপযোগীকরণে সহায়তা দান।
- শিক্ষকদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি এবং নেতৃত্বের গুনাবলী জাগ্রত করা।
- শিক্ষকদেরকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দেশের জরুরী সমস্যাগুলোর সাথে পরিচিত করা এবং তাদের সাথে সম্পৃক্ত করতে সাহায্য করা।
- শিক্ষকদের আচরনিক দক্ষতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা এবং দুর্বলতার কারণ অনুসন্ধান করে প্রতিশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করা।
- শিক্ষণের জন্য আধুনিক উপকরণ ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন এবং তা ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
- নতুন নতুন শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা ও কৌশল বৃদ্ধি করা।
- গবেষণা পত্র তৈরী ও প্রতিবেদন পেশের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব অর্জনে সহায়তা করা।
- সমাজের সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতিসত্ত্বা, আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ দিয়ে পাঠদানে উৎসাহিত করা।
- সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ক্ষুদ্রজাতিসত্ত্বা এবং প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের বিশেষ শিখন চাহিদা অনুসারে শিখন সেবা প্রদানের কলাকৌশল অর্জনে সহায়তা করা।
- সমস্যাদি বিশ্লেষণে দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা বৃদ্ধি করা।
- তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় সকল স্তরের শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করে উন্নত ও আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এর সর্বোচ্চ অনুশীলনে উৎসাহিত করা।
- দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন থেকে কার্য সম্পাদনের জন্য শিক্ষকদেরকে উৎসাহিত করা।
- গবেষণা কাজে অংশগ্রহণের জন্য আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি এবং গবেষণা কাজে উৎসাহিত করা।

**কৌশল**

১. নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য দুই মাসের বুনিয়াদী ও কলেজ শিক্ষকদের জন্য চারমাসের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের কাজে যোগদানের তিন বছরের মধ্যে যথাক্রমে সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন ও বিএড কোর্স সম্পন্ন করতে হবে।

২. শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আধুনিকীকরণ করা হবে।

৩. প্রশিক্ষকদের পরিবর্তিত নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তনের আগেই নিজ নিজ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে এবং এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ধারণা থাকতে হবে।

৪. প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রম সি-ইন-এড পরিবর্তন করে নতুন কার্যক্রম প্রবর্তন করা হবে। এ কার্যক্রমের মেয়াদ এক বছর থেকে বৃদ্ধি করে ১৮ মাস করা হবে। নতুন কার্যক্রমে শিখন-শেখানো ও মূল্যায়নের আধুনিক কলা-কৌশল সংযোজন করা হবে। ইন্টার্নসিপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্যবহারিক পাঠদানের মেয়াদ দুই পর্যায়ে কমপক্ষে নয় মাস করা হবে।

৫. সরকারি কলেজের শিক্ষকদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)এ দেওয়া হচ্ছে এবং এটি চলমান থাকবে। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক শিক্ষককে তিন বছর অন্তর বিষয়ভিত্তিক সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বেগবান করার জন্য প্রত্যেক বিভাগে একটি করে আঞ্চলিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৬. শিক্ষা প্রশাসনে যোগ্য ও আত্মবিশ্বাসী কর্মকর্তা সৃষ্টির জন্য চাকুরীর মধ্য ও উচ্চ স্তরে ব্যাপক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হবে।

৭. বেসরকারি বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকবৃন্দকেও বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এইচএসটিটিআই-তে বর্তমানে চলমান বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ জোরদার করা হবে।

৮. দেশের সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মান সমপর্যায়ে উন্নীত করা এবং সেগুলোতে যথাযথ পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান সমূহের নিজস্ব কর্মকর্তাদের সমপর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে বদলীর ব্যবস্থা করা হবে।

৯. প্রশিক্ষকদের মানোন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষদের জন্যও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে।

১০. প্রশিক্ষণে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ব্যাপক ব্যবস্থা করা ও প্রশিক্ষণার্থীদের ভূমিকার উপযুক্ত মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হবে।

১১. সকল শিক্ষক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হবে যাতে সকল একাডেমিক ষ্টাফ এর ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে যুগোপযোগী রাখতে পারেন।

১২. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হবে। কোনো দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে তা বিশেষ ব্যবস্থায় দূর করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১৩. বিভিন্ন পর্য্যায়ের ও ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা, প্রতিবন্ধী, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক) ভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের উপযোগী দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়বস্তুর তারতম্য থাকবে।

১৪. শিক্ষক সংগঠনগুলো তাদের কর্মকাণ্ড শুধু পেশাগত দাবি আদায়ের মধ্যে নিয়োজিত না রেখে শিক্ষকদের মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হবে।

১৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উৎসাহিত করা হবে।

১৬. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণকালীন আর্থিক মঞ্জুরি বাড়ানো এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

১৭. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো বস্তুনিষ্ঠ ও কার্যকর এবং সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণের স্বার্থে নিম্নমানের বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে নিরুৎসাহিত করে সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণকালীন পূর্ণ আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

# ২৫ শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব

**বাস্তবতা ও দিকনির্দেশনা**

প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সর্বত্র শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষকতায় আগ্রহী এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সকল স্তরের শিক্ষকদের মর্যাদার বিষয় গভীরভাবে বিবেচনা পূর্বক পুনর্বিন্যাস করা হবে যাতে তারা যথাযথ মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন। একই সাথে শিক্ষকদের অধিকারের সঙ্গে তাদের দায়িত্বের সামঞ্জস্য থাকতে হবে। শিক্ষকদেরকে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পাঠদানসহ তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে হবে। শিক্ষার পরিবেশ ও মান যাতে উন্নত হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলের যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে।

**কৌশল**

১. সামাজিক বাস্তবতা সামনে রেখে সকল স্তরের ও ধারার শিক্ষকদের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা এবং দায়-দায়িত্বের বিষয় গভীরভাবে বিবেচনা করে তা পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়টির দু'টি বিশেষ দিক রয়েছে :

- শিক্ষকদের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ঃ শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা শুধুমাত্র সুবিন্যস্ত বাক্য গাথার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকৃত অর্থে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়া না হ'লে শিক্ষার মানোন্নয়ন করা সম্ভব নয়। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের আত্মপ্রত্যয়ী, কর্মদক্ষ ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এক একজন সফল অবদানকারী হিসাবে গড়ে তোলা জরুরী। এজন্য শিক্ষকদের দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, শিক্ষাখাতকে শক্তিশালী করার জন্য প্রাপ্ত বৈদেশিক বৃত্তি ও প্রশিক্ষণের সুযোগ শিক্ষকদের দেওয়া হবে। আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল স্তরেরশিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা হবে।
- শিক্ষকদের দায়-দায়িত্ব ঃ প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দক্ষতা, মর্যাদা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ জরুরি। তাদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা মূল্যায়ণের অব্যাহত ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষার সকল স্তরের জন্য উপর্যুক্ত দু'টি বিষয়ে অর্থাৎ মর্যাদা ও বেতনভাতাসহ সুযোগ-সুবিধার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা সুপারিশ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতিনিধিত্ব সংবলিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হবে।

২. মহিলা শিক্ষকদের চাকরিতে নিয়োগসহ কোনো ক্ষেত্রেই বৈষম্য রাখা হবে না। সমযোগ্যতাসম্পন্ন মহিলাদের বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৩. শিক্ষার সকল পর্যায়ে শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে জেষ্ঠ্যতা এবং শিক্ষার সকল পর্যায়ে তাদের শিক্ষকতার মান বিবেচনায় আনা হবে। সেজন্য শিক্ষকতার মান নির্ণয় করার পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে। গৃহীত প্রশিক্ষণও শিক্ষার সর্বস্তরে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে উন্নতমানের প্রকাশনা ও গবেষণা এবং গৃহীত প্রশিক্ষণ বিবেচনায় নেওয়া অব্যাহত থাকবে।

৪. শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজে বিশেষ অবদান, মৌলিক রচনা ও প্রকাশনার জন্য শিক্ষকদের সম্মানিত ও উৎসাহিত করা হবে।

৫. মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্বাচিত শিক্ষকদের শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে পদায়ন করা হবে এবং তাঁদের পদোন্নতির সুযোগ থাকবে ।

৬. শিক্ষক সংগঠনগুলোর উচিত শিক্ষকদের নৈতিক আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা এবং এ নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা। এ ব্যাপারে সরকারও একটি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে।

৭. দায়িত্ব পালনকালে পরীক্ষায় নকল ও অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ করতে গিয়ে শিক্ষকগণকে যাতে সন্ত্রাসী ও দুস্কৃতিকারীদের হামলার মুখোমুখি হতে না হয় সেলক্ষ্যে তাদের নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮. পেশাগত আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হবে এবং বিধিসম্মতভাবে প্রয়োগ করা হবে।

৯. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে ছুটির সময় ব্যতীত শিক্ষা সংক্রান্ত কাজের বাইরে অন্যান্য কাজে সম্পৃক্ত করা হবে না।

১০. সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অন্যান্যদের মতো অর্জিত ছুটির ব্যবস্থা থাকবে।

১১. শিক্ষার্থীদের মনে সুকুমার বৃত্তির অনুশীলনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি, তাদের মধ্যে শ্রমশীলতা, সহনশীলতা, ধৈর্য্য, নিজ ও অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা এবং অধ্যবসায়ের অভ্যাস গঠন; কুসংস্কারমুক্ত, দেশপ্রেমিক ও কর্মকুশল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত বিনির্মাণের ব্রত নিয়ে শিক্ষকবৃন্দ মনোযোগ সহকারে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করবেন। অন্যান্য শিক্ষা সম্পর্কিত কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করা তাঁদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে। এজন্য শিক্ষকবৃন্দের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করা বাঞ্ছনীয়। নিম্নের সময়সূচী অনুসারে তাঁদেরকে বিদ্যালয়ে অবস্থান করে কার্যসম্পাদন করতে হবে–

| **শিক্ষার স্তর** | **শ্রেণী** | **সময় বিন্যাস** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **সাপ্তাহিক মোট কার্য ঘণ্টা** | **পাঠদান** | **শিক্ষার্থী পরিচালনা ও সংশোধন** | **অনুশীলনী তৈরি** | **অন্যান্য কাজ** |
| প্রাক্-প্রাথমিক | প্রাক্-প্রাথমিক শ্রেণী | ২৪ | ১২ | ৬ | ৩ | ৩ |
| প্রাথমিক | প্রথম থেকে পঞ্চম | ৩৬ | ১৮ | ৬ | ৮ | ৪ |
| | ষষ্ঠ থেকে অষ্টম | ৪০ | ২৪ | ৬ | ৬ | ৪ |
| মাধ্যমিক | নবম থেকে দ্বাদশ | **৪০** | **২৪** | ৬ | **৬** | ৪ |

# ২৬ শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

শিক্ষার মূল প্রাণবিন্দু শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে এটাও কাঙ্ক্ষিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় তাই পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষাক্রমে এগুলোর প্রতিফলন সুনিশ্চিত করা হবে। মূলতঃ শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও কাঙ্ক্ষিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হবে। আর সেই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকেই রচিত হবে পাঠ্যপুস্তক। পুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হবে যে প্রকৃত শিক্ষা যেন জীবনঘনিষ্ঠ হয় এবং তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত করে এবং চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি, অনুসন্ধিৎসা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে সহায়ক হয়।

**কৌশল**

**ক. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি**

১. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নির্ধারিত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই হবে এক ও অভিন্ন। সব রকম প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় তা অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করবে।

২. সর্বস্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে সামাজিক, মানবীয় এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে।

৩. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরসহ শিক্ষার প্রতিটি স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, চেতনা ও সঠিক ইতিহাস এবং দেশে বিরাজমান পারিপার্শ্বিকতা, মাতৃভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটবে।

৪. প্রাথমিক স্তরের এই শিক্ষাক্রম দেশজ আবহের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনঘনিষ্ঠ ও অত্যাবশ্যক শিখনক্রমের (essential learning continuum) ভিত্তিতে রচিত হবে।

৫. জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন এবং মানবিক মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করে যেন দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় তার ব্যবস্থা থাকবে এবং আত্মকর্মসংস্থান ও শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থী যেন আগ্রহী হয় এবং শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে তার প্রতিফলন ঘটানো হবে।

৬. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞান যাতে সৃজনশীলতা ও মুক্তচিন্তা উৎসাহিত করে এবং নূতন নূতন গবেষণা কাজে উদ্বুদ্ধ করে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সাবলীলভাবে এগিয়ে যেতে পারে সেই লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

## খ. পাঠ্যপুস্তক

১. সকল স্তরের পাঠ্যপুস্তকে উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহে ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, চেতনা, সঠিক ইতিহাস এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বীরত্ব কাহিনী যথার্থ উপায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২. প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পাঠসহায়ক সামগ্রীর মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ পর্যায়ক্রমে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।

৩. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিনামূল্যে যথাসময়ে বিতরণে অনুসৃত নীতি অব্যাহত থাকবে।

৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তককে আকর্ষণীয় ও সুন্দরভাবে মুদ্রণ ও যথাযথভাবে সঠিক সময়ে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে।

৫. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের লেখকদের এককালীন সম্মানী প্রদান করা হবে। বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্য লেখকদেরকে বই লিখার জন্য উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশেষ সম্মানী ও স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা হবে।

৬. উচ্চশিক্ষার জন্য নির্ধারিত পুস্তক এবং উন্নতমানের সৃষ্টিশীল ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশকদের উৎসাহিত করা হবে।

৭. পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন, পরিমার্জন ও সংস্কার সাধনের জন্য মৌলিক ও বাস্তবভিত্তিক গবেষণা, কর্মপরিকল্পনা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রয়োগ এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা হবে।

৮. পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন ও উন্নয়নের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

৯. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার সঠিক বিকাশ, ক্রমঅগ্রগতি ও জ্ঞানের আধুনিকতাকে বিবেচনায় রেখে পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স বই নির্বাচন করা হবে।

১০. প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স বই যাতে সহজে শিক্ষার্থীরা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। এজন্য গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও গ্রন্থাগারে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

## গ. পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নীতিমালা

১. বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের যে নির্দেশনা বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে রয়েছে বাস্তবতার আলোকে তা পরিবর্তন করা হবে।

২. পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রতিটি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার যে নীতিমালা নির্দেশ করা হয়েছে, সে অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ধারা অব্যাহত রাখা হবে।

## ঘ. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

১. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল দিয়ে সমৃদ্ধ করা হবে।

২. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দক্ষ, অবসরপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞগণের মধ্য থেকে উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

# ২৭ শিক্ষা প্রশাসন

**উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রশাসনের ওপর। শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন এবং নাগরিকগণের জন্য শিক্ষা সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য যথাযথ কর্মসূচী এবং প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা প্রশাসনকে আধুনিকায়ন প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ, গতিশীল, জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ এবং ফলপ্রসূ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। শিক্ষা প্রশাসনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ ঃ

- দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ এবং জাতীয় অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় নতুন জ্ঞান উদ্ভাবনে সক্ষম করে তোলা;
- শিক্ষা প্রশাসনের সকল স্তরে জবাবদিহিতা,গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রশাসনের কার্যকরিতা বৃদ্ধি ও দুর্নীতিমুক্তকরণ;
- শিক্ষা প্রশাসনের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে স্বচ্ছতা, জবাব-দিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নকরে শিক্ষার মানোন্নয়ন;
- দেশের সকল এলাকায় সকল মানুষের জন্য শিক্ষার সুষম সম্প্রসারণ ও গুণগত উৎকর্ষ সাধন;
- দেশের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন জন সম্পদ তৈরী।

**কৌশল**

শিক্ষা প্রশাসনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নের কৌশলগুলো অবলম্বন করা হবে

**১. সমন্বিত শিক্ষাআইন প্রণয়ন**

শিক্ষা সংক্রান্ত সকল আইন, বিধি-বিধান ও আদেশাবলী একত্রিত করে এ শিক্ষানীতির আলোকে এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত শিক্ষাআইন প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

**২. স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন**

সময়ের প্রয়োজনে দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে শিক্ষানীতির পরিমার্জন ও প্রয়োজনে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। শিক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্য-উপাত্ত, তথ্যপ্রযুক্তি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে আইনের মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসিত সংবিধিবদ্ধ একটি স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হবে। এই কমিশন জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর পরামর্শদানকারী সংস্থা হবে। বিভিন্ন স্তর ও ধারায় শিক্ষানীতির সুষ্ঠু ও কার্যকর বাস্তবায়ন কিভাবে হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা, এতদ্‌সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন সরকার ও জাতীয় সংসদের কাছে উপস্থাপন করা ও সুপারিশমালা প্রদান করা হবে এই কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। শিক্ষানীতির সময়োপযোগী পরিমার্জন ও প্রয়োজনে পরিবর্তন করার সুপারিশ তৈরি করাও এই কমিশনের দায়িত্ব হবে।

Dhaka University Institutional Repository

### ৩. শিক্ষানীতির আওতাধীন ও এম.পি.ও.ভুক্ত সকল ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, বদলি ও পদোন্নতি

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ, নিয়োগকৃত শিক্ষকদের মানোন্নয়ন এবং সীমিত জাতীয় সম্পদের সদব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কতিপয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে-

- সরকারি অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ি মাদরাসা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদরাসা ও কলেজের জন্য মেধাভিত্তিক ও উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ একটি বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে।
- বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন এর মাধ্যমে দ্রুত এবং যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নির্বাচন করে এলাকাভিত্তিক ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগদানের ব্যবস্থা করা হবে;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকে সুনির্দিষ্ট যোগ্যতার নিরিখে (উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন, মৌলিক গবেষণা কর্ম, শিক্ষাদান পদ্ধতি উন্নয়ন ইত্যাদি) প্রতিযোগীতা মূলক ভাবে উচ্চতর পদে নিয়োগ প্রদান করা হবে, যেমন প্রভাষক হতে সহকারী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক হতে সহযোগী অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপক হতে অধ্যাপক পদে। বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিধিমালার আওতায় এ ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হবে। বেতনবৃদ্ধি সফল প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনের সাথে সম্পর্কিত হবে। বৃহত্তর পরিসরে শিক্ষকদের মৌলিক সুবিধাদি নিশ্চিত করে অন্যান্য সুবিধাদি অর্জিত যোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত করা হবে ;
- বেসরকারি মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষক নিবন্ধনের জন্য বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যায়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA) নামক একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা রয়েছে। পৃথক বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠন করা হলে NTRCA−এর আবশ্যকতা থাকবে না ফলে একে বিলুপ্ত করা হবে;
- সকল পর্যায়ের সকল ধারার সকলস্তরের এম.পি.ও ভুক্ত শিক্ষকগণের চাকুরি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় বদলিযোগ্য হবে। সরকারি প্রয়োজনে এম.পি.ও ভুক্ত শিক্ষক গণকে সমধারার সমস্তরের প্রতিষ্ঠানে সমপর্যায়ের পদে বদলী করা হবে;
- সকল পর্যায়ে সকল ধারার শিক্ষকদের নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক হবে। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে।

### ৪. অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন

দেশে বর্তমানে বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানকারী বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্নাতক ও পরবর্তী) মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালণায় সক্ষম কি-না এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ব্যয় যৌক্তিক কি-না, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পড়াবার যথাযথ ব্যবস্থা আছে কি-না সে সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যায়ন জরুরি। স্বাস্থ্য, প্রকৌশল এবং কৃষিশিক্ষা প্রদানকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষেত্রে ও একই কথা প্রযোজ্য।

অপর দিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানকারী সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মান-নির্ণয় এবং সেই ভিত্তিতে প্রতিবছর এগুলোর র‍্যাংকিং নির্ধারণ করা ও উন্নয়নের পরামর্শ দান করা হবে।

উপর্যুক্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য যথাযথ ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পন্ন একটি অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল-এর সংগৃহিত তথ্যাবলী ও এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত বাৎসরিক সমীক্ষা (প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত শাখাসমূহের ভিত্তিতে) ও প্রদত্ত মূল্যায়নের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক যথাযথ ব্যবস্থা (যেমন, উচ্চমান সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ প্রদান, যথাযথ মানসম্পন্ন নয় এমন প্রতিষ্ঠানকে মানোন্নয়নে সহায়তা করা এবং কাংখিত মান অর্জনে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা ইত্যাদি) গ্রহণ করবে।

**৫. প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক এর অফিস স্থাপন**

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ কাংখিত মানের শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করছে কিনা তা নজরদারির জন্য বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের উপর অর্পিত বহুমুখী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নজরদারির কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারছেনা।

দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানে সক্ষম কি-না এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ব্যয় যৌক্তিক কি-না সে সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন জরুরি। এ পর্যায়ে স্বাস্থ্য, কৃষি এবং কারিগরি শিক্ষা প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষেত্রে ও একই কথা প্রযোজ্য।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ পরিদর্শন করে প্রতিষ্ঠান সমূহের একাডেমিক মান নির্ণয় পূর্বক প্রতিবছর এগুলোর র‍্যাংকিং নির্ধারণ করা ও উন্নয়নের পরামর্শ দান করা হবে।

উপর্যুক্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য যথাযথ ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পন্ন একটি প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক এর অফিস স্থাপন করা হবে।

প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক সংগৃহিত তথ্যাবলী ও এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত বাৎসরিক সমীক্ষা (প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত শাখাসমূহের ভিত্তিতে) ও প্রদত্ত মূল্যায়নের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক যথাযথ ব্যবস্থা (যেমন, উচ্চমান সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ প্রদান, যথাযথ মানসম্পন্ন নয় এমন প্রতিষ্ঠানকে মানোন্নয়নে সহায়তা করা এবং কাংখিত মান অর্জনে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা ইত্যাদি) গ্রহণ করবে।

প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক দ্বারা প্রণীত রিপোর্টটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পেশ করবে এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করবে। প্রতিষ্ঠান ওয়ারি অর্থবরাদ্দের ক্ষেত্রে এ রিপোর্ট বিবেচনা করা হবে।

প্রধান শিক্ষা পরিদর্শকের অফিস স্থাপন করা হলে বর্তমান ডি আই এ অফিস পুনর্গঠন প্রয়োজন হবে। পুনর্গঠিত ডি আই এ অফিস শুধুমাত্র আর্থিক অডিট পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে এবং এ বিষয়ে পেশাজীবিদের প্রেষণ অথবা চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে অফিসটি পরিচালনা করা হবে;

৬. শিক্ষা প্রশাসনে বর্তমান মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে দুইটি পৃথক অধিদপ্তর যথাক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা অধিদপ্তর গঠন করা হবে।

শিক্ষা প্রশাসনে নিয়োজিত সকল সংস্থার জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ করে তা যথাযথ ভাবে পালনের জন্যে লোকবল ও অর্থবল এর ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি যথাযথ জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে;

৭. মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পৃথক মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

## ৮. শিক্ষা ক্যাডারের উন্নয়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ

অধিকাংশ সরকারি কলেজে শিক্ষকের পদ প্রয়োজনের চাইতে কম। কলেজ সমূহে মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক পদায়ন নিশ্চিত করা হবে। এ লক্ষ্যে সরকারি কলেজ সমূহে বিষয় এবং স্তর অনুযায়ী অভিন্ন জনবল কাঠামো নিশ্চিত করা হবে।

শিক্ষা ক্যাডারে উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনের জন্য তেমন কোন প্রণোদনার ব্যবস্থা নেই। এম.ফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের ফলে বেতনবৃদ্ধির যে ব্যবস্থা রয়েছে তা যথেষ্ট নয়। নিজ নিজ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন, এম.ফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনকারী শিক্ষকদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনার্স এবং মাস্টার্স কলেজ সমূহে পদায়নসহ বিশেষ আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হবে।

শিক্ষা ক্যাডারের অধ্যাপক পদে কর্মরত কোন কর্মকর্তা একাডেমিক ব্যুৎপত্তি অথবা নুতন উদ্ভাবনীর জন্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হলে বিশেষ আর্থিক সুবিধা এবং পদমর্যাদা পাবেন।

শিক্ষা ক্যাডার পরিচালনায় আধুনিক ব্যবস্থাপনার রীতি অনুসরণ করা হবে। শিক্ষকগণের মূল্যায়নের জন্য প্রচলিত এ.সি.আর. ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করা হবে এবং পারফরমেন্স ভিত্তিক মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রচলন করা হবে। পারফরমেন্স ভিত্তিক মূল্যায়নের উপযুক্ত রিপোর্টিং ফরম্যাট উদ্ভাবন করা হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিমওয়ার্ক বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তির মূল্যায়নে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের র‍্যাংকিং-এর উপর নাম্বার অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রত্যেক শিক্ষক এবং তার সুপারভাইজার মিলে শিক্ষকের জন্য বার্ষিক, ষান্মাসিক ও ত্রৈমাসিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ভিত্তিতে শিক্ষক মূল্যায়ন করা হবে। শিক্ষকগণের পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার সাথে সাথে পারফরম্যান্স গুরুত্ব পাবে। জ্যেষ্ঠতার কারণে একজন শিক্ষক পদোন্নতির জন্য অগ্রে বিবেচিত হবেন তবে শুধুমাত্র উপযুক্ত পারফরম্যান্স এর অধিকারী হলে পদোন্নতি পাবেন। পারফরম্যান্স ভিত্তিক পদোন্নতি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

## শিক্ষার স্তরভিত্তিক কতিপয় কৌশল

### প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বর্তমান সময়ের বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে পুনর্বিন্যাস করা হবে। এতে স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করা হবে।

### কৌশল

১. প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনে আরো ক্ষমতা দিয়ে কার্যকর করে তোলা হবে। নারী অভিভাবকের সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে শিক্ষক-অভিভাবক কমিটি গঠন করে এবং এটিকে অধিকতর কার্যকর করে অভিভাবকদের বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা হবে। এছাড়াও স্থানীয় জনসাধারণকে প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও এর মানোন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হবে ;

২. শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য যথাযথ মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ অত্যন্ত জরুরী। তাই শিক্ষক নির্বাচন কমিশন-এর মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা হবে;

৩. শিক্ষকদের বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রধান শিক্ষক করবেন। প্রধান শিক্ষকের কাজের মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে জোরদার করা হবে;

৪. বিদ্যালয়গুলোর পরিবীক্ষণ আরো কার্যকর করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা কাঠামোর উন্নয়ন সাধন করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

**মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা**

আধুনিক যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী শিক্ষা প্রশাসন ছাড়া শিক্ষার সফল প্রসার ও মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। এলক্ষ্যে মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা প্রশাসনকে প্রয়োজনানুসারে সংস্কার করা হবে। স্থানীয় জনসাধারণকে এই প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করা হবে।

**কৌশল**

১. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। জেলা শিক্ষা অফিসারের পদটি জেলার অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে সুসামঞ্জস করা হবে;

২. বিদ্যালয়/কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনে অধিকতর ক্ষমতা দিয়ে আরো জোরদার করা হবে। অভিভাবক, স্থানীয় শিক্ষা অনুরাগী ও নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সমন্নয়ে তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হবে;

৩. অ্যাকাডেমিক তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ জোরদার করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যানুপাতে বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করতে হবে যেন প্রতিটি বিদ্যালয় প্রতি মাসে অন্তত একবার বিস্তারিতভাবে পরিদর্শন করা সম্ভব হয়;

৪. অধিদপ্তরে বর্তমান EMIS কম্পিউটার সেলকে সম্প্রসারণ করে আধুনিকীকরণ করা হবে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার জন্য এর কম্পিউটার সেলকে সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হবে এবং তাতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা হবে।

৫. স্কুলম্যাপিং কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে একাডেমিক স্বীকৃতি এবং এম, পি, ও , ভুক্তির অনুমোদন প্রদান করা হবে;

৬. সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণার্থে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সমান সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে সরকারের আর্থিক পরিস্থিতি এবং শিক্ষকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণগত যোগ্যতার আলোকে মূল বেতনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সরকার থেকে প্রদান করা হবে;

৭. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত কল্যাণ ট্রাস্ট, চিকিৎসা ব্যয়, অকালমৃত্যুতে পরিবারকে এককালীন সাহায্য করা, পেনশন, অবসরকালীন এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান ইত্যাদি ব্যবস্থা জোরদার করা হবে;

৮. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা জরুরি। এই নীতিমালায় জাতীয়করণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত বিধি-বিধান থাকবে যাতে কর্মকমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। একই সাথে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও থাকবে;

৯. যে সকল উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সরকারি কলেজ নাই সেসকল উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

১১. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সংখ্যানুপাতে সরকারি স্কুল, কলেজ, টি টি কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ জেলা শিক্ষা অফিস, আঞ্চলিক অফিস ও অধিদপ্তরে প্রয়োজনানুসারে কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে;

১২. ব্যক্তি বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় আনা প্রয়োজন। এ সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সমতার ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে;

Dhaka University Institutional Repository

১৩. জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য অর্জনকারী উচ্চমান সম্পন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ সরকারি সহায়তা প্রদান করা হবে।

**বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষা প্রশাসন**

১. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এ দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন ও নেতৃত্ব প্রদান করবে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মান যাতে একটি মর্যাদাপূর্ণ আসনে স্থিত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন এই কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব বলে বিবেচিত। সকল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় উন্নয়ন প্রকল্প, নতুন বিভাগ খোলা, বর্তমান বিভাগের সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেবে। তবে নতুন পদসৃষ্টি, নতুন বিভাগ, কেন্দ্র বা ইনস্টিটিউট খোলা এবং নির্ধারিত সংখ্যার অধিক শিক্ষার্থী ভর্তির সিদ্ধান্ত অর্থপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা সাপেক্ষে নিতে হবে। উচ্চশিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আইন-এর মধ্যে যে সকল অসঙ্গতি রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে দূর করা হবে। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত, এর সকল কর্মকাণ্ড স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাভিত্তিক হতে হবে। এলক্ষ্যে মঞ্জুরী কমিশন আইন প্রয়োজনীয়ভাবে সংশোধন করা হবে।

২. সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকাণ্ড, কর্মপরিধি পরীক্ষা ও পর্যালোচনা এবং শিক্ষার মান সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিবীক্ষণের দায়িত্বে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

৩. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ক্ষেত্রবিশেষে অন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করবে যাতে অতিরিক্ত প্রশাসনিক দায়িত্বভার শিক্ষকদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত না করে।

**জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়**

১. অনুমোদনকারী ও প্রশিক্ষণদানকারী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও ব্যাপকতা বিশাল হওয়ায় এর কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। প্রত্যেক বিভাগীয় সদরে কেন্দ্র স্থাপন করে এর কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণ করা জরুরি প্রতীয়মান হওয়ায় দ্রুত এই কাজ সম্পন্ন করা হবে। কেন্দ্রগুলোকে বিধিবদ্ধভাবে দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হবে। সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এক্ষেত্রে জরুরিভিত্তিতে পদক্ষেপ নিবে;

২. গাজীপুরে অবস্থিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাম্পাস-এর দিকনির্দেশনা ও তদারকিতে বিভাগীয় কেন্দ্রগুলো পরিচালিত হবে। এই কেন্দ্রীয় ক্যাম্পাস ঢাকা বিভাগীয় কেন্দ্র হিসাবেও দায়িত্ব পালন করবে। পরবর্তীতে এসকল কেন্দ্রকেও স্ব স্ব এলাকার জন্য পৃথক পৃথক অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

# ২৮ শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপ

১. যে কোনো স্তরের শিক্ষা সমাপনান্তে কর্মসংস্থানের লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষাজীবনে লব্ধ শিক্ষাগত যোগ্যতা বা কারিগরি দক্ষতা ও শ্রমবাজারের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর জন্য দ্রুত শ্রম বাজারে কারিগরি দক্ষতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার চাহিদা ও সরবরাহ জরিপ করা হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তরে জরিপ অব্যাহত রাখা হবে।

২. জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী যে সকল ক্ষেত্রে বিশেষ কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন জনবলের তাৎক্ষণিক চাহিদা রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অর্থ ও উপকরণ বরাদ্দ ও উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে চাহিদাসম্পন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত পর্যাপ্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৩. দেশে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি জনবলের চাহিদা নির্ণয় করে সে অনুযায়ী জনশক্তি গড়ে তোলা হবে। এ সকল ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হতে পারে। তবে আর্থ-সামাজিক ও বিভিন্নভাবে পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে আসা ছেলেমেয়েরা যাতে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে তার সুযোগ ও ব্যবস্থা থাকবে ।

৪. পর্যায়ক্রমে সকল স্তরে শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষালব্ধ দক্ষতা ও আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন জনশক্তির চাহিদার সমন্বয় বিধানের লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রণয়ন করা হবে।

৫. শিক্ষা স্তর ও ধারা নির্বিশেষে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রযোজ্য শর্তপূরণসাপেক্ষে (যেমন, প্রশাসনিক ও ভৌত কাঠামো, ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা, ছাত্র বেতন ও শিক্ষক পারিশ্রমিক, অর্থায়ন, শিক্ষাক্রম, সহশিক্ষাক্রম, শিক্ষার উপকরণ ইত্যাদি) যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধিত হতে হবে। নিবন্ধিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতি বছর বহিঃনিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষিত হতে হবে এবং নিরীক্ষিত হিসাবের অনুলিপি নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে। এ ব্যাপারে যথাযথ আইন প্রণয়ন করা হবে।

৬. যেসব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের উৎস আছে এবং যেসব প্রতিষ্ঠান চার্চ, ট্রাস্ট ও দেশি-বিদেশি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সরকারের শিক্ষাখাত থেকে বিশেষ বিবেচনায় বরাদ্দ দেওয়া হবে। এ সকল প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে নিবন্ধিত হতে হবে এবং শিক্ষার স্তরভিত্তিক প্রযোজ্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও অন্যান্য নীতিমালা বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে। তবে বর্তমানে অধিক হারে বেতন আদায়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বেতন আদায়ের বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করা হবে। চাঁদা আদায়ের বিষয়টিও নীতিমালার আওতায় আনা হবে।

৭. প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্নমুখী বিচ্যুতি ও অসঙ্গতির কারণে শিক্ষক সমাজের একাংশের নৈতিকতাবোধের অভাবে দেশে ব্যাপকভাবে প্রাইভেট টিউশনের ব্যবস্থা এবং কোচিং সেন্টার চালু হয়েছে। যথোপযুক্ত প্রতিকারের উদ্যোগ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের জন্য ক্ষতিকর এই ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রন ও নিরুৎসাহিত করে এর অবসান ঘটানো হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮. জরিপে দেখা গেছে যে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদরাসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি শিক্ষকদের প্রাপ্য সরকারি অনুদান ও বিদ্যালয়ে সরকার কর্তৃক দেয় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। অনুসন্ধানের মাধ্যমে এসকল ভুয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও লোককে চিহ্নিত করে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে, প্রয়োজনে জোরদার করা হবে।

৯. শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার স্বার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে দলভিত্তিক রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখা জরুরী। এই লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন ও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে।

১০. শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর জন্য আচরণবিধি তৈরি করা এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করা জরুরি। এই লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য পৃথক পৃথক উপযুক্ত কমিটি গঠন করে দ্রুত আচরণবিধি তৈরির কাজ সম্পন্ন করার পদক্ষেপ নেয়া হবে। শিক্ষার কোনো স্তরেই শিক্ষার্থীরা যেন কোনোভাবেই শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের মুখোমুখি না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

১১. ব্যাংক, বেসরকারি শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদেরকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদানে উৎসাহিত করা হবে।

১২. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মচারী (তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী)-র সংখ্যা; প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং তাঁদের কাজের পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে নির্ধারণ করা হবে। এর জন্য একটি নীতিকাঠামো তৈরি করা হবে।

১৩. কর্মচারীদের চাকুরির নিয়মাবলী তৈরি করে তা বিধিবদ্ধ করা হবে এবং যাঁরা চাকুরিতে আছেন তাঁদেরকে তা অবগত করা হবে। আর যাঁরা পরে কাজে যোগদান করবেন তাঁদেরকে নিয়োগপত্রের সঙ্গে নিয়মাবলী লিখিতভাবে জানানো হবে। তাঁদের বেতনকাঠামো যুগোপযুগী করা হবে।

১৪. সর্বপর্যায়ের শিক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্য একত্র করে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক একটি সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই যাতে সহজে তা ব্যবহার করার সুযোগ পায় সেরকম ব্যবস্থা করা হবে। এ সকল তথ্য হালনাগাদ রাখার ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (BANBEIS)-কে এই লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি, নেটওয়ার্কিং, অর্থ ও জনবল দিয়ে আরো শক্তিশালী করা যায়। তবে কার্যকর তদারকির মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যাতে দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারি উদ্যেগেও শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডার সৃষ্টি উৎসাহিত করা হবে।

১৫. বাংলা ভাষার উন্নয়নে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখা এবং ব্যাপকভাবে বিদেশি ভাষার আধুনিক বই, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন শাখার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই বাংলায় অনুবাদ করার জন্য বাংলা একাডেমীকে উৎসাহিত এবং লোকবল ও অর্থবল দিয়ে সহায়তা করা হবে।

১৬. বাংলাদেশে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা ও তৎসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ব্যবস্থা করার জন্য স্থাপিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে কার্যকর ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১৭. শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব, পর্যায়গুলোর মধ্যে সমন্বয় করা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজের সমন্বয় করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

## সংযোজনী - ১

## বাংলাদেশের সংবিধানের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিধান

**১৭. রাষ্ট্র**

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

**২৮. ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য**

(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

**৪১. ধর্মীয় স্বাধীনতা**

(২) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

## সংযোজনী - ২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শিম/শাঃ৪/শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সেল-২/২০০৪/১২১ তারিখ ২৩-১২-১৪১৫ বঙ্গাঃ/০৬-০৪-২০০৯ খ্রিঃ দ্বারা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার লক্ষ্যে সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। দুই জন কো-অপট করা সদস্যসহ কমিটির চূড়ান্ত গঠন নিম্নরূপ ঃ

| **কমিটি** | |
|---|---|
| *চেয়ারম্যান* | **জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী** |
| *কো-চেয়ারম্যান* | ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ<br>চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ<br>সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি |
| *সদস্য-সচিব* | অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবির<br>পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন),<br>জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), ঢাকা। |
| *সদস্য* | অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ<br>উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর |
| | অধ্যাপক আর আই এম আমিনুর রশীদ<br>উপাচার্য, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর |
| | অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম<br>সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা |
| | অধ্যাপক মুহঃ জাফর ইকবাল<br>বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং<br>শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট। |
| | অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম<br>ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা |
| | অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান<br>শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা |
| | অধ্যাপক ড. জারিনা রহমান খান<br>লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা |
| | অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর<br>মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা |
| | অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ<br>সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, ঢাকা |
| | জনাব সিরাজ উদ্দীন আহমেদ<br>অতিরিক্ত সচিব (অবসর প্রাপ্ত) |
| | জনাব মোঃ আবু হাফিজ<br>অতিরিক্ত সচিব (অবসর প্রাপ্ত) |
| | মাওলানা অধ্যাপক এ বি এম সিদ্দিকুর রহমান<br>প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সরকারি আলিয়া মাদরাসা, ঢাকা ও সিলেট |
| | বেগম নিহাদ কবির<br>ব্যারিষ্টার, সিনিয়র পার্টনার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এন্ড এসোসিয়েটস |
| | অধ্যক্ষ এম. এ আউয়াল সিদ্দিকী<br>সভাপতি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি |
| | অধ্যাপক শাহীন মাহ্‌বুবা কবীর<br>ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা |

Dhaka University Institutional Repository

# আমার বাংলা বই



পঞ্চম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

# বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

পঞ্চম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

# ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

## পঞ্চম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# বাংলা

## অষ্টম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

# ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

## অষ্টম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ